অধ্যাপক
চট্টোপাধ্যায় ও সেনগুপ্ত

উচ্চ-মাধ্যমিক
সমাজবিদ্যা

ব্যানার্জী পাবলিশার্স
কলিকাতা-৯

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত
পাঠক্রম অনুসারে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য লিখিত পাঠ্যপুস্তক।

উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা

[**Higher Secondary Sociology**]

[প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র একত্রে]

শ্রীপ্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, এম.-এ, (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
অধ্যাপক, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর,
বীরভূম।

শ্রীপ্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, এম-এ. (ডবল)
অধ্যাপক, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর,
বীরভূম।

ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫/১এ কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী
ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫/১এ কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৭৬

মূল্য : আঠার টাকা

[Paper used for the Printing of this book was made available by the Government of India at a concessional rate]

মুদ্রাকর :
শ্রীপরাণচন্দ্র রায়
সনেট প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৯ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এগার-বার ক্লাসের জন্য সমাজবিদ্যার যে পাঠক্রম প্রণয়ন করেছেন সেই পাঠক্রম অনুযায়ী রচিত উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা প্রকাশিত হল। গ্রন্থটি রচনাকালে সংসদের নির্দেশগুলি যথাযথ অনুসরণ করা হয়েছে। অনাবশ্যক আলোচনা গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করে গ্রন্থের কলেবর অযথা স্ফীত করা হয়নি। পাঠক্রমে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি এমন দু'একটি বিষয়ের আলোচনাকে যদি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হয়ে থাকে, তা করা হয়েছে কেবলমাত্র আলোচনার যোগসূত্র ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য। বিষয়বস্তুর আলোচনার জন্য যতদূর সম্ভব স্বীকৃত পরিভাষা গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচনা যাতে সহজ, সরল ও বোধগম্য হয় তার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। জটিল বিষয়গুলি উপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা শব্দের পাশেই ইংরাজী প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সংসদ গ্রন্থের যে পৃষ্ঠা সংখ্যা সীমিত করে দিয়েছেন সেটি বহুলাংশে মান্য করা হয়েছে। সংসদের নির্দেশমত প্রথমপত্র ও দ্বিতীয়পত্র একই সঙ্গে এক খণ্ডেই প্রকাশ করা হল।

এই গ্রন্থ রচনায় দেশী-বিদেশী বহু গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। যথাস্থানে পাদটীকায় লেখক ও গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে সেই ঋণের কথা স্বীকার করা হয়েছে। সেই কারণে এই সকল লেখক ও তাঁদের গ্রন্থের প্রকাশকের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থ রচনায় কলিকাতার আশুতোষ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীপরিমলভূষণ কর মহাশয় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানিয়ে এই গ্রন্থ রচনার বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। ঐ বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীঅমৃতাভ ব্যানার্জী ও হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক শ্রীজগদ্বন্ধু মেদ্দা কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে তাঁদের অভিমত জানিয়ে আমাদের এই গ্রন্থের উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করেছেন। এদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাই। শ্রীমতি বিজয়া চট্টোপাধ্যায়, এম. এ. (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনায় বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন এবং নানা আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে এই গ্রন্থ রচনায় বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁকেও জানাই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে, যাঁদের জন্য এই গ্রন্থখানি লেখা হল তারা উপকৃত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। সাধারণ পাঠকও এই গ্রন্থপাঠে সমাজবিদ্যার মূল বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন আশা করি। পুস্তকটির ভবিষ্যত উৎকর্ষের জন্য যে-কোন সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি রইল। পরবর্তী সংস্করণে তা সংযোজিত করার চেষ্টা করা হবে।

ব্যানার্জী পাবলিশার্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী এই পুস্তক প্রকাশ করে এবং সনেট প্রিন্টিং ওয়ার্কসের স্বত্বাধিকারী শ্রীপরাণচন্দ্র রায় মহাশয় পুস্তকটির মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

অনিচ্ছাসত্বেও পুস্তকটি দু-একটিতে মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে সমাজবিদ *August Comte* এবং *Kingsley Davis*-এর নামের বানান কয়েক জায়গায় ভুল মুদ্রণ হয়েছে। সেজন্য আমরা দুঃখিত। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য গ্রন্থে ব্যবহৃত পরিভাষার একটি তালিকা গ্রন্থের শেষে সন্নিবিষ্ট করা হল। ইতি—

বিনীত

হেতমপুর
১লা নভেম্বর, ১৯৭৬

প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত

SYLLABUS

SOCIOLOGY

(Elective)

Full marks—200

Paper I (Marks—100)

1. Sociology—a way of looking at Societies. Scope and subject-matter of Sociology.

Sociology as a science. Sociology and other social sciences (Economics, Politics, History, Anthropology).

2. Nature of human society. Types of social organisation in preliterate and developed societies.

3. A few preliminary concepts :

(*a*) Culture, (*b*) Community, (*c*) Association, (*d*) Institution, (*e*) Custom, folkways and mores.

4. Individual, society and culture. The individual as a social product. The effect of isolation in childhood. Socialisation of the child. Personality development. Different reactions owing to differential personality structure : The role of nature and nurture in the development of personality.

5. How people live in societies : Social processes—co-operation, competition, conflict, assimilation and accommodation.

Different forms of social organisation : Social groups, difference between social groups, social categories and social aggregates.

Different kinds of group : Primary and secondary group. Their characteristics and role in social life.

In-group and Out-group—voluntary and involuntary group, informal and formal group.

Group and individual in society.

6. Family—the most important primary group.

(i) Origin of family,

(ii) Universality of family.

(iii) Types of family.

(iv) Functions of family—social control and socialization in and through family.

(v) Family in agrarian societies and industrial societies,

(vi) Marriage and its importance.

Paper II (Marks—100)

1. Equality and inequality of members in a society. The idea of social differentiation. Superiority and inferiority among members in a society. The idea of social stratification, nature types, class, status and caste. Merits and demerits of social stratification – Social mobility.

2. The problem of social control. Definition of social control. Types and agencies of social control.

(i) Custom, folkways, mores, religion.

(ii) Public opinion, law, education, propaganda.

Effecting social control. Social order and social control as enforced through different institutions.

3. Economic institution. Pre-industrial economy—Industrialization—development of technology. Sociological effects of industrialization : Division of labour and specialization, Industrialization and social change. Agriculture and industry in developing countries.

4. Political institutions : Nature of power and authority. State and its functions, State as an organ of society. Party-system and election. Adult franchise and equality in India.

5. Education : Induction in the learner's culture. Education and socialization. Education and learning of skills. Role of educational institutions.

6. The place of religion in society : Its necessity. Magic and religion in simple societies. Religion in developed societies. Religion in India.

7. Social change. Society as a process—an ever changing phenomenon.

Factors of social change :

1. Environmental.
2. Biological.
3. Cultural.
4. Technological.
5. Psychological.

Total No. of pages should be around 425.

সূচীপত্র

প্রথম পত্র

সমাজবিদ্যা
(SOCIOLOGY)
প্রথম-পত্র

প্রথম অধ্যায়

সমাজবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী, পরিসর ও বিষয়-বস্তু (The Standpoint, Scope and Subject-matter of Sociology)

১। সমাজবিদ্যা—সমাজের প্রতি এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক (Sociology—a way of looking at Societies) :

মানুষ মাত্রেই সামাজিক জীব। সমাজবর্জিত মানুষ হয় পশু, না হয় দেবতা। সমাজেই মানুষের জন্ম, সমাজেই তার বৃদ্ধি, সমাজেই তার প্রতিষ্ঠা, আবার এই সমাজেই তার মৃত্যু। অর্থাৎ যে সমাজকে কেন্দ্র করে তার জীবনের শুরু, সে-সমাজেই তার শেষ পরিণতি। মানব ইতিহাসের শুরু থেকেই মানুষ ও সমাজ—একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, অথচ এই সমাজ তথা সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক বিষয়ে মানুষের সচেতনতা আসে অনেক পরে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (*Plato*)-র রিপাব্লিক (Republic) এবং অ্যারিষ্টটল (*Aristotle*)-এর 'এথিক্স এণ্ড পলিটিক্স' (Ethics and Politics) গ্রন্থ দুটিতে প্রসঙ্গক্রমে হলেও সমাজ সম্পর্কে আলোচনার প্রথম অবতারণা হয়। এরপর চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে ক্রমশঃই ব্যক্তি এবং সমাজ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা, আলোচনা এবং গবেষণামূলক পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশ ভারতবর্ষে সমাজ-চিন্তার সুপ্রাচীন আভাস খুঁজে পাওয়া যায় ধর্মীয় নানা পুঁথি-পত্রে; বিশেষতঃ, উপনিষদের সূত্রে এবং পুরাণে। অন্যান্য বহু বিষয়ের সঙ্গে দার্শনিক প্রশ্ন, প্রথাগত আইন, ইতিহাস, নীতি প্রভৃতির আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। দার্শনিক মনুর আইন এ ব্যাপারে বিশেষত্বের দাবি রাখে। তবে প্রাচীন ভারতে সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুচিন্তিত বিশ্লেষণমূলক আলোচনার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় চাণক্য বা কৌটিল্যের বিখ্যাত অর্থশাস্ত্রে। এর পর থেকে বিভিন্ন সমাজবিদ্ সমাজের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। এর ফলে উদ্ভব হয়েছে ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মানববিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, আইন, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন সামাজিক বিদ্যার (Social sciences)। সমাজবিদ্যা (Sociology) এই সব সামাজিক বিদ্যার অন্যতম ও কনিষ্ঠতম।

বস্তুতঃ, ফরাসী সমাজবিদ্ অগষ্ট কোঁৎ (*Auguste Comte*) খ্রীষ্টীয় ১৮৩৯ সালে প্রথম '*Sociology*' শব্দটি প্রবর্তন করে একটি স্বতন্ত্র সামাজিক বিদ্যা হিসেবে সমাজবিদ্যার সূচনা করেন।

'সোসিওলজি' কথাটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ 'সোসিয়াস' (Socious) এবং গ্রীক শব্দ লোগোস (logos)-এ দুয়ের সংযোগ থেকে। 'সোসিয়াস্' মানে সমাজ আর 'লোগোস' মানে জ্ঞান। অর্থাৎ সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান বা আলোচনা থাকে যে শাস্ত্রে তাই সমাজবিদ্যা। সুতরাং বলা যেতে পারে সমাজ যে শাস্ত্রের মূল বিবেচ্য বিষয় সেই শাস্ত্রই সমাজবিদ্যা।

এখন প্রশ্ন হলো, সমাজবিদ্যার যাবতীয় আলোচনা যে সমাজকে কেন্দ্র করে সেই সমাজ বলতে আসলে কি বুঝব? ঐতিহাসিক, রাজনীতিবিদ্, অর্থনীতি-বিদ্, আইনজ্ঞ প্রমুখ সামাজিক চিন্তাবিদ্দেরও আলোচনার পটভূমি ঐ একই সমাজ; তাহলে প্রশ্ন হল, সমাজবিদেরা (Sociologists) কোন্ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে দেখেন?

সমাজ ছাড়া মানুষ নিজের অস্তিত্ব কল্পনাও করতে পারে না। স্বভাবের তাগিদেই হোক বা প্রয়োজনের খাতিরেই হোক—স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গ ও সহযোগিতা কামনা করে এবং জড়িয়ে পড়ে পরস্পরের সঙ্গে নানারকম সম্পর্কের জটিল জালে। এই পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল জালকেই সমাজ নামে অভিহিত করা হয়।

তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কমাত্রই সামাজিক হতে পারে না যদি না সে-সম্পর্ক সম্বন্ধে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের মধ্যে সচেতনতা থাকে। যদি দুজন পথিক একই পার্কে একই গাছের তলায় একই বেঞ্চিতে বসে থাকেন তাহলে তাঁদের এই যুগপৎ অবস্থানকে আমরা সামাজিক সম্পর্ক বলতে পারিনা, কেননা তাঁরা পরস্পরের উপস্থিতি সম্পর্কে আদৌ সচেতন নন। কিন্তু যে মুহূর্তে দুজনের মধ্যে বাক্য বিনিময় হলো অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হলেন, সেই মুহূর্তে তাঁদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠলো। এই সামাজিকতা বা পারস্পরিক সচেতনতা বা পারস্পরিক স্বীকৃতিই হলো সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি।

এই সম্পর্ক যে কোন ধরনের হতে পারে—রক্তের সম্পর্ক, স্নেহের সম্পর্ক, প্রীতির সম্পর্ক, অধীনতার সম্পর্ক, বশ্যতার সম্পর্ক, প্রতিযোগিতার সম্পর্ক, ঘৃণার সম্পর্ক, এমনকি শত্রুতার সম্পর্ক। এই সম্পর্ক হতে পারে পিতা পুত্রের সম্পর্ক,

শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক, ছাত্রদের পারস্পরিক সম্পর্ক, ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, শাসক-শাসিতের সম্পর্ক এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের আরও নানা ধরনের সম্পর্ক।

সমাজের এই বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক প্রকাশ পায় নানারকম ভাবের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে, ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে।

দেখা যায় যে, সামাজিক মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পারস্পরিক কাজকর্ম বা আচার ব্যবহারের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনি বৈশাদৃশ্যও আছে। বস্তুতঃ তাদের বিভিন্ন উদ্দেশ্য, কার্যকলাপ ও আচার ব্যবহার সবসময়েই যে একমুখী হয় তা নয়, বিপরীতমুখীও হয়; সব সময়েই যে সংযোগকারী হয় তা নয়, বিয়োগকারীও হয়, সব সময়ে যে কাছে টানে তা নয়, দূরেও ঠেলে দেয়।

সামাজিক কাজকর্ম প্রকাশ পায় নানারকম সামাজিক রীতিনীতি, আচার-বিচার, ভাবের আদান-প্রদান ও কাজকর্মের মাধ্যমে—সামাজিক মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয় একটা স্থায়ী ও জটিল সংগঠনে।

সমাজ পরিবর্তনশীল। পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কাঠামোও পরিবর্তিত হয়। সমাজ মানসিক সংযোগের মাধ্যমও বটে। বস্তুতঃ, সামাজিক মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ ও আচার-ব্যবহার নির্ভর করে তাদের মানসিকতার উপর। এই কারণেই গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, "সমাজ হল প্রধানতঃ একটা মানসিক ব্যাপার (society is essentially a mental Phenomena)।

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সমাজস্থ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর, গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর এবং গোষ্ঠীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক খুবই জটিল। এ ধরনের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল জালই হল সমাজ।

ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রভৃতি অন্যান্য সামাজিক বিদ্যাগুলি নিজ নিজ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এই পারস্পরিক সম্পর্ক তথা সমাজকে দেখে এবং সমাজজীবনে মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের বিভিন্ন দিক পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করে। তাছাড়া, সামাজিক বিদ্যাগুলি মানুষের কার্যকলাপের সামগ্রিক আলোচনা করে না। এক কথায় সমাজজীবনের সামগ্রিক আলোচনা করে সমাজবিদ্যা (Sociology)। অর্থাৎ সমাজজীবনে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের সামগ্রিক আলোচনা করাই সমাজবিদ্যার কাজ। গিনস্‌বার্গ (*Ginsberg*) সমাজবিদ্যা সম্পর্কে বলেন, "মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধহেতু তাদের যা কিছু ঘটে সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই সমাজবিদ্যা সামাজিক সম্পর্কগুলিকে সামগ্রিক

সমন্বয়কারী দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে। যেখানে যে-কোন ধরনের, যে-কোন স্তরের আন্তর্মানবিক সম্পর্ক বা ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে বা পাবার সম্ভাবনা থাকবে সেখানেই সমাজবিদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে। প্রকৃতপক্ষে সমাজবিদ্যা হল সর্বপ্রথম বিদ্যা যার বিষয়বস্তু হল মানুষের সামগ্রিক সামাজিক জীবন, তার অন্তর্গত যাবতীয় গোষ্ঠী ও তাদের সংগঠন এবং তাদের জটিল পারস্পরিক সম্পর্ক।

অতএব, যে শাস্ত্র মানুষের যাবতীয় পারস্পরিক সম্পর্ক, তার সাংগঠনিক প্রকাশ, কর্মপ্রণালী ও সমস্যার বিশ্লেষণ করে তা হল সমাজবিদ্যা। অথচ অন্যান্য সামাজিক বিদ্যাগুলি সমাজজীবনের বিশেষ বিশেষ দিক বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে, আর সমাজবিদ্যা সমগ্র সমাজকে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সমাজদর্শন (Social Philosophy) ও সমাজবিদ্যা (Sociology) উভয়েরই আলোচ্য বিষয়বস্তু হল সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ক। তবু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য আছে। সামাজিক ঘটনার দার্শনিক তাৎপর্য নিরূপণ করা অর্থাৎ সামাজিক ঘটনাকে আদর্শ ও মূল্যের দিক থেকে আলোচনা করাই সমাজদর্শনের লক্ষ্য। সমাজদর্শন আদর্শনিষ্ঠ শাস্ত্র কিন্তু সমাজবিদ্যা বস্তুনিষ্ঠ শাস্ত্র, সেহেতু বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা সমাজবিদ্যার কাজ।

২। সমাজবিদ্যার পরিধি এবং বিষয়বস্তু (Scope and Subject matter of Sociology) :

সমাজবিদ্যার পরিধি (Scope of Sociology) ঃ আমরা জানি যে, সমাজ হল সমাজে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের ও তাদের সংগঠনগুলির যাবতীয় পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল জাল এবং তাই নিয়ে আলোচনা করে যে শাস্ত্র তাই হল 'সমাজবিদ্যা'। সহজেই অনুমান করা যায় যে, সমাজবিদ্যার আলোচনার পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের পক্ষে এই বিস্তৃত পরিসর মোটেই অনুকূল নয়। কাজেই প্রশ্ন ওঠে, যেখানে আলোচনার পরিসর এত ব্যাপক সেখানে সমাজবিদ্যার পক্ষে একটা পৃথক সামাজিক বিদ্যা হিসেবে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করা কি সম্ভব?

সত্যি কথা বলতে কি, সমাজবিদ্যার সঠিক বিষয়বস্তু কি এবং এর পরিধির সীমারেখাই বা কোথায় টানা উচিত, সমাজবিদেরা সে-সম্পর্কে আজও একমত হতে পারেন নি। বরং বলা যায়, এ ব্যাপারে 'নানা মুনির নানা মত।' মোটামুটি

ভাবে লক্ষ্য করা যায়, এঁদের বিভিন্ন মতবাদে দুটি বিশেষ চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছে। সেই দিক থেকে এই দুই ভিন্ন চিন্তাধারার প্রকাশকে দুটি মাত্র মতবাদের মাধ্যমে আলোচনা করা যেতে পারে। একটি হল বিশ্লেষাত্মক মতবাদ (Specialistic or Formalistic Theory) এবং অপরটি হল সংশ্লেষাত্মক মতবাদ (Synthetic Theory)। বিশ্লেষাত্মক মতবাদে বিশ্বাসী সমাজবিদ্‌দের মতে, সমগ্র সমাজ জীবন নয়, সমাজ-জীবনের বিশেষ বিশেষ কয়েকটা দিক সমাজবিদ্যার আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়া উচিত এবং সেই অনুপাতে এর পরিধিও খুবই সীমিত হওয়া উচিত। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়।

স্বভাব এবং প্রয়োজনীয়তা—দুয়ের তাগিদেই সমাজে নানারকম পারস্পরিক সম্পর্কের উদ্ভব হয়। এই সম্পর্ক ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর, গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর এবং গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তির। বিশ্লেষাত্মক মতবাদীরা সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু হিসেবে এই পারস্পরিক সম্পর্কগুলির বাহ্যরূপের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, যেমন—প্রভুত্বের সম্পর্ক, অধীনতার সম্পর্ক, প্রতিযোগিতার সম্পর্ক ও শত্রুতার সম্পর্ক ইত্যাদি। এঁরা বলেন যে, বিভিন্ন সম্পর্কের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা সমাজবিদ্যার কাজ নয়, সে কাজ অন্যান্য সামাজিক বিদ্যাগুলির। সমাজবিদ্যা শুধুমাত্র জটিল পারস্পরিক সম্পর্কের বাহ্য রূপগুলি বিশ্লেষণ এবং সমাজ জীবনে এগুলির তাৎপর্য আলোচনা করে।

কোন কোন সমাজবিদ্‌ আবার পারস্পরিক সম্পর্কের (inter-relations) বদলে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া (inter-action)-গুলি বিশ্লেষণ ও তাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করাকে সমাজবিদ্যার কাজ বলে গণ্য করেন। এক্ষেত্রেও এঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা, অসহযোগিতা, শত্রুতা, ঘৃণা প্রভৃতি কার্যকারণের বাহ্য দিকের উপর, তাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য খুঁজতে যাওয়া হল সমাজবিদের পক্ষে তার পরিসর-বহির্ভূত কাজ।

আবার এমন মতবাদও পাওয়া যায় যে, বিশেষ বিশেষ সমাজ বিশেষ বিশেষ মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। যেমন, ইংরেজ সমাজের ভিত্তি কি? সে সমাজ গড়ে উঠেছে যে ব্যক্তিদের নিয়ে মূলতঃ তাদের রক্ষণশীল মানসিকতা হল এই সমাজের ভিত্তি—এজন্য কোন বহিরাগত শক্তি এই সমাজের অব্যাহত গতিতে হঠাৎ পরিবর্তন আনতে পারে না। গতযুদ্ধে মৃতাবস্থা থেকেও আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে যে জাপানী সমাজ তার পেছনে কাজ করেছে কর্তব্যনিষ্ঠা, কর্মকুশলতা, দেশপ্রেম প্রভৃতি মানসিক

বৃত্তিগুলি। অতএব এক একটি সমাজের পেছনে কোন্ কোন্ মানসিক বৃত্তি কাজ করে অর্থাৎ কোন বিশেষ সমাজের গতিপ্রকৃতি কি ধরনের মানসিকতার উপর নির্ভর করে, শুধুমাত্র এই ধরনের বিষয়গুলিই সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু—এও কোন কোন বিশ্লেষাত্মক মতবাদের সমর্থক সমাজবিদের বক্তব্য।

বিভিন্ন রকম আচরণের মধ্য দিয়েও সমাজস্থ মানুষ ও সংগঠনগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় এবং বিশ্লেষাত্মক মতবাদের সমর্থনকারী কোন কোন সমাজবিদের মতে, এই আচরণের বাহ্যদিকগুলিই সমাজবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, বিশ্লেষাত্মক মতবাদের সমর্থনকারী যে সব সমাজবিদ্, তাঁরা সমাজ-জীবনের কোন না কোন বিশেষ দিককেই শুধুমাত্র সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু হিসেবে নির্দেশ করে এর পরিধিকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করতে চান। প্রকৃত-পক্ষে এঁরা চান সমাজবিদ্যা এমন এক বিশুদ্ধ এবং সর্বপ্রভাবমুক্ত শাস্ত্র হোক যাতে আর কোন সামাজিক বিদ্যার বিয়ষবস্তু এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে জড়িয়ে না পড়ে এবং সমাজবিদ্যার স্বকীয়তা সম্পূর্ণভাবে বজায় থাকে।

কিন্তু সমাজবিদ্যার পরিধি সম্পর্কে এই বিশ্লেষাত্মক মতবাদকে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

বিশ্লেষাত্মক মতবাদীরা দাবি করেন যে, সমাজবিদ্যাই একমাত্র সামাজিকবিদ্যা যা সামাজিক সম্পর্কের বাহ্য রূপ নিয়ে আলোচনা করে এবং এখানেই সমাজবিদ্যার স্বাতন্ত্র্য। সংশ্লেষাত্মক মতবাদীরা যুক্তি দেখান যে, আন্তর্জাতিক আইন নামে যে সামাজিক বিদ্যা আছে তারও বিষয়বস্তু, দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, বিরোধিতা, সন্ধি—এই ধরনের সামাজিক সম্পর্কের বাহ্যিক রূপ।

তাছাড়া, অন্যান্য সামাজিক বিদ্যার আলোচনার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, একটা বিশুদ্ধ এবং স্বাধীন শাস্ত্র হিসেবে সমাজবিদ্যার শুচিতা রক্ষার ধারণা একটা অলীক চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তবে কোন শাস্ত্রকেই অন্যান্য শাস্ত্রগুলির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে আলোচনা করা যায় না—বিশুদ্ধ সমাজবিদ্যার ধারণাটাই অনেকে সম্পূর্ণ অবাস্তব বলে মনে করেন।

বিশ্লেষাত্মক মতবাদীরা মনে করেন জ্যামিতির সঙ্গে পদার্থবিদ্যার যে সম্পর্ক সমাজবিদ্যার সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক বিদ্যাগুলিরও ঠিক সেই সম্পর্ক। এঁদের বক্তব্য হল যে, কোন বস্তুর প্রকৃতি এবং তার অন্তর্নিহিত উপাদানগুলি নিয়েই পদার্থবিদ্যার আলোচনা। কিন্তু বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে বস্তুর কতকগুলি জড়বৎ, স্থির, অচঞ্চল আকৃতি ও সম্পর্ক কল্পনা করাই হল জ্যামিতির কাজ।

সমালোচকদের মতে এ ধরনের তুলনা করতে গিয়ে জ্যামিতির বস্তুগুলির রূপ এবং সমাজবিদ্যার বস্তুর রূপের মধ্যে যে অসঙ্গতি তা এ মতবাদের সমর্থনকারীদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তাঁরা খেয়াল করেন নি যে, জ্যামিতিক গঠনগুলির এক একটা নির্দিষ্ট আকৃতি আছে কিন্তু সামাজিক সম্পর্কগুলির সেরকম কোন নির্দিষ্ট আকার নেই।

সর্বোপরি সমালোচনা করা হয় যে, একমাত্র বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা কোন সম্পর্কের বাহ্যরূপ উপলব্ধি করতে পারি, যেমন—প্রতিযোগিতা, প্রভুত্ব ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সম্পর্কের বিমূর্ত রূপ। যে বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে উপরিউক্ত সম্পর্কগুলি প্রকাশ লাভ করে সেই বাস্তব ঘটনা এবং সেই ঘটনার প্রকৃতি পর্যালোচনা করতে না পারলে আমরা ঐ বিমূর্ত সম্পর্কের রূপগুলি উপলব্ধি করব কি করে? বস্তুতঃ বাস্তব পটভূমি ছাড়া কোন বিমূর্তরূপ আমরা কল্পনা করতে পারি না।

কাজেই সিদ্ধান্ত করতে হয়, যে-কোন সম্পর্কের, কার্যকলাপের বা আচরণের বাহ্যিক রূপের সম্যক উপলব্ধি, তথা সে-সম্পর্কে আলোচনা সম্ভব একমাত্র বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই এবং তাই সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুর আলোচনার ব্যাপকতা ও আলোচনার পরিধির প্রসারণ প্রয়োজন। কিন্তু বিশ্লেষাত্মকবাদীরা সমাজবিদ্যার পরিধিকে সে তুলনায় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করে রেখেছেন।

বিশ্লেষাত্মক মতবাদের সমালোচনার ফলে উদ্ভব সংশ্লেষাত্মক মতবাদের। এই মতানুসারে সমাজের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তার এক অংশে কিছু ঘটলে সমাজের অন্যান্য অংশকেও তা কম বেশী প্রভাবিত করে। যেমন, সমাজের কোন অংশে যদি ছাত্র বিশৃঙ্খলা বা শ্রমিক বিক্ষোভ বা বেকার সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দেয়, সমাজের অপরাপর অংশ সে-প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। কাজেই ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রভৃতি অন্যান্য সামাজিকবিদ্যাগুলি নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করলেও তাদের সিদ্ধান্তগুলিকে একই সূত্রে গ্রথিত করে সমস্যাগুলিকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। তা না হলে সমগ্র আলোচনাটাই হবে অর্থহীন ও অবাস্তব।

বস্তুতঃ, মানুষের সামগ্রিক সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক পরস্পরের সঙ্গে অন্তর্সম্পর্কিত। অন্যান্য দিকগুলি উপেক্ষা করে বিশেষ একটি দিক থেকে আলোচনা করলে কোন সমস্যাকেই আমরা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারি না। যেমন, বেকার সমস্যা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সমস্যা নয়—প্রশাসনিক সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, নৈতিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যাও বটে।

এক কথায় বলা যায় সমগ্র মানব সমাজটাই সমাজবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্র। বিশেষ সামাজিক বিদ্যাগুলির আলোচনার ক্ষেত্র পরস্পরের থেকে আলাদা হলেও, এদের সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে সমাজের একটা সামগ্রিক রূপ ফুটে ওঠে, তারই রূপায়ণ এই সমাজবিদ্যায়।

অতএব যে শাস্ত্র মানুষের যাবতীয় পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের সাংগঠনিক প্রকাশ, ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ করে তাই সমাজবিদ্যা। সমাজবিদ্যা অন্যান্য সামাজিক বিদ্যাগুলির ভিত্তি বিশেষ।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুর যেমন একটা সামগ্রিক রূপ আছে তেমনি তার একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীও আছে যা তাকে অন্যান্য সমাজবিদ্যাগুলি থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করে। সেই বিশেষ ক্ষেত্র হলো মানুষের সাধারণ সম্পর্ক, তার তত্ত্বীয় এবং মৌলিক নীতি বিশ্লেষণ ও সমস্যা নির্ধারণ।

অতএব সংশ্লেষাত্মক মতবাদে বিশ্বাসী সমাজবিদেরা সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুর পরিধিকে অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন, তবে সেটা ঠিক কতদূর পর্যন্ত সে সম্পর্কে এঁরা সবাই একমত নন।

সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু (Subject matter of Sociology) ঃ সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু কি? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, বিভিন্ন সমাজবিদ্ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমাজবিদ্যার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এবং সেই অনুসারে সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তুর স্বরূপ নির্দেশ করেছেন। কোন কোন সমাজবিদ্ মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধকেই (interrelations) সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু গণ্য করেছেন। আবার কেউ কেউ পারস্পরিক সম্বন্ধের পরিবর্তে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া বা মিথষ্ক্রিয়াকে (interaction) সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু গণ্য করেছেন। আবার কোন কোন সমাজবিদের অভিমতানুসারে মানুষের সকল রকম পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণই সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু। আবার কেউবা মনে করেন যে সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু হল ব্যক্তির আচরণ (behaviour of individuals)। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে সমাজবিদ্যার যে আলোচ্য বিষয়বস্তুর কথা উপরে বলা হয়েছে তা খুবই ব্যাপক এবং সুনির্দিষ্ট নয়। কেননা মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ এত বিচিত্র, বা মানুষের আচরণের পরিধি এতই ব্যাপক তা আলোচনা করা কোন একটি বিশেষ বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব নয়। এই অসুবিধা সম্পর্কে সচেতন হয়ে কোন কোন সমাজবিদ্

মনে করেন যে, সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু হল গোষ্ঠী আচরণ (group behaviour), বা গোষ্ঠীতে মানুষের আচরণ (human behaviour in the group)। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু কি, সে সম্পর্কে কোন সাধারণভাবে স্বীকৃত সংজ্ঞা নেই।

তাহলে সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু কি, আমরা কিভাবে নির্দেশ করব? বিভিন্ন সমাজবিদ্ সমাজবিদ্যার আলোচনায় যে সব বিষয়ের আলোচনা করেছেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু কি হবে, আমরা বুঝে নিতে পারি। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে আমরা সমাজবিদ্যার মুখ্য আলোচ্য বিষয় বলে নির্দেশ করতে পারি ঃ

(১) সমাজ এবং সমাজস্থ ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াই সমাজবিদ্যার মূলতঃ আলোচ্য বিষয়। তাই সমাজের স্বরূপ (nature of society), মানুষের সামাজিক প্রকৃতি, ব্যক্তির জীবনে সমাজের ভূমিকা, সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রভৃতি সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু।

(২) সমাজ জীবনের মৌলিক নীতি এবং ধারণাগুলি সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। যেমন, সম্প্রদায় (Community), সংঘ (Association), অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান (Institution), আচার (Custom), লোকাচার (Folkways), লোকনীতি (Mores), সাধারণ স্বার্থ (Common Interest), প্রতিন্যাস (Attitude) প্রভৃতি।

(৩) সামাজিক সংগঠন বা কাঠামো (Social Structure) সমাজবিদ্যার অন্যতম আলোচ্য বিষয়বস্তু। এই প্রসঙ্গে সমাজবিদ্‌কে সামাজিক গোষ্ঠী (Social groups), সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সামাজিক সমষ্টি (Social Aggregates) ও সামাজিক বর্গ (Social Category) প্রভৃতির পার্থক্য, সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনা করতে হয়। সামাজিক গোষ্ঠীদের মধ্যে পরিবারের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা প্রাথমিক গোষ্ঠীদের মধ্যে পরিবারের স্থান অন্য কোন গোষ্ঠীর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কাজেই পরিবার, পরিবারের সামাজিক তাৎপর্য, পরিবারের শ্রেণীভেদ, পরিবারের উৎপত্তি, বিবর্তন এবং পরিবারের সঙ্গে যুক্ত বিবাহ অনুষ্ঠান, বিবাহ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব, বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। সমাজবিদ্‌কে সংস্কৃতি, সংস্কৃতির সঙ্গে সভ্যতার সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ধর্ম প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি নিয়েও আলোচনা করতে হয়।

(৪) ব্যক্তির সামাজিকীকরণের (Socialization) সমস্যা একটি গুরুত্ব-পূর্ণ সমস্যা। কাজেই সামাজিকীকরণের অর্থ ও গুরুত্ব, সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছা, আগ্রহ, প্রতিন্যাস, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব (Personality), ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সামাজিকীকরণের সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা সমাজবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

(৫) সমষ্টিগত আচরণের প্রকৃতি ও বিভিন্ন ধরনের সমষ্টিগত আচরণ (Collective Behaviour) যেমন, জনগণের আচরণ (Mass Behaviour), জনতার আচরণ (Crowd Behaviour), শ্রোতৃমণ্ডলী (Audience), সমাজ-বিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে সমাজবিদ্‌কে ফ্যাশন(Fashion), গুজব (Rumour) জনমত (Public Opinion), প্রচার(Propaganda), নেতৃত্ব (Leadership) প্রভৃতি বিষয়গুলির আলোচনা করতে হয়।

(৬) সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়া (Social Processes) সমাজবিদ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়বস্তু। এ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যাকে দ্বন্দ্ব (Conflict), প্রতিযোগিতা (Competition), সহযোগিতা (Co-operation), অভিযোজন (Adaptation), উপযোজন (Accomodation), আত্তীকরণ (Assimilation) প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়।

(৭) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control) এবং ঐ আলোচনা প্রসঙ্গে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম ও প্রণালী, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কার্যকরিতা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণে লোকনীতির ভূমিকা প্রভৃতি সমাজবিদ্‌কে আলোচনা করতে হয়।

(৮) সামাজিক স্তরবিন্যাসের (Social Stratification) অর্থ ও স্বরূপ, স্তরবিন্যাসের নীতি, স্তরবিন্যাসের সামাজিক ফলাফল, শ্রেণী, মর্যাদা অনুসারী শ্রেণী, সামাজিক সচলতা (Social Mobility), সামাজিক স্তর বিন্যাসের উদ্ভবের কারণ প্রভৃতি সমাজবিদ্যায় আলোচিত হয়।

(৯) সামাজিক পরিবর্তন (Social change)-এর আলোচনা সমাজবিদ্যার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা। সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি, সামাজিক পরিবর্তনের উপাদান, সামাজিক পরিবর্তনের সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক উপাদান, সামাজিক বিবর্তন (Social evolution) ও সামাজিক প্রগতি (Social Progress), উভয়ের পার্থক্য, সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সম্বন্ধ, সমাজে অসম পরিবর্তনজনিত অসঙ্গতি (Cultural lag), প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা সমাজবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

(১০) সামাজিক সমস্যার (Social Problem) আলোচনাকে কোন

সমাজবিদ্ উপেক্ষা করতে পারেন না। সমাজ-জীবনের যেমন একটা সুস্থ ও বলিষ্ঠ দিক আছে তেমনি তার আছে একটা ব্যাধির দিক। সমাজ-ব্যাধিবিজ্ঞান (Social Pathology) সমাজবিদ্যার অন্যতম আলোচ্য বিষয়বস্তু। সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অপরাধ ও শাস্তি, শিশু দুষ্ক্রিয়তা (Juvenile Delinquency), ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, বর্ণবিদ্বেষ, জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও তজ্জনিত সমস্যা, পরিবার-পরিকল্পনা প্রভৃতি সমস্যার আলোচনা সমাজবিদ্যার অবশ্য প্রয়োজনীয় আলোচনারই অন্তর্ভুক্ত।

উপরে কেবলমাত্র সমাজবিদ্যার বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুরই উল্লেখ করা হয়েছে। সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিধি বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। সমাজ-মনোবিদ্যা (Social Psychology) বর্তমানে অন্যতম জ্ঞানের শাখা-রূপে স্বীকৃত। সমাজবিদ্যার কোন কোন সমস্যার আলোচনায় তার মনো-বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ এসে পড়ে। ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ। ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা—এককথায় ব্যক্তির মনই সমাজজীবনে প্রতিবিম্বিত হয়। কাজেই ব্যক্তির মনকে বাদ দিয়ে সমাজজীবনের কোন আলোচনা সম্ভব নয়। কাজেই সমাজবিদ্ সমাজজীবনের মনস্তত্বমূলক ভিত্তিকে উপেক্ষা করতে পারেন না। তাছাড়া সমাজবিদ্‌কে সমাজবিদ্যার সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক বিদ্যার (Social Sciences), যেমন—অর্থনীতি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃ-বিদ্যা এবং তাছাড়াও মনোবিজ্ঞান ও সমাজদর্শনের সঙ্গে সম্পর্কের আলোচনা করতে হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তুর সীমারেখা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যে খুবই কঠিন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অনুশীলনী

১। সমাজবিদ্যা-সমাজের প্রতি এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর সূচক। অন্যান্য সামাজিক বিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সমাজবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য নিরূপণ করে উপরিউক্ত বক্তব্যটির তাৎপর্য নিরূপণ কর। (Sociology—a way of looking at societies. Explain it by pointing out the difference between the Standpoints of social sciences and Sociology).

২। সমাজবিদ্যার পরিধি ও বিষয়বস্তু নির্দেশ কর। (Indicate the Scope and Subject matter of Sociology).

৩। সমাজের প্রতি সমাজবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ কর। (Indicate the standpoint of Sociology towards society).

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজবিদ্যা, বিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান
(Sociology, Science and other Social Sciences)

১। বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিদ্যা (Sociology as a Science) :

একটি মৌলিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সমাজবিদ্দের মধ্যে মতবিভেদ লক্ষ্য করা যায়—সেই প্রশ্নটি হল, সমাজবিদ্যাকে কি বিজ্ঞানের অর্থাৎ কিনা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া যায়? পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যে অর্থে বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা কি সে অর্থে বিজ্ঞান পদবাচ্য? সমাজ-বিদ্যার জনক অগস্ট কোঁৎ (*August Coemte*) সমাজবিদ্যাকে 'বিজ্ঞানের রাণী' বলে অভিহিত করেছেন। তার পর থেকে বহু সমাজবিদ্ সমাজবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানরূপে গণ্য করার পক্ষপাতী। প্রশ্ন হল, যারা সমাজবিদ্যাকে বিজ্ঞানের অর্থাৎ কিনা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে চান, তাঁদের সেই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা যেতে পারে কি? সমাজবিদ্যা কি প্রকৃতই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পদবাচ্য?

এই প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হলে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন বিজ্ঞানের প্রকৃতি কি, এবং বিশেষ করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যগুলি কি, বুঝে নেওয়া। প্রকৃতির কোন বিশেষ বিভাগ সম্পর্কে যথাযথ, সুশৃঙ্খল, সুনিশ্চিত ও সুসংহত জ্ঞানকে বলা হয় বিজ্ঞান। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্যে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা এবং নিজ নিজ বিভাগের বিষয়বস্তু ও ঘটনাকে এইসব সাধারণ নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করাই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পদার্থ-বিজ্ঞানে বিভিন্ন জড় পদার্থের গুণ ও ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে এবং পরীক্ষার সাহায্যে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা হয়। এই সব সাধারণ নিয়মের সাহায্যে পুনরায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে জড় পদার্থের গুণ ও ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা হয়।

সমাজবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানরূপে গণ্য করা যেতে পারে কিনা তা বিচার করতে হলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যগুলি জানা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তার আলোচ্য বিষয়বস্তু হিসেবে প্রকৃতির একটা বিশেষ অংশকে

নির্বাচন করে নেয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সকল প্রকার অপ্রাকৃত বিষয়বস্তু বা আত লৌকিকতা বর্জন করে প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে তার আলোচ্য বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করে। তৃতীয়তঃ, এই উদ্দেশ্যে প্রকৃতির একরূপতা (Uniformity) এবং কার্যকারণ নিয়ম (Law of Causation)-এই দুই প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে এইসব প্রাকৃতিক ঘটনার অন্তরালে যেসব নিয়ম বা সূত্র আছে, সেগুলি আবিষ্কার করে ও ব্যাখ্যা করে এবং এই উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ প্রভৃতি পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করে। চতুর্থতঃ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বস্তুকে যেভাবে আমরা জানি, তাই নিয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আলোচনা করে, বস্তুর অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত কোন স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে না। ব্যক্তিগত আদর্শবোধ ও মতামতের মানদণ্ড প্রয়োগ না করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে গৃহীত তথ্যের বিচার বিশ্লেষণ করাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীর কাজ।

অনেক সমাজবিদ্ মনে করেন যে, সমাজবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। তাঁদের মতে, অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতন সমাজবিদ্যার আলোচ্য পরিধির একটা সীমারেখা আছে। দ্বিতীয়তঃ, নীতিগত দিক থেকে 'প্রাকৃতিক তথ্য' এবং 'সামাজিক তথ্য বা ঘটনা'র আলোচনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তৃতীয়তঃ, জাগতিক ঘটনার ক্ষেত্রে যেমন সামাজিক ঘটনার বা আচরণের ক্ষেত্রেও তেমনি একরূপতা লক্ষ্য করা যায়, যার জন্য সে সম্পর্কে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করা যেতে পারে। চতুর্থতঃ, বিভিন্ন সামাজিক ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত কতকগুলি সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করা সমাজবিদ্যার কাজ। পঞ্চমতঃ, বিজ্ঞানের অনুশীলন পদ্ধতি এবং সমাজবিদ্যার অনুশীলন পদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্য আছে, এবং সর্বশেষে সমাজবিদ্ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্যক্তিগত মূল্যবোধ সম্পর্কীয় ধারণাকে বর্জন করে নিরাসক্তভাবে সামাজিক ঘটনার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করেন।

বহু সমাজবিদই সমাজবিদ্যাকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়ায় ঘোরতর বিরোধী। তাঁদের মতে বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের জন্য যে গবেষণাগার দরকার সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে তা কোথায়? বিজ্ঞানীকে একটা নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ওপর বিশ্লেষাত্মক গবেষণা চালাতে হলে গবেষণার বিভিন্ন উপাদানের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার যাতে যতবার যেভাবে প্রয়োজন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। এবং এর জন্য নানারকম যন্ত্রপাতিরও প্রয়োজন। কিন্তু এঁদের

মতে সমাজবিদ্যার সেরকম গবেষণাগার থাকতে পারে না। কারণ তার কাজ মননশীল মানুষ ও তার জটিল সম্পর্ক নিয়ে। যদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে স্বভাবে, প্রকৃতিতে, আচার-ব্যবহারে মানুষে মানুষে কত প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। এমনকি সময়ের ব্যবধানে একজন মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্যে কত বৈচিত্র্য নজরে পড়ে। কাজেই অন্যান্য বিজ্ঞানের মত সমাজবিদ্যার গবেষণার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থাকে না, এবং তাদের প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ করাও যায় না। ফলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে যে ফল আমরা আশা করতে পারি, সমাজবিদ্যায় তা আদৌ সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী নিশ্চিত ভবিষ্যৎবাণী করতে পারেন যে কোন বিশেষ বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হলে কোন বিশেষ ফল দেখা দেবে। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে যে কোন একটি ঘটনা থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অনির্দিষ্ট সংখ্যক ফল দেখা দেয়, আবার বিভিন্ন ধরণের ঘটনা থেকে হয়ত একই ফল দেখা গেল। কাজেই এঁরা যুক্তি দেখান যে, অন্যান্য বিজ্ঞানে যেমন বিশেষ বিশেষ উপাদানের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে সাধারণ সূত্র নির্দেশ করা সম্ভব, সমাজবিদ্যায় তা সম্ভব নয়। সেখানে যত নিয়ম তত ব্যতিক্রম। অতএব সমাজবিদ্যায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব নয়।

এটা ঠিক যে সমাজবিদ্‌দের নির্দিষ্ট কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার নেই। কিন্তু তা সত্বেও বিভিন্নরকম সামাজিক সমস্যা বা ঘটনাবলী নিয়ে নানা অসুবিধা সত্বেও যতদূর সম্ভব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁরা গবেষণা চালাচ্ছেন এবং তাঁদের এই গবেষণা ক্ষেত্র সারা পৃথিবী জুড়ে মানবসমাজ। তাঁদের মৌলিক অসুবিধা হলো যে তাঁদের গবেষণার বিষয়বস্তু বস্তু নয়, ব্যক্তি। কিন্তু মানুষের কতকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। মানব প্রকৃতির মধ্যে যেমন বিভিন্নতা আছে, তেমন অভিন্নতাও আছে এবং অবস্থাবিশেষে সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে একই ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। যেমন, মানুষের স্বাভাবিক সমাজ গঠনের আকাঙ্ক্ষা, পৃথিবীর নানাজাতির মধ্যে সামাজিক সংগঠনগুলির মৌলিক সাদৃশ্য ও পরিবার প্রথার সার্বজনীনতা, পরাধীনতায় অনীহা এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আন্তর্জাতিক সহাবস্থান ও শান্তির জন্য প্রচেষ্টা প্রাকৃতিক শক্তির ওপর প্রাধান্য বিস্তারের প্রয়াস, নৈতিক বোধে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ভালমন্দ বিচার, আদর্শবোধ প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে, মানুষের নানারকম সমস্যার সাদৃশ্য ও সমকালীনতাও লক্ষ্য করার মত। কাজেই সমাজবিদ্যায় যদিও অন্যান্য বিজ্ঞানের মত বাহ্যিক অবস্থাগুলিকে

প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না তবুও সমাজবিদ্ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিশেষ বিশেষ পারিপার্শ্বিকতায় সামাজিক ঘটনা বা সমস্যাবলী নিরীক্ষণ করে থাকেন ও তাদের তাৎপর্য উপলব্ধি করেন। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ঘটনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলে, অন্যান্য বিজ্ঞানের মত তা নিখুঁত না হলেও, মোটামুটি-ভাবে তার ভিত্তিতে সাধারণসূত্র নির্দেশ করা এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তও প্রতিষ্ঠা করা সামাজবিদের পক্ষে সম্ভব হয়। যেমন, মালিকের সঙ্গে আপোষ না হলে শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দেবে, শিক্ষক ছাত্র সম্পর্ক হৃদ্যতাপূর্ণ না হলে ছাত্র অসন্তোষ দেখা দেবে, বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা বাড়লে পরিবার বিভক্তিকরণের মাত্রা বাড়বে, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ না হলে বেকার সমস্যা বাড়বে, জীবন যাত্রার মানে মোটামুটি সমতা না আনতে পারলে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বাড়বে, মনোজগতে পরিবর্তন না আনতে পারা পর্যন্ত হিন্দু সমাজে পণপ্রথা, বর্ণবৈষম্য, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি চলবেই, সমাজবিদ্দের এই সিদ্ধান্তগুলি প্রায় সকলেরই সমর্থন লাভ করেছে।

সমাজবিদ্যাকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে আপত্তি যাঁদের তাঁরা আরও বলেন যে, গবেষক নিজেই যেখানে গবেষণার বস্তু সেখানে তিনি গবেষণা চালাবেন কি-ভাবে? মানুষকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা যে গবেষকের, তিনি নিজেও ত মানুষ— ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিগত মূল্য বিচারের (Value Judgement) উর্ধে ত তিনি নন্ বরং এইসব ঐতিহ্যের মধ্য দিয়েই তাঁর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে। এই অবস্থায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে নিজের ব্যক্তিগত আদর্শবোধ ও মতামতের মানদণ্ড প্রয়োগ না করে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক অনুশীলন চালানো কি তাঁর পক্ষে সম্ভব?

এর উত্তরে বলা যেতে পারে, অতীতে সমাজবিদ্দের সমাজচিন্তায় যদিও কিছুটা নৈতিক-চেতনা উদ্বুদ্ধ মূল্যায়ণের ভূমিকা ছিল, সমসাময়িক সমাজবিদেরা ব্যক্তিগত মূল্যবোধের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাবলী বা সমস্যাবলী নিয়ে অনুশীলনের কাজ চালানোর চেষ্টা করছেন। কারণ সমাজবিদ্যা আজ বৈজ্ঞানিক মর্যাদা পেতে বিশেষ আগ্রহী।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, সমাজবিদ্যা বিজ্ঞান পদবাচ্য হতে পারে কিনা এক কথায় হ্যাঁ বা না বলা যায় না। বাস্তব ক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিতশাস্ত্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক

বিজ্ঞানগুলি যে অর্থে বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা কখনই সে অর্থে বিজ্ঞান নয়, হতেও পারে না। এ জন্য দায়ী প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিদ্যাগুলির মধ্যে মূলগত পার্থক্য। তবে সমাজবিদ্যা বিজ্ঞান পদবাচ্য না হলেও বিজ্ঞান সমগোত্রীয়, এসত্য অস্বীকার করা যায় না। কারণ মূলগত অসুবিধা সত্ত্বেও আধুনিক সমাজবিদেরা সমাজবিদ্যার গবেষণায় যতদূর সম্ভব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে চলেছেন এবং করে চলবেন।

২। সমাজবিদ্যা এবং অন্যান্য সামাজিক বিদ্যা (Sociology and other Social Sciences) ঃ

আমরা জানি যে মানুষের যাবতীয় পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের যে জটিলজাল তাই হল সমাজ এবং এই সমাজই হল সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু। কিন্তু সমাজবিদ্যা ছাড়াও অর্থবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি আরও সামাজিক বিদ্যা আছে যাদেরও বিষয়বস্তু এই সমাজকে কেন্দ্র করে। অগষ্ট কোঁৎ (*August Comte*) অবশ্য এইসব সামাজিক বিদ্যাগুলিকে একেবারে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন, কেননা, তাঁর মতে সমাজকে কখনই টুকরো টুকরো ভাগে বিশ্লেষণ করে গবেষণা বা আলোচনা করা যায় না; সমাজ হল একটি সামগ্রিক সত্তা এবং তাকে বিচার করতে হলে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করতে হবে। অর্থাৎ তাঁর মতে, সমাজবিদ্যাই হল একমাত্র সামাজিক বিদ্যা। কিন্তু আধুনিক সমাজবিদেরা কোঁৎ-এর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। এর প্রধান কারণ হল, বর্তমান সমাজের আয়তন এত বিশাল এবং তার বিভিন্ন দিকগুলি এত জটিল যে, তাকে সামগ্রিকভাবে দেখার জন্য যেমন একটি সাধারণ সমাজবিদ্যার প্রয়োজন তেমনি তাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে দেখার জন্য বিশেষ বিশেষ সামাজিক বিদ্যারও (Social Sciences) প্রয়োজন আছে। কাজেই আজকের সমাজবিদেরা সমাজবিদ্যার অতিরিক্ত অন্যান্য সামাজিক বিদ্যাগুলির উপযোগিতা অস্বীকার করতে পারেন না। এই সামাজিক বিদ্যাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই সমাজবিদ্যার সাধারণ কাজ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সমাজবিদ্যা হল এই সমাজিকবিদ্যাগুলির সমষ্টিমাত্র। বরং বলা যায়, এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে সামাজিকবিদ্যাগুলি তাদের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেয় এবং সৃষ্টি হয় একটা নতুন কিছুর—এই নতুন কিছুটাই হলো সমাজবিদ্যা। অন্যান্য সামাজিক বিদ্যাগুলি প্রসঙ্গে একটা সংশ্লেষাত্মক ভূমিকা নিলেও সমাজবিদ্যার একটা নিজস্ব

স্বকীয়তা আছে যা তাকে অন্যান্য সামাজিক বিদ্যাগুলি থেকে পৃথক করে—সেটা হল তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ কিনা এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী।

কয়েকটি সামাজিক বিদ্যার বিষয়বস্তু, পরিধি ও দৃষ্টিকোণ পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করলে সমাজবিদ্যার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আরও সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হবে।

(ক) **অর্থবিদ্যা ও সমাজবিদ্যা**ঃ মানুষের সামগ্রিক জীবনের যে অংশ অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত বা জড়িত সেই দিকটাই তার অর্থনৈতিক দিক—অর্থবিদ্যা মানুষের এই অর্থনৈতিক দিক নিয়েই আলোচনা করে। অর্থকে কেন্দ্র করে সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের যাবতীয় পারস্পরিক সম্পর্ক, ক্রিয়াকলাপ, অর্থবিদ্যার গবেষণার বিষয়বস্তু। যদি কোন জিনিস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের অভাব মেটাতে পারে এবং যদি সে জিনিসের যোগান চাহিদার তুলনায় সীমিত হয় তবে অর্থবিদ্যায় সেই বস্তুর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অর্থবিদ্যা ধন উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সমাজস্থ মানুষের গোটা অর্থনৈতিক জীবনের উন্নয়ন সাধনের উপায় বার করে এবং উপায়গুলি ভিন্ন ভিন্ন কাজে প্রয়োগ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করে।

অর্থবিদেরা অনেকদিন পর্যন্ত অর্থবিদ্যাকে অন্যান্য সামাজিক বিদ্যার প্রভাব থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। সমাজের অন্য সব ঘটনা বা সামাজিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সম্পর্ক, কাজকর্ম ও চিন্তা-ভাবনা অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু ছিল; এর উদ্দেশ্য অর্থবিদ্যার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁরা বুঝতে পারলেন যে অন্যান্য সামাজিক বিদ্যাগুলির মত অর্থবিদ্যাও একটা সামাজিক তথা ব্যবহারিক বিজ্ঞান—এরও ভিত্তি মানবিক, এরও ভিত্তি সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ ও ব্যবহার—যদিও তা ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্ম, আচার-ব্যবহার, চিন্তা-ভাবনা সবকিছুই মূলতঃ নির্ভর করে সামাজিক কাঠামো—সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা—সামাজিক মূল্যবোধের ওপর। অতএব কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে বুঝতে হলে আগে সামাজিক অবস্থাকে বোঝা দরকার। সোমবার্ট (*Sombart*), ম্যাক্স ওয়েবার (*Max Weber*), ওপেনহাইমার (*Oppenheimer*), প্যারেটো (*Pareto*) প্রমুখ অর্থবিদ মনে করেন যে আর্থিক পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনেরই একটা দিক। সে কারণে তাঁদের অভিমত হল সামাজিক পারিপার্শ্বিকতাকে অগ্রাহ্য করে অর্থবিদ্যার

আলোচনা ভ্রান্তিজনক এবং অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। সাম্প্রতিককালে অন্যান্য অর্থবিদরাও এই যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাছাড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেহেতু একটি সামাজিক ব্যবস্থা সেহেতু সামাজিক সংগঠনের আলোচনা ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনা সম্ভবপর নয়। সমাজবিদ্যার গবেষণা ও বিশ্লেষণ অর্থনৈতিক আচরণকে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। অন্যদিকে মানুষের সমাজ জীবনের মান বিশেষভাবে নির্ভর করে তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপর। মানুষের সামাজিক সম্পর্ক অর্থনৈতিক সম্পর্কের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

অর্থবিদ্যা ও সমাজবিদ্যার মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য কোন কোন সমাজবিদ্ অর্থবিদ্যাকে সমাজবিদ্যার একটা বিশেষ অংশ হিসেবে গণ্য করেন। টমাস (*Tomas*) বলেন, 'অর্থবিদ্যা হল, বহু বিস্তৃত সমাজবিদ্যার একটি শাখা বিশেষ।'

কোন খ্যাতনামা আধুনিক অর্থবিদ্ মন্তব্য করেছেন যে, অর্থবিদ্যা অবশ্যই সমাজবিদ্যার পরিচারিকা হবে (Economics must be the handmaid of sociology)। আবার মার্কস (*Marx*), ভেবলেন্ (*Veblen*) প্রমুখ লেখকবৃন্দ মনে করেন যে সামাজিক বিষয়বস্তুগুলিকে শেষ পর্যন্ত কতকগুলি অর্থ নৈতিক শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। এঁদের দৃষ্টিতে সমাজবিদ্যা হল অর্থবিদ্যার একটা অংশ বা দিক।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, অর্থবিদ্যা ও সমাজবিদ্যা দুটি ভিন্ন জ্ঞানের শাখা, একটাকে আর একটার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নয়। এই দুই জ্ঞানের শাখা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত—এইটাই সকলে স্বীকার করেন।

কিন্তু অর্থবিদ্যা ও সমাজবিদ্যার মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উপলব্ধি করতে গিয়ে এই দুই বিদ্যার মধ্যে যে পার্থক্য আছে সে সম্বন্ধেও আমাদের অবহিত থাকা প্রয়োজন।

সমাজবিদ্যা এবং অর্থবিদ্যার মধ্যে প্রথম ও প্রধান পার্থক্য হলো সমাজবিদ্যা সমাজে বসবাসকারী মানুষের সামগ্রিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে; কিন্তু অর্থবিদ্যা আলোচনা করে মানুষের অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে, তাদের সামাজিক সম্পর্ক অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু নয়।

দ্বিতীয়তঃ, বিষয়বস্তুর পার্থক্য থেকেই দুই বিদ্যার মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্যটা এসে পড়ে—সেটা হল তাদের নিজ নিজ বিষয়বস্তুর পরিসর সম্পর্কে। সমাজবিদ্যার

বিষয়বস্তুর পরিধি গোটা সমাজকে কেন্দ্র করে ; কিন্তু অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর পরিধি সমগ্র সমাজের একটা অংশকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ এর পরিধি সমাজবিদ্যার পরিধির তুলনায় সীমিত।

তৃতীয়তঃ, সমাজবিদ্যার একটা সার্বিক (universal) দৃষ্টিভঙ্গী আছে ; কিন্তু অর্থবিদ্যা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের যাবতীয় কাজকর্ম, আচার-ব্যবহার ও সম্পর্ক আলোচনা করে।

চতুর্থতঃ, সমাজবিদ্যার দৃষ্টি (focus) হল সমাজের উপর, ব্যক্তির উপরে নয়। সমাজবিদ্যা সাধারণতঃ সমষ্টিগত আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা চালায়। পক্ষান্তরে অর্থবিদ্যার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় ব্যক্তির উপরে —তার অর্থনৈতিক কাজকর্ম, চাল-চলন প্রভৃতি এর প্রধান লক্ষ্যবস্তু।

পঞ্চমতঃ, সমাজবিদ্যা এবং অর্থবিদ্যার অনুশীলন পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন, এক নয়।

বিষয়বস্তু, পরিধি, দৃষ্টিভঙ্গী, অনুশীলন পদ্ধতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুটি বিদ্যার মধ্যে এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও খেয়াল রাখা দরকার যে জ্ঞানের এই দুটি শাখা পরস্পরের ওপর কেবলমাত্র বিশেষভাবে নির্ভরশীল নয়, একে অন্যের পরিপূরকও বটে। একটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক, সুসংহত ও বাস্তব জ্ঞান অর্জন করার জন্য আর একটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার, তা না হলে সে জ্ঞান হবে অসম্পূর্ণ, অবাস্তব এবং দুর্বোধ্য।

গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন 'সমাজে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার যতই বিকাশ হতে থাকে, এটি মানুষের সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে এবং এটি মানুষের সামাজিক জীবনের দ্বারা প্রভাবিত হয় ; এই দুই বিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই নিবিড়।'

(খ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যা (Political Science and Sociology) : রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল রাষ্ট্র-সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। রাষ্ট্রের উৎপত্তি, স্বরূপ, সংগঠন ও বিকাশ, রাষ্ট্রের নীতি, উদ্দেশ্য ও ক্রিয়াকর্ম, বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও তাৎপর্য, জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের আনুগত্য, কর্তব্য এবং রাষ্ট্রের কাছ থেকে জনগণের প্রাপ্য অধিকার—এ সবই হল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। এককথায় রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে মানুষের যাবতীয় পারস্পরিক সম্পর্ক, কাজকর্ম, আচার-আচরণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্যবস্তু। অনেক সমাজবিদ্ দাবি করেন যে, সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয় এত বিশাল তার কারণ সমাজবিদ্যার আলোচনা মানুষ এবং তার সামাজিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। তাই সমাজবিদ্যা মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাভাবনা

এবং রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন নিয়েও আলোচনা করে। কাজেই কোন কোন সমাজবিদ্ বলেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল সমাজবিদ্যার একটি শাখামাত্র। সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুর মধ্যেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নিহিত।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া চলে না। কেননা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিজস্ব আলোচ্য বিষয় রয়েছে, যা নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে অন্য কোন বিজ্ঞান আলোচনা করে না।

তাছাড়াও যদি আমরা প্রাচীন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরাই তাহলে আমরা জানতে পারি যে প্রাথমিক অবস্থায় রাষ্ট্র এবং সমাজের আলাদা আলাদা অস্তিত্ব ছিল না; লোকচোখে তখন রাষ্ট্র যা সমাজও তাই ছিল। বস্তুতঃ তখন রাষ্ট্রের পরিধি ছিল সীমিত এবং লোকসংখ্যাও ছিল খুবই কম। তাই গ্রীক চিন্তাবিদ্‌রা রাষ্ট্র বা সমাজ—এ দুইয়ের কোন পৃথক সত্তা কল্পনা করতে পারেন নি। সীমিত গণ্ডীর মধ্যে সীমিত জনগণের যাবতীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন একাধারে রাষ্ট্রই মেটাতে সমর্থ হতো। কিন্তু রাষ্ট্রের আয়তন এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন রাষ্ট্রের কাজের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল তখন রাষ্ট্রের পক্ষে এই বিশাল সংখ্যক মানুষের যাবতীয় অভাব মেটানো অসম্ভব হয়ে উঠলো। ফলে মানুষের বিভিন্ন স্বার্থ, উদ্দেশ্য, প্রয়োজন ইত্যাদি চরিতার্থ করার জন্য রাষ্ট্র ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের উদ্ভব হল এবং স্বাভাবিকভাবেই সমাজে বসবাসকারী মানুষের আনুগত্য রাষ্ট্র এবং সংগঠনগুলির মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র যে অর্থে আনুগত্যের দাবি রাখে ঠিক সেই-অর্থে অন্যান্য সামাজিক সংঘগুলি আনুগত্যের দাবি করতে পারে না। রাষ্ট্রের কাজ জনগণের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ আর তাদের সামাজিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন ধরনের এই সামাজিক সংগঠনগুলি। সংগঠনগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কগুলি সরল থেকে জটিল, জটিল থেকে ক্রমশঃ জটিলতর হয়ে উঠল এবং সেগুলির বিচার বিশ্লেষণর জন্য সমাজবিদ্যার উদ্ভব হল।

অতএব সমাজবিদ্যার উদ্ভব রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক পরে। এই দুই বিদ্যার মধ্যে বিশেষ কতকগুলি পার্থক্য বিদ্যমান।

সমাজবিদ্যা সমাজে বসবাসকারী মানুষের সমগ্র দিক নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাদের এই সামগ্রিক জীবনের বিশেষ একটি দিক অর্থাৎ কিনা রাষ্ট্রনৈতিক দিক নিয়ে আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সামাজিক মানুষের যাবতীয় দিক নিয়ে আলোচনা করে না। অর্থাৎ যেকোন ধরনের সামাজিক সম্পর্ক

সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু কিন্তু একমাত্র রাজনৈতিক সম্পর্কই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণার বস্তু হতে পারে।

সমাজবিদ্যা হল সমাজ সম্পর্কে সাধারণ বিদ্যা—এই বিদ্যা মানুষের সমাজ-জীবন সম্পর্কে আমাদের সাধারণ শিক্ষা দেয়। কিন্তু এই সাধারণ সামাজিক জীবন সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশেষ কোন অবদানের অবকাশ নেই, রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র ও সরকার সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে অর্থাৎ মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন সম্পর্কে আমাদের বিশেষ শিক্ষা দেয়।

মনে রাখা দরকার যে, সমাজবিদ্যা তার আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ; কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লক্ষ্য সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং তার যাবতীয় আলোচনা ও গবেষণা চলে রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। সমাজবিদ্যার চোখে রাষ্ট্র হল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা সংঘ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চোখে রাষ্ট্র হল সমাজের সর্বপ্রধান নিয়ামক শক্তি এবং রাষ্ট্রনৈতিক আইনের উৎস।

এই দুই বিদ্যার মধ্যে আর একটা পার্থক্য হল—সমাজবিদ্যার আলোচনা যাবতীয় সংগঠিত অথবা অসংগঠিত সংগঠন নিয়ে—স্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী বা অস্থায়ী যেভাবেই হোক তার মাধ্যমে কোন সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হলেই তা সমাজবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন একটা ক্ষণস্থায়ী জনতাও সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সংগঠিত কোন রাষ্ট্রনৈতিক সংঘ না হলে—তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের আলোচ্য বিষয়রূপে গণ্য হয় না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আদর্শনিষ্ঠ (normative), সমাজবিদ্যা বস্তুনিষ্ঠ (Positive)। অবশ্য অনেক সমাজবিদ বলেন যে সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে তথ্যের আলোচনাকে মূল্যের আলোচনা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখা যায় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যবহারিক বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা তাত্ত্বিক বিজ্ঞান, তাই ব্যবহারিক উপযোগিতার দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্যণীয়।

পরিশেষে, সমাজবিদ্ কোন সমাজের উপর গবেষণা করতে গিয়ে সে-সমাজের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সমস্ত ধরনের সংগঠন নিয়ে সমীক্ষা চালাতে পারেন ; কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী একমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন।

এসব পার্থক্যগুলি থাকা সত্ত্বেও সমাজবিদ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের থেকে সম্পূর্ণ-ভাবে পৃথক হতে পারে নি বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে এই বিজ্ঞান দুটি

পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিজস্ব আলোচ্য বিষয় থাকলেও কতকগুলি রাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্ন যেমন—আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্ক, রাষ্ট্রনৈতিক আনুগত্যের স্বরূপ প্রভৃতি যেহেতু সমগ্র সামাজিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত, সেহেতু সমাজবিদ্যারও আলোচ্য বিষয়। তাই বলা যায় এই দুই বিজ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে কেবলমাত্র ঘনিষ্ঠসম্পর্কযুক্ত নয়, পরস্পর পরস্পরের পরিপূরকও বটে। কারণ বাস্তবক্ষেত্রে যেকোন রাষ্ট্রনৈতিক সফলতা বা বিফলতা বিশেষভাবে নির্ভর করে সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার ওপর। যেমন, কোন দেশের সরকার একনায়তান্ত্রিক হবে, না গণতান্ত্রিক হবে সেটা বহুলাংশে নির্ভর করে সে দেশের সামাজিক কাঠামো, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সামাজিক পরিবেশের ওপর; যদি দেশের জনগণ মোটামুটিভাবে শিক্ষিত ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন না হয় এবং সর্বোপরি যদি সে সমাজে জনগণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকারে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে সেখানে গণতন্ত্র কখনই সফল হতে পারে না। বস্তুতঃ আজকের দিনে মানুষের অধিকাংশ সমস্যাই সমাজবিদ্ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দুজনকেই সমভাবে ভাবিয়ে তোলে। সাধারণতঃ রাষ্ট্রীয় সরকার আইনের মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আনার বা সমাজের উন্নয়নসাধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগের সময় যদি সেই সরকার সামাজিক ঐতিহ্য, সংস্কৃতি রীতি-নীতি, অনুশাসনগুলি উপেক্ষা করে থাকেন তবে সে-আইন কার্যতঃ কখনই ফলপ্রসূ হতে পারে না। বর্তমানে ভারতে বিধবা-বিবাহ আইন, পণপ্রথা-বিরোধী আইন, অতিথি-নিয়ন্ত্রণ আইনগুলির মধ্য দিয়ে সরকারের উদ্দেশ্য কখনও সিদ্ধ হতে পারে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত সামাজিক কাঠামোতে বা সমাজস্থ-মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে বা মানসিকতায় সেই অনুপাতে পরিবর্তন আসে। সমস্যাগুলি একদিকে যেমন রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা, অন্যদিকে তেমনি সামাজিক সমস্যাও বটে। অতএব সমস্যাগুলিকে যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গভাবে উপলব্ধি করতে হলে এবং সেগুলির সমাধানের সঠিক উপায় খুঁজে পেতে হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে যেমন সমস্যাগুলির সামাজিক তাৎপর্য বুঝতে সমাজবিদের সাহায্য নিতে হয় তেমনি সমাজবিদ্‌কেও সমস্যাগুলির রাষ্ট্রনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মৌল (fundamental) ধারণাগুলি সম্পর্কে অবহিত হতে হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিদ্‌কে তার বিষয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞান সরবরাহ করে, সামাজিক মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আচার-ব্যবহার ও সম্পর্ক বুঝতে, ব্যাখ্যা করতে এবং সে সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে। সমাজবিদ্যাও বিভিন্ন

ধরনের সামাজিক তত্ত্ব ও তথ্য সরবরাহ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে নাগরিকের বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ, আচার-আচরণের সামাজিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ও সেই অনুযায়ী সর্বসাধারণের সাধারণ উন্নতির জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করতে সাহায্য করে।

সমাজবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে গিডিংস্ (*Giddings*) বলেন, "সমাজবিদ্যার মূল নীতিগুলি যে শিক্ষা করেনি তাকে রাষ্ট্র সম্পর্কীয় মতবাদ শিক্ষা দেওয়া, নিউটনের গতি সম্পর্কীয় সূত্র যে শিক্ষা করেনি তাকে জ্যোতিবিজ্ঞান বা তাপপ্রয়োগ দ্বারা যন্ত্রাদি চালনবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার সমান।"

(গ) **ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা (History and Sociology)** : ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা এই দুটি জ্ঞানের শাখার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই গভীর। উভয়েরই পটভূমিকা মানবসমাজ এবং উভয়েরই আলোচ্য বিষয় সামাজিক বিষয়বস্তু (Social reality)। ইতিহাস মানব-সমাজে সংগঠিত বিভিন্ন ঘটনাকে স্থান ও কাল অনুসারে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে ঐ ধারাবাহিকতার ইতিবৃত্ত রচনা করে। আর সমাজবিদ্যা সমাজের উদ্ভব, গঠন ও বিকাশ, সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, নিয়ম-কানুন, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করে। এককথায় সামাজিক মানুষের সমগ্র জীবনই সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। তবে সমাজবিদ্যা বিশেষ করে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া এবং তার কারণ ও পরিণাম নিয়ে আলোচনা করে। ইতিহাস এবং সমাজবিদ্যার মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনি বৈসাদৃশ্যও আছে।

ইতিহাসের গতি সাধারণত: অতীতের দিকে—অতীতকে ধরে রাখাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু সমাজবিদ্যার লক্ষ্য সাধারণতঃ সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের দিকে। সে অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করে ততটুকুই যতটুকু সেটা তার বিষয়বস্তু বোঝার জন্য প্রয়োজন হয়। সমাজবিদ্যা সাধারণভাবে অতীতের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে না।

ইতিহাসে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন রকম শাসনপ্রথা ও তাদের উত্থান-পতনের কাহিনী প্রাধান্য পায়। সামন্তপ্রথা ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান এবং সমাজে বিভিন্ন সময়ে কোথায় কি ধরনের সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা, নিয়ম, অনুশাসন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি প্রচলিত ছিল, তাতে ইতিহাসের বিশেষ আগ্রহ নেই। বিশেষতঃ পরিবারে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের উপর কিসের প্রভাবে কি কি পরিবর্তন হয়েছে—এইসব ব্যাপারে ইতিহাস বিশেষ আগ্রহ দেখায় না।

কিন্তু এই ধরনের বিষয়গুলিই সমাজবিদ্যার মূল বিষয়বস্তু; সমাজবিদ্যা কোন রাজত্বের উত্থানপতনের কাহিনীতে বিন্দুমাত্র উৎসাহী নয়।

ইতিহাস ও সমাজবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে আসল পার্থক্য হল ইতিহাস সেইসব মানবীয় ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে যারা কালের সঙ্গে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আর সমাজবিদ্যা সেগুলিই আলোচনা করে সামাজিক সম্পর্কের দিক থেকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ঐতিহাসিক সমস্ত আনুষঙ্গিক ঘটনাসহ যখন কোন যুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে, সমাজবিদ্ সমাজস্থ মানুষের উপর প্রধানতঃ তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে। ঐতিহাসিক সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে পরিবারের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করে। সমাজবিদের কাজ হল এই প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন রূপ নিয়ে আলোচনা করা; তাদের মধ্যে আকারগত সাদৃশ্য নিরূপণ করা, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করা যাতে তাদের কেন্দ্র করে পরিবর্তন ও কার্যকারণ সম্পর্কীয় নিয়মগুলি নির্ধারণ করা যায়।

ইতিহাস এবং সমাজবিদ্যার মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টিকে অযথা বড় করে দেখে কোন কোন লেখক দাবি করেন যে, ইতিহাসের কাজ বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে। আর সমাজবিদ্যার কাজ সমাজসম্পর্কীয় সাধারণ নিয়ম (general laws) নিয়ে। একথা ঠিক যে এই পার্থক্যের বিষয়টি অতিরঞ্জিত হলেও; এর মূলে যে সত্যতা নেই তা নয়। সমাজবিদ্যার প্রাথমিক কাজ যে সমাজের সাধারণ নিয়মগুলিকে অবিষ্কার করা এবং ঐতিহাসিকের কাজ যেভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ঘটে তার ধারা বা ক্রমের পুনর্বিন্যাস করা, এ অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু একথাও সত্য যে সমাজবিদ্ সামাজিক ঘটনা বা তথ্যকে উপেক্ষা করতে পারেন না যেমন পারেন না ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক নিয়ম বা সূত্রগুলিকে উপেক্ষা করতে। ইতিহাস এবং সমাজবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দুটি বিদ্যা নিজ নিজ বিষয়বস্তুর চর্চার জন্য পরস্পরের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, পরস্পর পরস্পরের পরিপূরকও বলা চলে। জেনে রাখা দরকার, ইতিহাস সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেতে সচেষ্ট হয় এবং সামাজিক ও অর্থ নৈতিক —ইতিহাসের এই দুটি ধারার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস এবং সমাজবিদ্যার মধ্যে একটি সেতুবন্ধন গড়ে উঠেছে। ফলে আমরা ঐতিহাসিক সমাজবিদ্যা' বা 'Historical Sociology' নামে সমাজবিদ্যার একটি বিশেষ শাখা পাই। এই বিশেষ শাখায় নানারকম ঐতিহাসিক ঘটনাকে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টি-

ভঙ্গীতে বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়াস চলে। সমাজবিদ্যার এই বিশেষ শাখাটি ইতিহাস এবং সমাজবিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচায়ক।

বস্তুতঃ ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত রচনা করার মাধ্যমে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি নানারকম ঘটনাকে সময়ের পারম্পর্য অনুযায়ী ধরে রাখার চেষ্টা করেন। ফলে বিভিন্ন সময়ে কিভাবে মানুষের সমাজ-জীবনে কি কি পরিবর্তন ঘটছে, কেন ঘটছে এবং তাদের পরিণাম কি হচ্ছে সেগুলিও ইতিহাসে পাওয়া যায়। সমাজবিদ্যার চর্চাকালে সমাজবিদ্ এগুলি থেকে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস লিখতে গিয়ে প্রসঙ্গতঃ বিভিন্ন রকম মানবিক সম্পর্ক, সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন ধরন, নানারকম আচার অনুষ্ঠান, প্রথা এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এগুলি যে সমাজবিদ্যাকে তথ্য-নির্ভর প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের যোগান দিয়ে থাকে এটা অস্বীকার করা যায় না। অন্যদিকে ঐতিহাসিকেরাও ইতিহাস রচনার সময়ে সমাজবিদ্যার মৌল ধারণা ও পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে থাকেন। বহু সমাজবিদ্ নানারকম সামাজিক সংগঠন, সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির উপর যে বিশ্লেষাত্মক আলোচনা ও গবেষণা চালান তা ঐতিহাসিককে ইতিহাস লেখার সময়ে সামাজিক ঘটনাগুলির তাৎপর্য সহজে বুঝতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। দেখা যাচ্ছে সমাজবিদ্যাকে যেমন সমাজ জীবনের বিভিন্ন বিষয়গুলি সম্পর্কে যথার্থ, পূর্ণাঙ্গ ও সুসঙ্গত জ্ঞান লাভের জন্য তথ্য-নির্ভর ইতিহাসের শরণাপন্ন হতে হয়; অনুরূপভাবে নিজ বিষয়বস্তুকে সহজে এবং সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য সমাজবিদ্যার বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে ইতিহাসেরও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অতএব এটা খুবই স্বাভাবিক যে নিজ নিজ বিষয় আলোচনা করার সময় একে অন্যের কাছে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য পেয়ে থাকে এবং এই অর্থে একে অন্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এককথায় ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা যদিও জ্ঞানের দুটি ভিন্ন শাখা, তাদের সম্পূর্ণভাবে আলাদা করা যায় না। উভয়েই সমাজে বসবাসকারী মানুষের জীবন-প্রণালী নিয়ে আলোচনা করে—কখনও একই দৃষ্টি-কোণ থেকে, আবার কখনও বা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

তবে এই সম্পর্কের নিবিড়তা উপলব্ধি করতে গিয়ে দুটি বিদ্যা যে এক নয় সেই সত্য সম্পর্কেও আমাদের সচেতন থাকা প্রয়োজন, কারণ তা না হলে দুটি বিদ্যাকে পৃথক পৃথকভাবে অধ্যয়নের প্রয়োজন হতো না।

(ঘ) **নৃতত্ত্ব ও সমাজবিদ্যা (Anthropology and Sociology) :** অন্যান্য সামাজিক বিদ্যার মত নৃতত্ত্বের সঙ্গেও সমাজবিদ্যার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ইংরাজী 'anthropology' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে গ্রীক শব্দ 'anthropos' থেকে যার অর্থ হল মানুষ। কাজেই নৃতত্ব হল মানুষ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। সমাজবিদ্যার মত নৃতত্ত্বেরও বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক। সেজন্য নৃতত্ত্বকে শারীরিক নৃতত্ব (Physical Anthropology), প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ব (Prehistoric Archeology) এবং সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃতত্ব (Cultural Anthropology) ইত্যাদি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। শারিরিক নৃতত্ব জাতিগত গোষ্ঠীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য, তাদের জৈবিক প্রতিক্রিয়া এবং তাদের উপর পরিবেশগত উপাদানের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে। প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ব প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সামাজিক জীবনের পুর্নগঠনের জন্য সচেষ্ট হয়। সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃতত্বই বিশেষ করে সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষবস্তু।

অনেকে সামাজিক নৃতত্ত্বের সঙ্গে সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুর প্রচুর সাদৃশ্য খুঁজে পান। সামাজিক নৃতত্ব আদিম মানবসমাজের জীবনযাত্রার প্রণালী, তাদের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন দিক এবং তাদের আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় জীবন ও সামাজিক সংগঠনের আলোচনা করে থাকে। সমাজবিদ্যাও বর্তমান সমাজের নানাবিধ সামাজিক সংগঠন, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি মানবসমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের সমাজতাত্বিক মূল্য নিরূপণ করে। এই দুই জ্ঞানের শাখার বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য এত বেশী যে অনেকে এই দুয়ের পৃথকীকরণ করার পক্ষপাতী তো ননই, এমনকি পৃথকীকরণে ঘোর বিরোধী। এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করে কেউ কেউ সামাজিক নৃতত্ব এবং সমাজবিদ্যাকে মিশিয়ে দেবার পক্ষপাতি এবং এই দৃষ্টি ভঙ্গীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোন কোন নৃতত্ববিদ্ সমাজবিদ্যার উপর কিছু কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। কতখানি সার্থক হয়েছেন তা বিতর্কমূলক। আসল কথা সামাজিক বিদ্যার এই দুই শাখার পার্থক্যের বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করা যুক্তিযুক্ত নয় কেননা সামাজিক বিষয়বস্তুর প্রতি উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক এবং তাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও সবসময় অভিন্ন হয় না।

নৃতত্ত্বের আলোচনা মানুষকে নিয়ে, সমাজবিদ্যারও অলোচনা মানুষকে নিয়ে, যে মানুষ এক সমাজিক জীব।

সমাজবিদ্যা বর্তমান সমাজে বসবাসকারী লোকেদের পারস্পরিক সম্পর্ক, ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও নানাবিধ সামাজিক সংগঠনের আলোচনায় নিজেকে আবদ্ধ

রাখে। যদিও বর্তমান সমাজই সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু তবু একথা ভুললে চলবে না যে—যেমন বর্তমানকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যতের কোন কিছু আলোচনা অবান্তর সেরূপ অতীতকে বাদ দিয়েও বর্তমানের সামগ্রিক পর্যালোচনাও মূল্যহীন বলে মনে হয়। তাই সমাজবিদ্‌দের সমাজবিদ্যার আলোচনায় অতীতের সামাজিক সংগঠনের দিকেও দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে হয়। বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গীতে আদিম সমাজে সামাজিক সংগঠন নিশ্চয়ই ছিল না কিন্তু 'মানুষ যে সামাজিক জীব' তা সমাজবিদেরা আদিম সমাজের সামাজিক সংগঠনের উদাহরণ দিয়েই প্রমাণ করেছেন। কাজেই আদিম সমাজের মানুষের এবং তাদের আচার-অনুষ্ঠানের ধারণা ছাড়া সমাজবিদ্যার জ্ঞানও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নৃতত্ত্ব আদিম সমাজের আচার-ব্যবহার, প্রথা, ধর্ম ইত্যাদির মধ্যে তার আলোচনা নিবদ্ধ রাখে। সমাজবিদ্যা এগুলি থেকে সামাজিক মানুষের নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান ও সংগঠনের উৎস খুঁজে পান যা সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুকে পরিপুষ্ট করতে সাহায্য করে। তবে আমরা যেন ভুল না করি যে, সমাজবিদ্যা এবং নৃতত্ত্বের বস্তু এক এবং উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদি দুটি বিষয়ের বিষয়বস্তু একই হোত তাহলে পৃথকভাবে এই দুই জ্ঞানের শাখা অধ্যয়নের কোন প্রয়োজনও ছিল না। এই দুই বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান।

সভ্যতার আলো যখন মানব সমাজে পৌঁছায় নি সেই আদিম মানুষ এবং তাদের সমাজ নিয়েই নৃতত্ত্বের আলোচনা, তাই নৃতত্ত্ববিদ্‌রা অতীতচারী কিন্তু সমাজবিদ্‌রা বর্তমান সমাজের পথিকৃৎ। সমাজবিদের গবেষণা যেমন একদিকে অশিক্ষিত মানুষদের নিয়ে আবার শিক্ষিত, সুসভ্য মানবসমাজেও তার আনাগোনা। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন অতীতের সমাজের প্রতি কিন্তু সমাজবিদেরা নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন বর্তমান সমাজের দিকে। শুধু তাই নয় সমাজবিদ্‌রা নানারকম সামাজিক ঘটনা এবং কার্যকলাপ বা ক্রিয়া-প্রক্রিয়া আলোচনা করার সময় এবং এর ফলে উদ্ভাবিত সমস্যাবলীর প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার প্রস্তাবও উপস্থাপিত করেছেন কিন্তু নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রাগৈতিহাসিক এবং প্রাচীন সমাজজীবন সম্পর্কে আলোচনা থাকে মাত্র, প্রস্তাব কিন্তু থাকে না এবং তা সম্ভবও নয়।

দুইটি বিষয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য অনুশীলন পদ্ধতিরও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সমাজবিদ্যার গবেষণা ক্ষেত্রের পরিধি অনেক ব্যাপক। সমাজবিদ্ মূলতঃ পরিসংখ্যান, সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন

কিন্তু নৃতত্ত্ববিদের গবেষণাক্ষেত্র প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ছোট ছোট সম্প্রদায় এবং পত্র-পত্রিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং তথ্যের স্বল্পতাহেতু তা যাচাই করার সুযোগও সীমিত।

এসব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি যে, তুইটি বিষয়ের সম্পর্ক এত নিকট যে উভয়ের ভেদরেখা টানা শক্ত। যদি অশিক্ষিত ও অসভ্য আদিম অধিবাসীদের কাছে শিক্ষা ও সভ্যতার আলো পৌঁছে দেওয়া যেত তাহলে তুটির আলোচনাক্ষেত্র প্রায় এক হয়ে যেত।

অনুশীলনী

১। সমাজবিদ্যা কি বিজ্ঞানপদবাচ্য ? (Is Sociology a science ?)

২। সমাজবিদ্যার সঙ্গে নৃতত্ত্বের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা কর। (Explain the relation of Sociology to Anthropology.)

৩। সমাজবিদ্যা কি অর্থবিদ্যার বা অর্থবিদ্যা কি সমাজবিদ্যার শাখা ? উভয়ের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। (Is Sociology a branch of Economics ? Is Economics a branch of Sociology ? Explain their exact relation.)

৪। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি সমাজবিদ্যার একটা অংশ ? আলোচ্য বিষয়বস্তুর দিক থেকে উভয়ের সাদৃশ্য থাকলেও, উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক, ব্যাখ্যা কর। (Is Political Science a part of Sociology ? The subject-matter of Sociology and Political Science is largely common, but their viewpoints are different'—Explain).

৫। সমাজবিদ্যা ও ইতিহাসের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য আছে নির্দেশ কর এবং উভয়ের সম্বন্ধ নির্দেশ কর। (In what respects does Sociology differ from History ? Explain the relation between these two subjects).

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজ ও সামাজিক সংগঠনের প্রকারভেদ

(Society and Types of social organisation)

১। মানব সমাজের স্বরূপ (Nature of human society) :

যখন বহু ব্যক্তি একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলা হয়। প্রধানতত, দুটি বৈশিষ্ট্য থাকলে যে-কোন জন-সমষ্টিকে সমাজ বলা যায়। প্রথমতঃ, বহু লোকের সংঘবদ্ধভাবে বসবাস এবং দ্বিতীয়তঃ, এই সংঘবদ্ধতার পিছনে কোন একটি উদ্দেশ্য। এই সামাজিক সম্পর্কই সমাজের ভিত্তি।

গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, "সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের জটিল জাল, যে সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।" কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের যে কোন সম্পর্কই সামাজিক সম্পর্ক নয়। দুটি মানুষ একই পথ দিয়ে একই স্থানে চলেছে, কারও সঙ্গে কারও কোন সম্পর্ক নেই। যেহেতু মানুষ দুটি একই স্থানে একই সময়ে রয়েছে বা উভয়ের দৃষ্টি একই বস্তুর উপর নিবদ্ধ, তাকেও বলা যেতে পারে না যে তাদের মধ্যে কোন সামাজিক সম্পর্ক বর্তমান। কিন্তু যে মুহূর্তে একজন আর একজনকে জানে বা তার সম্পর্কে সচেতন হয় বা পরস্পরকে অভিন্দন জানায় বা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করে, তখনই সামাজিকতার শুরু হয়। এজন্য গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, "সামাজিকতা বা সমাজ হল একটি মানসিক ব্যাপার।"

সামাজিক সম্পর্ক বলতে আমরা বুঝি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির পরস্পরের সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং কয়েকটি বিষয়ে অন্ততঃ তাদের মধ্যে যে মিল আছে সে-সম্বন্ধে তাদের মধ্যে অল্পবিস্তর চেতনা থাকা। পারস্পরিক স্বীকৃতি (Reciprocal Recognition) তা প্রত্যক্ষই হোক বা পরোক্ষই হোক এবং সাদৃশ্য (Commonness) যে-কোন সামাজিক সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অবশ্য একথা ঠিক নয় যে, সমাজের মধ্যে কেবল সাদৃশ্য ও সহযোগিতা আছে এবং কোনরূপ পরিবর্তন, বৈচিত্র্য বা পার্থক্য নেই। যে মানুষ নিয়ে সমাজ গঠিত, সেই মানুষের পরস্পরের মধ্যে আছে অনেক পার্থক্য। বস্তুতঃ, সাদৃশ্য এবং পার্থক্য, বিরোধ এবং সহযোগিতা, মতের ঐক্য এবং মতের অনৈক্য

সবই সমাজে বর্তমান। তবু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, সাদৃশ্য, সহযোগিতা, মিল—এগুলিই সমাজের প্রধান ভিত্তি। যেখানে সামাজিক সম্পর্ক সেখানেই যখন সমাজ তখন যুক্তির দিক দিয়ে আমাদের যে কোন সামাজিক সংগঠন ও সম্পর্ককে সমাজ বলে অভিহিত করা উচিত। কিন্তু সাধারণতঃ যে-সব সংগঠন কম স্থায়ী সেগুলির ক্ষেত্রে 'সামাজিক গোষ্ঠী' (Social Groups) কথাটিকে ব্যবহার করা হয়। কেননা সমাজ বলতে বুঝি 'সমজাতীয় উদ্দেশ্য অনুসরণ করার জন্য কতকগুলি স্থায়ী সম্পর্কের দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি-সমষ্টি।' সুতরাং ঐক্য, বহুত্ব, স্থায়িত্ব এবং সংঘবদ্ধতাই হল সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন সমাজবিদ্ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমাজের সংজ্ঞা নির্দেশ করছেন। বস্তুতঃ, সমাজের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যেমন হবে, সে-ভাবেই আমরা সমাজের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারি।

সমাজের কাজ কি, এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমাজের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে। জীবনের বিচিত্র ধরনের কার্য সম্পাদনের জন্য, বিশেষ বিশেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য, বিশেষ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, মানুষকে অবশ্যই অন্য মানুষের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হবে, গোষ্ঠী-জীবন যাপন করতে হবে। তার জীবনের প্রতিটি দিকের পরিপূর্ণতা গোষ্ঠী-জীবন যাপনের দ্বারাই সম্ভব। কাজেই এই দিক থেকে সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা যেতে পারে যে 'সমাজ হল' পারস্পরিক সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত গোষ্ঠী-সমূহের এক যৌগিক সংগঠন, যে গোষ্ঠীগুলি পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে এবং প্রতিটি মানুষকে তার জীবনকে পরিপূর্ণ করে তুলতে সহায়তা করে।' আবার একটা সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই মানুষ সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করে। কাজেই কাঠামোর দিক থেকে সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয় যে, সমাজ হল 'একটা প্রদত্ত কাঠামোর মধ্যে আচার, লোকাচার, আচরণ, নিয়ম, অনুমান, অভ্যাস, বিশ্বাস, আদর্শ—এই সবকিছুর জটিল পারস্পরিক সম্বন্ধের যে সামাজিক ঐতিহ্য তার সমষ্টি।' আবার সামাজিক প্রক্রিয়ার দিক থেকে সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা যেতে পারে যে, সমাজ হল উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধরূপ এক প্রক্রিয়া, যা মিথস্ক্রিয়া, যোগাযোগ এবং পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় পরিণতি লাভ করে। উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলির বৈশিষ্ট্যসমূহকে একত্র করে সমাজের সংজ্ঞায় বলা যেতে পারে যে সমাজ হল এক সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে মানুষ ও গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জটিল জাল।'

গিডিংস (*Giddings*) সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "সমাজ হল একই মনোভাবসম্পন্ন কতকগুলি ব্যক্তি যারা তাদের এই একই মনোভাবের কথা জানে ও উপভোগ করে এবং সেই কারণে সমজাতীয় লক্ষ্যের জন্য সমবেত-ভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়। স্থতরাং সমাজ বলতে আমরা বুঝি সমাজভুক্ত ব্যক্তিদের পরস্পরের সম্পর্কে সচেতনতা এবং তাদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যর সাদৃশ্য।" কিন্তু কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী, যেমন—গিনস্‌বার্গ (*Ginsberg*), এ অর্থে সমাজকে গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেন, পরোক্ষ সম্পর্ক এবং যে-সব সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা সকল সময় সচেতন নই সেগুলিও সমাজ জীবনে খুবই মূল্যবান। কাজেই মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-কোন ব্যবহারের ক্ষেত্রেই সমাজ কথাটিকে প্রয়োগ করা যায়, সে-ব্যবহার প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ হোক, সংগঠিত হোক বা অসংগঠিত হোক, সচেতন হোক বা নাই হোক, সহযোগিতামূলক হোক বা শত্রুতামূলক হোক। তিনি 'সমাজ' (Society) এবং 'একটি সমাজ' (A society) —এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। 'সমাজ' হল সার্বভৌম, ব্যাপক এবং তার কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। 'একটি সমাজ' হল সেই সকল ব্যক্তির সমষ্টি বা গোষ্ঠী, যারা কতকগুলি আচরণ-পদ্ধতি বা কতকগুলি সম্পর্কের দ্বারা যুক্ত হয়েছে এবং যারা এই বৈশিষ্ট্যের জন্য যে সকল লোক এরূপ কোন সম্পর্কের দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত হয়নি তাদের থেকে পৃথক। যে-কোন রকমের জনসমষ্টিই গোষ্ঠী নয়। গোষ্ঠী বলতে বুঝব যারা পরস্পরের সঙ্গে নিয়মিতভাবে যুক্ত বা যাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ আছে এবং যাদের এমন একটি সংগঠন আছে যা সকলের স্বীকৃতি লাভ করে। এমন অনেক জনসমষ্টি আছে যাদের উদ্দেশ্যর মধ্যে সাদৃশ্য আছে এবং যাদের আচরণের ধারায়ও মিল আছে, অথচ যাদের কোন সংগঠন নেই।

ম্যাকইভার ও পেজ (*MacIver and Page*) বলেন, "সমাজ হল আচার এবং কার্য-প্রণালী, কর্তৃত্ব এবং পারস্পরিক সাহায্য, নানারকম সমবায় এবং বিভাগ, মানুষের আচরণের নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীনতা—এ সকল কিছুর দ্বারা গঠিত প্রথা। এই নিয়ত পরিবর্তনশীল জটিল প্রথাকেই আমরা সমাজ বলি। এ হল সামাজিক সম্পর্কের জাল।"

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, সমাজ কথাটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং **ব্যাপক অর্থে 'সমাজ' বলতে যে-কোন 'সামাজিক সম্পর্ক'কে বোঝায়। ক্ষুদ্রতর অর্থে**

'সমাজ' হল একটি অল্পবিস্তর স্থায়ী সংগঠন (Organization) যার মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক প্রকাশিত হয়। সমাজ হল মানুষের বিচিত্র সামাজিক সম্পর্কের জাল, সমাজ হল বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী—যে মানবগোষ্ঠী একই উদ্দেশ্য ও স্বার্থ-সাধনের জন্য, নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ককে আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য একটি সংগঠনের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয়। মোটামুটি একটা স্থায়ী সংগঠন থাকলেই আমরা 'সমাজ' কথাটি ব্যবহার করি।

উপরে যে আলোচনা করা হল, তা হল মানব সমাজের আলোচনা, কিন্তু সমাজ শুধু মানুষকে নিয়েই নয়, পশু সমাজের কথাও বলা যেতে পারে, তবে এই দুই সমাজের মধ্যে পার্থক্য আছে। পশু সমাজে সামাজিক চেতনা খুবই ক্ষীণ এবং পশুদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগের বিষয়টিও খুবই পরিবর্তনশীল। পারস্পরিক সচেতনতা এবং স্বাজাত্যবোধ মানবসমাজের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া, পশু সমাজে পশুরা সহজাত প্রবৃত্তি (instincts)-র দ্বারা চালিত হয়ে তাদের প্রয়োজন মেটায়। আর মানুষ প্রয়োজন মেটায় তার শিক্ষালব্ধ আচরণের দ্বারা। মানুষের সামাজিক সংগঠন এক সাংস্কৃতিক সংগঠন; পশুসমাজের সংগঠন তা নয়। মানুষ তার মনোভাব, তার অর্জিত জ্ঞানকে বংশ-পরম্পরায় হস্তান্তরিত করতে পারে। মানুষ ভাষার অধিকারী। তাই ভাষার মাধ্যমে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। এই সাংকেতিক বা প্রতীকমূলক যোগাযোগ (symbolic communication) করার ক্ষমতা মানব সমাজের এক অনুপম বৈশিষ্ট্য বলে সমাজবিদ্ কিংস্‌লে ডেভিস (*Kingsles Davis*) উল্লেখ করেছেন।

২। প্রাক্-অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন এবং উন্নত সমাজে সামাজিক সংগঠনের শ্রেণীভেদ (Types of Social Organisation in Preliterate and Developed Societies.)

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া মানুষের পক্ষে জীবনযাপন করা সম্ভবপর নয়। অধুনিকযুগে আমরা নানা ধরনের সামাজিক সংগঠনের পরিচয় পাই যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। অতি প্রাচীনকালে যখন সভ্যতার আলো মনুষ্য সমাজে প্রবেশ করেনি, তখনও কতকগুলি সামাজিক সংগঠনের নজীর আমরা পাই। বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গিতে

সমাজের অস্তিত্ব তখন ছিল না কিন্তু জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদই প্রাক্-অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন মনুষ্যসমাজকে সংঘবদ্ধ হতে বাধ্য করেছিল। কাজেই সামাজিক সংগঠনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দলের বা গোষ্ঠীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা সামাজিক জীবনকে সহজ এবং সুন্দর করে তোলে ; যেমন—পরিবার, স্কুল, ক্লাব ইত্যাদি। অর্থনৈতিক স্বার্থ সাধনের জন্য অর্থনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে এবং সামাজিক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য পঞ্চায়েতের মতন সংগঠনও আমরা দেখতে পাই।

প্রাক্-অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সমাজে এবং আধুনিক সমাজে যে সমস্ত সামাজিক সংগঠনের পরিচয় আমরা পাই তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এখন প্রথমেই যে প্রশ্ন মনে জাগে তা হচ্ছে, প্রাক্-অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সমাজ ও উন্নত সমাজের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করব কিভাবে? নৃতত্ত্ববিদ্‌রা খাদ্য সংগ্রহের (food collection) পর্যায়কে প্রথম ধরণের সমাজের এবং খননকার্য এবং কৃষিকার্যের (cultivation) পর্যায়কে উন্নত সমাজের স্তর রূপে চিহ্নিত করেছেন।

প্রাক-অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সমাজের উপজাতি (Tribal) সংগঠন আলোচনা করার আগে উপজাতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। হিন্দু সামাজিক সংগঠনে বিভিন্ন জাতি বা বর্ণের (Caste) সম্পর্ক এবং একই জাতি বা বর্ণের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। উপজাতীয় (Tribal) সামাজিক সংগঠন কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। ভারতবর্ষের উপজাতিদের পারস্পরিক সম্পর্কের নজীর পাওয়া যায় না তবে ভৌগোলিক কারণ অনেক উপজাতিকে একত্র হতে বাধ্য করেছিল। উপজাতিদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে জানা যায় যে, উপজাতি হল বিভিন্ন পরিবারের সমষ্টি। তারা একই জায়গায় বসবাস করে ; একই ভাষায় কথা বলে বা একই প্রতীক (dialet) ব্যবহার করে। বিবাহ এবং বৃত্তি ইত্যাদি ব্যাপারে তারা কতকগুলি নিয়ম পালন করে। যেমন—একই উপজাতির সদস্যরা নিজ উপজাতি ছাড়া অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে লিপ্ত হয় না। উপজাতীয় জীবনের যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হল কয়েকজন নৃতত্ত্ববিদ (Anthropologists) সে-সব বৈশিষ্ট্যগুলিকে পুরোপুরী স্বীকার করেন না। একই অঞ্চলে বসবাস করা যে উপজাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য, রিভারস্ (*Rivers*) তাঁর গ্রন্থে তা অস্বীকার করেছেন। নৃতত্ত্ববিদ পেরী (*Perry*) ও কিন্তু উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, যাযাবর (Nomadic) উপজাতি একই অঞ্চলেই ঘোরাফেরা করত। র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন (*Radcliffe Brown*) অষ্ট্রেলিয়ার উদাহরণ উদ্ধৃত করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, সেখানকার উপজাতির একটি অংশ

অপর অংশের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। অর্থাৎ উপজাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে মত পার্থক্য বর্তমান। এই মত পার্থক্যের মূল কারণ, তাঁরা যে অঞ্চলের সমীক্ষায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন সেই অঞ্চলের উদাহরণই তাঁদের মনোগ্রাহী হয়েছে। কয়েকজন আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ উপজাতিদের একইস্থলে বসবাস করার বৈশিষ্ট্যকেও স্বীকার করে নিয়েছেন।

প্রত্যেক সমাজেই লোকেরা বিভিন্ন দলে, গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়—বিভিন্ন বন্ধনের মাধ্যমে। এই সমস্ত বন্ধনের মধ্যে প্রধান হল সেই বন্ধন যা জনন সম্বন্ধীয় (Reproduction) ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। এই সম্পর্কের ভিত্তিতেই জ্ঞাতিসম্পর্কীয় সংগঠন (Kinship Organisation) গড়ে ওঠে। জনন সম্বন্ধীয় বন্ধন দু' প্রকারের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করে। প্রথম প্রকারের বন্ধনের আঁওতায় স্বামী, স্ত্রী এবং আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক এবং দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্কে পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রথম প্রকার সম্পর্ক জ্ঞাতি সম্পর্কের (affinal Kinship) উপর এবং দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্ক রক্তের সম্পর্কের (Consanguineous kinship) উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রক্ত সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা (Consanguineous kinship) নির্ধারণের ক্ষেত্রে জৈবিক কারণই যথেষ্ট নয়, সামাজিক স্বীকৃতির প্রশ্নই আসল; কারণ প্রাক্-অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সমাজে পিতা কে তা নির্ধারণ করা অনেক সময় দুরূহ ব্যাপার ছিল। টোডা (Toda) গোষ্ঠীর মধ্যে এই সামাজিক স্বীকৃতির জন্য উৎসবের মাধ্যমে তীর-ধনুক উপহার দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল।

প্রাক-অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন যুগে সামাজিক সংগঠন হিসেবে পরিবারের (Family) নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। তবে এ সম্পর্কেও নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। নৃতত্ত্ববিদ ওয়েষ্টারমার্ক (*Westermark*) বলেন যে, প্রাক্-অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সমাজে, বর্তমানে পরিবারের যে সংজ্ঞা আমরা নিরূপণ করি, সে অর্থে পরিবার নিশ্চয়ই ছিল না; কিন্তু পরিবারের একেবারেই অস্তিত্ব ছিল না, তা বলা যায় না। গর্ডেন চাইল্ড (*Gorden childe*) তাঁর 'Social Evolution' গ্রন্থে এই অভিমত সমর্থন করেছেন। কিন্তু মর্গান (*Morgan*), ম্যাকলিলান (*Maclellan*) এবং বেকোফেন (*Bachofen*) বলেন যে, প্রাক্-অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সমাজে পরিবারের কোনরূপ অস্তিত্বই ছিল না। অনেকে একথাও বলেন যেহেতু বিবাহ এবং পরিবার ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত কাজেই পরিবারের উৎপত্তির সঙ্গে বিবাহ অনুষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত ছিল। নৃতত্ত্ববিদ্ লাউই (*Lowie*) বলেন, বিবাহ এবং পরিবারকে

পৃথকভাবে চিন্তা করা যায় না এবং উভয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানই যৌন সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রাক্-অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সমাজে পরিবারের স্বরূপ জানতে হলে বিবাহের ক্রম বিবর্তনের সম্পর্কে কিছু জানা দরকার। প্রথম পর্যায় হল আদিম অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্ভোগ (Primitive promiscuity)। এই পর্যায়ে অবাধ যৌন মিলনে কোন বাধা নিষেধ ছিল না। একদল পুরুষ একদল স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌন মিলনে রত হত। এই অবস্থায় উৎসাবাদিতে যৌন সম্ভোগের সুযোগ প্রদান করা হোত এবং আন্তরিকতার প্রতীক হিসেবে পরস্পরের মধ্যে স্ত্রী বিনিময়ের প্রচলন ছিল। নৃতত্ত্ববিদ মলিনাওস্কি (*Molinowski*) এই পর্যায়ের নরনারী সম্পর্ককে বৈবাহিক সম্পর্করূপে আখ্যাত করতে রাজি নন। তিনি বলেন যেহেতু পরিবার ছাড়া বৈধভাবে সন্তানপালনের কোন সংগঠনই নেই সেহেতু এ অবস্থায় বৈধভাবে সন্তান লালন পালনের কোন উপায়ই ছিল না।

বহু-স্বামীক (Polyandry) প্রথা দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ এই পর্যায়ে একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে কয়েকজন পুরুষ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হত। যথেচ্ছাচার যৌন মিলনে যে অবৈধ শিশুর জন্ম হোত তার প্রতি পিতৃত্বের অবজ্ঞাই মাতৃতান্ত্রিক সমাজের জন্ম দেয়। কিন্তু এই অবস্থারও অবসান ঘটল। পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ বহু-বিবাহকারী (Polygamy) পর্যায়ে একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রীলোকের সাথে যৌন-সম্পর্কে লিপ্ত হত। নৃতত্ত্ববিদ্ মর্গান (*Morgan*) বলেন এইভাবে বর্তমান পরিবারের অর্থাৎ এক-বিবাহকারী (monogamous) পরিবারের উদ্ভব হয় অর্থাৎ যৌন-সম্পর্ক একটি পুরুষের সঙ্গে একটি নারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রাক্-অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সমাজে পরিবারের অস্তিত্ব সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে মতদ্বৈধ রয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্ভোগ (Promiscuty) পর্যায়ে পরিবারের যে কোন অস্তিত্ব ছিল না তা প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন।

পরিবারের পরই সামাজিক সংগঠন হিসেবে গোষ্ঠী (Clan) উল্লেখযোগ্য যা রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে সংগঠিত। গোষ্ঠীর সদস্যরা মনে করে যে তারা একই বংশোদ্ভূত। সেজন্য একই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে কোন রকম বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা থেকে তারা বিরত থাকত। লাওই (Lowie) গোষ্ঠীর সদস্যদের একত্রে বসবাসের নীতিও স্বীকার করেন নি। তিনি বলেন, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার গোষ্ঠীর মধ্যে তা লক্ষ্য করা যায় না। তাদের নিজেদের মধ্যে বিবাহ যে পুরোপুরি নিষিদ্ধ একথাও বলা চলে না, কারণ কিছু কিছু উপজাতি, যেমন আরব উপজাতিদের নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহের প্রচলনের নজীরও চোখে পড়ে।

গোষ্ঠী (Clan) বলতে মাতৃতান্ত্রিক এবং পিতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীই বুঝায়। পিতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীর আগেই মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীর উদ্ভব। সেজন্য আমেরিকার নৃতত্ত্ববিদেরা গোষ্ঠী (Clan) বলতে মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীরই ইংগিত দিয়েছেন। নৃতত্ত্ববিদ লাওই (*Lowie*) সেজন্য গোষ্ঠী বা Clan-এর জায়গায় 'Sib' কথাটি ব্যবহার করেছেন এবং পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্য 'Father Sib' এবং 'Mother Sib' কথা দুটি ব্যবহার করেছেন।

Clan বা গোষ্ঠীর সঙ্গে উভয় সংগঠনই বহির্গোষ্ঠী বিবাহ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত (exogamous) অর্থাৎ উভয় সংগঠনের সদস্যরা নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হোত না এবং উভয় সংগঠনই উত্তরাধিকার সূত্রে একপাক্ষিক (unilateral) নীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু পরিবারের সঙ্গে গোষ্ঠীর পার্থক্য হল গোষ্ঠীর আকার এত বৃহৎ হতে পারে যে তার সদস্যরা সব সময় একই আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ নাও হতে পারে।

গোষ্ঠী জীবনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোচনা করলে বুঝতে পারি, প্রাত্যহিক জীবনে সদস্যরা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে যেতে কুণ্ঠাবোধ করত না। নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে কেবলমাত্র বিবাহই যে নিষিদ্ধ তাই নয়, আইনগত এবং রাজনৈতিক জীবনে একাত্মবোধের নীতিই তারা প্রয়োগ করত, যে নীতি তাদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত।

যখন গোষ্ঠীয় দলগুলি (groups) কোন কারণে একত্রে মিশে যায় তখন তা Phratry নামে পরিচিত। যখন উপজাতির সব গোষ্ঠী দুইটি Phratry গঠন করে তখন যে দ্বিসংগঠন গড়ে ওঠে তাকে Moiety বলে। Phratry সংগঠন বহির্গোষ্ঠী বিবাহকারী (exogamous) নাও হতে পারে অর্থাৎ তাদের নিজেদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝি যে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে Phratry গঠিত হয়। কেন এরকম হয় তার কারণ দেখিয়ে লাওই (*Lowie*) চার প্রকারের সম্ভাবনার কথা বলেছেন।

প্রথমতঃ, বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিয়েও একত্রে মিলিত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যখন একটি গোষ্ঠী বৃহৎ আকার ধারণ করে তখন তাদের একতার বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন না করেও ছোট ছোট দলে বিভক্ত হতে পারে। তৃতীয়তঃ, লাওই আমেরিকাকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করে সেখানকার সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলেন যে, গোষ্ঠীগুলি ও Moityগুলি নানাকারণে পৃথকভাবে উদ্ভূত হতে পারে কিন্তু পরে তারা সংগঠিত হয়েছে এমন

নজীরও রয়েছে। চতুর্থতঃ, রিভারস্ (*Rivers*) টোডা গোষ্ঠীর উদাহরণ থেকে বলেন যে দুটি ছাড়া অন্যান্য গোষ্ঠীর অবলুপ্তি ঘটেছে যা আগে একটি মাত্র বৃহদাকার গোষ্ঠীরূপে বিরাজ করত। একটি গোষ্ঠীর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সদস্যরা অন্য গোষ্ঠীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সমগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ যখন একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ল তখন তারা একত্র হতে বাধ্য হল।

কৃষিকার্যের এবং গ্রাম্য সম্প্রদায়ের (village community) উন্নতির সাথে সাথে সমাজে শ্রেণী (class) এবং জাতি (caste) বিভাগ সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। প্রাক্-অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন যুগের সমাজের মত উন্নত (Developed) সমাজেও নানারকম সামাজিক সংগঠনের আবির্ভাব হয়েছে। তবে প্রাক্-অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সমাজের সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে উন্নত সমাজের সামাজিক সংগঠনের মূলগত পার্থক্য হলঃ প্রাকঅক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সমাজের সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতি মোটামুটি একই ধরনের এবং সংখ্যাও সীমিত, কিন্তু উন্নত সমাজের সামাজিক সংগঠন যেমন বিভিন্ন প্রকারের তেমনি তার কার্যাবলীও বিচিত্রমুখী। উন্নত সমাজে নানারকম সামাজিক সংগঠনের যে পরিচয় পাই তা গঠিত হয় কখনও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং কখনও কখনও সংগঠনের জন্য সতর্কতাও অবলম্বন করা হয়। এইভাবে একদিকে যেমন পরিবার এবং সম্প্রদায় (community) গড়ে ওঠে, অন্যদিকে সেরূপ রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, ক্লাব ইত্যাদি গড়ে ওঠে। এই সমস্ত বহুমুখী সংগঠন মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত এবং জীবনযাত্রার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। খাদ্য, আশ্রয় এমনকি যে সমাজে মানুষ বাস করে সেই সমাজকে রক্ষার কর্তব্যেই মানুষ সংগঠিত হয় এবং এই ইচ্ছাই মূর্ত হয়ে উঠে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, সংগঠনের সদস্যরা পরস্পর বোঝাপরা এবং শ্রমবিভাগের ভিত্তিতেই সংগঠনকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

উন্নত সমাজের সামাজিক সংগঠন হিসাবে পরিবার (Family) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। পরিবারের সদস্য হয়ে মানুষ সমাজে বসবাস করে। পরিবারেই তার জন্ম এবং পরিবারেই সে তার সমস্ত জীবন অতিবাহিত করে। সুষ্ঠু সমাজ জীবন যাপনের জন্য যে সব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সর্বজনস্বীকৃত তার মধ্যে বিবাহ এবং পরিবার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবারের কার্যাবলীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সন্তান-প্রজনন। আদিম সমাজে সুষ্ঠু পরিবারের অভাবে অবৈধ শিশুর অকাল মৃত্যু ঘটত। পরিবার ছাড়া নরনারীর যৌন মিলন সমাজ-স্বীকৃত নয়। কাজেই বৈধ উপায়ে যৌন মিলন এবং সন্তান-প্রজনন পরিবারের প্রধান কাজ। এছাড়াও নব-জাত শিশুর সামাজিকীকরণেও

পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরিবারে শিশুটি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাই তার ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে। স্নেহ, ভালবাসা ইত্যাদি মানসিক বৃত্তিগুলি পরিবারেই বিকশিত হয়। কাজেই পারিবারিক সম্পর্ক যতখানি দীর্ঘস্থায়ী অন্যান্য সংগঠনের স্থায়িত্ব সেই পরিমাণে কম বলা চলে।

সামাজিক সংগঠন হিসেবে উন্নত সমাজে পরিবারের পরই গ্রামীণ সম্প্রদায় (village community) উল্লেখযোগ্য। সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই গ্রাম্য সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। গ্রাম্য সম্প্রদায়কে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণই বলা চলে কারণ, একদিকে যেমন খাদ্য সরবরাহ এর প্রধান কাজ অন্যদিকে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং দুস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য কারও গ্রামীণ সম্প্রদায়ের নৈতিক দায়িত্ব। এককথায় সুন্দর জীবন-যাপনের আবশ্যকীয় সামগ্রী গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সদস্যদের যোগান অন্যতম প্রধান কাজ।

মানুষের প্রয়োজনের কোন শেষ নেই। কাজেই কৃষিভিত্তিক গ্রামের পক্ষে জনগণের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হল না। তখনই শিল্পকেন্দ্রিক শহরের সৃষ্টি হল। ফলে পরিবর্তিত প্রয়োজন মেটাতে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে নানারকম প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে। তখন একই ব্যক্তি নানান প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ গ্রহণ করে। কারখানার শ্রমিক-মালিক বিরোধের ফলে যেমন নানাধরণের শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে ওঠে তেমনি মানুষের মানসিক চাহিদা পরিতৃপ্ত করার জন্যও বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনও গড়ে ওঠে।

মানুষের প্রয়োজনের যেহেতু কোন সীমারেখা নির্দেশ করা যায় না, কাজেই নিত্য নতুন প্রয়োজন মেটাতে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি নানা ধরনের সংগঠনের উদ্ভব হয় ক্রমে ক্রমে।

উন্নত সমাজের সংগঠনগুলির কিছু কিছু ত্রুটি আছে ঠিকই তবু সংগঠনের সুবিধার কথা চিন্তা করলে অসুবিধাগুলি বিরাট কিছু মনে হয় না। শিক্ষার প্রসারে, রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে, ধর্মীয় জীবনের বিকাশ সাধনে এবং সুস্থ-সবল জীবনযাপনের পক্ষে সামাজিক সংগঠনগুলি উন্নত সমাজে শুধু যে অত্যাবশ্যক তাই নয়, এগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

অনুশীলনী

১। মানব সমাজের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। (Explain the nature of human society.)

২। প্রাক-অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন এবং উন্নত সমাজে সামাজিক সংগঠনের শ্রেণীভেদ আলোচনা কর। (Discuss the types of social organisation in preliterate and developed societies.)

চতুর্থ অধ্যায়

কয়েকটি প্রারম্ভিক প্রত্যয়
(A few preliminary concepts)

(ক) সংস্কৃতি ঃ (Culture) ঃ

(1) সংস্কৃতি বলতে কি বুঝি? (What is the meaning of Culture) : 'সংস্কৃতি' শব্দটি ক্ষুদ্রতর ও ব্যাপকতর, দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ক্ষুদ্রতর অর্থে সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মার্জিত রুচি বা অভ্যাসজাত উৎকর্ষ। ডিউই (*Dewey*) বলেন, "সংস্কৃতি বলতে বোঝায় কোন একটা কিছু যার অনুশীলন করা হয়েছে, যা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এ হচ্ছে অপরিণত ও অমার্জিতের বিরোধী।" নৃতত্ত্ববিদ্‌রা 'সংস্কৃতি' শব্দটিকে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করেছেন। এই অর্থে আমাদের জীবনের সব দিকগুলিই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নৈতিকতা, রীতিনীতি, মানুষের অর্জিত বিভিন্ন অভ্যাস সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যাপকতর অর্থে যখন সংস্কৃতি শব্দটি ব্যবহৃত হয় তখন তার দুটি দিক আছে, পার্থিব ও আধ্যাত্মিক।

মানুষের প্রতিটি কাজ প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক তা তার সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মানুষ ও তার পরিবেশের মধ্যে যে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া চলেছে তার মূলে রয়েছে মানুষের কোন-না-কোন প্রয়োজন। মানুষের এই প্রয়োজনকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, পার্থিব প্রয়োজন—যার জন্য মানুষ জমি চাষ করে, খাদ্য উৎপাদন করে, নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করে, প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে খনিজ সম্পদ নিয়ে নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরি করে।

কিন্তু মানুষের আরও এক ধরনের প্রয়োজন আছে। সে প্রয়োজন হল, সৌন্দর্য-সম্পর্কীয় এবং আধ্যাত্মিক (Aesthetic and Spiritual)। এরই জন্য মানুষ সঙ্গীত শিক্ষা করে, কবিতা লেখে, সাহিত্য রচনা করে। পার্থিব বস্তু সম্পর্কে যেমন মানুষের আগ্রহ হল, কি ভাবে এই জিনিসগুলি উৎপন্ন করা যায়, তেমনি উৎকর্ষমূলক প্রয়োজন সম্পর্কেও মানুষের আগ্রহ কম নয়। সে কারণে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বস্তু ছাড়াও আমরা দেখি রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের বৈচিত্র্য, প্রচলিত প্রথা, নানা ধরনের অনুষ্ঠান, বহু রকমের প্রতিষ্ঠান

এবং এগুলি মানুষের সঙ্গে তার সামাজিক পরিবেশের সম্পর্ককে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে ; একে আমরা মানুষের সাংস্কৃতিক দিক বলতে পারি।

গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, "এ সকল বস্তু এবং আচরণের ধারা, পার্থিব ও অপার্থিব স্বার্থ এবং সন্তোষ—এ সকল কিছুর জটিল সমগ্রতাকেই প্রাচীন এবং আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্‌রা 'সংস্কৃতি' নামে অভিহিত করেছেন।" টাইলর (*Tylor*) বলেন, "সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজস্থ মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নীতি, নিয়ম, সংস্কার ও অন্যান্য যে-কোন বিষয়ে দক্ষতার জটিল সমাবেশ।" মলিনাওস্কির (*Malinowski*) মতে সংস্কৃতি হল মানুষের তৈরি বস্তু ও একটি উপায় যার মাধ্যমে সে তার উদ্দেশ্য সাধন করে। নর্থ (*C. C. North*) সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন, "সংস্কৃতি হল মানুষের সৃষ্ট সে-সব উপায় যেগুলি তাকে তার অভাব মেটাতে সহায়তা করে।" সরোকিন (*P. A. Sorokin*)-এর মতে দুটি ব্যক্তির চেতন ও অচেতন ব্যবহারের যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া তার ফলে সৃষ্ট ও পরিবর্তিত যা কিছু তার সমগ্রতাই সংস্কৃতি। তাঁর মতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, কলা সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।" লাপেয়ার (*R. T. Lapiere*)-এর মতে "সংস্কৃতি হল, কোন সমাজের সভ্যরা বংশ পরম্পরায় যেসব আচার, প্রথা ও অনুষ্ঠান উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে সেগুলি। সংস্কৃতি সম্পর্কে ডিউই (*Dewey*) বলেন, "এ হল ধারণা ও কলার মূল্যাবধারণ এবং মানবীয় অনুরাগ জাগ্রত করার জন্য অনুশীলন।" হোয়াইটহেড (*Whitehead*) বলেন, "সংস্কৃতি হল চিন্তার ক্রিয়াশীলতা এবং সৌন্দর্য ও মানবীয় অনুভূতিতে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা।"

সংস্কৃতির যে বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হল সেগুলি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, সংস্কৃতি বলতে কেবলমাত্র মার্জিত রুচি, ব্যবহার বা অভ্যাসের উৎকর্ষ বোঝায় না, সংস্কৃতি তার থেকেও বেশী কিছু। সংস্কৃতি হল মানুষের আচরণের সমষ্টি। মানুষের জাগতিক নৈপুণ্য ও কর্মকুশলতা, তার বিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কলা, নৈতিকতা, রীতিনীতি, ভাষা, মূল্যবোধ সব কিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের বিরোধিতা দেখা দেয়। মানুষ তার ব্যক্তিত্বের অনুশীলনের মাধ্যমেই এ বিরোধিতা থেকে মুক্ত হতে পারে এবং এমন এক দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করতে পারে যাতে সকলে অংশ গ্রহণ করতে পারে। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) সংস্কৃতি বলতে এই ব্যষ্টিগত ব্যক্তিত্বের (**Individual Personality**) অনুশীলনকেই বুঝেছেন।

শিক্ষার ব্যাপকতর এবং সঙ্কীর্ণতর দু-ধরনের তাৎপর্য আছে এবং ব্যাপকতর অর্থে শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তাই হল 'সংস্কৃতি'।

কিংস্‌লে ডেভিস (*Kingsley Davis*) মনে করেন মানুষ এক অনুপম সত্তা, এবং তার কারণ সে সামাজিক বলে নয়, অন্যান্য অনেক প্রাণীও সামাজিক। তাঁর মতে মানুষ অনুপম সত্তা, কারণ সে সংস্কৃতির অধিকারী। সংস্কৃতির জন্যই তার বুদ্ধি অনেকগুণ বেড়ে গেছে। তার বাকক্ষমতা তার সংস্কৃতিরই অঙ্গ। তার সামাজিক জীবন সংস্কৃতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এই সংস্কৃতিই মানুষের জীবনে নিজেকে নানাভাবে শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত করে দিয়েছে এবং মানুষের সব অনুপম বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংস্কৃতির সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সংস্কৃতির অধিকারী হওয়ার জন্য শুধুমাত্র মানুষ নয়, তার সমাজও হয়ে উঠেছে অনুপম।

অনেকে আবার সংস্কৃতিকে বিশেষ এক শ্রেণীর লোকদের একচেটিয়া জিনিস বলে মনে করে, কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। প্রতিটি ব্যক্তিরই সংস্কৃতিবান হওয়ার অধিকার আছে এবং নিজের চেষ্টায় সে সংস্কৃতিসম্পন্ন হতে পারে। বস্তুতঃ, সংস্কৃতির মধ্যে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দুটি দিকই আছে। 'সংস্কৃতি' মানুষের পশুভাবকে দূর করে। সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই মানুষের সঙ্গে নিম্নতর প্রাণীর পার্থক্য। সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি জানে কিভাবে বুদ্ধিমানের মতো আচরণ করতে হয়, সে পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া করতে পারে। জ্ঞান মানুষের বুদ্ধিকে উন্নত করে, সংস্কৃতি তার হৃদয়কে গঠিত করে। সংস্কৃতির সঙ্গে সামাজিক লক্ষ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারে, সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হলে সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা উচিত। ব্যক্তির সংস্কৃতি সমাজের জীবনকে প্রভাবিত করে, আর ব্যক্তির জীবন সমাজের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। সংস্কৃতিকে অনেক সময় কৃত্রিম বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর সংস্কৃতির সাধারণ উপাদানগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, মানুষের অনেক প্রয়োজনের মতন সংস্কৃতিও স্বাভাবিক, কৃত্রিম কিছু নয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। গোষ্ঠীভেদে, সমাজভেদে সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ দৃষ্ট হয়। এর কারণ হল সংস্কৃতি হল ঐতিহ্যের ব্যাপার, সেহেতু পরিবর্তনশীল। সংস্কৃতিগত এই পরিবর্তনশীলতার সাহায্যেই আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি কেন বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন দেশের সামাজিক জীবনের মধ্যে এত পার্থক্য। আবার একই অঞ্চলেও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনশীলতা

দৃষ্ট হয়। কোন এক অঞ্চলে পঞ্চাশ বছর আগেকার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে বর্তমানের সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়াই কঠিন হয়ে পড়ে।

(ii) সংস্কৃতি এবং সভ্যতা (Culture and Civilisation) : 'সংস্কৃতি' ও 'সভ্যতা' শব্দ দুটিকে অনেক সময় সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহার করা হয় যদিও তাদের সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহার করা চলে না। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা 'সংস্কৃতি' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নৈতিকতা, আচার-ব্যবহার এবং সমাজের সভ্য হিসেবে মানুষের অর্জিত অভ্যাস ও কর্মক্ষমতা সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। 'সভ্যতা' বলতে তাঁরা বোঝেন মনুষ্য সমাজের উন্নত স্তরে, শহরে এবং রাষ্ট্রে মানুষের যে কর্মকুশলতার আবির্ভাব ঘটেছে, তার সমষ্টি।

কোন কোন লেখক মনে করেন, মানুষের আচরণের দুটি দিক আছে—বাইরের দিক এবং ভেতরের দিক। আচরণের বাইরের দিক হল সভ্যতা, তার ভেতরের দিক হল সংস্কৃতি। এসব লেখকদের মতে সংস্কৃতির মাধ্যমেই আমাদের প্রকৃতি প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হয়। আমাদের চিন্তা-ভাবনা, কাজকর্ম, শিল্পকলা, নীতিবোধ, ধর্ম, আমোদ-প্রমোদ সব কিছুর মাধ্যমেই আমাদের সংস্কৃতির প্রকাশ। বিভিন্ন বিষয়ের আকর্ষণ ও মূল্য হল লক্ষ্য এবং বস্তু ও ক্রিয়া হল এই লক্ষ্য লাভ করার উপায়; আর মানুষ যত রকম যন্ত্র বা উপায় নির্ধারণ করেছে সেগুলি সব মিলিয়ে হল মানুষের সভ্যতা। পার্থিব ও শিল্প-সংক্রান্ত যত রকম ব্যবস্থা বা কৌশল এবং মানুষের জীবনকে পরিচালিত করার জন্য যত আর্থিক ও রাজনৈতিক সংগঠন, সবই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত।

বিভিন্ন লেখক 'সংস্কৃতি' ও 'সভ্যতার' মধ্যে প্রভেদ করেছেন। জার্মান দার্শনিক কাণ্ট(*Kant*)-এর মতে নৈতিকতা সংস্কৃতির প্রয়োজনীয় উপাদান; সংস্কৃতি মনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, সভ্যতার সঙ্গে ব্যক্তির বাহ্য আচরণের সম্পর্ক। মেথু আরনল্ড (*Metthew Arnold*)-ও মনে করেন যে, সংস্কৃতি হল অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া, যেহেতু মানুষের সমগ্র পূর্ণতাতেই সংস্কৃতি নিহিত, আর সভ্যতা বাইরের ব্যাপার, যা বাহ্য ঘটনার উপর নির্ভর। ডঃ আলফ্রেড্ ওয়েবার (*Dr. Alfred Weber*)-এর অভিমতানুসারে সংস্কৃতি হল সমাজের শিল্পগত, ধর্মীয়, দার্শনিক সৃষ্টি। আর সভ্যতা হল মুখ্যতঃ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত জ্ঞান এবং তারা প্রাকৃতিক শক্তির উপর যে নিয়ন্ত্রণ এনে দেয় তাই।'

ম্যাকাইভার (*MacIver*)-এর মতে সংস্কৃতি হল লক্ষ্য, সভ্যতা হল সেই লক্ষ্য লাভের উপায়। তাঁর ভাষায়, সভ্যতা হল সংস্কৃতির যন্ত্র, শরীর বা পরিচ্ছদস্বরূপ।

সভ্যতা রাজনীতি, অর্থনীতি এবং যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, আর সংস্কৃতি নিজেকে প্রকাশ করে কলা, সাহিত্য, ধর্ম ও নৈতিকতার মধ্য দিয়ে। আমাদের সংস্কৃতি হল আমরা যা তাই, আমাদের সভ্যতা হল আমরা যা ব্যবহার করি।"

গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, "সভ্যতা হল বাহ্যিক ও যান্ত্রিক, জনকল্যাণকর উপায়ের সঙ্গেই এর সম্পর্ক। কিন্তু সংস্কৃতির কাজ যেহেতু লক্ষ্য নিয়ে, সেহেতু এ হল অভ্যন্তরীণ, আঙ্গিক এবং সম্পূর্ণ।' তাই তিনি বলেন, "সভ্যতা হল যা আমাদের আছে, সংস্কৃতি হল আমরা যা তাই।"[1]

সংস্কৃতি এবং সভ্যতার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। যথা ঃ

(ক) দক্ষতার ভিত্তিতে সভ্যতার পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে কিন্তু সংস্কৃতির বিচার হয় মানুষের মানসিক উৎকর্ষের মানদণ্ডে। সভ্যতার পরিমাপ করতে গিয়ে আমরা বাইরের উন্নতি লক্ষ্য করি, যেমন—হাতে বোনা তাঁতের তুলনায় যান্ত্রিক তাঁতের ক্ষমতা অনেক বেশী। আর শিল্পকলার ক্ষেত্রে মতবিভেদের জন্য কোন ভাল চিত্র কারও কাছে সুন্দর, কারও কাছে অসুন্দর।

(খ) সভ্যতার অবদানগুলিকে সহজেই বোঝা যায়, উপলব্ধি করা যায়। সংস্কৃতির অবদান সাধারণ মানুষ অত সহজে উপলব্ধি করতে পারে না। সাধারণ লোক সামান্য শিক্ষা পেলেই আধুনিক যন্ত্রপাতির কলাকৌশল ও ব্যবহার বুঝে নিতে পারে। কিন্তু কোন লোককে কবিতা লেখা বা ছবি আঁকা ভালোভাবে শেখালেই যে সেই বিষয়ে সে দক্ষতা লাভ করবে তা নিশ্চয় করে বলা যায় না।

(গ) সভ্যতার গতি যেমন দ্রুত, সংস্কৃতির গতি তেমন দ্রুত নয়। সংস্কৃতির গতি অনেক সময় বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে একটা থমথমে নিশ্চল ভাব দেখা দেয়। কখনও বা সংস্কৃতি হয় পশ্চাদগামী।

(ঘ) সভ্যতার ক্ষেত্রে পরিণতি বা ফলাফল হল বড় কথা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিণতির থেকে কাজটাই হল বড়, সেটাই হল লক্ষ্য। তাছাড়া, সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা যত তীব্র, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা তত তীব্র নয়। মানুষ সৌন্দর্যকে নানাভাবে উপভোগ করতে পারে, বুদ্ধির সাধনায় নানাভাবে ব্রতী হতে পারে, ধর্ম সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতাও বিভিন্নভাবে হতে পারে ; এগুলি

---

1. 'Civilisation is what *we* have, culture is what *we* are.'—
—*Gisbert* : Fundamentals of Sociology

একত্রেও বিরাজ করতে পারে। কিন্তু সভ্যতার ক্ষেত্রে দেখি, আধুনিকতম সভ্যতার অবদান প্রাচীন আবিষ্কারকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

(ঙ) সভ্যতা হল ক্রমবর্ধিষ্ণু, কেননা মানুষ পুরাতনের পরিবর্তন বা উন্নতি সাধন করতে পারে কিন্তু সংস্কৃতি তা নয়। কারণ সংস্কৃতি সকলকেই নতুন করে অর্জন করতে হয়। সভ্যতা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতি অর্জন করতে হয়।

পূর্বোক্ত পার্থক্যের মধ্যে সবগুলিই যে যুক্তিযুক্ত তা বলা চলে না। সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য লক্ষ্য ও উপায়ের পার্থক্যের সমতুল্য তাও বলা চলে না। কারণ সভ্যতার অবদানগুলির স্বতঃ ও পরতঃ উভয় প্রকার মূল্যই থাকতে পারে। বিজ্ঞানের অবদান যেমন বাহ্যলক্ষ্য সাধন করে, তেমনি তার নিজস্ব মূল্য আছে। সংস্কৃতির তুলনায় সভ্যতার গতি নিরবচ্ছিন্ন, এ অভিমতও যুক্তিযুক্ত নয়। হবহাউস (*Hobhouse*) এবং হোয়াইটহেড (*Whitehed*)-এর মতে নৈতিকতা ও ধর্মের সম্মুখ গতি লক্ষ্য করা যায়, কোন নিশ্চল ভাব দেখা যায় না। সংস্কৃতির তুলনায় সভ্যতার অবদানগুলির বিনিময় সহজতর, এ অভিমতও যুক্তিযুক্ত নয়। আধুনিক আবিষ্কারগুলির বিনিময় যেমন সহজ এই আবিষ্কারগুলির পিছনে যে জ্ঞানের ব্যাপার রয়েছে, তা তেমন সহজে অপরকে জানানো যায় না।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে প্রভেদ থাকলেও একটির সঙ্গে আর একটির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। জাতি এবং ব্যক্তির সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার সংস্কৃতির উন্নতি সাধিত হয় এবং সভ্যতার অবদানকে উপেক্ষা করে সংস্কৃতি নিজেকে বিকশিত বা উন্নত করতে পারে না। কাজেই 'সংস্কৃতি' ও 'সভ্যতা' সমার্থক শব্দ নয় বা এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সভ্যতাকে সংস্কৃতির একটি দিকরূপে গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত।

(III) সংস্কৃতির সামাজিক তাৎপর্য (The Social Significance of Culture) : আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, সংস্কৃতির সামাজিক এবং ব্যক্তিগত উভয় দিকই বর্তমান। সাধারণতঃ মনে করা হয় সংস্কৃতি হল ব্যক্তিগত ব্যাপার, মানুষকে নিজের চেষ্টায় সংস্কৃতিসম্পন্ন হতে হয় এবং অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই এর অধিকারী হতে পারে। তবে সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে কোন বিরোধ নেই, সকলেরই এতে অধিকার আছে। মানুষ তার প্রয়োজনীয় বস্তু নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বিরোধে মত্ত হয়, কিন্তু সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে এ জাতীয় বিরোধিতা দেখা যায় না। বিজ্ঞান, কলা, শিল্প, দর্শন—এ সবের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন মতবাদ ও মতভেদ দেখা

যায় তাহলে সভ্যতার বিভেদ বা বিরোধ, সংস্কৃতির বিরোধ নয়। প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য মানুষে মানুষে যে বিরোধিতা এবং যে প্রতিযোগিতা দেখা যায়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেগুলি দৃষ্টিগোচর হয় না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সংস্কৃতির বিরোধ আমরা লক্ষ্য করি সে কেবল তার প্রাথমিক অবস্থায়; সংস্কৃতির প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলেই এ বিরোধিতা মিলিয়ে যায়।

সংস্কৃতি যদিও ব্যক্তিগত অনুশীলনের ব্যাপার তবু এর একটা সামাজিক দিক আছে। সংস্কৃতির প্রথম শুরু গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে। তারপর এই সংস্কৃতি অনেকটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে এবং ফলে এই সংস্কৃতি সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে বিশেষ কয়েকজন লোকের মধ্যে। সাহিত্য, কলা, দর্শন —এসবের প্রকৃত সমঝদার অল্প লোকই, তবে এসব জটিল বিষয়কে সহজতর করার চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে অধিক সংখ্যক লোক এসবের রসাস্বাদ করতে পারে।

কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করলেই সংস্কৃতির সামাজিক তাৎপর্যের বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়। প্রথমতঃ, সমাজকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতি বেঁচে থাকতে পারে না। আবার প্রতিটি মনুষ্য সমাজের একটা সংস্কৃতি আছে। সংস্কৃতি যেমন ব্যক্তির উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য তেমনি সামাজিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যও সাধন করে। সংস্কৃতি, সামাজিক সংহতি সংরক্ষণে সহায়তা করে। সংস্কৃতি সমাজের ঐক্য ও কল্যাণের পরিপোষক। সংস্কৃতি সমাজকে প্রভাবিত করে, আর সমাজ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখে। সংস্কৃতি মানুষের মনে মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে তার সামাজিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। সংস্কৃতি সমাজের সভ্যদের মধ্যে 'আমরা-ভাব' (we-feeling) জাগিয়ে তুলে সবাইকে এক ঐক্য ও বন্ধুত্বের বন্ধনে বেঁধে ফেলে। সামাজিক ঐক্য দৃঢ় করার ব্যাপারে সংস্কৃতি সংহতি শক্তিরূপে ক্রিয়া করতে পারে। আবার সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। কাজেই সংস্কৃতি সামাজিক ঐক্য ছাড়াও, আন্তর্জাতিক ঐক্য সৃষ্টি করার পক্ষে সহায়ক।

(খ) সম্প্রদায় (Community) :

(i) সম্প্রদায় বলতে কি বুঝি? (What is a Community ?) : ম্যাকাইভার ও পেজ (*MacIver and Page*) সম্প্রদায়ের (Community) সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, "যখন কোন ছোট বা বড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সভ্যরা এমনভাবে বসবাস করে যে তারা কোন বিশেষ স্বার্থের অংশীদার না হয়ে

সাধারণ জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বিষয়ে অংশ গ্রহণ করে, তখন সেই গোষ্ঠীকে আমরা সম্প্রদায় বলি।" যেমন—গ্রাম্য সম্প্রদায়, সহুরে সম্প্রদায় ইত্যাদি। তাদের মতে সম্প্রদায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে, এর মধ্যে মানুষের সবরকম সামাজিক সম্পর্ককে খুঁজে পাওয়া যাবে। মানুষের পক্ষে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকে তার সব প্রয়োজন মেটান সম্ভব নয়, কিন্তু সে কোন উপজাতির (Tribe) অন্তর্ভুক্ত হলে তা মেটান সম্ভব।

ম্যাকাইভার (*MacIver*)-এর মতে সম্প্রদায়ের ভিত্তি হল দুটি। যথা, **(ক) অঞ্চল (Locality)**ঃ যে-কোন সম্প্রদায় একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে। এমন কি জিপসীদের মত ভবঘুরে যাযাবরের দলের বসবাস করার (সাময়িক হলেও) একটি বিশেষ অঞ্চল আছে। একই অঞ্চলে বসবাসকারী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যক্তি একটি নিবিড় সমাজবন্ধনে বাঁধা। সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা যে অঞ্চলে বসবাস করে, ক্রমশঃ সেই অঞ্চলে তাদের প্রয়োজনগুলি মেটাবার ব্যবস্থা করে নেয়। সেই নির্দিষ্ট অঞ্চল ক্রমশঃ তাদের দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে সক্ষম হয়।

(খ) স্বাজাত্যবোধ (Community Sentiment)ঃ স্বজাত্যবোধ হল একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতনতা (Feeling of belonging together)। বস্তুতঃ, একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে ভাষাগত, আচারগত, রীতিগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ম্যাকাইভার-এর অভিমতানুসারে এই স্বাজাত্যবোধ ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত অথচ তিনটি পৃথক অনুভূতির বা মনোভাবের সংমিশ্রণে গঠিত। এই তিনটি অনুভূতি বা মনোভাব হল, 'আমরা' মনোভাব (We-feeling), 'নির্দিষ্ট কর্ম' করার মনোভাব (Role-feeling) এবং 'নির্ভরতার' মনোভাব (Dependency-feeling)। 'আমরা' এই মনোভাবের জন্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পরের সঙ্গে নিজেদের একাত্মতা অনুভব করে। একই উদ্দেশ্যের উপস্থিতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে। নির্দিষ্ট কর্ম করার মনোভাবের জন্য সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তি মনে করে যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে তার একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে, সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে তাকে কতকগুলি নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। 'নির্ভরতার' মনোভাবের জন্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তি মনে করে যে, তার দৈহিক এবং মানসিক প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য সে সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর। এই স্বাজাত্যবোধ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই

সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভূত হয়। কিন্তু সময় সময় এই স্বাজাত্যবোধ সৃষ্টি করার জন্য সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করা হয়।

সমাজের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের সম্প্রদায় দেখা যায়; প্রাচীনকালে শিকারী সম্পদায়ের (**Hunting Community**) অস্তিত্ব ছিল, যারা খাদ্যের অন্বেষণে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। অর্থাৎ এদের জীবনযাপনের রীতি ছিল যাযাবরদের মত। মেষপালক সম্প্রদায় (**Pastoral Community**) শিকারী সম্প্রদায়ের তুলনায় বৃহত্তর। এই সম্প্রদায়ের কাজ ছিল পশু-পালন। এই সম্প্রদায় বিশেষ করে তৃণাচ্ছাদিত অঞ্চলেই বসবাস করত, যেহেতু এই অঞ্চলই পশু-পালনের কাজের জন্য অধিক উপযোগী। শিকারী সম্প্রদায়ের তুলনায় এই মেষপালক সম্প্রদায় অধিকতর স্থায়ীভাবে এক স্থানে বসবাস করত। আবার মেষপালক সম্প্রদায়ের তুলনায় কৃষক সম্প্রদায় অধিকতর স্থায়ী এবং সংগঠিত সম্প্রদায়। কৃষিকার্য সম্পাদন করার জন্য কৃষকদের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হত; যার জন্য তারা তাদের জমির সঙ্গে বাঁধা পড়ে যেত এবং কৃষকেরা এক স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হত। গ্রাম্য সম্প্রদায় হল সবচেয়ে আদিম সম্প্রদায়।

সম্প্রদায় ছোটও হতে পারে, বড়ও হতে পারে। মানুষের পক্ষে উভয় প্রকার সম্প্রদায়েরই প্রয়োজন আছে। বস্তুতঃ, বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে বিলীন করে দেয় না। সমাজের মধ্যে গ্রাম্য সম্প্রদায় ও শহুরে সম্প্রদায় পাশাপাশিই অবস্থান করে। ছোট সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির নিবিড় যোগাযোগ সম্ভব, কিন্তু বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক পরোক্ষ এবং বাহ্য। বস্তুতঃ একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় একটি বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যেমন—একটি গ্রাম একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত। সম্প্রদায় স্থিতিশীল নয়, গতিশীল; সে সবসময়ই এগিয়ে চলেছে। সমাজ-বিজ্ঞানী নিউমিয়ার (*Neumeyer*) বলেন, "হয় সম্প্রদায় বেড়ে চলে এবং সামনের দিকে এগিয়ে চলে, অথবা সে পিছিয়ে পড়ে (either it grows and moves forward or it retrogresses)"।

ম্যাকাইভার (*MacIver*)-এর মতে উদ্দেশ্য এবং স্বার্থের অভিন্নতাই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগতি রক্ষা করে। এজন্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত উপ-গোষ্ঠীর (Sub-groups) স্বার্থের মধ্যে যদি বিরোধ বা দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তাহলে সম্প্রদায়ের

সংহতির মধ্যে ভাঙন ধরে। সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিবিভাগ সম্প্রদায়ের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক। আরও এক কারণে সম্প্রদায়ের সংহতি বিনষ্ট হতে পারে—সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কোন একটি গোষ্ঠী যদি অন্য গোষ্ঠীর উপর নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাহলে সম্প্রদায়ের মধ্যে যে শান্তি তা বিনষ্ট হয় এবং সম্প্রদায়ের সংহতিও নষ্ট হয়ে যায়। এই প্রভুত্ব নানাপ্রকার হতে পারে ; যেমন—সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক। সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী যদি নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি সংগঠন বলে মনে ক'রে অপরের থেকে নিজকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে তাহলে গোষ্ঠীর মধ্যে যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ তা আর সম্ভব হয় না। তার ফলেও সম্প্রদায়ের ঐক্য ও সংহতি অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হতে পারে। অবশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিবিভাগের অস্তিত্ব থাকলেও একই জাতীয় আচার, রীতিনীতি, অনুষ্ঠান, ধর্ম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করতে পারে। সেজন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ থাকলেও একই সাধারণ জীবনযাত্রার রীতি সম্প্রদায়কে স্থায়ী ও উন্নত করতে পারে।

(ii) সম্প্রদায় ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Community and Society) ঃ ইংরেজি 'Society' এবং 'Community' শব্দ দুটিকে অনেকেই সমার্থক মনে করেন। ম্যাকাইভার (*MacIver*) তাঁর '*Community*' গ্রন্থে[1] উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান তা নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে 'Society' বা 'সমাজ' কথাটিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করলে বোঝায় মানুষের ইচ্ছাকৃত যে-কোন পারস্পরিক সম্পর্ক (every willed relationship of man to man)। 'Community' বা 'সম্প্রদায়' বলতে তিনি বোঝেন সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য একটি স্থান বা অঞ্চল ; যেমন—গ্রাম, শহর, জেলা, দেশ বা তার চেয়েও বড় কোন অঞ্চল যেখানে অবস্থিত এমন কোন জনসমষ্টি যার ব্যক্তিদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য (common characteristics) যেমন—আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ইত্যাদি বর্তমান আছে। অবশ্য একটি সম্প্রদায় অন্য আর একটি বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অংশ হতে পারে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পার্থক্য সে পার্থক্য জাতিগত নয়, মাত্রাগত।

---

1. *MacIver :* Community, Page 23

(গ) সংঘ (Association) :

(i) **সংঘ কাকে বলে ?** (What is an Association) : ম্যাকাইভার (*MacIver*) বলেন, "সমবেতভাবে এক বা একাধিক উদ্দেশ্য অনুসরণ করার জন্য কোন গোষ্ঠী যখন সংগঠিত হয় তখন তাকে সংঘ বলা হয়।"

মানুষ তিনভাবে তার উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। প্রতিটি মানুষ অপরের কথা চিন্তা না করে **স্বতন্ত্রভাবে** নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য সচেষ্ট হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, মানুষ অপরের সঙ্গে **বিরোধিতা** করে নিজ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। তৃতীয়তঃ, অনেকে **সমবেতভাবে** তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সচেষ্ট হতে পারে। যখন কোন গোষ্ঠী সমবেতভাবে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগঠিত হয় তখনই সংঘের আবির্ভাব ঘটে, যেমন—কোন ফুটবল ক্লাব, শিক্ষা সমিতি, সৈন্যদল ইত্যাদি। সৈন্যদল একটি সংঘ, যেহেতু জাতিকে বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষা করাই সৈনিকদের উদ্দেশ্য।

যে-কোন জনসমষ্টিকেই সংঘ বলে অভিহিত করা চলে না। একটি উদাহরণের সাহায্যে ম্যাকাইভার বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছেন। পথের ধারে দাঁড়িয়ে যে জনতা আগুন লাগা দেখছে তাকে সংঘ বলা যেতে পারে না। একই স্বার্থ তাদের একজায়গায় সমবেত করেছে কিন্তু তাদের মধ্যে কোন সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্ট হয়নি। কিন্তু যদি পথের জনতা মনে করে যে সমবেতভাবে সকলে সহযোগিতা করে আগুন নেভাবে তখনই সেই জনসমষ্টি সংঘে পরিণত হবে, তাদের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

মানুষের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিচিত্র ধরনের। কিন্তু একক প্রচেষ্টায় সব সময় মানুষ সহজে এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে না। এই উদ্দেশ্য লাভ সহজতর হয় যদি সমবেতভাবে মানুষ এই উদ্দেশ্য লাভ করতে চায়, সকলের সহযোগিতায় যদি উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ করতে চায়। কাজেই মানুষ তার নানা ধরনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য সংঘ গঠন করেছে। এই সব সংঘ নানা ধরনের হতে পারে, যেমন—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্য বিষয়ক, ধর্মীয়, বৃত্তিগত ইত্যাদি। কাজেই সংঘ হল ক্রিয়াসম্পাদনকারী গোষ্ঠী, বিচিত্র অথচ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য যাদের আবির্ভাব এবং যেগুলি সমষ্টিগত কার্য ও ক্রিয়ার মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্য পরিপূরণ করতে চায়। অগবার্ণ-নিমকফ (*Ogburn-Nimkoff*) সংঘের প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে সংঘ হল অপেক্ষাকৃত বিশিষ্ট উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে গঠিত। গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, 'সংঘ হল একটা

মানুষের গোষ্ঠী যা কোন বিশেষ বা কতকগুলি নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়।'

সংঘের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির কথা আমরা স্মরণ রাখতে পারি।

প্রথমতঃ, এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সংঘের আবির্ভাব। সংঘের সভ্যদের উদ্দেশ্য একজাতীয় হওয়া দরকার। দ্বিতীয়তঃ, সংঘ একটি সংগঠন, পথে সমবেত জনতা সংঘ নয়। সাধারণতঃ সংঘের প্রতি দায়িত্বশীল, এমন কর্মকর্তার (agent) মাধ্যমে সংঘ ক্রিয়া করে। ম্যাকাইভার-এর মতানুসারে এই বিষয়টিই সংঘকে একটা বৈশিষ্ট্যসূচক প্রকৃতি দান করে এবং এর বিশেষ একটা আইনগত মর্যাদা আছে। তৃতীয়তঃ, কোন কোন সভ্যের বা সব সভ্যের উদ্দেশ্য নয়, এমন কোন উদ্দেশ্য সংঘের থাকতে পারে না। তবে সংঘ হিসেবে এর নিজস্ব কর্মপদ্ধতি থাকতে পারে। সংঘের নিজস্ব সম্পত্তি থাকতে পারে যা সভ্যদের সম্পত্তির সমষ্টি নয়। সংঘের নিজস্ব অর্থভাণ্ডার থাকতে পারে, যা সভ্যরা এই অর্থ খুশীমত নিজেদের মধ্যে বণ্টন করতে পারে না। সংঘের নিজস্ব অধিকার, দায়-দায়ীত্ব বা ক্ষমতা থাকতে পারে যা সংঘের সভ্যরা ব্যক্তিগত সামর্থ্যে প্রয়োগ করতে পারে না। একটা রাজনৈতিক দল, একটা ক্লাব, একটা ট্রেড ইউনিয়ন, তার সংগঠনগত এবং ক্রিয়াগত বৈশিষ্ট্যের জন্য কিছু বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে পারে, বা তার বিশেষ ধরনের কর্মপদ্ধতি থাকার জন্য বিশেষ ধরনের কর্তব্য থাকতে পারে। বিশেষ ধরনের কর্তব্য করার জন্য বা সুখ সুবিধা ভোগ করার জন্য সংঘ হয়ে পড়ে এক যৌথ সংস্থা এবং যখন উপরিউক্ত বিষয়গুলিই আইনগত স্বীকৃতি লাভ করে, তখন সংঘ হয়ে পড়ে আইনবলে গঠিত এক যৌথ সংস্থা। চতুর্থতঃ, সংঘের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের ধারাবাহিকতা থাকে, সে-কারণে একটা পর্যটক দলকে সংঘ নামে অভিহিত করা যায় না। পঞ্চমতঃ, সংঘের কম বেশী একটা স্থায়িত্ব থাকে। ষষ্ঠতঃ, সংঘ তার সভ্যদের ভাবের আদান প্রদানেরও একটা মাধ্যম।

(ii) সংঘ এবং সম্প্রদায় (Association and Community) ঃ সংঘ হল এমন একটি জনসমষ্টি যা এক বা একাধিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয় বা সংগঠিত হয়। সম্প্রদায় হল স্থায়ী সামাজিক গোষ্ঠী যারা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে এবং যাদের সভ্যদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ আছে। সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা কোন বিশেষ স্বার্থের অংশীদার না হয়ে সাধারণ জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বিষয়ে অংশ গ্রহণ করে। গ্রাম্য সম্প্রদায়, শহুরে

সম্প্রদায় প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদাহরণ। সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল একাধিক। সংঘের মধ্যে মানুষ তার সব সামাজিক সম্পর্ক খুঁজে পায় না। ধরা যাক, ফুটবল ক্লাব। এই সংঘের অন্তর্ভুক্ত সভ্যবৃন্দ সংঘের মধ্যে থেকে তাদের কোন উদ্দেশ্যসাধন (যেমন—খেলাধূলা) করে। সংঘের বাইরে অসংখ্য প্রয়োজন আছে যা তারা এই সংঘের মধ্যে থেকে মেটাতে পারে না। সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষ তার সবরকম সামাজিক সম্পর্ক খুঁজে পায়। সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই তাদের উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে। এ দিক থেকে সম্প্রদায় হল স্বয়ংসম্পূর্ণ (Self-contained)। কিন্তু সংঘের অন্তর্ভুক্ত সভ্যরা তাদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সংঘকে উপায় হিসেবে গ্রহণ করে এবং সে হিসেবে উদ্দেশ্য হল সংঘের বহির্ভূত বিষয়।

স্থতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সংঘকে সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা যেতে পারে না। এ হল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত একটা সংগঠন। একাধিক সংঘ একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যার ফলে সংঘের সভ্যরা ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উভয় উদ্দেশ্য অনুসরণ করতে পারে। সংঘের থেকে সম্প্রদায় অনেক বেশী ব্যাপক। ধরা যাক্, একটা ক্রিকেট ক্লাব। ক্রিকেট ক্লাব সম্পর্কে এমন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ক্লাবটা কিসের জন্য, কি কারণে এর অস্তিত্ব, এর লক্ষ্য কি? এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তরও আমরা পেতে পারি। কিন্তু সম্প্রদায় সম্পর্কে এ জাতীয় প্রশ্নের কোন অবকাশ নেই। তাছাড়া, সংঘের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। কোন ব্যক্তি যদি সেই উদ্দেশ্য লাভ করতে চায় তবেই সংঘের সভ্য হয়। যে লোক খেলাধূলা ভালবাসে, সে কোন ক্রীড়া-সংঘের সভ্য হয়। যে গানবাজনা ভালবাসে বা পছন্দ করে সে কোন সংগীত প্রতিষ্ঠানের সভ্য হয়। এই কারণে ম্যাকাইভার ও পেজ (*MacIver and Page*) বলেন, "কোন সংঘের সভ্য হওয়ার তাৎপর্য সীমিত। একথা সত্য যে, কোন একটি সংঘ আমাদের সম্পূর্ণ আনুগত্য আকর্ষণ করতে পারে…কিন্তু বিশেষ ধরনের কোন স্থবিধার জন্যই আমরা সংঘের অন্তর্ভুক্ত হই।" একই সম্প্রদায়ে একাধিক সংঘ থাকতে পারে এবং একই ব্যক্তির পক্ষে একাধিক সংঘের সভ্য হওয়ার পথে কোন বাধা নেই।

কোন একটি সম্প্রদায় বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। প্রাচীনকালে সম্প্রদায় ও সংঘের মধ্যে যে প্রভেদ তা স্থনির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু বর্তমানে সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং মানুষের প্রয়োজন বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানাজাতীয়

সামাজিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে সম্প্রদায় ও সংঘের প্রভেদটুকু আর সুনির্দিষ্ট নেই।

কোন একটি গোষ্ঠী বা জনসমষ্টি কি সম্প্রদায়, না সংঘ—এ স্থির করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। সংঘের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের সংখ্যা যতই বেড়ে যেতে থাকে ততই সম্প্রদায়ের সঙ্গে তার পার্থক্য কমে আসে। কোন ধর্মীয় সংঘকে সম্প্রদায়রূপে গণ্য করা যেতে পারে না। ভারতে যে হিন্দু বা মুসলমান গোষ্ঠী আছে, তাদের অনেক সময় সম্প্রদায় বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের সম্প্রদায় বলে গণ্য করা যায় না। একই কারণে এ সব গোষ্ঠী পরস্পরের উপর এবং বৃহত্তর পরিবেশের উপর নির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

(ঘ) অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) (Institution) :

(i) অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান বলতে কি বুঝ? (What is an Institution) : সাধারণ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই মানুষ সংঘ গঠন করে। এই সব সংঘের কতকগুলি স্থায়ী এবং কতকগুলি অস্থায়ী। পরিবার, গীর্জা এবং রাষ্ট্র হল স্থায়ী সংঘ। স্থায়ী সংঘগুলি তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কতকগুলি কর্মপদ্ধতি, বিধি বা নিয়মের উপর নির্ভর করে, যেগুলি দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করার জন্য ও সংঘের বিভিন্ন সভ্যদের সামাজিক মেলামেশাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজন হয়। এই সব অনুষ্ঠান, প্রচলিত বিধি এবং কর্মপদ্ধতিগুলি স্থায়ীরূপ লাভ করলে সামাজিক অনুষ্ঠানে (social institutions) পরিণত হয়। কোন কর্তৃপক্ষ এই সব অনুষ্ঠান প্রচলন করেন এবং সামাজিক গোষ্ঠীর বা সংঘের সভ্যবৃন্দ এগুলিকে স্বীকার করে নেন। যেমন—পরিবারের বিবাহ-প্রথা, গীর্জার দীক্ষাদান পদ্ধতি, রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি, কারখানার বেতন পদ্ধতি ইত্যাদি।

ইংরেজী '*Institution*' কথাটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'Institution' কথাটির একটি অর্থ হল প্রতিষ্ঠান। যে-কোন ধরনের সংঘই হল প্রতিষ্ঠান। পরিবার, রাষ্ট্র—এ সবই প্রতিষ্ঠান, যেহেতু এগুলি মানুষের দ্বারা তৈরি সামাজিক এক-একটি কাঠামো (Social Structure)। বার্নেস (*H. E. Barnes*) তাঁর '*Social Institution*' গ্রন্থে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, "সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল সামাজিক কাঠামো এবং যন্ত্র যার মাধ্যমে জনসমাজ মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ সংগঠন, পরিচালনা এবং সম্পাদন করে।"

দ্বিতীয় অর্থে *Institution* কথাটির অর্থ হল অনুষ্ঠান, প্রচলিত বিধি, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি। এই অর্থে 'Institution'—এর অর্থ হল সংঘ বা প্রতিষ্ঠান নয়, যে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী সংঘগুলি গঠিত হয় ও তাদের কার্যকলাপ পরিচালিত হয় তাই। এই অর্থে বিবাহ-প্রথা হল *Institution*, পরিবার বা রাষ্ট্র নয়। ম্যাকাইভার এবং পেজ (*MacIver and Page*), গিসবার্ট (*Gisbert*), এলউড (*Ellowed*), হেয়েস (*E. C. Hayes*) প্রমুখ সমাজবিদ্‌রা এই অর্থে '*Institution*' কথাটিকে গ্রহণ করেছেন। ম্যাকাইভার এবং পেজ্‌ 'Institution' কথাটির অর্থ বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, "সেই সব প্রচলিত কর্মপদ্ধতি যার মাধ্যমে গোষ্ঠীর কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়।"

গিসবার্ট (*Gisbert*)-ও 'Institution' বলতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলি স্থায়ী ও স্বীকৃত কর্মপদ্ধতিকেই বুঝিয়েছেন। এলউড (*C. A. Ellowed*) 'Institutiou বলতে বোঝেন, সম্প্রদায়ের কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত, সংগঠিত এবং প্রতিষ্ঠিত একত্র বসবাস করার অভ্যাসসিদ্ধ পদ্ধতি।"

হেয়েস (*E.C. Hayes*) এর মতে 'Institution' হল একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লাভের জন্য কোন সামাজিক গোষ্ঠীর দ্বারা গৃহীত কর্মপদ্ধতি।

সুতরাং পূর্বোক্ত লেখকবৃন্দ *Institution* কথাটির অর্থে বুঝেছেন কোন প্রচলিত বিধি বা কর্মপন্থা। সাধারণতঃ *Institution* বলতে আমরা যে প্রতিষ্ঠানকে বুঝে থাকি, তাঁর সঙ্গে এঁরা একে সমার্থক বলে মনে করেন নি।

সমাজের সংরক্ষণ এবং তার ক্রিয়াকলাপ চালনার জন্য এই সব অনুষ্ঠান, প্রচলিত বিধি বা কর্মপন্থার একান্ত প্রয়োজন। বস্তুতঃ, এগুলির মাধ্যমেই সমাজ তার সভ্যদের শারীরিক এবং মানসিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য যে সব কার্যকলাপের প্রয়োজন সেগুলিকে সংগঠিত করে ও পরিচালিত করে। বার্নেস (*Barnes*)-এর ভাষায়, অনুষ্ঠানগুলি হল যন্ত্রবিশেষ যার মাধ্যমে সমাজ তার কার্য পরিচালনা করে।

এই সব অনুষ্ঠান বা কর্ম-পদ্ধতি সমাজকে প্রাণবান ও গতিশীল করে রাখে। এদের জন্যই সমাজের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় না। এগুলির জন্যই ব্যক্তির আচরণ জটিলতা মুক্ত হয়। এই সব অনুষ্ঠান ব্যক্তির কর্মপদ্ধতির উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে তাদের একটি নির্দিষ্ট আকার দান করে। যে-কোন ব্যক্তিকে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ভাবে আচরণ করতে হয়। সামাজিক অনুষ্ঠান বা কর্ম-পদ্ধতিগুলি একই প্রকৃতিবিশিষ্ট আচরণ-পদ্ধতি ব্যক্তির সামনে তুলে ধরে তাকে

সামাজিক জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে আচরণ করতে সহায়তা করে।

বস্তুতঃ, এই সব সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি সমাজ-জীবনে ব্যক্তির ভূমিকা নির্ধারণ করে। এগুলির মাধ্যমে সমাজের স্থায়িত্ব রক্ষা হয়। অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই সব সামাজিক অনুষ্ঠান ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সীমিত করে এবং অনেক সময় এগুলি এতই কঠোর হয় যে, ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথে এগুলি প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সময় সময় এই সব অনুষ্ঠানের বেড়াজাল থেকে মানুষ মুক্তি চায় বা এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া করে। অবশ্য এই সব সামাজিক অনুষ্ঠান বা কর্মপদ্ধতি যদি অত্যন্ত কঠোর ও উৎপীড়নমূলক মনে হয় তবেই ব্যক্তির মধ্যে এই তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণে স্থিতিশীলতা আনয়ন করে যার জন্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাজ সহজতর হয়। এই সব প্রচলিত বিধি বা অনুষ্ঠান সমাজের সভ্যদের মধ্যে সামাজিকতার সৃষ্টি করে গোষ্ঠীর নৈতিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

(ii) **অনুষ্ঠান ও সংঘ (Institution and Association)**: *Institution* হল প্রচলিত বিধি, কর্মপদ্ধতি বা সামাজিক ব্যষ্টিসমূহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের রীতি (established forms of relation between social beings)। সংঘ তার চাইতে ব্যাপক, কেবলমাত্র প্রথা নয়, এ হল প্রচলিত বিধি বা কর্মপদ্ধতির উৎস। সংঘের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ (subjective) এবং ব্যক্তি-সাপেক্ষ (objective) উভয় প্রকার দিক আছে। সাধারণের ইচ্ছায় যেমন প্রচলিত বিধি গড়ে ওঠে, তেমনি সংঘও গড়ে ওঠে। কিন্তু সংঘের বেলায় কোন সাধারণ স্বার্থ এই সাধারণ ইচ্ছাকে সংগঠিত করে। প্রচলিত বিধি হল উপায় মাত্র। সংঘ প্রয়োজন অনুসারে প্রচলিত বিধি বা কর্মপদ্ধতিকে পরিবর্তিত করতে পারে, বাতিল করে দিতে পারে, নতুন বিধি গড়ে তুলতে পারে। সে কারণে *Institution* বা প্রচলিত বিধিকে কোন মতেই বাইরের জিনিস বলে মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। ম্যাকইভার (*MacIver*) বলেন, "কোন অনুষ্ঠান বা প্রচলিত বিধির (Institution) তাৎপর্য তার বাহ্যাংশে খুঁজে পাওয়া তেমনি ভুল, যেমন—ভুল হচ্ছে কোন আচরণ ও তার বহিঃপ্রকাশকে এক মনে করা। প্রচলিত বিধি হল সামাজিক কার্যের সংগঠিত ধারা এবং সেহেতু এদের একটা বাইরের দিক আছে, যে দিকটি দেশে ও কালে প্রকাশিত।" অনুষ্ঠান বা

প্রচলিত বিধিরও একটা বাইরের দিক আছে। যেমন—কলেজ-গৃহ, যেখানে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। তবে *Institution* বা প্রচলিত বিধির অভ্যন্তরীণ দিকটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু এই বিধি সমাজের সভ্যদের সামাজিক জীবনের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

মানুষ সংঘ গঠন করে, কিন্তু সংঘ গঠন করলেই সংঘের কাজ চালাবার জন্য এবং সংঘের ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতকগুলি নিয়ম বা কার্যধারার প্রয়োজন হয়। এই নিয়ম বা কার্যধারাই হল *Institution* বা সামাজিক বিধি। প্রত্যেকটি সংঘেরই তার নিজস্ব নিয়ম, পদ্ধতি বা কার্যধারা আছে। পরিবারের বিবাহ আছে, গীর্জার উপাসনা-পদ্ধতি আছে, রাষ্ট্রের আইন সংক্রান্ত বিধি আছে। আমরা ব্যক্তিরা সংঘের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু কোন প্রচলিত বিধির (Institution) অন্তর্ভুক্ত নই। সময় সময় সংঘের সঙ্গে বিধিকে আমরা গুলিয়ে ফেলি, কিন্তু ম্যাকাইভার (*MacIver*) বলেন, এ দুটোর মধ্যে কোন গোলমাল হবার কারণ নেই। পরিবার হল একটি সংঘ, বহুবিবাহ হল একটি সামাজিক প্রথা বা বিধি। যখন কোন সংগঠিত গোষ্ঠীর কথা চিন্তা করব, তখন সেটি হল সংঘ এবং যদি তার প্রথা বা নিয়মের কথা চিন্তা করি তখন সেটি হল বিধি (Institution)। যখন শিক্ষায়তন বলতে বুঝি শিক্ষক এবং ছাত্র তখন সেটি হল সংঘ। যখন শিক্ষায়তন বলতে বুঝি শিক্ষা সম্পর্কীয় বিধি-ব্যবস্থা সেটা হল বিধি বা অনুষ্ঠান। আমরা 'রাষ্ট্রের বা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত' এমন কথা বলি, কিন্তু আমরা 'বিবাহের বা সম্পত্তি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত' এমন কথা বলি না। সংঘের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এবং সেই উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্যকে লাভ করার পদ্ধতি—এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। পরিবারের প্রধান উদ্দেশ্য হল বংশ রক্ষা করা, কিন্তু বিবাহ, সম্পত্তি ব্যবস্থা—এগুলি হল এর প্রধান প্রথা বা নিয়ম। সেরকম ধর্মীয় সংঘগুলির উদ্দেশ্য হল ধর্ম সম্পর্কীয় প্রয়োজন মেটান, কিন্তু উপাসনা, পূজাপদ্ধতি হল এর পদ্ধতি বা প্রথা। সংঘ থাকলেই তার কার্যপদ্ধতিও থাকবে।

ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "যদিও কোন বিশেষ প্রকারের সংঘ (a mode of association) এবং এর উপায়ের মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য করা যায়, কোন অনুষ্ঠান এদের উভয়ের মাঝামাঝি স্থানে আছে বলে উভয়ের বৈশিষ্ট্যের অংশ গ্রহণ করে।"

সংঘ (Association) এবং অনুষ্ঠান, প্রচলিত পদ্ধতি বা প্রথা (Institution) —এই উভয়ের প্রভেদটুকু মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। সমাজ-জীবনের পক্ষে

বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংগঠন অপরিহার্য, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি এবং অনুষ্ঠানই সামাজিক সংগঠনগুলিকে গতিশীল করে রাখে। গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, Associations are things, institutions are modes and ways" অর্থাৎ "সংঘ হল বস্তু, অনুষ্ঠান হল এর বিভিন্ন পদ্ধতি।" সংঘতেই আমাদের জন্ম হয়, সেখানেই আমরা প্রতিপালিত হই এবং বড় হই কিন্তু আমরা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই কাজ করি। গিসবার্ট (*Gisbert*)-এর মতে যদিও সমাজ-জীবনের এ দুটি উপাদান গভীরভাবে সংযুক্ত, তবু একটির বৈশিষ্ট্য অপরের বৈশিষ্ট্য নয়।

এই সব অনুষ্ঠান বা প্রচলিত বিধির মধ্যে কোন কোনটি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উদ্ভূত হয়েছে। যেমন – সম্পত্তি ব্যবস্থা, সরকার ইত্যাদি। আবার কোন কোন প্রচলিত বিধি বিশেষ চেষ্টার ফলে উদ্ভূত। যেমন—উত্তরাধিকার, কর প্রথা (Inheritance tax)। অবশ্য কালক্রমে এইসব প্রচলিত বিধি বা অনুষ্ঠানের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে।

(iii) **বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান** (**Various Modes or forms of Social Institutions**) : সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান-গুলিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, সেই উদ্দেশ্যের দিক থেকে, সমাজজীবনে প্রয়োজনের দিক থেকে, তাদের সাধারণতা (generality) এবং সীমাবদ্ধতার (restriction) দিক থেকে আমরা তাদের শ্রেণীভুক্ত করতে পারি। যে উদ্দেশ্য তারা সিদ্ধ করে সেই উদ্দেশ্যের দিক থেকে যদি তাদের শ্রেণীভুক্ত করি তাহলে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীবিভাগ হবে নিম্নরূপ।

(ক) **পারিবারিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান** (Domestic Institution) : পারিবারিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য জৈবিক প্রয়োজন মেটান, যদিও জৈবিক প্রয়োজন ছাড়া তারা অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করে। পারিবারিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের প্রধান কাজ বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়তা করা। শিশু প্রতিপালন করা এবং বৃহত্তর জীবনের জন্য শিশুকে গঠন করার দায়িত্ব পরিবারের।

(খ) **শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান** (Educational Institutions) : ব্যাপক অর্থে সব শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত বুদ্ধিগত ও নৈতিক ক্ষমতাগুলিকে বিকশিত করে তার ব্যক্তিত্বকে সুগঠিত

করা। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তির চরিত্র গঠন করে এবং বৃহত্তর সমাজ-জীবনে তার দায়িত্বগুলি পালন করার জন্য তাকে যোগ্য করে তোলে। ক্ষুদ্রতর অর্থে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি একটা বিশেষ লক্ষ্য লাভের জন্য কোন বিশেষ বিষয়ে ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং জীবনে যাতে সে তার নির্বাচিত পেশা অনুসরণ করতে পারে তার জন্য তাকে যোগ্য করে তোলে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি হল বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ, যেগুলি ব্যক্তির জীবন গঠনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

প্রধান প্রধান অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আলোচনায় ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) গঠনমূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের (Formative Institutions) আলোচনা করেছেন।

কতকগুলি অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল শুধু কোন এক ধরনের সামাজিক ঐক্যকে টিকিয়ে না রেখে সামাজিক ঐক্য গঠন করা। এই সব গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান মূলতঃ শিক্ষামূলক, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষাবিষয়ক উদ্দেশ্য খুব সুনির্দিষ্টভাবে পরিস্ফুট হয় না। যেমন, পরিবার, এর প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষামূলক, তবে তা ছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্য একে পূর্ণ করতে হয়।

(গ) **অর্থনৈতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান** (Economic Institutions)ঃ সমাজে কতকগুলি অনুষ্ঠান যেমন—গঠনমূলক, তেমনি কতকগুলি অনুষ্ঠান আছে যারা রক্ষণমূলক; যাদের উদ্দেশ্য যতটা না মানুষের জীবনকে গঠন করা তার বেশী মানুষের জীবন রক্ষা করা। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, নিদ্রা প্রভৃতির প্রয়োজন। অর্থনৈতিক অনুষ্ঠানগুলি মানুষের এসব প্রয়োজন মেটায়। অবশ্য এ অনুষ্ঠানগুলিকে মানুষের আরও নানারকম প্রয়োজন বা দাবী; যেমন—খেলাধূলা, গানবাজনা, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি মেটাতে হয়। সে-সব অনুষ্ঠানগুলিকেই আমরা অর্থনৈতিক বলে অভিহিত করতে পারি যেগুলি আমাদের বেড়ে ওঠার জন্য যে-সব অভাব, সেগুলি দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই কার্যকরী হয়।

(ঘ) **শিল্পসম্পর্কীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান** (Industrial Institutions): বেড়ে ওঠার প্রয়োজন ছাড়াও মানুষের আরও কতকগুলি প্রয়োজন আছে, যেগুলির সঙ্গে তার জৈবিক ও বুদ্ধিগত দিকের সম্পর্ক আছে। তার জ্ঞান অর্জনের জন্য পুস্তক পাঠের প্রয়োজন, ঘর সাজানোর জন্য চিত্রের প্রয়োজন,

গৃহনির্মাণের জন্য উপাদানের প্রয়োজন, সঙ্গীত অনুশীলনের জন্য বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। বিভিন্ন শিল্পসম্পর্কীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান—যেমন মিল, কারখানা, শ্রমিক সংঘ, মানুষের এসব প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করে।

(ঙ) **সরকারী অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান** (Governmental Institutions): সমাজের মধ্যে নানা ধরনের সংঘ আছে। এই সংঘগুলিকে যদি নিয়ন্ত্রিত এবং সংযোজিত করা না হয় তাহলে বিভিন্ন সংঘের মধ্যে বিরোধিতার ফলে তারা আদর্শভ্রষ্ট হবে এবং ফলে সমাজ-জীবনের শান্তি এবং ঐক্য ব্যাহত হবে। মানুষ একটি স্বীকৃত শাসনব্যবস্থার সাহায্যে বিভিন্ন সংঘগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজের প্রাথমিক অবস্থায় এই শাসন-ব্যবস্থা ন্যস্ত ছিল সমাজপতিদের উপর। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মধ্যে বিরোধিতার ফলে এবং অভ্যন্তরীণ অশান্তি দূর করার জন্য একটি সুসংহত শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ধীরে ধীরে আবির্ভাব ঘটল রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র তার কর্তৃত্ব বিভিন্ন সংঘ এবং প্রতিষ্ঠানগুলির উপর প্রসারিত করল। মানুষের অধিকার ও কর্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হল। মানুষের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। মানুষ যাতে স্বীকৃত শাসন-ব্যবস্থা মেনে চলে তার জন্য প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগ করা দরকার, তাই দেখা দিল পুলিসী ও সামরিক ব্যবস্থা।

(চ) **সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান** (Cultural Institutions): মানুষের তিনটি দিক আছে—(১) বর্ধনশীল দিক (Vegetative aspect), (২) জৈবিক দিক (Animal aspect) এবং আর একটি হল তার (৩) বিচার-বুদ্ধির দিক (Rational aspect)। মানুষের অগ্রগতি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ উপলব্ধি করল যে তার বিচারবুদ্ধির বিকাশের দিকটিই আসল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এবং অপর দুটি সেই উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় মাত্র। বিচার-বুদ্ধির অনুশীলনকেই মানুষ করে নিল মুখ্য উদ্দেশ্য। তার ফলে দেখা দিল নতুন এক ধরনের সংঘ। কেবলমাত্র শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যেই সংঘ গঠিত হল না; জ্ঞান, বুদ্ধির এবং চরিত্রের বিকাশের জন্যও সংঘ গঠিত হয়। মানুষের যে আবেগ তার জৈবিক প্রবৃত্তির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে সেই আবেগ এক নতুন রূপ পরিগ্রহণ করল। সে আবেগ সূক্ষ্ম এক চিন্তামূলক আবেগ ও মনোভাবের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করল। ললিতকলার মাধ্যমে মানুষ নিজের

এই আবেগ বা মনোভাবকে প্রকাশ করতে লাগল। শিক্ষা ও কলার অনুষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আবিভাব ঘটল। কলা ও সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের সৃজনমূলক প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটে এবং সুনির্দিষ্ট ও সুসঙ্গত উপায়ে মানুষের সুকোমল ও সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং আবেগকে প্রকাশ করার জন্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটে। এই জাতীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। সাহিত্য সংঘ, সঙ্গীত সভা, চিত্র প্রদর্শনী প্রভৃতি এই জাতীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ।

এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান মানুষের জীবনের ঐক্য এবং মূল্য সম্পর্কে চেতনাকে গভীরতর করে বিভিন্ন মনুষ্য সমাজের মধ্যে বিরোধিতাকে দূরীভূত করে, যার ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নত ও দৃঢ় হওয়ার জন্য আরও অনেক নতুন নতুন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটে।

(ছ) ধর্মমূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান (Religious Institution)ঃ অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মতো ধর্মমূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সামাজিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ধর্মমূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান রূপেও গণ্য করা যেতে পারে। ধর্ম কোন পরমসত্তায় বিশ্বাস সূচনা করে, যে সত্তার সঙ্গে ব্যক্তি ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হয়। ধর্মের অভ্যন্তরীণ দিক হল ব্যক্তির বিশ্বাস, ধারণা, অনুভূতি ও আবেগের দিক এবং ধর্মের বাহ্য দিক হল কতকগুলি আচার ও অনুষ্ঠান—যেমন উপাসনা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ব্যক্তির ধর্মীয় মনোভাব প্রকাশ পায়। ধর্মের এই বাহ্য দিক থেকেই কতকগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আবিভাব ঘটে যেগুলি বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। গীর্জা, মন্দির, মসজিদ, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ। যদিও ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয় তবু ধর্মের একটা সামাজিক দিক আছে। বহু ধর্মীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান অনেক সময় সামাজিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের কেন্দ্ররূপেও কার্য করে।

(জ) আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান (Recreational Institution)ঃ খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতিরও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান রূপেও গণ্য করা যেতে পারে। ফুটবল ক্লাব, ক্রিকেট ক্লাব, নাট্যসংঘ, সঙ্গীত-সংঘ প্রভৃতি এই জাতীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ।

(ঙ) আচার (Custom) :

(i) আচার কাকে বলে (What is Custom ?) : আচার বলতে বুঝি সামাজিক আচরণের অভ্যাসলব্ধ পদ্ধতি বা ধারা। যেমন, পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলে আমরা পরস্পরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। এ সব আচারগুলির সামাজিক সম্পর্কের প্রতি আমরা উদাসীন নই। যদি কোন কারণে কোন আচার ভঙ্গ করা হয় তাহলে তার ফলে আমাদের মধ্যে মনস্তাপ দেখা দেয়।

গিসবার্ট (*Gisbert*) আচারের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন ; যথা—আচরণের ধারাবাহিকতা (a constant way of acting), সামাজিকতা (social in character) এবং আদর্শগত মূল্য (normative value)। সেহেতু সাধারণ অভ্যাস থেকে একে পৃথক করা যেতে পারে ; যেমন, ধূমপানের অভ্যাস। আচার হল আচরণের অভ্যাসসিদ্ধ রূপ। তবে আচার ব্যক্তি বিশেষের অভ্যাস নয়, সম্প্রদায়ের অভ্যাস। যদিও আচার ও অভ্যাসের মধ্যে বাহ্যতঃ সাদৃশ্য আছে, দুটোকে অভিন্ন গণ্য করা উচিত হবে না। ঐচ্ছিক ক্রিয়া অর্থাৎ বিশেষ এক ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি থেকেই অভ্যাসের উৎপত্তি। অভ্যাসের দরুন ব্যক্তির পক্ষে কোন কাজ সম্পাদন করা সহজতর হয়। যেমন, রাত্রে শয্যা গ্রহণ করার আগে কফি খাওয়া হল অভ্যাস, আচার নয়। অভ্যাস হল ব্যক্তিগত বিষয়, তার কোন সামাজিক অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। সাধারণ অভ্যাসের সঙ্গে আচারের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই একে 'অনুমোদিত অভ্যাস' বলে অভিহিত করা হয়। আচার হল নৈর্ব্যক্তিক এবং আচারের সঙ্গে সামাজিক অনুমোদন যুক্ত।

আচারের বিশেষ সামাজিক তাৎপর্য আছে এবং সে-কারণে আচার লঙ্ঘন করা হলে ব্যক্তিকে সমাজে নিন্দিত হতে হয়। আদিম সমাজে প্রচলিত আচার লঙ্ঘন করার বিষয়টিকে অপরাধ বলে গণ্য করা হত এবং অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। আচার মেনে চলা গোষ্ঠীর কল্যাণের উপযোগী কার্য এবং এই বিষয়টি গোষ্ঠীর সভ্যদের কাছে আচারকে স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলে। যে সমাজে সভ্যরা বিশ্বাসপ্রবণ এবং অমননশীল, সে সমাজে ব্যক্তিরা বিনা আপত্তিতেই আচার মেনে চলে। কাজেই আচার হল সার্বিক, অভ্যাস সার্বিক নয়। আচারের আদর্শগত বৈশিষ্ট্য আছে, যা অভ্যাসের নেই।

আচারের একটা ব্যক্তিগত দিক আছে। আচার বলতেই আমরা বুঝি কতকগুলি স্বীকৃত কর্মপদ্ধতি যেগুলি মানুষ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে

একত্রে করে থাকে। অনুষ্ঠান (Institution) বলতে আমরা বুঝি নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (system of control), যা ব্যক্তিগত সম্পর্কের সীমার বাইরে চলে যায়। এই নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হল অতীত এবং বর্তমান, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র যা মানুষকে তার পূর্বপুরুষ এবং বংশধরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে।

(ii) আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Custom and Institution) : আচার (Custom) এবং অনুষ্ঠানের (Institution) মধ্যে যে পার্থক্য তা জাতিগত নয়, মাত্রাগত। অনুষ্ঠানেরও একটা সামাজিক এবং আদর্শগত মূল্যের দিক আছে, কিন্তু আচারের তুলনায় অনুষ্ঠান অধিক নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) এবং কম স্বতঃস্ফূর্ত (spontaneous)। সমাজে আচারের থেকে অনুষ্ঠানের স্বীকৃতিই বেশী। যেমন, উত্তরাধিকার ও ভদ্রতা। সমাজ অনুষ্ঠান হিসেবে উত্তরাধিকারকেই বেশী স্বীকৃতি দেয়। উত্তরাধিকারের দ্বারা পরিবারের স্থায়িত্ব রক্ষা হয়। কিন্তু আচার হিসেবে ভদ্রতার গুরুত্ব অত বেশী নয়। এ ছাড়া অধিকাংশ অনুষ্ঠান সুনির্দিষ্ট, আচার সাধারণতঃ তেমন সুনির্দিষ্ট নয়। আচার অনুষ্ঠানে পরিণত হতে পারে যখন আচার সাধারণের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি লাভ করে।

(চ) লোকাচার (Folkways) :

আচার এবং অনুষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত হয়ে রয়েছে আর একটি বিষয়ের আলোচনা, সেটি হল লোকাচার (Folkways) এবং লোকনীতি (mores)। ডবলু. জি. সামনার (*W.G. Sumner*) ১৯০৬খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর '*Folkways*' গ্রন্থটিতে এই সম্পর্কে মনোরম ও দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিমতানুসারে মানুষ তার পূর্বপুরুষ পশুদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে দৈহিক-মানসিক প্রলক্ষণ, সহজাত প্রবৃত্তি, দক্ষতা বা আর কিছু না হলেও প্রবণতা বা স্বভাব যা তাকে খাদ্য যোগান, যৌন জীবন, ব্যবসা-বাণিজ্য বা আত্মগরিমা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে সহায়তা করে। উপরিউক্ত সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করে যেমন নানা ব্যাপারে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঘটল মতবিভেদ, তেমনি দেখা দিল মতের ঐক্য। এই যে মতের ঐক্য, মতের সাদৃশ্য, পারস্পরিক মত-বিনিময়—এ সবই লোকাচার উৎপন্ন করে। আচার এবং অনুষ্ঠানের তুলনায় লোকাচারের ব্যাপকতা অনেকবেশী। লোকাচার হল কতকগুলি স্বতঃস্ফূর্ত আচরণের রীতি। সমাজে লোকাচারের আবির্ভাবের পূর্বে যে সব সামাজিক আচরণ পরিলক্ষিত হত, লোকাচারগুলিকে তাদের কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত করা চলে না।

ভৌগোলিক অঞ্চলের বসবাসকারী প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়—প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধানের প্রচেষ্টা, জীবিকা সংগ্রহের ব্যস্ততা এবং এমন আচরণপদ্ধতির উদ্ভাবন যা বিরোধিতার মনোভাব দূরীভূত করে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে। এরই ফলে কতকগুলি আচরণ পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। এই সব আচরণ পদ্ধতি খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য প্রস্তুতকরণ, খাদ্যসংরক্ষণ, খাদ্যগ্রহণ, ব্যক্তির নিরাপত্তা, ব্যক্তি যে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তার নিরাপত্তা, বিবাহ, যৌন জীবন, শিষ্টাচার, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান, দেহসজ্জা এবং জীবনের আরও বহু বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রকাশ পায়। সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আচরণ পদ্ধতিগুলি এক হিসেবে সকলের দ্বারা অনুসৃত হয় এবং গোষ্ঠীজীবনে তাদের সার্বভৌমিকতার জন্য তারা লোকাচার নামে অভিহিত হয়। হাত জোড় করে নমস্কার করা, বিবাহিত মেয়েদের মাথায় ঘোমটা দেওয়া ভারতীয়দের উল্লেখযোগ্য লোকাচার। করমর্দন করা, গলাতে নেকটাই পরা ইউরোপীয় সমাজে বহুপরিচিত লোকাচার।

লোকাচার হল মানুষের পরিবেশের সঙ্গে অজানিত, স্বতঃস্ফূর্ত, অসমন্বয়-মূলক সংগতিবিধান, মামুলি কাজের প্রায়ঃশই পুনরাবৃত্তি ; যে কাজগুলি বহুসংখ্যক ব্যক্তি হয়ত ঐক্যবদ্ধভাবে বা একই প্রয়োজনের মুখোমুখী হলে একই ভাবে সম্পাদন করে।

লোকাচার হল ম্যাকাইভার এবং পেজ এর কথায় সমাজের দ্বারা অনুমোদিত এবং গৃহীত আচরণ পদ্ধতি। চলিত রীতি, শিষ্টাচার এবং সমাজে বসবাস করার জন্য মানুষের দ্বারা উদ্ভাবিত আচরণের বিচিত্র রীতি এই লোকাচারের অন্তর্গত। এই সব রীতিগুলি কার্যকর হওয়ার জন্য সমাজজীবনে কম বেশী স্থিরতা লাভ করে। সামাজিক ঐতিহ্যের অংশরূপে এরা বংশানুক্রমে হস্তান্তরিত হয়। এরা হয়ে পড়ে সমাজের অভ্যাস এবং প্রথা—সামনার (*Sumner*)-এর ভাষায় এরা পরবর্তী বংশধরদের পক্ষে আদর্শ হিসেবে কার্যকর হয়। সমাজে যখন এসব লোকাচার স্থায়ী হয়, তখন তারা নানাভাবে ব্যক্তি ও সমাজের কর্মপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। এসব লোকাচার অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত। তারা কোন সজ্ঞান পরীক্ষা-প্রচেষ্টার বা বিচারবুদ্ধিসম্মত পরিকল্পনার ফলশ্রুতি নয়। কোনরকম বৌদ্ধিক মনন বা উদ্দেশ্য ছাড়াই এরা বংশপরম্পরায় হস্তান্তরিত হয়। এই সব লোকাচারের আবির্ভাবের পর তারা সামাজিক শক্তিতে পরিণত হয়। কখন এবং কিভাবে তাদের উদ্ভব, বলা খুবই কঠিন। এরকম অনুমান করা যেতে পারে যে, কোন গোষ্ঠী কোন সমস্যার সমাধান কল্পে তার আচরণকে ভুল ও সংশোধন

পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত এগুলি লোকাচারে এসে উপনীত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, আদিম সমাজে পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধ ও তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করার রীতি ছিল লোকাচার। বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের জলবায়ু অনুসারে বিভিন্ন ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করাও লোকাচারের দৃষ্টান্ত। রৌদ্র এবং বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্যই হয়ত মস্তকে শিরাবরণ পরিধান করা—এই লোকাচারের উদ্ভব। কোন কোন ক্ষেত্রে শত্রুর কাছ থেকে নিজের মস্তক রক্ষা করাও হয়ত এই লোকাচারের উদ্দেশ্য হতে পারে। এই সব আচারণ-ধারা, যাদের লোকাচার নামে অভিহিত করা হয় একটা গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে পরে যে তাদের পরিবর্তন হলেও, এই পরিবর্তন হয় খুব ধীরে ধীরে। সাধারণতঃ এই সব লোকাচারের বিকল্প আচরণ পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য বড় বেশী কেউ উৎসুক হয়ে ওঠে না। ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই সব আচরণ পদ্ধতি মেনে চলে। এই অর্থে ব্যক্তির আচরণ সমাজ নিয়ন্ত্রিত।

লোকাচার মেনে কি হবে, সাধারণতঃ এই প্রশ্ন কেউ বড় একটা করে না। কাউকে লোকাচার মেনে চলার জন্য বাধ্য করতে হয় না। লোকাচারের মধ্যে যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার রয়েছে তা ঘটে ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ব্যক্তির মধ্যে এমন অনুভূতি কখনও দেখা দেয় না যে, সে যখন কোন লোকাচার মেনে চলছে তখন তাকে এ জাতীয় কিছু করতে বাধ্য করা হচ্ছে। কাজেই যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এর পেছনে কার্যকর হয় তা সুসংবদ্ধ বা বিধিবদ্ধ কিছু নয়। অ-বিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণই এর পেছনে কাজ করে। প্রতিটি ব্যক্তি লোকাচার মেনে চলুক তা তদারকী করার জন্য কোন সাংগঠনিক ব্যবস্থা কিছু থাকে না ; কারণ, তার প্রয়োজন হয় না। যে লোক লোকাচার মানে না, তাকে হয়ত একটু হাসি-বিদ্রূপের সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই ব্যঙ্গ, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, রটনা এসবই লোকাচার মেনে চলার ব্যাপারে নিয়ামকের কাজ করে। এর কারণ হল, সমাজের সমষ্টিগত প্রয়োজনের উপর অধিকাংশ লোকাচারের বিশেষ কোন প্রভাব নেই। যে লোক লোকাচার মেনে চলে না বা তা' উপেক্ষা করে, তেমন ব্যক্তি সমাজ-জীবনে অশান্তির সৃষ্টি করেছে এমন মনে করাও হয় না। লোকাচার না মানার জন্য সমাজ তাকে তার জন্য ধিক্কার দেয় না বা সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করে না, বা সমাজ তাকে একঘরে করে রাখে না।

আসল কথা হল, সমাজে কে লোকাচার মেনে চলছে, কে চলছে না, এই নিয়ে বড় একটা কেউ মাথা ঘামায় না। সমাজে সব লোকই যে লোকাচার মেনে চলছে তা নয়। তবে লোকাচার একেবারে মেনে না চলাও সম্ভব নয়, কারণ তাহলে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক বলতে কিছুই থাকবে না।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, সময় সময় কোন কোন লোকাচারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সমাজ সচেতন হয়। সমাজ মনে করে যে কোন কোন মানবিক মূল্যের দিক থেকে এই সব লোকাচার মেনে চলা খুবই প্রয়োজনীয়। কাজেই সামাজিক জীবনে যখন এই সব লোকাচার বিচারমূলক মননের বিষয়বস্তু হয়, তখন কোন কোন লোকাচার সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করে এবং নৈতিক তাৎপর্য যুক্ত হয়। যারা এই সব লোকাচারকে উপেক্ষা করে তারা সমাজে নিন্দিত হয়। কোন সম্প্রদায় হয়ত এদের সমাজের পক্ষে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে গণ্য করতে পারে। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি কোন অপরিচিতা মহিলাকে সম্বোধন করার সময় সম্ভ্রমসূচক শব্দ ব্যবহার না করে, তাহলে তার এ জাতীয় আচরণ খুবই নিন্দার বিষয় হবে।

তবে একথা স্বীকার না করে পারা যায় না যে, সমাজে ঐক্যবদ্ধ, প্রীতিপদ এবং সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের জন্য লোকাচার খুবই সহায়ক। মোটামুটি কোন্ অবস্থায় কোন্ ব্যক্তি কিরূপ আচরণ করবে, পূর্ব থেকে জানা থাকলে তার আচরণের সঙ্গে সংগতিবিধান করে চলা সম্ভব হয়। এর ফলে সমাজ-জীবনে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক সহজ ও সরল হয়। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিও আচরণের একরূপতার গুণে বিরোধ-মুক্ত হয় ও সমাজের স্বচ্ছন্দ গতিতে সহায়তা করে। সমাজবিদ্ কিংস্লে ডেভিস (*Kingsley Davis*) বলেন, 'মানুষের অস্তিত্বের আগুন্ত যদি কোথাও নিহিত থাকে তা রয়েছে লোকাচারে, কেননা আমরা তাদের নিয়ে শুরু করি এবং সব সময় তাতেই ফিরে আসি।'

(ছ) লোকনীতি (Mores) ঃ

যখন লোকাচারকে শুধুমাত্র আচরণের নির্দিষ্ট রীতি রূপে গণ্য না করে, আচরণের নিয়ামকরূপে গণ্য করা হয়, তখন তাদের লোকনীতি রূপে গণ্য করা হয়। লোকনীতি হল সেই সব লোকাচার, যেগুলি অবশ্য পালনীয়। প্রতিটি সামাজিক রীতি বা প্রথা, প্রতিটি লোকাচার কিছুমাত্রায় সামাজিক নিয়ামকের কাজ করে। অতি সাধারণ ধরনের শিষ্টাচারমূলক আচরণের মধ্যেও

নিহিত রয়েছে কোন কিছু সঠিকভাবে সম্পাদন করার ব্যাপার। কাজেই লোকনীতি লোকাচার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক কিছু নয়। সামাজিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র রূপে যে সব লোকাচার ক্রিয়া করে সেগুলিই হল লোকনীতি। গোষ্ঠী-আচরণের মানদণ্ড, গোষ্ঠীর ভাল-মন্দ উচিত বোধ, গোষ্ঠীর কল্যাণের পক্ষে কি উপযোগী—লোকনীতি তাই প্রকাশ করে।

আসল কথা হল, কোন বিশেষ লোকাচারের সঙ্গে যখন উচিত, অনুচিত, ভাল-মন্দের মূল্য সম্পর্কীয় অবধারণ (value judgments) যুক্ত হয়, তখন লোকনীতির উদ্ভব ঘটে। সাম্‌নার (*Sumner*) বলেন যে, যখন লোকাচারের সঙ্গে যুক্ত হয় গোষ্ঠীগত কল্যাণের চেতনা, উচিত অনুচিতের মানদণ্ডের ধারণা, তখনই তারা লোকনীতিতে পরিণত হয়। যেমন, বিশেষ ধরনের বস্ত্র পরিধান করা লোকাচারের ব্যাপার, কিন্তু বস্ত্র পরিধানের রীতিটাই হল লোকনীতি।

লোকনীতি অবশ্যই পালনীয় কেননা সমাজের ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন লোকনীতির সঙ্গে জড়িত। লোকাচারের সঙ্গে এই জাতীয় প্রশ্ন তেমন জড়িত নয়। কাজেই লোকাচার মেনে না চললে ব্যক্তি নিন্দার পাত্র হন না; কিন্তু লোকনীতিকে উপেক্ষা করলে ব্যক্তিকে নিন্দা করা হয়, অনেক সময় ব্যক্তিকে এর জন্য শাস্তি পেতে হয়।

সভ্য সমাজে নরনারী ভদ্রজনোচিত পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করবে, এটাই লোকনীতি, যদি কেউ তাকে লঙ্ঘন করে তাহলে তাকে নিন্দিত হতে হয়। সময় সময় তাকে শাস্তিও পেতে হয়। তবে লোকাচারের মত, লোকনীতিও সমাজে প্রবর্তিত হয় কোন বিধিবদ্ধ নিয়মের দ্বারা নয়। কাজেই লোকনীতি মেনে চলার জন্য কোন বিধিবদ্ধ চাপ সৃষ্টি করা হয় না।

সমাজ-জীবনের একটা বিশেষ স্তরে মানুষ চিন্তা করে দেখেনি যে লোকাচার সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত কল্যাণের পক্ষে উপযোগী, কি উপযোগী নয়। কিন্তু পরবর্তীকালে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের সঞ্চার হল, মানুষ সমষ্টিগত কল্যাণের কথা চিন্তা করতে লাগল। তখন তারা দেখল সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য কোন কোন আচরণ ভাল এবং মনে করল বিধিনিষেধের দ্বারা ব্যক্তিগত আচরণের নিয়ন্ত্রণ সমাজের সাধারণ কল্যাণ রক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজন। তখন কোন কোন লোকাচার লোকনীতিতে রূপান্তরিত হল।

ম্যাকাইভার এবং পেজ-এর অভিমতানুসারে লোকনীতির মাধ্যমেই একটা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের

সভ্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে লোকনীতি কার্যকর হয়। লোকনীতি একাধারে যেমন আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি আচরণ বিশেষকে নিষিদ্ধও করে।

এমন অনেক লোকনীতি আছে যা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে, কোন্ বিশেষ অবস্থায় দুটি ব্যক্তির মধ্যে যেমন স্বামী এবং স্ত্রী, ভ্রাতা এবং ভাগিনী, পিতা এবং পুত্র, চিকিৎসক এবং রোগী প্রভৃতির সম্পর্ক কিরূপ হবে।

গোষ্ঠী জীবনের প্রকাশ ঘটে যেমন লোকনীতির মাধ্যমে, তেমনি গোষ্ঠী জীবনের আচরণের সীমারেখা নির্দেশ করে এই সব লোকনীতি। গোষ্ঠীজীবনে যাতে সদস্যরা আচরণের মাধ্যমে গোষ্ঠীজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে, লোকনীতি সেই উদ্দেশ্যে সদস্যদের প্রভাবিত করে। এইসব লোকনীতি প্রতিটি ব্যক্তির মানসিক প্রবণতা যেমন একাধারে গঠন করে তেমনি সংযত করে। লোকনীতি মেনে চলার জন্য ব্যক্তি প্রসংশিত হয়, আর লঙ্ঘন করার জন্য হয় নিন্দিত। লোকনীতি মেনে যারা কাজ করে তাদের কাজ সমাজের অনুমোদন লাভ করে, যারা তা করে না, তাদের কর্মপদ্ধতি সমাজ অনুমোদন করে না।

লোকনীতি সমাজ ভেদে পৃথক হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতে অসবর্ণ বিবাহ কোন সমাজে অনুমোদিত, কোন সমাজে নিন্দিত। কোন গোষ্ঠী প্রাক্‌বিবাহ প্রণয়ে উৎসাহদান করে, আবার কোন গোষ্ঠী তার নিন্দা করে।

সাধারণতঃ লোকনীতির সমালোচনা করা হয় না, লোকনীতিকে সমালোচনার বিষয়বস্তু করা হলে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান যায়। লোকনীতিকে লঙ্ঘন করা হলে ব্যক্তিকে দণ্ড পেতে হতে পারে। এই দণ্ড শারীরিক শাস্তি প্রদান বা সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করা বা একঘরে করা—নানাভাবে প্রকাশ পেতে পারে। কাজেই অনেক সময় সমাজের সভ্যরা শাস্তির ভয়ে এই লোকনীতি মেনে চলে। কাজেই লোকনীতির মধ্যে কিছুটা বাধ্যতার ভাব আছে। তবে তারা আইনের সমপর্যায়ভুক্ত নয়, কেননা লোকনীতি লঙ্ঘনের জন্য কোন বিধিবদ্ধ দণ্ডদানের ব্যবস্থা নেই।

লোকনীতি ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। বস্তুতঃ লোকনীতি গোষ্ঠীর সংহতি রক্ষায়ও বিশেষ সহায়ক হয়।

অনুশীলনী

১। সংস্কৃতি কাকে বলে? সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি কী? (What is Culture? What are the characteristics of Culture?)

২। সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে প্রভেদ কর। (Distinguish between Culture and Civilization.)

৩। সম্প্রদায় কাকে বলে? সম্প্রদায় ও সমাজের মধ্যে প্রভেদ কী? (What is Community? Distinguish between Community and Society?)

৪। সংঘ কাকে বলে? অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? (What is an Association? How does it differ from Institution?)

৫। আচার কাকে বলে? আচারের সঙ্গে অভ্যাসের ও অনুষ্ঠানের পার্থক্য কোথায়? (What is custom? How does custom differ from habit and institution?)

৬। লোকনীতি বলতে কি বোঝ? সামাজিক জীবনে তাদের প্রয়োজনীয়তা কি? (What do you understand by Mores? Are they necessary for social life?)

৭। লোকাচার ও লোকনীতির মধ্যে পার্থক্য কর। (Distinguish between Folkways and Mores.)

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি
(Individual, Society and Culture)

১। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Individual and Society) :

ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি—এদের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করার পূর্বে প্রথমে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করা দরকার। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের আসল সম্পর্ক কি, এই প্রশ্ন নিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাবিদ্দের মধ্যে মতদ্বৈধ রয়েছে। তবে একটি প্রশ্নে সকলেই একমত পোষণ করেছেন যে, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। মানুষ জন্মায় এবং মানুষের মৃত্যু হয় কিন্তু সামাজিক গতির কোন পরিবর্তন নেই। একটি ব্যক্তি একটি সংগঠন বা সংস্থা পছন্দ করে বা অন্যটি করেনা, এ প্রশ্ন গৌণ। আসল কথা, সৃষ্টির আদিম কাল থেকে যে-কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানেই সে লালিত পালিত হোক না কেন, সমাজ বা পরিবেশ ছাড়া সে আদৌ স্থায়িত্বলাভ করতে পারত না। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের কথা যখন বলা হয় তখন কোন বিশেষ ধরনের সমাজের কথা আমরা চিন্তা করি না, তা যে-কোন সংগঠনের রূপই গ্রহণ করতে পারে—যেমন পরিবার, গোষ্ঠী অথবা রাষ্ট্রও হতে পারে। তবে একথাও সত্য যে সমাজ ছাড়া যেমন ব্যক্তির কোন অস্তিত্ব থাকতে পারেনা, সেরকম ব্যক্তি ছাড়া সমাজেরও কোন অস্তিত্বের কথা ভাবা যায় না। মানুষ নিয়েই সমাজ। সমাজই মানুষের জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। এ সমাজই মানুষকে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন করে তোলে। জন্মের সময় একটি শিশু রক্তমাংসের পিণ্ড ছাড়া আর কিছুই থাকে না। সমাজই তার মানসিক উন্নতি সাধন করে এবং তার সামাজিকীকরণের মাধ্যমে তাকে এক আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। সামাজিক পরিবেশ ছাড়া ব্যক্তিত্ব গঠিত হতে পারেনা। 'অহং' সম্পর্কে সচেতনতা এ সমাজেরই সৃষ্টি। একটি শিশু তখনই হাসে যখন তার মা তাকে দেখে হাসে এবং পরবর্তীকালে পরিবারের সদস্যদের, খেলাধূলার সাথীদের এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে তার যে অভিজ্ঞতা হয়, সেই অভিজ্ঞতাবশতঃ তার চরিত্রের মধ্যে উদারতা, স্বার্থপরতা, মহানুভবতা, সাহসিকতা, পরশ্রীকাতরতা, ক্রোধ এবং আন্তরিকতা

প্রভৃতি নানা দোষগুণের বিকাশ হয়। এইভাবে 'ভাল' 'মন্দ' 'উচিত' অনুচিত' সম্পর্কে তার ধারণা জন্মায় যা বস্তুতঃ সমাজেরই সৃষ্টি। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে একাধিক মতবাদ প্রচলিত আছে। এখানে কয়েকটি প্রধান মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে :

(ক) **সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract Theory) :** যে সমস্ত মতবাদ সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছে সামাজিক চুক্তি মতবাদ তাদের মধ্যে অন্যতম। সপ্তদশ শতাব্দীতে টমাস হবস্ (*Thomas Hobbes*) তাঁর বিখ্যাত 'লেভিয়াথাণ' (Leviathan) গ্রন্থে বলেন যে, মানুষ আদিম যুগে প্রাক্-সামাজিক অবস্থায় প্রকৃতির রাজ্যে (State of Nature) বাস করত। এই 'প্রকৃতির রাজ্যে'(State of nature) হানাহানি, মারামারি মানুষের জীবনকে জঘন্য, দারিদ্র, পাশবিক এবং ক্ষণস্থায়ী করতে বাধ্য করেছিল। ব্যক্তি ছিল তখন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তখনও পর্যন্ত কোন পারস্পরিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠেনি। এই অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে তারা একটা সামাজিক চুক্তি করে সমাজ গঠন করে। এর ফলে ব্যক্তির দায়িত্বহীনতা, পাশবিক আচরণ এবং অহং প্রবৃত্তির বিনাশ ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দার্শনিক রুশো (*Rousseau*) স্বীকার করেন যে, মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই সমাজ সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতির রাজ্য ছিল ভূ-স্বর্গ, কিন্তু জনসংখ্যার বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূচনা এবং মানুষের চিন্তার ক্রমবিকাশ এই প্রকৃতি রাজ্যের সাম্য ও সুখ শান্তি বিনষ্ট করল। অবশেষে মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন করে নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সমষ্টিগত ইচ্ছার অধীনস্থ করল। সামাজিক চুক্তি মতবাদের অপর একজন সমর্থক হলেন জন লক্ (*John Locke*)। তাঁর মতে প্রকৃতিতে সকল মানুষই স্বাধীনতা নিয়ে জন্মায়। প্রাক্-সামাজিক প্রকৃতির রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত। এ অবস্থায় মানুষের জীবনযাত্রা প্রাকৃতিক আইন ও স্বাভাবিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। কিন্তু এই আইন প্রয়োগ করার জন্য বা আইন লঙ্ঘন করলে শাস্তি দেবার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না। এজন্য মানুষ একটি সামাজিক চুক্তি সম্পাদন করল এবং সমাজ গঠন করল। ব্যক্তিই সমাজ তৈরি করেছে প্রয়োজনের তাগিদে।

ম্যাকাইভার এবং অন্যান্য সমাজবিদেরা সামাজিক চুক্তি মতবাদকে ভিত্তিহীন বলে মনে করেন। ম্যাকাইভার মনে করেন যে—এই মতবাদ কোন ঐতিহাসিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রাক্-সামাজিক মানুষের কোন চুক্তি

সম্বন্ধে যে জ্ঞান ছিল তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। সমাজ বহির্ভূত ব্যক্তির স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাপন সামাজিক চুক্তি মতবাদে স্বীকৃত হয়েছে যা নিতান্ত বাস্তবতা বর্জিত। দ্বিতীয়তঃ, মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সমাজ সৃষ্টি করেছে বলে সামাজিক চুক্তি মতবাদে যে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে সমাজবিদেরা তা মেনে নিতে পারেন নি। কারণ সমাজ ছাড়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ধারণা করা একান্তই অসংগতিপূর্ণ, কারণ সামাজিকীকরণ পদ্ধতির দ্বারাই তার ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। সমাজ-বহির্ভূত প্রাকৃতিক অবস্থায় বসবাসকারী মানুষের মধ্যে সামাজিক চেতনা সঞ্চারের কথা ভাবা যায় না। প্রাক্-সামাজিক প্রকৃতি-রাজ্যের কথা কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। তাছাড়া সমাজ-জীবনের পূর্বে সামাজিক চুক্তির কল্পনা যেন 'ঘোড়ার সামনে গাড়ীকে জুড়ে দেওয়ার মত ব্যাপার'। ম্যাকাইভার আরও বলেন যে, সমাজ আগে, কি ব্যক্তি আগে—এ প্রশ্ন নিরর্থক। কারণ সমাজ ছাড়া ব্যক্তির ধারণা যেমন অবাস্তব, সেরকম ব্যক্তি ছাড়াও সমাজের চিন্তা অসম্ভব। সমাজ এবং ব্যক্তি পৃথকভাবে অবস্থান করতে পারেনা।

(খ) **জৈব মতবাদ** (Organic Theory)ঃ এই মতবাদ অনুযায়ী সমাজ একটি যন্ত্রবিশেষ যার গঠনে এবং কার্যকলাপে জীবের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই মতবাদ অনুযায়ী জীবদেহের সঙ্গে তার বিভিন্ন অংশের যে সম্পর্ক, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে অনুরূপ সম্পর্ক বর্তমান। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক যান্ত্রিক নয়, আঙ্গিক। এই মতবাদ অনুসারে সমাজ ব্যক্তির যান্ত্রিক সমষ্টি নয়, পরস্পর নির্ভর এমন অংশের সমন্বয়ে একটি জীবন্ত জীবদেহ। সমাজ-দেহের আকার ও কার্যকলাপ জীবদেহের মতনই। ব্যক্তিই হল সমাজদেহের কোষবিশেষ। জীবদেহের বা সমগ্রের জন্যই কোষের অস্তিত্ব, সমাজ বা সমগ্রের জন্যই ব্যক্তির অস্তিত্ব। জীবদেহের বিভিন্ন অংশের যেমন পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই, তেমনি সমাজ বাদ দিয়ে ব্যক্তিরও কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই। ব্লুটস্‌লি, স্পেন্সার, স্পেংলার ছিলেন এই মতের প্রবক্তা। স্পেনসার বলেন, মানবদেহ এবং সমাজ, প্রারম্ভিক পর্যায়ে উভয়ের কার্যকলাপ খুবই সরল কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে উভয়ের কার্যই জটিলতর হয়ে পড়ে। উভয় ক্ষেত্রেই অংশগুলি স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করে, যেমন মানবদেহের অংশবিশেষ অর্থাৎ চোখ, কান, পা, হাত যদিও পরস্পর নির্ভরশীল প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করে। সেইরকম ব্যক্তিরা নিজনিজ কার্য সম্পাদন করে এবং সমাজের স্বার্থে যৌথভাবে কার্য সম্পাদন করে। জীবদেহ এবং সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই অংশের সন্তোষজনক ক্রিয়ার উপর সমগ্রের সুস্থতা নির্ভর করে।

এই মতবাদের প্রধান ত্রুটি হল, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ককে মানবদেহ এবং কোষের সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করা যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। ব্যক্তির জীবন্ত সত্তা আছে; তার মস্তিষ্ক আছে এবং সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে। অপরপক্ষে মানবদেহের কোষগুলির নিজস্ব সত্তা কিছুই নেই। ব্যক্তির মত তার স্বতন্ত্র ইচ্ছা, অভিপ্রায় বা সঙ্কল্প নেই। কাজেই সমাজকে যন্ত্রবিশেষ মনে করা ভুল। সমাজস্থ প্রতিটি ব্যক্তির একটি স্বতন্ত্র জীবন আছে যাকে সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে দেওয়া যায় না। এই মতবাদ সামাজিক ঐক্যের উপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করে যে, সমাজস্থ প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত গুণকে উপেক্ষা করে। ম্যাকাইভার বলেন যে, যখন অভিজ্ঞতার কোন প্রশ্ন ওঠে তখন সমাজস্থ ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতার কথা এবং তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার কথাই বলা হয়। যখন সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থের কথা বলা হয়, তখন সেই স্বার্থের কথা বলা হয় যা তার সদস্যরা অনুভব করে। এই মতবাদও ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের ব্যাপারে সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ। তবু জৈব মতবাদকে পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না, কারণ জৈব মতবাদে সমাজস্থ ব্যক্তিদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথা স্বীকার করা হয়। তবে সমাজের সঙ্গে জীবদেহের কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও পূর্বোক্ত কারণে এ সাদৃশ্যকে খুব বেশী দূর টেনে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। সমাজের সঙ্গে জীবদেহের যে তুলনা তাকে একটা রূপক হিসেবেই গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। জনৈক সমালোচকের কথায়, 'সমাজকে যদি জীব বলতে হয়, এ হল বহু জীব নিয়ে একটি জীব, যার প্রত্যেকটিরই একটি স্বতন্ত্র জীবন আছে।'

(গ) ভাববাদ বা গোষ্ঠী-চেতনা বাদ (Idealism or Group-Mind Theory) ঃ ভাববাদীদের মতে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। ভাববাদীরা সমাজকে জীবদেহ রূপে কল্পনা না করে সমাজকে একটি মন বা এক বৃহত্তর চেতনারূপে কল্পনা করেছেন। এই মতবাদ অনুসারে সমাজ একটি বৃহত্তর মন (greater mind) যা ব্যক্তিমনের নিছক সমষ্টিমাত্র নয়। সমাজস্থ সভ্যদের মন ছাড়াও সমাজের একটা অতিরিক্ত মন আছে। মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল (*McDougall*) সমষ্টিগত চেতনার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। খ্যাতনামা সমাজবিদ্ এসপিনোস (*Espinos*) মনে করেন সমাজের একটি সমষ্টিগত চেতনা আছে। ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী ডুরখীম্ (*Durkhim*)-এর মতে সমাজ তার

অংশের সমষ্টির তুলনায় বৃহত্তর এবং ব্যক্তিমন ছাড়াও সামাজিক মনের বা সমষ্টি-গত চেতনার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।

সমালোচনায় বলা যেতে পারে যে, ভাববাদীরা সমাজ এবং ব্যক্তির নিবিড় সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার জন্য যদি উভয়ের সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বলে অভিহিত করেন তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু ব্যক্তিমন ছাড়াও 'গোষ্ঠীমন' (group mind), সামাজিক মনের (Social Mind) স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিষয়টিও নানারকম বিতর্কমূলক দার্শনিক ও মনস্তত্ত্বমূলক সমস্যার সৃষ্টি করে। সুতরাং 'গোষ্ঠীমন' বা 'সামাজিক মনকে' রূপক হিসেবে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, সামাজিক চুক্তি মতবাদ এবং জৈবমতবাদ পরস্পর বিরোধী। সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুযায়ী সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সামঞ্জস্যতার অভাব রয়েছে এবং জৈব মতবাদ অনুযায়ী সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। সামগ্রিক দিক থেকে সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ধারণে উভয় মতবাদ অসমর্থ হলেও এই দুই মতবাদীরা সমাজের সঙ্গে জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ককে অস্বীকার করতে পারেন নি। ম্যাকাইভার এবং পেজ বলেন, সমাজ ও ব্যক্তি উভয়েই উভয়ের উপর নির্ভরশীল। ম্যাকাইভার আরও বলেন যে, এমন কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে নেই যে সামাজিক ব্যক্তি নয়। সমাজ হল ব্যক্তির সংগঠন। সমাজ ও ব্যক্তির জীবনের বাইরে কোন জীবন নেই। যা ব্যক্তির উদ্দেশ্য তাই সমাজেরই উদ্দেশ্য। সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে অথবা উভয়ের কল্যাণের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই। যা সামাজিক নীতি তা একান্ত ব্যক্তির নীতি বলেই গণ্য হয়। লিওপোল্ড ভিজে (*Leopold Wiese*) অনুরূপ বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেন, ব্যক্তি বনাম সমাজের যে প্রশ্ন তা নিতান্তই অবান্তর প্রশ্ন। তিনি বলেন, কাউকে যখন আমরা ব্যক্তি আখ্যা দিই তখন তাকে 'একক' প্রাণী হিসেবে ধরে নিই। তাকে যখন বিরাট কিছু ভাবি তখনই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। সমাজের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সমাজকেও যখন প্রাধান্য দিই এবং বিরাটকায় জীব বলে কল্পনা করি তখনই ভুল হয়। আলোর সঙ্গে ছায়ার যে সম্পর্ক, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সেই একই সম্পর্ক। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির চিন্তা কল্পনাতীত। ব্যক্তি সমাজের উপর নির্ভর করে, সমাজ ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। কিন্তু আমাদের সকল সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, সমাজস্থ ব্যক্তির পৃথক অস্তিত্ব আছে। তার ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা আছে—সমাজের সঙ্গে তাকে একেবারে লীন করে দেওয়া কোনমতেই যুক্তিযুক্ত

নয়। কোন একটি সৈন্যদলের সঙ্গে সেই সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সৈনিকের যে সম্পর্ক, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কও তাই। সৈন্যকে বাদ দিয়ে সৈন্যদলের কথা কল্পনা করা যায় না, সেরকম ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজের কল্পনা করা যায় না, কিন্তু সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রতিটি সৈনিকের একটা নিজস্ব সত্তা বা অস্তিত্ব আছে যাকে সৈন্যদল থেকে আলাদা করে দেখা যায়। ঠিক তেমনি সমাজের মধ্যেও ব্যক্তির একটা নিজস্ব অস্তিত্ব আছে, স্বাতন্ত্র্য আছে, যাকে কোন মতেই উপেক্ষা করা যেতে পারে না।

কাজেই আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং উভয়েই উভয়ের উপরে নির্ভরশীল।

২। ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation between Individual, Society and Culture) ঃ

উপরিউক্ত আলোচনার জন্য প্রয়োজন প্রথমেই বুঝে নেওয়া, সংস্কৃতি কাকে বলে? মানুষ সামাজিক জীব কিন্তু সামাজিক জীব হয়েই সে জন্মায় না। জন্মাবস্থায় তার সঙ্গে পশুজগতের বিশেষ পার্থক্য সূচিত হয় না। প্রাথমিক অবস্থায় পশু জগতের মত নিতান্ত কতকগুলি জৈবিক প্রয়োজন (need) দ্বারাই সে পরিচালিত হয়। সমাজ হল পারস্পরিক সম্পর্কের এক জটিল জাল। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাকে নানাধরনের জটিল সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। এক-দিকে সমাজ যেমন পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল জাল, অপর দিকে সমাজই হল সংস্কৃতির জন্মদাতা। জলাশয় ছাড়া মাছের যেমন কোন অস্তিত্ব থাকে না সেরূপ সমাজকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতির প্রশ্নও অবান্তর।

সংস্কৃতির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক জানতে হলে সংস্কৃতি কি তা জানা প্রয়োজন। সমাজ হল একটি গোষ্ঠী আর সংস্কৃতি হল সেই গোষ্ঠীর আচার-ব্যবহারের পদ্ধতি। সংস্কৃতি বলতে কেবলমাত্র মার্জিত রুচি, ব্যবহার বা অভ্যাসের উৎকর্ষ বোঝায় না, সংস্কৃতি তার থেকেও বেশী কিছু। সংস্কৃতি হল মানুষের আচরণের সমষ্টি। মানুষের জাগতিক নৈপুণ্য ও কর্মকুশলতা, তার বিশ্বাস, আশা, আকাঙ্ক্ষা, কলা, নৈতিকতা, রীতিনীতি, ভাষা, মূল্যবোধ সব কিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। মানব সমাজের যেমন সংস্কৃতি ছাড়া কোন অস্তিত্ব নেই সেরূপ সংস্কৃতি সমাজ ছাড়া কার্য করতে পারে না। অনেক সময় বস্তুগত সংস্কৃতি (material culture) এবং অ-বস্তুগত সংস্কৃতির (Non-material culture) মধ্যে পার্থক্য

করা হয়। বস্তুগত সংস্কৃতি বলতে প্রয়োজনের উপকরণ হিসেবে যা ব্যবহার করি তাই বোঝায়। অ-বস্তুগত সংস্কৃতি বলতে আদর্শ, মূল্য, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি বোঝায়। সংস্কৃতিকে আমরা বস্তুগত এবং অ-বস্তুগত এই দুই ভাগে ভাগ করি আমাদের সুবিধার জন্য। কিন্তু মূল কথা হল, সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী জীবন ছাড়া সংস্কৃতির অস্তিত্বই অসম্ভব। একটি অপরটির পরিপূরক। সংঘবদ্ধ জীবনকে যদি সমাজ বলি তাহলে সংস্কৃতি হল সেই সংঘবদ্ধ জীবনকে ধরে রাখার গ্রন্থিবিশেষ। একটি শিশুর সামাজিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি সংস্কৃতির প্রভাবেই বিকশিত হয় এবং সেই বিকাশ সাধনের প্রাথমিক পর্যায়ে এবং পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্কের প্রভাবকে অস্বীকার করা চলে না। তাই বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ফিকটে (*Fichte*) বলেছেন, 'সমাজে মানুষের সংস্পর্শে এসেই একটি মানুষ 'মানুষে' পরিণত হয়।' ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ এবং সেই সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের গ্রন্থি হল সংস্কৃতি। কাজেই একটি অপরটির সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে যে ধারণা একটি শিশুর মধ্যে বিকশিত হয় তা প্রথমে সে তার পিতা-মাতার কাছ থেকেই আয়ত্ত করে। কোন্‌টি করা 'ন্যায়' এবং কোন্‌টি 'অন্যায়' সে বোধও তার জন্মে। এই সাংস্কৃতিক মানসিক গঠনে একদিকে যেমন পরিবারের ভূমিকা রয়েছে অপরদিকে বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীদের অবদানও কম নয়। সেজন্য মনস্তত্ত্ববিদরা প্রমাণ করেছেন যে, সমস্যাজর্জরিত পরিবারে একটি শিশুর সামাজিকীকরণ কোন রকমেই সম্পূর্ণ হতে পারে না। যে অভিজ্ঞতা একটি ব্যক্তি সামাজিক সম্পর্কের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অর্জন করে তার একটি সহজ সাংস্কৃতিক গঠন আছে এবং এই সমাজই হল সে সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। কোন একটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কিভাবে গড়ে উঠেছে তা নিরূপণ করতে হলে আমাদের জানতে হবে, কি ধরনের সাংস্কৃতিক পরিবেশে সে বৃদ্ধিলাভ করেছে এবং সেই কারণেই দেখা যায় সমাজভেদে যেমন সংস্কৃতির পার্থক্য সূচিত হয় সেরকম ব্যক্তিত্বেরও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

যদি আমরা একটি সমাজ থেকে অন্য সমাজে যাই তাহলে বিভিন্ন সমাজের ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্বের গুণাবলীর বৈচিত্র্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। যেমন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বা সময় সম্পর্কে সচেতনতার কথা উল্লেখ করা যায়। বিভিন্ন সমাজের লোকেদের মধ্যে এই ব্যাপারে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই পার্থক্যের

মূলগত কারণই হল সংস্কৃতিগত পার্থক্য। আচার, আইন, ধর্ম, শিল্প এবং দর্শন কতকগুলি মূল্যবোধের জন্ম দেয় যা ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক হয়। কোন সংস্কৃতিতে প্রতিযোগিতার উপর এবং কোন সংস্কৃতিতে সহযোগিতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এমনকি একই সমাজের সংস্কৃতির পার্থক্যহেতু ব্যক্তিত্বের পার্থক্য সূচিত হয়। জৈবিক প্রয়োজনে শিশুদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না; কিন্তু তাদের ব্যবহারে এবং চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে যে পার্থক্য সূচিত হয় তা মূলতঃ সংস্কৃতিগত পার্থক্যের জন্য। বিভিন্ন সমাজে সংস্কার বা কুসংস্কার সম্পর্কীয় ধারণার বিষয়ে একই কথা প্রযোজ্য। রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীল পরিবারে সংস্কৃতির জন্য সদস্যদের ব্যক্তিত্বেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অ-বস্তুগত সংস্কৃতি ছাড়াও বস্তুগত সংস্কৃতির প্রভাবও অপরিসীম। যেমন, ঘড়ির উদ্ভাবন সময় সচেতনতা এবং নিয়মানুবর্তিতার উদ্রেক করে।

পরিশেষে, আমরা বলতে পারি ব্যক্তি, সমাজ এবং সংস্কৃতির বিশ্লেষণ পৃথকভাবে করা হলে সেই বিশ্লেষণ সার্থক হয় না। কারণ উভয়ই পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। ব্যক্তির সংস্কৃতি সমাজকে প্রভাবিত করে, আর ব্যক্তির জীবন সমাজের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৩। ব্যক্তি সমাজের সৃষ্টি (The Individual as a social product) :

ব্যক্তি সমাজের সৃষ্টি—এই উক্তির যথার্থ তাৎপর্য বুঝে নিতে হলে প্রথমে ব্যক্তি বলতে আমরা কি বুঝি, দেখা যাক :

ব্যক্তি কথাটির শারীরিক (physical) এবং জৈবিক (biological) অর্থ আছে। শারীরিক দিক থেকে ব্যক্তি বলতে বুঝি 'বিশেষ' বা 'একক'। 'জৈবিক' দিক থেকে বিচার করলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় তার আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। ব্যক্তি তার পরিবেশকে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু 'ব্যক্তি' কথাটির সামাজিক অর্থই আমাদের কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক দিক থেকে ব্যক্তি কেবলমাত্র জীবন্ত রক্তমাংসের পিণ্ড নয়, সমাজের একজন সভ্য মাত্র নয়, তার থেকে বেশী, সে হল কর্মকর্তা, তার ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তার নিজের স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। কেবলমাত্র অপরের থেকে স্বাতন্ত্র্য বোধের মধ্যেই ফুটে ওঠে না, বরং ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে তার কাজের স্বাতন্ত্র্যে। অর্থাৎ নিজের চেতনা ও বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে, অপরের সঙ্গে

নিজের সম্পর্কের কথা ভেবে সে তখন কাজ করতে পারে। ব্যক্তির নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গী তার কাজের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। তার মানে এই নয় যে, একজন ব্যক্তি অপর দশজনের মতন আচরণ করে না। অনেক সময় অপরে যেরূপ আচরণ করে ব্যক্তিও সেভাবে আচরণ করে। তবে তার অর্থ এই নয় যে, অন্ধভাবে বিনা বিচারে সে অপরের কর্মপন্থা অনুসরণ করে, বরং তার ব্যক্তিত্বের দ্বারা অনুমোদিত বলেই সেই কর্মপন্থা সে অনুসরণ করে।

এবার সমাজ বলতে আমরা কি বুঝব? ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যাপক অর্থে সমাজ বলতে যে-কোন সামাজিক সম্পর্ক বোঝায়। ক্ষুদ্রতর অর্থে 'সমাজ' হল একটি অল্পবিস্তর স্থায়ী সংগঠন যার মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক প্রকাশিত হয়। সমাজবিদ্‌রা সমাজের অর্থ নিরূপণে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, সমাজের একটি সাংগঠনিক প্রকাশ আছে। দ্বিতীয়তঃ, আকস্মিক কোন জনসমাজকে সমাজ বলা হয় না। তৃতীয়তঃ, জটিল ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সমাজের উদ্ভব। চতুর্থতঃ, সমাজ হল মানুষের ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যম। পঞ্চমতঃ, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত সচেতন মনুষ্য সমষ্টিকে সমাজ বলা হয়। ষষ্ঠতঃ, সমাজ গতিশীল, স্থিতিশীল নয়। কাজেই সমাজ হল মানুষের বিচিত্র সামাজিক সম্পর্কের জাল বিশেষ। সমাজ হল বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী, যে মানবগোষ্ঠী একই উদ্দেশ্য ও স্বার্থ সাধনের জন্য, নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ককে আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে একটি সংগঠনের মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ হয়।

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে, তার নিজস্ব চিন্তাধারায়, তার বিশ্বাস, আদর্শ, মূল্যবোধ, অর্থাৎ তার নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গিতে। অপরের মতামত বিনা বিচারে গ্রহণ না করে সে নিজে উদ্যোগী হয়ে কাজ করতে পারে এবং ভাল মন্দ বিচার করার ক্ষমতা তার আছে অর্থাৎ তার চরিত্রের বল আছে যার জন্য সে তার নিজের বৈশিষ্ট্যকে বা ব্যক্তিত্বকে সমাজের দশজনের কাছে প্রকাশ করতে পারে। এ্যরিষ্টটলের যুগ থেকেই ব্যক্তি সামাজিক জীব, একথা খুবই প্রচলিত। কিন্তু কেবল সামাজিকতা মানুষকে পশুসমাজ থেকে পৃথক করে না। মরিস জিনস্‌বার্গ (*Morris Ginsberg*) বলেন, 'যা মানুষকে সমাজের মর্যাদার উচ্চশিখরে স্থান দিয়েছে তা হল সমাজের সঙ্গে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের (individuality) অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, যার জন্য ব্যক্তি হল, ব্যক্তি; তা সমাজেরই সৃষ্টি।

কাজেই আমাদের আলোচ্য বিষয় হল ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূলে সমাজের অবদান কতটুকু। আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, ব্যক্তির এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমাজসৃষ্ট। ব্যক্তি যে-সব সহজাত প্রবণতা ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সমাজের মধ্যে থেকেই তার সেই বৈশিষ্ট্যগুলি পরিণতি লাভ করে। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধের মাধ্যমে শিক্ষামূলক, সৃষ্টিমূলক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলে এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ফলে শিশুর পক্ষে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু অভিযোজন সম্ভব হয়। একেই বলা হয় শিশুর সামাজিকীকরণ। জন্মের মুহূর্ত থেকেই শিশুর সব সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত হয় না। ধীরে ধীরে সে যতই বড় হতে থাকে ততই সে তার চারপাশের বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে আসে। ছোট বড় নানা দলের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ সে লাভ করে। সে নানারকম সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হলে অনেক বৃহত্তর সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়। এইভাবে তার সমাজ চেতনার বিকাশ ঘটে। শিশুর এই সমাজ চেতনা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে শিশুকে একটি পূর্ণ ব্যক্তিসত্তাতে পরিণত করে। তার সামাজিক চেতনাকে একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সমাজের রীতিনীতি, আদর্শ, ভাবধারা, আচরণ প্রভৃতি যে পরিমাণে শিশু আয়ত্ত করতে পারে তার উপরেই শিশুর সামাজিক বিকাশ নির্ভর করে। সামাজিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যীকরণ (individualisation) প্রক্রিয়াও চলতে থাকে। একদিকে যেমন পারস্পরিক আদানপ্রদানের ফলে শিশুর সমাজ চেতনার বিকাশ ঘটে, তেমনি তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশে এই দুটি প্রক্রিয়া পরস্পরের পরিপূরক, পরস্পর বিরুদ্ধ প্রক্রিয়া নয়। শিশুর সামাজিক চেতনার বিকাশ ও অহংবোধের বিকাশ একই সঙ্গে চলতে থাকে। একদিকে শিশু যেমন সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজকর্ম করতে, অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শিক্ষা করে, তেমনই অপরদিকে নিজের মতামত বা নিজের স্বার্থরক্ষা করার, অপরের বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট হয়। শিশু অনেক সময় তার পছন্দ অনুযায়ী সঙ্গী নির্বাচন করে। কোন্ দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে তা সে নিজেই বিবেচনা করে। সময় সময় সে দলের নেতৃত্বও গ্রহণ করে।

বস্তুতঃ, যে সামাজিক সম্পর্ক তাকে সমাজ সচেতন করে তোলে, সেই সামাজিক সম্পর্কই তাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের অধিকারী করে। বস্তুতঃ, সমাজই নানা দিক থেকে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশে সহায়তা করে।

ব্যক্তির চিন্তায় ও আচরণে যে স্বকীয়তা, তাও ব্যক্তি লাভ করে সমাজ থেকেই। সমাজে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগের অন্যতম মাধ্যম হল ভাষা, ব্যক্তি এই ভাষার মাধ্যমে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে, এবং সামাজিক মেলামেশার মধ্য দিয়ে চিন্তার ক্ষেত্রে স্বকীয়তা অর্জন করে। দশ জনের কাছে সে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে। সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির আচরণ লক্ষ্য করে এবং তার পরিণাম প্রত্যক্ষ করে সে সমাজ অনুমোদিত আচরণগুলি শিক্ষা করে। অনেক সময় অনুকরণীয় ব্যক্তিদের আচরণছাঁদ তাকে প্রভাবিত করে। কাজেই সমাজস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশার ফলেই ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গড়ে ওঠে। ব্যক্তি অপর ব্যক্তি থেকে নিজেকে পৃথক করতে শেখে। ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে ওঠে। অপরের কাছ থেকে ব্যক্তি যে স্বীকৃতি লাভ করে, সেইটাই হল ব্যক্তির 'সামাজিক আমি'। অপরে তার সম্পর্কে কি ভাবছে তার দ্বারাই নির্ধারিত হয় ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে ধারণা। ব্যক্তির আচরণ, চলাফেরা, আত্মশ্রদ্ধা, আত্মবিশ্বাস, প্রত্যাশা সব কিছুর ভিত্তি হল অপরে তার সম্পর্কে কি অভিমত পোষণ করে।

কাজেই ব্যক্তির মূল্যবোধ, আদর্শবোধ, নীতিবোধ, সবকিছুই গড়ে ওঠে সমাজকে কেন্দ্র করে। গৃহের পরিবেশেই ব্যক্তির নীতিবোধ গড়ে ওঠে। সমাজ স্বীকৃত মূল্যগুলিকে অগ্রাহ্য করলে সমাজে উপেক্ষিত হতে হয়, ব্যক্তি তা উপলব্ধি করে। ব্যক্তি সমাজ থেকেই সমষ্টিগত কল্যাণের ধারণা লাভ করে। বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করার দক্ষতা সমাজই তাকে শিক্ষা দেয়।

ম্যাকাইভার (*MacIver*) বলেন—সমাজতাত্ত্বিক অর্থে ব্যক্তি বলতে ব্যক্তির কতকগুলি গুণের সমষ্টিকে বোঝায়,—ব্যক্তি গোষ্ঠীর একজন সদস্য শুধু এটুকুমাত্র বোঝায় না। যখন আমরা কাউকে ব্যক্তি বলে অভিহিত করি তখন একথা বুঝি যে, ব্যক্তি কেবল আচার, অভ্যাস, রীতিনীতির দাস নয়, অথবা পরানুকরণই তার একমাত্র কাজ নয়। সে যখনই অপর একটি কাজ করে তার কারণ এই নয়যে, অপরে তা করে—তার কারণ হল সে সেই কাজটিকে যথার্থ মনে করে, তাই করে। যেভাবে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় সেইভাবেই সে তার সমাধানে ব্রতী হয়। অপরের তার উপরে দাবি রয়েছে এ-সম্পর্কে সে যখন সচেতনতার

পরিচয় দেয় তখনই তার ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়েছে বলা যায়। সমাজবিদেরা ব্যক্তির যে ব্যক্তিত্বের কথা বলে থাকেন, সেটা অংশতঃ সমাজেরই সৃষ্টি।

আদিম সমাজে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বগঠনের সুযোগ যথাযথ ছিল না যা বর্তমান জটিল এবং সংগঠিত সমাজে রয়েছে। আদিম সমাজে মানসিক বৃত্তির বিকাশ লাভের সুযোগ যে তেমন ছিল না তার কারণ তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় আচার, সংস্কার ও রীতিনীতির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হোত। কিন্তু বর্তমান সভ্য সমাজে ভাষার উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং জনমত প্রকাশের বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করছে। প্রাচীন সমাজে সামাজিক ঐক্য রক্ষার জন্য সমতার (likeness) ওপর গুরুত্ব দেওয়া হোত কিন্তু কোন ব্যক্তিত্বই বিকাশ লাভ করতে পারে না ; যদি তার ব্যক্তিগত রুচি এবং কৃষ্টির বিকাশ লাভের সুযোগ না থাকে। সে-জন্য বর্তমান উন্নত সমাজে সমতা (likeness) এবং বিভিন্নতা (difference)—উভয়েরই গুরুত্ব স্বীকার করা হয় এবং তার ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অধিকতর বিকাশ লাভে সমর্থ হয়।

তবে উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা যেন এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হই যে, বর্তমান সমাজে আচার-অনুষ্ঠান বা রীতি-নীতির কোন মূল্য নেই। সমাজে আচারের(custom) মূল্য অপরিসীম। আচার মানুষের প্রাত্যহিক জীবন যাপনকে সহজতর করে। আচারের জন্যই প্রত্যেক নূতন বংশধরের (generation) পক্ষে সামাজিক আচরণ এবং আচার-অনুষ্ঠান পালনের পথ সুগম হয়। সমাজে এই আচারের জন্যই বিবাহ, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উৎসব, এবং অনুষ্ঠান সম্পাদনের সুবিধা হয়। অবশ্য আচারের দিক থেকে সমাজে সমাজে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কোন একটি সমাজে যা গ্রহণীয় আচার বলে বিবেচ্য, অপর একটি সমাজে তা বর্জনীয় এবং দণ্ডযোগ্য হতে পারে। এভাবে ব্যক্তির মানসিক কাঠামো গঠনে সামাজিক আচারের মূল্য অস্বীকার করা যায়-না। সমাজ স্থায়ী (Static) নয়—সমাজ পরিবর্তনশীল (dynamic)। কোন একটি সমাজে যে-সব আচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা যে চিরকাল আদরণীয় থাকবে এমন মনে করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। সমাজের আচারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির মানসিক গঠনও পরিবর্তিত হয়।

মানুষের আচরণের নিয়ামকরূপেও (Control of human bahaviour) সমাজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। মানুষের আচরণের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সমাজ যথাযথভাবে উন্নতি লাভ করতে পারে না। কোন ব্যক্তি তার নিজের

ইচ্ছানুযায়ী সবসময় আচরণ করতে পারে না, কারণ অপরের জীবনের ক্ষেত্রে তার কার্যের ফলাফল সম্পর্কে তাকে চিন্তা করতে হয়। এভাবে সমাজ এবং ব্যক্তির আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সমাজকে নানাপ্রকার বাধানিষেধ আরোপ করতে হয়। সমাজে যে আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, নিয়মকানুন বর্তমান তার ভিত্তিতেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ক্রিয়া করে এবং সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যেও কোন্‌টা করণীয় এবং কোন্‌টা বর্জনীয় সে সম্পর্কে ধারণা জন্মায়।

সমাজ বিভিন্ন বাধানিষেধের মাধ্যমেই ব্যক্তির নানারকম অবাঞ্ছিত ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু একথা যেন আমরা মনে না করি যে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিনাশ ঘটে। বরং এটাই যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত যে, নিয়ন্ত্রনহীন সমাজই স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিত্ব গঠন করে।

কাজেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সামাজিক নিয়ন্ত্রণের যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি ব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে সমাজ-আরোপিত বাধানিষেধের যদি সামঞ্জস্য না ঘটে তা হলে তা ব্যক্তির ও সমাজের উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। সেজন্য প্রত্যেক সভ্য সমাজে শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং বিবাহ ও বৃত্তিনির্বাচনে ব্যক্তিকে নিজ নিজ ইচ্ছার সুযোগ দেওয়া হয়। এভাবেই ব্যক্তির সুস্থ ও স্বাভাবিক মানসিক গঠন সম্ভব হয়।

ব্যক্তির ধর্মীয় জীবনের ক্ষেত্রেও সমাজের প্রভাব কম নয়। কয়েকজন নৃতত্ত্ব-বিদ্‌ বলেন যে, আদিম সমাজে ধর্মযাজক বা শামন (Shaman)-কে উপজাতীয় লোকেরা ভয় করত, তার কারণ ধর্মযাজকের সঙ্গে উপজাতীয় প্রধানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যিনি সমস্ত অর্থের উৎসই নিয়ন্ত্রণ করতেন। ধর্মযাজক নানান অলৌকিক শক্তি (Spirit)-র কথা উল্লেখ করে উপজাতীয় ব্যক্তিদের মনে ভীতির সঞ্চার করত। নিজস্বার্থ সিদ্ধি করাই তার আসল উদ্দেশ্য ছিল। আসলে অর্থ নৈতিক নিরাপত্তার অভাবই ছিল এই ভীতির উৎস। সমাজই ছিল উপজাতীয় জীবনের ধর্মীয় মনোভাবের কারণ।

বর্তমান সমাজেও আমরা দেখতে পাই যাঁরা দীক্ষাগুরু বা ধর্মগুরু, পরিবেশই তাঁদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার উৎস। মানুষের মধ্যে ধর্মীয় মনোভাবের সৃষ্টি কোন অতিপ্রাকৃতিক (supernatural) ব্যাপার নয়। প্রাচীন বা পুরাতনের ভিত্তিতেই মানুষ নূতনকে গ্রহণ করে, কিন্তু যার সঙ্গে প্রাচীনের কোন সম্পর্ক নেই, লোকে তাকে গ্রহণ করতে ভয় পায়। পরিবেশই আদিম অধিবাসীদের মনে ধর্মীয় মনোভাবের উদ্রেক করতে সাহায্য করেছিল। কতকগুলি

স্বাভাবিক মানবিক প্রবণতাও ধর্মকে প্রভাবিত করেছিল। সমাজ বা গোষ্ঠীর যারা শত্রু বা মিত্র তারা তাদের দেবতাদেরও শত্রু বা মিত্রে পরিণত হল।

কার্লমার্কস (*Karl Marx*) রাষ্ট্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, রাষ্ট্র হল অর্থনৈতিক ভিত্তিতে পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রেণী (class) দ্বারা গঠিত। পুঁজিপতি শ্রেণী উৎপাদনের উপকরণগুলি করায়ত্ত করে এবং তার উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর উপরে শোষণ চালিয়ে যায়। তাঁর মতে এ ধরনের ধনতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো সমাজের লোকদের কেবলমাত্র অর্থনৈতিক জীবনকেই প্রভাবিত করে তাই নয়—তার সংস্কৃতি, আদর্শ, ধর্ম, কৃষ্টি এবং দৃষ্টিভঙ্গীকেও নিয়ন্ত্রিত করে। তাই বলা যায়, মানুষ সামাজিক কাঠামোর দাস।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, সমাজই হোল মানুষের ব্যক্তিত্বগঠনের, সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশ সাধনের এবং ধর্মীয় মনোভাবের প্রেরণার উৎসস্বরূপ। যা সমাজের কাম্য তাই ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হয় এবং বিকাশ লাভ করে।

৪। শৈশবকালে পৃথকীকরণের ফলাফল (The effect of isolation in childhood) :

আমরা আগেই দেখেছি সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক খুবই নিবিড়। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সমাজ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন করে এবং সামগ্রিকভাবে তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এমনকি আদিম সমাজেও নানারকম সংগঠনের পরিচয় আমরা পাই। মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য এইখানে যে, অন্যান্য প্রাণীর শৈশবাবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। সামাজিকীকরণ পদ্ধতির দ্বারাই মানব-শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। একটি শিশু যখন জন্মায় তখন সেনিতান্ত নিঃসঙ্গ একটি অসহায় প্রাণী ছাড়া কিছুই নয়। পরিবারেই মাতা-পিতার সান্নিধ্যে তার সামাজিকীকরণের প্রথম ধাপ শুরু হয়। নিঃসঙ্গ অবস্থায় একটি শিশুর মানসিক বিকাশ সম্ভব নয়; ফলে সে অস্বাভাবিক প্রাণীতে পরিণত হয়। জন্মের সময় যদি একটি শিশু মানুষ্য সমাজ থেকে দূরে থাকে, তাহলে তার মধ্যে অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা যায়। সে কথা বলতে অসমর্থ হয়; 'ভাল' 'মন্দ' সম্পর্কে তার মধ্যে কোন ধারণা জন্মলাভ করে না। এমনকি সাংস্কৃতিক আদবকায়দা সম্বন্ধেও সে অবহিত হতে পারে না। সমাজতত্ত্ববিদেরা এভাবে নানারকম ঘটনার সমীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন যে, সমাজ ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব অসম্ভব।

কাসপার হসার ঘটনায় (Kaspar Hauser case) দেখা যায়, কাসপার হসারকে সমাজের বাইরে নিউরেমবার্গের জঙ্গলে লালনপালন করা হয়। বেশী বয়সে যখন তাকে শহরের মধ্যে আনা হোল তখন দেখা গেল যে, সে ভালভাবে চলতে পারে না; তার মানসিক গঠন একেবারেই শিশু তুল্য; সে ভাল করে ভাষারপ্ত করতে পারেনি। এমনকি চেতন ও জড় পদার্থের মধ্যে পার্থক্য করতেও সে অসমর্থ।

অমলা-কমলাকে (Amla and Kamala case) ১৯২০ সালে নেকড়ে বাঘের গুহায় পাওয়া যায়। অমলা কিছুদিন পর মারা যায় কিন্তু কমলা কিছু বছর জীবিত ছিল। দেখা গেল মানব চরিত্রের কোন গুণই তার মধ্যে বিকশিত হয়নি। সে চার পায়ে হাঁটত, বাঘের মত ডাকত, এমনকি মানুষ দেখলে ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে পড়ত।

আন্না (Anna) ছিল আমেরিকায় কোন এক শহরের অবৈধ সন্তান। তাকে ছ'মাস বয়সে সমাজ থেকে দূরে একটি ঘরে বদ্ধ করে রাখা হয়। সাত বছর পর যখন তাকে পাওয়া গেল তখন দেখা গেল, সে ভালভাবে কথা বলতে পারে না, এমনকি মানুষ দেখলেও ভয় পায়।

উপরিউক্ত কয়েকটি ঘটনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, শৈশবকালে কোন শিশুকে যদি সুস্থ স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় তাহলে কোন শিশুই বিকাশ লাভ করতে পারে না।

৩। শিশুর সামাজিকীকরণ (Socialisation of the child) ঃ

কোন শিশুই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক হয়ে জন্মায় না। সে যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে সেই পরিবারের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত পালিত হয়। বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে বন্ধু-বান্ধবদের, প্রতিবেশীদের এবং স্কুল জীবনে সহপাঠীদের সান্নিধ্যে আসে। এসময় তার নানারকম সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সমাজের কাছ থেকে সে নানা ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সে ক্রমশঃ স্থানীয় ভাষা আয়ত্ত করে এবং বাবা-মা ও ভাইবোনেদের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে।

এইভাবে সংস্কৃতির মাধ্যমেই পূর্বপুরুষ এবং বর্তমান পুরুষের (Present generation) সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ রক্ষিত হয়। সামাজিকীকরণ পদ্ধতি ছাড়া সমাজ এক পুরুষের বেশী স্থায়ী হতে পারত না।

বিভিন্ন সমাজবিদেরা সামাজিকীকরণের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন যা আলোচনা করলে সামাজিকীকরণ সম্পর্ক আমাদের ধারণা আরও পরিষ্কার হবে। বোগারডাস (*Bogardas*) বলেন, সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তিরা পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়, তাছাড়া পরস্পরের মঙ্গলকামনায় এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনেও তারা তৎপর হয়। এইভাবে তাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়।

অগবার্ণ এবং নিমকফ (*Ogburn and Nimkoff*) বলেন, সামাজিকীকরণ ছাড়া সমাজে জীবনযাপন একেবারে সম্ভব নয় এবং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তি তার গোষ্ঠীর সঙ্গে মেলামেশায় সামাজিক মূল্য বজায় রাখে।

ম্যাকাইভার (*MacIver*) বলেন, সামাজিকীকরণের দ্বারা সমাজের লোকেরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করে, নিজেদের দায়িত্বসম্পর্কে সচেতন হয় এবং স্থায়ী সংগঠনের জটিল কাঠামো তৈরি করতে সমর্থ হয়। কিংসলি ডেভিস (*Kingly Devis*) বলেন যে, এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তি পুরোপুরি সামাজিক মানুষে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়া ছাড়া ব্যক্তি ব্যক্তিত্বলাভে সমর্থ হয় না। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ছাড়া মনুষ্য সমাজ এক পুরুষের বেশী স্থায়ী হতে পারত না।

উপরিউক্ত সমাজবিদ্দের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে কতকগুলি ঐতিহ্যগত সামাজিক মূল্যের ওপর ভিত্তি করে সামাজিকীকরণ প্রণালী ক্রিয়া করে। এইভাবেই পুরুষানুক্রমে শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের যে ধারা তার মধ্য দিয়েই এই প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে এবং তা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন করে। ব্যক্তিত্ব বলতে সব সময় ব্যক্তির প্রকাশ্য আচরণকেই বুঝায় না। সামাজিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সে যে যথাযথভাবে তার নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে, তার মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হয়, তাই তার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

সামাজিক সম্পর্কের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর 'অহং' (ego) গঠিত হয়। চার্লস কুলী (*Charles C. H. Cooley*) বলেন, একটি শিশুর আত্মসচেতনতা তখনই জন্মায় যখন সে চিন্তা করে অপরে তার সম্পর্কে কি চিন্তা করছে। চার্লস কুলী শিশুর আত্মসচেতনতার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে একজন অপরের সামনে অবতীর্ণ হওয়ার কল্পনা করে, দ্বিতীয় পর্যায়ে অবতীর্ণ হওয়ার পর অপরের বিচারের

কল্পনা করে এবং তৃতীয় বা সর্বশেষ পর্যায়ে দেখা যায় অপরের কল্পিত বিচারের কাছে আত্মসচেতন মনের বিকাশ লাভ। এইভাবে সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যম তার 'অহং' কাজ করে যা পরবর্তী স্তরে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে সাহায্য করে।

সামাজিকীকরণ প্রাথমিক মর্যাদার (initial status) উপর বৃহৎ পরিমাণে নির্ভর করে যা একটি শিশু পরিবারে, স্কুলে এবং অন্যান্য সংগঠনের মাধ্যমে লাভ করে। প্রত্যেকটি পরিবারেই শিশুর এই প্রাথমিক মর্যাদা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রাথমিক মর্যাদাই তার ব্যক্তিত্ব গঠনে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে। এই প্রাথমিক মর্যাদা অর্জনে সে সমাজের তথা পরিবারের কাছ থেকে অনেক সময় বাধা পায় যার ফলে তার সামাজিকীকরণ সফল হয় না। যেমন ধরা যাক্, একটি শিশু অঙ্গহীন হয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে, তার সামাজিকীকরণ একটি সুস্থ শিশুর সামাজিকীকরণের সমতুল্য হতে পারে না। তার কারণ সে প্রথমেই প্রাথমিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। তার বাবা-মাও তাকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে পারেন না এবং পরবর্তীকালে যখন সে পরিবারের গণ্ডী পার হয়ে স্কুলে গেল তখন বিকলাঙ্গ হওয়ার জন্য সহপাঠীদের কাছে সে হাস্যাস্পদ হয়ে পড়ল। এই জাতীয় ঘটনার প্রতিক্রিয়া তার স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক হোল না। তার মনে হতে লাগল সমগ্র বিশ্বই যেন তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, ফলে আর পাঁচ জনের মত সে অপরের সঙ্গে সহজ সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করতে প্রতি পদে পদে অসমর্থ হয়ে পড়ল।

অনেক সময় শিশুর প্রতি বাবা-মার অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারের ফলেও শিশুর সামাজিকীকরণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেমন, কোন কোন পরিবারে পিতামাতা ও অন্যান্যদের মাত্রাতিরিক্ত স্নেহই একটি শিশুর অবনতির পথ প্রশস্ত করে দেয়। অপরপক্ষে একটি শিশু যদি ক্রমাগতই পারিবারিক স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয় তাহলেও তার সামাজিকীকরণ পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হোল, একটি শিশুর সামাজিকীকরণের পিছনে কার দায়িত্ব রয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, যে পরিবারে শিশুটি জন্মগ্রহণ করে শিশুটির সামাজিকীকরণের ব্যাপারে সে পরিবারের মুখ্য দায়িত্ব রয়েছে। শিশুটি তার বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে অনেক কিছুই শেখে, সে তাদের আচার-আচরণ এবং প্রত্যেকটি কাজের অনুকরণ করে। যেমন, শিশুটি মাকে রান্না করতে দেখে 'রান্না রান্না' খেলা করে এবং তার মায়ের মত সেও তার পুতুলকে দুধ খাওয়ায়। এই অনুকরণের ফলে পরিবারের

সৎ গুণাবলীও যেমন তার চরিত্রে বিকশিত হতে পারে আবার পরিবারে সদস্যদের নিজেদের মধ্যে ঠিকমত বোঝাপড়ার সম্পর্ক না থাকলে তার মন্দ প্রভাবও শিশুর জীবনে দেখা দিতে পারে। সামাজিক সমস্যার ব্যাখ্যায় সমাজবিদেরা বলেন যে, পরিবারের মধ্যে যথার্থ সামাজিকীকরণের অভাবেই শিশু নানারকম দুষ্কর্মে অংশ গ্রহণ করে। মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড বলেন যে, পারিবারিক সম্পর্ক বা ব্যবহারই একটি শিশুর সামাজিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। উপযুক্ত মাটি না হলে গাছ যেমন বাড়তে পারে না, সেরূপ উপযুক্ত পারিবারিক পরিবেশ না থাকলে শিশুর সামাজিকীকরণও যথার্থ হয় না।

তবে একথা ঠিক নয় যে, কেবলমাত্র পরিবারই একটি শিশুর সামাজিকীকরণে এককভাবে সাহায্য করে। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংঘের অবদানও কম নয়। তাছাড়া, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, সহপাঠিদের সান্নিধ্য এবং পরবর্তীকালে সহকর্মীদের সংস্পর্শ তার সামাজিকীকরণে সহায়ক হয়। মাতা পিতার বিবাহিত জীবনের মনোরম সম্পর্কও শিশুর সামাজিকীকরণে সহায়ক হয়। এই শিশুই তার পরিবারে পরবর্তীকালে স্বামী ও পিতার ভূমিকা গ্রহণ করে। এক কথায়, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া কাজ করে।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া একটি শিশুর পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ ব্যক্তিগত গুণাবলীকে নিশ্চয় অস্বীকার করা যায় না কিন্তু সামাজিকীকরণ ছাড়া কেবলমাত্র উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ গুণাবলীই যে ব্যক্তিত্ব গঠনে যথেষ্ট নয়, সমাজবিদ্‌রা তা প্রমাণ করেছেন। দুটি যমজ সন্তানকে ভিন্ন পরিবেশে রাখা হলে সামাজিকীকরণের ফলে তাদের ব্যক্তিত্বও ভিন্ন প্রকৃতির হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শৈশবকালে সামাজিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হোলে কোন শিশুই সামাজিকতা (sociability) লাভ করতে পারে না। কাজেই ব্যক্তিত্ব হল সামাজিকীকরণের সামগ্রিক ফল।

৬। ব্যক্তিত্বের বিকাশ (Personality Development) :

ব্যক্তিত্ব (Personality) বলতে কি বোঝায়? সাধারণতঃ স্বাতন্ত্র্য (individuality) এবং অসাধারণত্বকেই (uniqueness) ব্যক্তিত্বের লক্ষণ মনে করা হয়। কিন্তু এ হল ব্যক্তিত্বের লৌকিক ব্যাখ্যা, মনোবিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা নয়।

বিভিন্ন মনোবিদ্ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। মনোবিদ্ মান (*Munn*) ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞায় বলেছেন—'বিশেষ করে সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ব্যক্তির গঠন, আচরণের ধরণ, আগ্রহ, ভাবভঙ্গী, ক্ষমতা, সামর্থ্য এবং প্রবণতার বিশেষ সংহতি বা ঐক্য হল ব্যক্তিত্ব,' অলপোর্ট (*Allport*) বলেন, 'ব্যক্তিত্ব মানুষের অন্তঃস্থিত দৈহিক-মানসিক তন্ত্রের সেই গতিবন্ত সংগঠন যা পরিবেশের সঙ্গে তার অভিনব উপযোজন নির্ধারণ করে। অলপোর্টের সংজ্ঞাটি সন্তোষজনক কারণ তিনি ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনশীল রূপটি স্বীকার করেছেন। তিনি বাহ্য প্রকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে অভ্যন্তরীণ দিকের উপর এবং ব্যক্তির সামাজিক দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভি. ভি. আকোলকার (*V. V. Akolkar*) বলেন, 'ব্যক্তির চিন্তন, জীবনের পরিবেশের সঙ্গে উপযোজন এবং আবেগগত প্রতিক্রিয়ার যে ধরন তারই এক জটিল সংগঠন হল ব্যক্তিত্ব'।

ব্যক্তিত্ব এক জটিল বিষয়। ব্যক্তিত্ব দেহ-মনের এক জীবন্ত ঐক্য, ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, সহজাত প্রবৃত্তি, মানসিক প্রবণতা ও ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা, আগ্রহ, জীবনাদর্শ, অভ্যাস, অভিজ্ঞতা, কল্পনাশক্তি, বুদ্ধি, নৈপুণ্য, দোষ, গুণ, প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে উপযোজনের ক্ষমতা এবং বাহ্য প্রতিক্রিয়া—এই সব কিছুর সংমিশ্রণেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব শুধুমাত্র সংহতি বা ঐক্য নয়। ব্যক্তিত্ব হল সেই সত্তা যা গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে উপস্থিত থেকে তাদের সংহত বা ঐক্যবদ্ধ করে।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের প্রশ্নে দুটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য কি কি? আর দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিত্ব্যের উপাদান-গুলি কি কি?

ব্যক্তিত্বের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—ব্যক্তির মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা ও বিচিত্র শক্তি সুপ্ত থাকে, পরিবেশের সঙ্গে উপযোজনের মধ্য দিয়েই সেগুলি বিকাশলাভ করে। কাজেই পরিবেশের সঙ্গে উপযোজনের জন্য ব্যক্তির কার্যাবলী তার ব্যক্তিত্বের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ। ব্যক্তির সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের এই উপযোজনের পিছনে আছে একাধারে ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, ভাবধারা, কামনা, বাসনা, জীবনাদর্শ এবং ব্যক্তির সহজাত প্রবণতা, বৃত্তি এবং অপরদিকে ব্যক্তির দৈহিক বৈশিষ্ট্য। মানসিক এবং দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি ঐক্য-বদ্ধ হয়ে একটা সুসমঞ্জস রূপ লাভ করে। ব্যক্তিত্বের মধ্যে আছে একটা

সমগ্রতা, একটা সংহতি, একটা সুসমঞ্জস সংগঠন। ব্যক্তিত্ব স্থির বা নিশ্চল নয়, ব্যক্তিত্বের গঠন ক্রমবর্ধমান ও গতিধর্মী। পরিবেশের মধ্যে পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য এবং এই পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গতিসাধনের প্রচেষ্টার জন্য ব্যক্তিত্বের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দেয়। ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনশীল ও বিকাশমান হলেও এর মধ্যে একটা স্থায়িত্ব আছে, যার মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বুঝে নেওয়া যায়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সামাজিক পরিবেশের মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করে। সমাজের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, কৃষ্টি ও ভাবধারা প্রভৃতি সামাজিক উপাদান ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে। সে কারণে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সমাজের উপর নির্ভরশীল।

ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলিকে দুভাগে ভাগ করা হয়—প্রাকৃতিক উপাদান এবং পরিবেশগত উপাদান।

বংশধারা বা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কতকগুলি বৈশিষ্ট্য; দৈহিকগঠন এবং কতকগুলি রসক্ষরা গ্রন্থির (ductless glands) ক্রিয়া হল প্রাকৃতিক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। পরিবেশগত উপাদান হোল দু' ধরনের—প্রাকৃতিক এবং সামাজিক। প্রাকৃতিক পরিবেশ, যেমন জলবায়ু, মৃত্তিকা, গাছপালা, জীবজন্তু, খাদ্য—এসব কিছুই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে। সামাজিক পরিবেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য হল গৃহের বা পরিবারের পরিবেশ। শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে ও বিকাশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তারপর শিশু যখন পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয় তখন বিভিন্ন আচার, অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ধর্ম প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, অফিস প্রভৃতি সংগঠনগুলি ব্যক্তির চিন্তাধারা ও আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং এই প্রভাবের তারতম্য অনুযায়ী ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

ব্যক্তি জন্মগত সূত্রে যে সব বৈশিষ্ট্য লাভ করে সেগুলি এবং পরিবেশগত উপাদান, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে, উভয়েরই গুরুত্ব রয়েছে। কোনটিই উপেক্ষার বিষয় নয়।

ব্যক্তির দৈহিক ত্রুটি, রসক্ষরণ গ্রন্থির ক্ষরণের অভাব ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশকে ব্যাহত করে। যদি দৈহিক ত্রুটি দূর করা সম্ভব হয় এবং রসক্ষরণ গ্রন্থির ক্রিয়াকে চিকিৎসার সাহায্যে স্বাভাবিক করে তোলা যায় তাহলে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ আবার সুগম হয়ে ওঠে। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনে তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু উপযুক্ত সামাজিকীকরণের মাধ্যমেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধিত হতে পারে।

সেকারণে শিশুর সামাজিকীকরণের সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে।

সামাজিকীকরণ বলতে বোঝায় সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিশু তার সমাজের বা গোষ্ঠীর কর্তব্য সম্পাদনকারী এবং সমাজের কার্যে অংশ গ্রহণকারী সভ্য হতে শিক্ষা করে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার অর্থ হল শিশুকে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জগতে অণুপ্রবিষ্ট করা, তাকে সমাজের এবং সমাজস্থ নানাধরনের গোষ্ঠীর কাজকর্মে একজন অংশগ্রহণকারী সভ্যরূপে গড়ে তোলা এবং সমাজের আদর্শ ও মূল্য গ্রহণে তাকে প্রবৃত্ত করা। প্রচলিত আচরণ ধারা গ্রহণ করার নামই শিশুর সামাজিকীকরণ। অপরের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমেই এটি ঘটে থাকে। ব্যক্তির সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অনেকগুলি প্রক্রিয়া যুগপৎ ক্রিয়া করে। প্রধান প্রধান প্রক্রিয়াগুলি হোল—বাস্তবতাবোধের বিকাশ, নিজের সম্পর্কে ধারণার বিকাশ, ভাষা আয়ত্তীকরণ, প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম শিক্ষা করা এবং জীবনের বিভিন্ন ভূমিকার জন্য প্রস্তুতি।

সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বন্য পরিবেশে যেসব মানব-শিশু ঘটনাচক্রে লালিত-পালিত হয়েছে বা নানা কারণে সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেসব মানব শিশু প্রতিপালিত হয়েছে তাদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ যথাযথ ঘটেনি। যখনই তাদের সামাজিক পরিবেশে স্থাপন করা হয়েছে তখনই তাদের আচরণে মানব-সুলভ আচরণের বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে প্রকাশ পেয়েছে এবং তার ব্যক্তিত্বের বিকাশও সুরু হয়েছে।

সমাজ জীবনের অংশীদার নয় এমন ব্যক্তির আচরণ লক্ষ্য করা হলে বোঝা যাবে যে, ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের জন্য সমাজের কাছে কতখানি ঋণী। সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে নানা অসংগতি পরিদৃষ্ট হয়।

সমাজ জীবনের বিশেষ কোন একস্তরে যদি কোন ব্যক্তিকে সমাজ জীবন থেকে সুদীর্ঘকাল ধরে বিচ্ছিন্ন রাখা হয় তবে ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রবল বাধা দেখা দেয়। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের অর্থ হল শিশুর দৈহিক ও অন্তর্নিহিত সুপ্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলির যথাযথ আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে তার এক সুসংবদ্ধ রূপ গড়ে তোলা। কিন্তু ব্যক্তির সামাজিকীকরণ ভিন্ন এই কার্য কখনও সিদ্ধ হতে পারে না। এই সামাজিকীকরণ কিভাবে সম্ভব হয়? শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির যেমন—পরিবার, সমবয়সীদের গোষ্ঠী, বিদ্যালয় প্রভৃতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সময়ের দিক থেকে গৃহের

ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির নীতিবোধ গঠিত হয় গৃহের পরিবেশে, গৃহই তার চিন্তা, আবেগ ও কর্মের অভ্যাস গঠন করে। কিভাবে নিজের আবেগগুলিকে প্রকাশ করতে হয় তার যথাযথ রূপ সে গৃহেই শিক্ষা করে। বিভিন্ন পরিবেশে আবেগের যথাযথ প্রকাশ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। পরিবার থেকে ব্যক্তি ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি শিক্ষা করে। পরিবার তাকে আত্মপ্রত্যয় শিক্ষা দেয়। সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা সবচেয়ে প্রধান। সমবয়সীদের গোষ্ঠীতে শিশু নিজের আচরণের ভালত্ব ও মন্দত্বের প্রত্যক্ষ এবং খোলাখুলি সমালোচনা শুনতে পায়। এই ধরনের গোষ্ঠী, হল 'সমাজ-দর্পণ', সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে শিশু নিজের সম্পর্কে নির্ভুল ও সুসমঞ্জস ধারণা গঠন করতে পারে। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অভিভাবণ (suggestion), অনুকরণ (imitation) এবং সহানুভূতি (sympathy)—এই উপাদানগুলি শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সামাজিকীকরণের সারবস্তু হল শিশুর মধ্যে বাস্তবতাবোধের বিকাশ। কেননা বাস্তবতার বোধ ছাড়া অপরের সঙ্গে বা জীবনের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করা সম্ভব নয়। অপরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ফলে শিশুর 'অহং' ভাব গড়ে ওঠে। শিশু নিজের সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে তোলে। 'আমি করেছি', 'আমি বলেছি'—এই ভাবে তার অহং বোধের বিকাশ ঘটে। যে আত্মসচেতন জীব নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে সমর্থ, তিনিই ব্যক্তি। সুতরাং আত্মসচেতনতার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাই ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি।

শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশে উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যকে নিশ্চয়ই অবহেলা করা যায় না। উত্তরাধিকারসূত্রে ব্যক্তি যে বুদ্ধির অধিকারী, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে তার যথেষ্ট ভূমিকা আছে। কেননা প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা, স্মৃতি, সংরক্ষণের ক্ষমতা, অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিক্ষণের ক্ষমতা—সবই আসে বুদ্ধি থেকে। কিন্তু শিশু প্রকৃতি প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যতটুকুই হোক না কেন, সেই সীমার মধ্যেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশে পরিবেশের যথেষ্ট অবদান আছে। পরিবেশ বলতে যেমন খাদ্য, পানীয়, গৃহ, বিদ্যালয় এগুলিকে বোঝায় তেমনি বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবকেও বোঝায় যার সঙ্গে শিশু প্রত্যক্ষভাবে বা সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমে পরিচিত হয়। এই সব বিষয়ও শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

৭। পার্থক্যমূলক ব্যক্তিত্বের সংগঠনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া (Different reactions owing to differential personality structure) :

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে ও বিকাশে দুটি উপাদানের কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায়। একটি হল প্রকৃতিগত ও অপরটি হল পরিবেশগত। উত্তরাধিকারসূত্রে ব্যক্তি শারীরিক বা দৈহিক বৈশিষ্ট্য, মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য লাভ করে। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলির অন্তর্গত হল দৈহিক গঠন, উচ্চতা, মুখচোখের গড়ন, দেহের রঙ প্রভৃতি। মানসিক বৈশিষ্ট্য হল চিন্তা, বুদ্ধি, ইচ্ছা, কল্পনা ও মানসিক শক্তি প্রভৃতি। মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হল শিশুর মেজাজ বা মুড (mood)। ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত থাকে বিচিত্র সম্ভাবনা, অনন্ত শক্তি। তবে অনুকূল পরিবেশেই ব্যক্তির এই সম্ভাবনা ও শক্তি বাস্তবে রূপান্তরিত হয়। পরিবেশের সঙ্গে সফল সঙ্গতিবিধান ও সেই সঙ্গে নিজের শক্তি ও সম্ভাবনার সুষম সমন্বয়ের ফলেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এই পরিবেশ একাধারে প্রাকৃতিক ও একাধারে সামাজিক।

যেহেতু ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব উপরিউক্ত উপাদানগুলির ওপর নির্ভর, সেহেতু উপরিউক্ত উপাদানগুলির বৈষম্য হেতু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এই কারণেই একই পরিবেশে লালিত দুটি শিশুর ব্যক্তিত্ব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গঠিত হয় এবং তাদের প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক : দৈহিক গঠনের ওপর ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে নির্ভর করে। কাজেই দৈহিক বা শারীরিক ত্রুটিযুক্ত ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিত্বের বিকাশে প্রতিবন্ধক দেখা দেয়। মনোবিদ্ অ্যাডলার (*Adler*)-এর মতে শারীরিক ত্রুটিযুক্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ দেখা যায়। স্বাভাবিক ভাবেই এই সব ছেলেমেয়েদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় অন্যান্য সুস্থ স্বাভাবিক দৈহিক গঠনযুক্ত শিশুদের তুলনায় আচরণের বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়।

দেহের মধ্যে কতকগুলি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (ductless gland) আছে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশে সেগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেহ ও মনের সম্পূর্ণ বিকাশের পক্ষে এই গ্রন্থিগুলির উপযুক্ত ক্ষরণ একান্ত প্রয়োজনীয়। থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ ব্যাহত হলে শারীরিক এবং মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ব্যক্তির মধ্যে উৎসাহের অভাব, বিষণ্ণতা ও অবসন্নতা দেখা দেয়। থাইরয়েড গ্রন্থির

ক্ষরণ বৃদ্ধি পেলে ব্যক্তির মধ্যে চপলতা, উত্তেজনা ও মানসিক উদ্বেগ অধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে দৈহিক গঠনের তারতম্য হেতু ব্যক্তিত্বের সংগঠনে তারতম্য ঘটে এবং ব্যক্তির প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন হয়। বুদ্ধি হচ্ছে মানুষের জন্মগত শক্তি যা কম বা বেশী পরিমাণে প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধির পরিমাণ কতটুকু, ব্যক্তিত্বের গঠনে এই বিষয়টির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কেননা বুদ্ধি থেকেই আসে প্রত্যক্ষ করার সামর্থ্য ও বিষয়বস্তু মনে সংরক্ষণের ক্ষমতা। অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিখনের ক্ষমতা, পরিবেশের সঙ্গে উপযোজন, যা ব্যক্তির সামাজিকীকরণের জন্য, তার ব্যক্তিত্বের গঠন ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন, বুদ্ধির উপর তা অনেকাংশে নির্ভর করে। বর্তমানে বুদ্ধির পরিমাপের জন্য বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q) ব্যবহার করা হয়। ব্যক্তির প্রকৃত বয়স ও মানসিক বয়সের আনুপাতিক সম্বন্ধ হল বুদ্ধ্যঙ্ক এবং যে সব মানুষ স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০ ধরে নেওয়া হয়। বুদ্ধির সোপানের সর্বনিম্নে রয়েছে জড়ধী (Idiot)। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ২০ থেকে ২৪। এদের বাকশক্তি ও বোধশক্তি দুই-ই নেই বললেই চলে। কাজেই এদের সুসংগত ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রশ্নই ওঠে না। যারা ক্ষীণধী বা স্বল্পবুদ্ধি (moron), এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৫০ থেকে ৭০। এরা নতুন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে বা কোন জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে না। স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে উপরিউক্ত জড়ধী বা স্বল্পবুদ্ধির পার্থক্য সহজেই দৃষ্ট হবে এবং জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় তাদের প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন হবে। ব্যক্তির প্রকৃতিগত বা মেজাজের বৈষম্য হেতু তাদের ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেও বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়।

পরিবেশগত উপাদনের পার্থক্য হেতু ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সংগঠন ভিন্ন হয় এবং তার প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন হয়। পরিবারের সুস্থ ও মনোরম পরিবেশ শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে বিশেষভাবে উপযোগী। পরিবারের পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনদের কার্যকলাপ, চিন্তাধারা ও আদর্শ শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। পিতামাতা যদি শিশুকে স্বাধীনভাবে কর্ম করার সুযোগ দেন তাহলে শিশুর মধ্যে আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস, সাহস, স্বাধীনভাবে কর্ম করা ও চিন্তা করার ক্ষমতা দেখা দেয়, তার ফলে শিশু স্থির ব্যক্তিত্ব অর্জন করে। আবার অপরপক্ষে পিতামাতা যদি শিশুকে কেবল চোখে চোখে রাখতে চান, তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করা ও চিন্তা করার সুযোগ না দেন

তাহলে শিশুর মধ্যে এক দুর্বল ভীরু ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। আবার পিতামাতা যদি শিশুর প্রতি নির্মম ব্যবহার করেন বা পিতামাতা যদি খেয়ালী, উৎপীড়ক বা অত্যাচারী হন তাহলেও শিশু বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন, অসংযত, ভীরু, অসামাজিক ও রুক্ষ মেজাজের হয়ে থাকে। কাজেই গৃহের পরিবেশ যত মনোরম, যত স্বাস্থ্যকর, যত স্নেহপূর্ণ হবে, পরিবারের ছেলেমেয়েরা সেভাবেই ব্যক্তিত্ব অর্জন করবে। অনুরূপ ভাবে শিশুদের সদয় ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার সুসংগত ব্যক্তিত্ব অর্জনে সহায়তা করে এবং অপরপক্ষে শিক্ষকের কঠোর ব্যবহার, নির্মমতা শিশু মনকে বিদ্রোহী করে তোলে। সুতরাং বিদ্যালয়ের পরিবেশের পার্থক্যহেতু শিশুদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব দেখা দেয় এবং তাদের প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

সামাজিকীকরণ যথাযথ হল কি না হল তার উপরও ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের তারতম্য লক্ষিত হয়। সামাজিকীকরণ হল ব্যক্তি কিভাবে কতকগুলি সামাজিক কর্তব্য সন্তোষজনকভাবে সম্পাদন করবে তাই শিক্ষা করা। অর্থাৎ সামাজিকীকরণ হল সব রকমের অভিজ্ঞতা যার দ্বারা ব্যক্তি সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভ করে।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার অর্থ হল শিশুকে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জগতে অনুপ্রবিষ্ট করা। সংস্কৃতির সঙ্গে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের নিগূঢ় সম্পর্ক। সংস্কৃতির প্রভাব অনুযায়ী ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে তারতম্য ঘটে। এক এক ধরনের সংস্কৃতি এক এক ধরনের ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে। আবার কোন বিশেষ সমাজের সংস্কৃতি এমন যাতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণগুলির (traits) একেবারেই বিকাশ ঘটে না।

সামাজিকীকরণ দুধরনের হতে পারে—এক ধরনের সামাজিকীকরণ হল কোন একটি বিশেষ সমাজের মৌলিক সাংস্কৃতিক আদর্শের সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করিয়ে দেওয়া। পরিবারের সভ্যবৃন্দ বিশেষ করে পিতামাতা এই কার্য সম্পাদন করেন। শিশু তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে শেখে এবং সমাজের সংস্কৃতির দাবি অনুসারে ব্যক্তি বস্তুর প্রতি তার চিন্তামূলক এবং আবেগমূলক দৃষ্টিভঙ্গীকে সংগঠিত করতে শেখে। এখন যদি কোন কোন পিতামাতা শিশুর সামাজিকীকরণের ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ব পালন না করেন এবং কেউ যদি তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করেন তাহলে শিশুদের ব্যক্তিত্বের সংগঠনে অবশ্যই তারতম্য দেখা দেবে। দ্বিতীয় ধরনের সামাজিকীকরণের উৎপত্তি হয় শিশুর ব্যক্তিগত সামাজিক শিক্ষা থেকে। এই ধরনের শিক্ষা হচ্ছে প্রাক-সাংস্কৃতিক। এই শিক্ষা

সংস্কৃতির পরিসর-বহির্ভূত। শিক্ষণের অনেক সৃজনমূলক দিক এই ব্যক্তিগত সামাজিক শিক্ষণের পরিসর-অন্তর্ভুক্ত।

সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির যেমন দায়িত্ব আছে তেমনি প্রাথমিক গোষ্ঠী ভিন্ন অন্যান্য গোষ্ঠীগুলিরও দায়িত্ব আছে। সকলের যথাযথ দায়িত্ব পালনের উপরই শিশুর ব্যক্তিত্বের সঠিক বিকাশ সাধিত হয়। এই দায়িত্ব পালনের তারতম্যের উপরই শিশুর ব্যক্তিত্বের সংগঠনেরও তারতম্য দেখা দেয় এবং সে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিক্রিয়া করে।

যথাযথ সামাজিকীকরণের অভাবে কোন কোন শিশু অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব অর্জন করে। এই ধরনের ব্যক্তিরা আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, বাহ্যবস্তুর প্রতি উদাসীন ও আত্মসচেতন হয়, আবার যথাযথ সামাজিকীকরণের ফলে শিশুর ব্যক্তিত্ব এমনভাবে গড়ে ওঠে যে সে বাইরের জগতের কর্ম কোলাহলে অংশ গ্রহণ করতে চায়, অপরকে নিয়ে থাকতে ভালবাসে।

উপরের আলোচনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, ব্যক্তিত্বের সংগঠনের তারতম্য হেতু ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ায় পার্থক্য দেখা দেয়। মানুষের প্রতি ভালবাসাকেই সামাজিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্য বলে ধারণা করে। আবার অসামাজিক লোক আত্মস্বার্থের পরিতৃপ্তি নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তাত্ত্বিক ধরনের ব্যক্তি হল সত্যানুসন্ধানী, চিন্তাপ্রবণ বা মননশীল, কাজেই এদের প্রতিক্রিয়া এক ধরনের। হিসাবী ব্যক্তির ভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্বের সংগঠন; তার প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন ধরনের। জাগতিক প্রয়োজনের দিকেই এদের নজর। চিন্তাপ্রবণ ব্যক্তি একভাবে প্রতিক্রিয়া করে, আবার অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তি অন্যভাবে প্রতিক্রিয়া করে।

ব্যক্তিত্ব যদিও নানাধরনের উপাদানের উপর নির্ভর, ব্যক্তির সামাজিকীকরণের তারতম্য হেতু ব্যক্তিত্বের সংগঠনে যে তারতম্য দেখা দেয় তাও অস্বীকার করা চলে না।

৮। ব্যক্তিত্বগঠনে প্রকৃতি এবং পরিবেশের ভূমিকা (The role of Nature and nurture in the development of Personality) ঃ

ব্যক্তির ব্যক্তিত্বগঠনে প্রকৃতি এবং পরিবেশ, উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। আমরা এই অবদানের প্রকৃতি সম্পর্কে এবার আলোচনা করব। সামাজিকীকরণের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে সামাজিকীকরণের প্রভাব অনস্বীকার্য। কিন্তু তার ব্যক্তিত্বগঠনে বংশগতির

প্রভাবকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে সমাজবিদ্‌রা একথা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, বংশগতি (Heridity) ছাড়া কেবলমাত্র পরিবেশের প্রভাব ব্যক্তিত্বগঠনে এককভাবে অবশ্যম্ভাবী নয়। পিতামাতার কাছ থেকে সন্তান কিছু না কিছু শারীরিক ও মানসিক গুণাবলী পেয়ে থাকে। একই পরিবেশের মধ্যে দুটি শিশুকে সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হলেও তাদের ব্যক্তিত্বে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। উত্তরাধিকারসূত্রে শিশুটি যে গুণাবলী অর্জন করে, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা আপনা থেকেই বিকশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন শিক্ষকের কাছে অনেকগুলি ছাত্র পড়াশুনা করে এবং শিক্ষক মহাশয় সকলকে সমানভাবে দেখেন কিন্তু দেখা যায় তাদের মধ্যে কোন একটি ছাত্র যত তাড়াতাড়ি পড়াশুনা আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়, অপরে তা পারে না। অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধির জন্যই যে এটা ঘটে থাকে তা অস্বীকার করা চলে না। বুদ্ধির ব্যাপারে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে প্রভেদ বুদ্ধি পরিমাপ সম্পর্কীয় অভীক্ষাগুলি থেকেই তা জানা যায়। ব্যক্তির স্বভাবের (temperament) কথা ধরা যাক: মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন যে, দৈহিক গঠনের দিক থেকে বিচার করলে ব্যক্তির তিন ধরনের দৈহিক কাঠামো দেখতে পাওয়া যায়। আবার স্বভাবের দিক থেকে বিচার করলেও তিন ধরনের স্বভাব লক্ষ্য করা যায়। মনস্তত্ত্ববিদরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, এক ধরনের শরীর বা দেহ এক ধরনের স্বভাব বহনকারী। যাদের মধ্যে অলসতা এবং জড়তা দেখা যায় তারা সাধারণতঃ ধীরস্থির এবং উদাসীন হয়। হলুদ পিত্তরস যাদের শরীরে বেশী নিঃসৃত হয় তাদের মেজাজ সাধারণতঃ খিটখিটে হয় এবং কাল পিত্তরস যাহার শরীরে বেশী নিসৃত হয়, ফল তাদের স্বভাবের মধ্যে বিষণ্ণতার ছাপ দেখা যায়।

ব্যক্তিত্ব গঠনে প্রকৃতির ভূমিকা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে আর দু-চারটি কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক উপাদানগুলির মধ্যে প্রধান হল বংশধারা বা উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া কতকগুলি বৈশিষ্ট্য (hereditary factors), দ্বিতীয়তঃ, দৈহিক গঠন (Physique), তৃতীয়তঃ, অনালী বা রসক্ষরা গ্রন্থির ক্রিয়া (function of ductless glands)। পিতৃকোষের এবং মাতৃকোষের জিনগুলির পারস্পরিক মিলনের উপরই শিশুর বংশধারার স্বরূপ নির্ভর করে। এই জিনগুলিই শিশুর দৈহিক এবং মানসিক প্রকৃতি নির্ধারণ করে। ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, স্বভাবগত সব রকম সহজাত

বৈশিষ্ট্যই এই জিনসগুলির ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ব্যক্তির এই বৈশিষ্ট্যগুলি তিন প্রকার—শারীরিক বা দৈহিক বৈশিষ্ট্য, মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলির অন্তর্গত হল দৈহিক গঠন, উচ্চতা, মুখ-চোখের গড়ন, দেহের বর্ণ ইত্যাদি। অনালী গ্রন্থিগুলির ক্ষরণের ফলে যে দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য সূচিত হয় সেগুলিও এর অন্তর্ভুক্ত। মানসিক বৈশিষ্ট্য হল চিন্তা, বুদ্ধি, ইচ্ছা, কল্পনা ও মানসিক শক্তি প্রভৃতি। মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হল শিশুর মেজাজ বা মুড।

দেহের মধ্যে যেসব অনালী গ্রন্থি আছে ব্যক্তিত্বের বিকাশে সেগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অনালী গ্রন্থিগুলি রক্তের মধ্যে যে রস ক্ষরণ করে, সেই রস সমস্ত দেহের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। দেহের বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করা ছাড়াও দেহ ও মনের সম্পূর্ণ বিকাশের পক্ষে এই গ্রন্থিগুলির উপযুক্ত ক্ষরণ একান্ত প্রয়োজনীয়। থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ ব্যাহত হলে ব্যক্তির শারীরিক এবং মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়; ব্যক্তির মধ্যে উৎসাহের অভাব, বিষন্নতা ও অবসন্নতা দেখা দেয়। থাইরয়েড, পিটুইটারি এবং যৌনগ্রন্থির স্বাভাবিক ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হলে ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে সংগতি বিধান করার ক্ষমতা কমে যায়।

কিন্তু এমন মনে করা ভুল হবে যে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে কেবলমাত্র উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত গুণাবলীই এককভাবে কাজ করে। সামাজিক কাঠামো বা পরিবেশের প্রভাব কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখন প্রশ্ন হল—এই কাঠামো বলতে কি বুঝি? একটি সমাজের আদর্শ, নিয়ম, প্রথা, মূল্যবোধ প্রভৃতি এই সামাজিক কাঠামো তৈরি করে। প্রত্যেকটি সমাজই বিশেষ কতকগুলি মূল্যবোধ দ্বারা চালিত হয়। ব্যক্তিগত আচার-আচরণ এবং সমষ্টিগত আচার-আচরণ সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়। জৈবিক প্রয়োজন ছাড়াও মানসিক চাহিদা মেটাবার তাগিদেও মানুষকে নানারকম সংঘ বা সমিতি স্থাপন করতে হয়। প্রত্যেকটি সংঘ বা সমিতির কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও আচরণ লক্ষ্য করা যায়। যে সমস্ত বিধিনিষেধ সমাজে প্রচলিত সেগুলি সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করে এবং শিশুর সামাজিকীকরণের পথকে প্রশস্ত করে।

একটি শিশুর ক্ষেত্রে পরিবারের এবং সমাজের সংস্কৃতির প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। প্রত্যেকটি সমাজের মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে কাঠামো গড়ে ওঠে, একটি মানুষের ব্যক্তিত্বগঠনে তার প্রভাব অপরিসীম। সমাজভেদে এবং সামাজিক পরিবেশের বিভিন্নতার জন্যে ব্যক্তিত্বের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

অগবার্ণ বলেন—এমনকি বস্তুতান্ত্রিক সংস্কৃতিও ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে। ঘড়ির উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সময় নিষ্ঠার অভ্যাসও গড়ে ওঠে। একজন ইউরোপবাসীর সঙ্গে ভারতবাসীর নিয়মনিষ্ঠার ব্যাপারে যে পার্থক্য সূচিত হয় তার কারণ দুটি দেশের সংস্কৃতিগত পার্থক্য। কোন একটি সমাজের প্রথা, ধর্ম, শিল্প এবং দর্শন কতকগুলি মূল্যবোধের জন্ম দেয়। কোন কোন সংস্কৃতিতে প্রতিযোগিতার উপর আবার কোন কোন সংস্কৃতিতে সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশের জন্য ব্যক্তিত্বের বিভিন্নতা দেখা যায়। কমিউনিষ্ট এবং অ-কমিউনিষ্ট দেশের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য বর্তমান। ধর্মীয় জীবনের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন দেশের সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন ছাড়াও একই সমাজে বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠীগত সংস্কৃতির (subculture) পার্থক্য বিদ্যমান। অন্যান্য দেশের লোকদের সঙ্গে ভারতবাসীদের আচারে, ব্যবহারে, চালচলনে, ভাবের আদান-প্রদানে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, আবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষিত হয়। প্রত্যেক গোষ্ঠীরই কতকগুলি নিজস্ব শিক্ষাগত এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ খ্রীষ্টান, আদিবাসী এবং মুসলমানের মধ্যে গোষ্ঠীগত সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্যণীয় যা সেই গোষ্ঠীর সদস্যদের ব্যক্তিত্ব গঠনে বিশেষভাবে সহায়ক হয়।

একটি লোক যে বৃত্তি গ্রহণ করে সেই বৃত্তি তার ব্যক্তিত্বকে প্রভূত পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। ব্যক্তির বৃত্তি তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করে। আবার সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষেত্রেও তার বৃত্তির ভূমিকা কম নয়। যেমন, একজন স্কুল শিক্ষকের সামাজিক আচার-আচরণে যে বিশিষ্টতা প্রকাশ পায় তা অন্য বিশেষ কোন বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে দৃষ্টিকটু মনে হতে পারে। একজন চিকিৎসককে তার বৃত্তিতে এমন কতকগুলি আচার-আচরণ, বিধি-নিষেধ মানতে হয় যা অন্য বৃত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কাজেই ব্যক্তির বৃত্তির সঙ্গে তার জীবনধারার নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। এই বৃত্তিমূলক সংস্কৃতিরও ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে অবদান আছে।

শহর এবং গ্রাম্য-অঞ্চলের জীবনধারাও বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্ব গঠন করে। যার ফলে শহর ও গ্রামের ব্যক্তির চিন্তায় ও কাজে অনেক সময় পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। শিল্পভিত্তিক শহরে গতিশীলতা (dynamism) শহর অঞ্চলের

লোকেদের চালচলনে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও পার্থক্য স্থচনা করে। গ্রাম অঞ্চলে জমিজায়গা থাকার ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্যবহারের যে বিশিষ্টতা দেখা যায়, শিল্প অঞ্চলে শুধুমাত্র চাকুরি নির্ভর লোকেদের মধ্যে তা দেখা যায় না।

একটি লোক যে শ্রেণীভুক্ত সেই শ্রেণীর প্রভাবও তার জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। এজন্য উচ্চ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং বৃত্তহীন লোকেদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। উচ্চ মধ্যবিত্ত লোকেদের চালচলনে, সামাজিক আচার-আচরণে সর্বত্রই বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল বা কলেজ শিক্ষকের ব্যবহারে বিশেষ ধরনের সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; আবার বিত্তহীন চাষীর মনের ভাব প্রকাশে যে আবেগ প্রবণতা প্রকাশ পায় তা অন্য শ্রেণীর লোকদের মধ্যে স্বভাবতঃই দৃষ্ট হয় না। রাল্‌ফ লিমটন (*Ralph Limton*) মাদাগাস্কারে দুটি উপজাতির উপর সমীক্ষা করে দেখেছেন যে—তাদের চাষ করার পদ্ধতি তাদের বস্তুতান্ত্রিক জীবনেই কেবলমাত্র পরিবর্তন আনে নি, তাদের মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক জীবনেও পরিবর্তন এনেছে। আবার নৃতত্ত্ববিদেরা অন্যান্য উপজাতিদের সঙ্গে আরাপেস (*Arapesh*) উপজাতির চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বের পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে তার উপর পরিবেশের প্রভাব বিশেষ করে লক্ষ্য করেন। তাঁরা দেখেন, এই উপজাতি শিকার এবং চাষবাসের মাধ্যমে জীবন ধারণ করে। যে পার্বত্যসঙ্কুল অঞ্চলে তাদের বসবাস, বহিরাঞ্চলের আক্রমণ থেকে তা অনেকাংশে মুক্ত। খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাদের সমবেত প্রচেষ্টারও বিশেষ প্রয়োজন হয় নি। সে কারণে একদিকে তারা সংগঠিত হবার শক্তি লাভে যেমন অসমর্থ হয়েছে, তেমনি তাদের চরিত্রও প্রতিযোগিতামূলক হয় নি।

প্রত্যেক সমাজেরই, তা প্রাচীন বা আধুনিক যাই হোক না কেন, নিজস্ব কতকগুলি সামাজিক প্রথা বা সাংস্কৃতিক মূল্য আছে। এই সামাজিক প্রথা বা সাংস্কৃতিক মূল্যগুলি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান যেমন—বিবাহ, পরিবার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এবং সাংস্কৃতিক জীবনের যেমন—শিল্প, সাহিত্য এবং আইনের মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়। নৃতত্ত্ববিদরা (Anthropologists) মনে করেন যে, সাংস্কৃতিক মূল্য (cultural norms) এবং তার থেকে বিচ্যুতি (deviation) অর্থনৈতিক জীবনের উপর নির্ভর করে। এই অর্থ-নৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সম্পর্ক নৃতত্ত্ববিদরা

বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্য দেখিয়েছেন। যেমন—মাদাগস্কারের কোন একটি সমীক্ষায় দেখা যায় সেখানকার অধিবাসীরা একই সংস্কৃতিতে এবং অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে বিশ্বাসী। শুষ্ক ধান চাষ (dry rice cultivation) ছিল তাদের জীবনের উপজীবিকা। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও গণতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে সেচকার্যের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে ধান চাষের ক্ষেত্রে জলের ব্যবহারও তারা আয়ত্ত করে নিল (wet rice cultivation)। চাষের উন্নতির ফলে যখন উৎপাদন বৃদ্ধি পেল তখন সম্পত্তি সম্পর্কে অনেকেই সচেতন হয়ে উঠল। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠল এবং সমাজে উচ্চ এবং নিম্নশ্রেণীরও জন্ম হল। অর্থনৈতিক পরিবর্তন এইভাবে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানসিক বৃত্তি গঠনে নিয়ামক হিসেবে কার্য করেছে।

তবে আমরা নিশ্চয় একথা বলতে পারিনা যে—অর্থনৈতিক দিকই একটি গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। অন্যান্য সমাজে দেখা গেছে যে, একটি পরিবারের গঠন, স্ত্রীজাতির সামাজিক মর্যাদা ও বিবাহ পদ্ধতিও অর্থনৈতিক কাঠামোকে প্রভাবিত করে। কাজেই বোঝা যায়, সামাজিক বিভিন্ন দিকগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং একটি ব্যক্তিত্ব গঠনে কোন একটি সামাজিক পরিবেশকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলা চলে না। এলিজাবেথ হারলক (*Elizabath B. Hurlock*) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রভাব ব্যক্তিজীবনে কতখানি প্রবল তা প্রমাণ করার জন্য আমেরিকা ও ফ্রান্সের উদাহরণ দিয়েছেন। আমেরিকা ও ফ্রান্সের শিশুদের সমীক্ষায় দেখা গেছে, দুটি দেশের শিশুরা যদিও মূলগত ভাবে একই রকম ব্যক্তিত্ব অর্জ্জনে সক্ষম; তবুও তাদের মধ্যে পার্থক্যও দৃষ্ট হয়; কারণ হল দুটি দেশের মূল্য সম্পর্কে সামাজিক চিন্তাধারার বিভিন্নতা। ফরাসী শিশুরা অধিক মাত্রায় পিতামাতার উপর নির্ভরশীল, পক্ষান্তরে আমেরিকার শিশুরা অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করে। আমেরিকার শিশুরা যত তাড়াতাড়ি দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম, ফরাসী শিশুদের ক্ষেত্রে তা অকল্পনীয়।

কাজেই দেখা যায়, ব্যক্তিত্ব গঠনে জন্মসূত্রে অর্জিত গুণাবলী ও পরিবেশ উভয়েরই প্রভাব সমান গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলনী

১। ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ নিরূপণ কর (**Indicate the relation between Individual and Society**)।

২। ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতির সম্বন্ধ নিরূপণ কর (Indicate the relation between Individual, Society and Culture)।

৩। কিভাবে তুমি প্রমাণ করতে পার যে ব্যক্তি সমাজে সৃষ্ট ? (How can you prove that individual is a social product ?)

৪। শৈশবে শিশুকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিণাম কি হয়, উদাহরণের সাহায্যে দেখাও (Show the effects of isolation from society in childhood with suitable examples)।

৫। শিশুর সামাজিকীকরণ কিভাবে ঘটে দেখাও। (Show how the socialisation of the child is effected)।

৬। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের ভূমিকা নিরূপণ কর (Indicate the role of socialisation in the development of the personality of the child)।

৭। ব্যক্তিত্বের পার্থক্যমূলক সংগঠনের জন্য কিভাবে শিশু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিক্রিয়া করে দেখাও (Show how children react differently owing to differential personality structure)।

৮। ব্যক্তিত্বের বিকাশে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভূমিকা বর্ণনা কর (Describe the role of nature and nurture in the development of personality)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানুষ সমাজে কিভাবে বসবাস করে

(How people live in Societies)

১। ভূমিকা (Introduction) :

সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের একটি জটিল জাল। সমাজের সদস্যদের পারস্পরিক আচরণের দ্বারাই সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এভাবে পরস্পরের চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্কের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। পশুজগতের সঙ্গে মানবসমাজের মূলগত পার্থক্য হল, পশু জগতের চাহিদা জৈবিক চাহিদাতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু নিছক জৈবিক প্রয়োজনই যদি মানব সমাজকে বেঁধে রাখতে সমর্থ হোত তাহলে পৃথিবী স্থিতিশীল (Static) হয়ে পড়ত এবং প্রগতির দ্বারও রুদ্ধ হয়ে যেত। তাই জৈবিক চাহিদা বা প্রয়োজন ছাড়াও রয়েছে মানুষের মানসিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন বা চাহিদা। সমাজবহির্ভূত কোন ব্যক্তির পক্ষে উপরি-উক্ত প্রয়োজনগুলি পরিপূরিত হওয়া সম্ভব নয়। সামাজিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই তার নানাবিধ চাহিদার প্রকাশ। তবে এ কথাও ঠিক নয় যে, মানব সমাজ কেবল চাহিদা মেটাবার যন্ত্র বিশেষ। নিজের বাঁচার জন্য এবং মানসিক বিকাশসাধনের জন্য ব্যক্তির চাহিদার যেমন শেষ নেই, তেমনি অপরের চাহিদা বা প্রয়োজন মেটাবার আনন্দও তার কম নয়। এইভাবে পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা, সহানুভূতি এবং সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা সুষ্ঠ, সহজ ও সুন্দর জীবনযাত্রার পক্ষে একান্ত অনিবার্য। কিন্তু সামাজিক সম্পর্কের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, সমাজের সকলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সব সময় যে মধুর বা সহানুভূতিমূলক হয়, তা নয়। সদস্যদের মধ্যে এমন সম্পর্কও গড়ে ওঠে যা ব্যক্তিগত তথা সামাজিক জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই একদিকে যেমন সহযোগিতা ও সমঝোতার মত সংযোগকারী (associa-tive) সম্পর্কও দেখা যায়, অপরদিকে প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, ও শত্রুতার মত বিযুক্তকারী (dissociative) সম্পর্কও দৃষ্টিগোচর হয়। এইভাবে বিপরীতমুখী উভয় সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেই মানুষ সমাজে বসবাস করে। শরীর থাকলে রোগের জন্ম হবেই, তা বলে শরীরের অস্তিত্ব যেমন নষ্ট করা চলে

না, সে রকম বিযুক্তকারী (dissociative) সম্পর্ক গড়ে উঠবে বলে—সমাজকে ধ্বংস করাও চলে না। সমাজবিদ্যার স্বাতন্ত্র এইখানেই। সমাজবিদ্যা সামাজিক সম্পর্ক নিরূপণে একদিকে যেমন সংযোগকারী সম্পর্কের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে, অপরদিকে বিযুক্তকারী সম্পর্কের সামাজিক মূল্যও নিরূপণ করে। এইভাবে বিপরীতধর্মী দুই সম্পর্কের মধ্যেই সমাজের ব্যক্তিরা বসবাস করে। এই দুই ভিন্ন ধরনের সম্পর্কের বিচার-বিশ্লেষণ সমাজবিদ্যার কাজ।

২। সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়া (Social Processes) :

কত প্রকারের সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়া (Social processes) আছে সেই সম্পর্কে সমাজবিদ্‌দের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অনেক সমাজবিদ্ মনে করেন যে, একশতেরও অধিক সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়ার অস্তিত্ব সমাজে দেখা যায়। কয়েকজন সমাজবিদ অবশ্য এই অভিমতকে সমর্থন করতে পারেন না। তাঁদের মতে সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়াকে দুটি বিভাগে ভাগ করাই সমীচীন, একটি হল সংযোগকারী (conjunctive) এবং অপরটি হল বিযুক্তকারী (disjunctive)। কিন্তু বর্তমানে উপরিউক্ত দুটি মত সকলের স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হয়নি। পার্ক এবং বার্জেস (*Park and Burges*) নিম্নলিখিত সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়াগুলিকে মুখ্য বলে বিবেচনা করেছেন। যথা—

(১) প্রতিযোগিতা (Competition)

(২) দ্বন্দ্ব (Conflict)

(৩) উপযোজন (Accommodation)

(৪) আত্তীকরণ (Assimilation)

মার্টন এবং ম্যাকাইভার (*Murton and MacIver*) উপরিউক্ত চার প্রকারের সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়া ছাড়াও সহযোগিতাকেও (Co-operation)-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এর মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্বকে বিযুক্তকারী (disjunctive) এবং উপযোজন, আত্তীকরণ ও সহযোগিতাকে সংযোগকারী (Conjunctive) সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়ার মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে।

এখন আমরা উপরিউক্ত পাঁচ প্রকার সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়ার স্বরূপ এবং তাদের সমাজতাত্ত্বিক ভূমিকার বিষয় নীচে বিস্তারিত আলোচনা করব।

(১) **সহযোগিতা (Co-operation) :** সহযোগিতা হল এমন একটি সামাজিক সম্পর্ক যার দ্বারা দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একটি যৌথ উদ্দেশ্যে

সমবেতভাবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি কলেজের সকল শিক্ষকের উদ্দেশ্য হল যথাযথভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করে শিক্ষার উচ্চমান বজায় রাখা এবং সমাজে সম্মানসূচক মর্যাদা রক্ষা করে চলা। শিক্ষকরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করেই এ কাজ করতে পারে। কিন্তু যদি দেখা যায় তাদের মধ্যে কোন একজন শিক্ষক শিক্ষার মান বজায় রাখার ব্যাপারে উদাসীন, সামাজিক মর্যাদার প্রতি সচেতন নন্ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি শৃঙ্খলা রক্ষা করা অপেক্ষা শৃঙ্খলা ভঙ্গেই আগ্রহী, তাহলে এটাই সত্য যে তিনি অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক নন্। একটি দেশের সরকার তখনই সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয় যখন শাসক এবং শাসিতের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন দৃঢ় হয়। যখন শাসিতের দল কোন সরকারের কাজকর্মে অসন্তুষ্ট হয়ে সেই সরকারের পরিবর্তন চায় তখন স্বভাবতঃই তারা সেই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায় না এবং তার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে। ব্রিটিশ আমলে সরকারের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ভারতবাসীরা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগিতামূলক আন্দোলনের করতে বাধ্য হয়। এসব আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, সহযোগিতা তখনই দৃঢ় হয় যখন একটি যৌথ উদ্দেশ্য থাকে এবং দ্বিতীয়তঃ, যখন সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সংগঠিত প্রচেষ্টা গড়ে ওঠে। তাই সমাজবিদ্ ফেয়ার-চাইল্ড(*Fairchild*) মন্তব্য করেছেন যে. "সহযোগিতা হল এমন এক সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী যৌথভাবে কাজ করে—যৌথ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য, তাতে সংগঠন কম বা বেশী জোরালো হোক না কেন।"

সহযোগিতার সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে সমাজবিদরা মন্তব্য করেছেন যে, সমাজের স্থায়িত্ব পুরোপুরি নির্ভর করে যখন পুরুষ এবং নারীজাতি পারস্পরিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। সন্তানের জন্ম এবং লালনপালনেও স্বামী-স্ত্রীর সহযোগিতার প্রয়োজন। এমনকি একটি শিশুর সামাজিকীকরণ এবং তার অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশসাধনও পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব হয় না। শুধু পরিবারেই কেন, পরিবারের বাইরেও সহযোগিতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিক্ষাজীবনে শিক্ষক ও অন্যান্য সহপাঠীদের সহযোগিতা-মূলক আচরণ শিশুর শিখন ক্রিয়া সহজতর করে তোলে। শিক্ষাশেষে যখন সে বৃহৎ কর্মজীবনে প্রবেশ করে তখন সহকর্মীদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করার জন্য তাকে এগিয়ে যেতে হয়। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর বিবাহিত

জীবন কখনই সুখী হতে পারে না যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা না করে অসহযোগিতামূলক কাজে লিপ্ত হয়। ব্যক্তির জৈবিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন অপরের সহযোগিতা ছাড়া পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। দ্বন্দ্ব সামাজিক প্রগতিতে উৎসাহ যোগায় ঠিকই, তবে প্রগতি কখনও সম্ভব হয় না যদি না সহযোগিতা ও দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়।

সাধারণ স্বার্থ (Common Interest)-কে কেন্দ্র করে সহযোগিতামূলক ক্রিয়া বা আচরণের সূচনা হতে পারে। ম্যাকাইভার ও পেজ (*MacIver and Page*) বলেন, "সাধারণ স্বার্থের কথা আমরা তখনই বলব যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোন একটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য লাভ করতে চায় যা তাদের সকলের পক্ষে এক ও অবিভাজ্য এবং তাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক লক্ষ্যের সমষ্টি নয় বরং এমন এক লক্ষ্য যা তাদের সকলকে একত্রিত করে। ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ভিন্ন ; কিন্তু সাধারণ স্বার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। স্বার্থের অভিন্নতা ও অবিভাজ্যতাই একটি লক্ষ্যকে সাধারণ স্বার্থে পরিণত করে। সাধারণ স্বার্থের জন্যই সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সক্রিয়তা দেখা যায়। বিভিন্ন প্রচেষ্টার তুলনায় যৌথ প্রচেষ্টা অধিকতর কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হয়—এই ধারণা গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি করে। আবার অভিন্ন স্বার্থের প্রকৃতি এমন যে, এটি সমধর্মী ব্যক্তিদের মধ্যে এক ঐক্যবোধ উদ্রেক করে যা তাদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বন্যাপীড়িত লোকদের দুঃখ দুর্দশা দূর করার জন্য সংঘ গঠন করা হল। এক্ষেত্রে বন্যাপীড়িত ব্যক্তিদের সেবাকার্য সংঘের সভ্যদের সাধারণ স্বার্থ হওয়াতে, সহযোগিতামূলক মনোভাব সকলের মধ্যে দেখা দিল।

অনুরূপ স্বার্থ (Like Interest)-কে কেন্দ্র করেও সহযোগিতা দেখা দিতে পারে। অনুরূপ স্বার্থ বলতে বোঝায় সেই স্বার্থ যা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের কাছে পৃথক। অনেক সময় বিভিন্ন ব্যবসায়ীর স্বার্থ ব্যক্তিগতভাবে পৃথক, কিন্তু সরকারের কাছ থেকে বিশেষ কোন সুবিধা আদায় করার জন্য, যা হয়ে পড়ে তাদের কাছে অনুরূপ স্বার্থ, তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে।

আবার, কোন বড় রকমের প্রতিযোগীকে পরাজিত করা—এই অনুরূপ স্বার্থের পরিপূরণের জন্যও বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি হয়ত পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা

করতে পারে। প্রতিযোগীরা নিজ নিজ মালের চাহিদা বাড়াবার জন্য, উপাদানের ও শ্রমের সংগ্রহ-মূল্য হ্রাস করার জন্যে সহযোগিতা করতে পারে। এ সবই হল অনুরূপ স্বার্থের জন্য সহযোগিতা করার দৃষ্টান্ত।

এই দুই ধরনের সহযোগিতার সামাজিক তাৎপর্য খুবই ব্যাপক। সাধারণ স্বার্থের ক্ষেত্রে স্বার্থ পরিপূরণ এবং সহযোগিতার মনোভাব অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত, কেননা সহযোগিতা ভিন্ন ঐ ধরনের স্বার্থ পরিপূরণ করা সম্ভব নয়। সাধারণ স্বার্থ থেকে যে সহযোগিতার উদ্ভব হয় তা সব সময় সাফল্যের উপরে নির্ভর করে না। ব্যর্থতাও অনেক সময় সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে। যখন কোন ধর্মসম্প্রদায় অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের দ্বারা নিগৃহীত হয় তখন প্রথম সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে নিগ্রহ থেকে রক্ষা পাবার জন্যই পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে। কিন্তু অনুরূপ স্বার্থের ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়টি বা মনোভাবটি ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনার ফল। এই জাতীয় সহযোগিতার স্থায়িত্ব তুলনামূলকভাবে কম, কেননা এই ধরনের সহযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রাধান্য লাভ করে। সহযোগিতার দ্বারা লক্ষ্য সিদ্ধ হবে এই মনে করে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি যখন নিজ নিজ স্বার্থের মধ্যে অস্থায়ীভাবে সংগতি বিধান করতে পারে তখনই সহযোগিতা সম্ভব হয়। যখন ব্যক্তিগত স্বার্থের চেতনা প্রাধান্য লাভ করে তখন এই সংগতি বিধান সম্ভব হয় না, ফলে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রবণতা মন থেকে অন্তর্হিত হয়।

পারস্পরিক সহযোগিতা ভিন্ন মানুষ সংঘবদ্ধ হতে পারে না। হয় সাধারণ স্বার্থ কিংবা অনুরূপ স্বার্থ অনুসরণ করার জন্য মানুষকে সহযোগিতা করতে হয়। সমাজজীবনে এই সহযোগিতার প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়।

সহযোগিতার শ্রেণী বিভাগ করতে গিয়ে তাকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

(i) প্রত্যক্ষ সহযোগিতা (Direct Co-operation) : সেই সব ক্রিয়াই প্রত্যক্ষ সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত, যে ক্ষেত্রে মানুষ কোন অনুরূপ বিষয় একত্র সম্পাদন করে ; যেমন একত্র ক্রীড়া করা, একত্র ভূমি- কর্ষণ করা, একত্র কোন কার্য-সম্পাদনের জন্য পরিশ্রম করা ইত্যাদি। এইসব সংঘবদ্ধ কাজের ক্ষেত্রে, সকলের কাজই যে একই ধরনের তা নয়, কিন্তু আসল কথা, যে কাজ বিভিন্ন ব্যক্তি একসঙ্গে পরস্পরের সহযোগিতায় সম্পাদন করছে, সেগুলি তারা পৃথক পৃথক ভাবেও সম্পাদন করতে সক্ষম। তবু একসঙ্গে সম্পাদন করার কারণ

হল, পরস্পরের নিবিড় মুখোমুখি হয়ে কাজ করার বিষয়টি কাজে প্রেরণা যোগায় বা নানা ধরনের সামাজিক তৃপ্তি এনে দেয়। যখন কোন কাজ ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদন করতে গেলে ব্যক্তিকে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, তখন সমবেতভাবে কাজ করার মনোভাব ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা দেয় এবং তখনই আমরা প্রত্যক্ষ সহযোগিতার দৃষ্টান্তের পরিচয় পাই।

(ii) **পরোক্ষ সহযোগিতা (Indirect Co-operation) :** সে-সব ক্রিয়াই পরোক্ষ সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত, যে-সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কর্ম সম্পাদন করে। কোন কলকারখানায়, যেখানে শ্রমবিভাগের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে এই জাতীয় সহযোগিতার দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই।

এই ধরনের পরোক্ষ সহযোগিতার দৃষ্টান্ত আমরা পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের কাজের মধ্য দিয়ে পেয়ে থাকি। এই ধরনের সহযোগিতা তখনই দৃষ্ট হয় যখন বিভিন্ন ব্যক্তি কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার বা পারস্পরিক সন্তোষ লাভের জন্য নিজ নিজ পার্থক্য ভুলে গিয়ে সমবেতভাবে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে। কলকারখানায়, সরকারী দপ্তরখানায়, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে বা আমোদপ্রমোদ সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে এই ধরনের সহযোগিতা দেখা যায়।

বর্তমানে প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। কেন না, প্রযুক্তিবিদ্যাগত কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের কর্মদক্ষতা ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন। এর ফলে প্রত্যক্ষ সহযোগিতার স্থান দখল করছে পরোক্ষ সহযোগিতা। সহযোগিতা আবার প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন হতে পারে। যথা—

প্রকাশ্য সহযোগিতা : সেই সব কাজ প্রকাশ্য সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয় যখন সমাজস্থ ব্যক্তিরা কোন সাধারণ লক্ষ্য সিদ্ধ করার জন্য প্রকাশ্যে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে। যেমন, কোন সামাজিক দুর্নীতি দূর করার জন্য কিছু ব্যক্তির সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করা।

প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা : যখন বাহ্যতঃ দ্বন্দ্বের ভাবটি সুপরিস্ফুট, কিন্তু তার অন্তরালে সহযোগিতার ভাবটি বিদ্যমান, তখন সেই সহযোগিতা হল প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা। আইনসভায় বিরোধী দল যখন শাসক সম্প্রদায়ের কাজের সমালোচনা করেন তখন বাহ্যতঃ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলেও তারা প্রচ্ছন্নভাবে সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

(২) **প্রতিযোগিতা (Competition) :** প্রতিযোগিতা বলতে আমরা কি বুঝি? প্রতিযোগিতা হল এক ধরনের বিরোধ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যেক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, পরস্পরের কোন কাম্য বস্তু বা লক্ষ্যকে লাভের জন্য সংগ্রাম বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রতিযোগিতা হল সামাজিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি মৌলিক রূপ। মানুষের চাহিদার তুলনায় তার যোগান সীমিত হলেই এই প্রতিযোগিতা আমাদের সমাজে জাগতিক দ্রব্য, ক্ষমতা, সামাজিক মর্যাদা, খ্যাতি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে দেখা দেয়। এ ছাড়াও অন্যান্য আরও অনেক কিছুর জন্যেই প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়।

অনেক সমাজবিদ্ প্রতিযোগিতার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। সুদারল্যাণ্ড (*Sutherland*) বলেন যে, ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে অথবা গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীর মধ্যে কোন একটি জিনিসের সীমিত সরবরাহের দরুণ যে স্বতঃস্ফূর্ত এবং অবিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ দেখা দেয় এবং যা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, তাই হল প্রতিযোগিতা। অপর একজন সমাজবিদ্ প্রতিযোগিতার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেন যে, যখন কোন একটি জিনিসের প্রতি অনেকের আগ্রহ থাকে কিন্তু জিনিসটির সরবরাহ বা যোগান যদি সীমিত হয় তখন যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়, তাই হল প্রতিযোগিতা। সমাজবিদ ফেয়ারচাইল্ড (*Fairchild*) এবং বোগারডাস (*Bogardas*) বলেন যে, কোন একটি জিনিসের যদি প্রাচুর্যের অভাব থাকে তখন যে-সব ব্যক্তি সেই বস্তুটি লাভ করতে ইচ্ছুক তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উপরিউক্ত সংজ্ঞা ও বর্ণনাগুলি থেকে প্রতিযোগিতার স্বরূপ বোঝা যায়। প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য হল—কোন একটি জিনিস সরবরাহ করা যার যোগান সীমাবদ্ধ। জলের এবং বাতাসের জন্য কোন প্রতিযোগিতা গড়ে ওঠে না, কারণ এদের সরবরাহ বা যোগান সীমাবদ্ধ নয়।

প্রতিযোগিতা দ্বন্দ্বে পরিণতি লাভ করতে পারে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কতকগুলি নিয়ম আছে যা সব প্রতিযোগীদের মেনে চলতে হয়। ছলনা, প্রতারণা, অসদুপায়ে অভীষ্ট সিদ্ধ করা প্রভৃতি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বর্জন করে চলতে হবে। সদুপায়েই প্রতিযোগীদের তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে হবে। যখন প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত উপরিউক্ত নিয়মগুলিকে মেনে চলে না, তখন প্রতিযোগিতা দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়। প্রতিযোগিতা নৈর্ব্যক্তিক, কেননা প্রতিযোগিতায় দৃষ্টি থাকে লক্ষ্যের দিকে, অপর প্রতিযোগীর দিকে নয়, অর্থাৎ ব্যক্তির দিকে নয়। কিন্তু প্রতিযোগিতা যখন নৈর্ব্যক্তিক থাকে

না এবং পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার ভাব দেখা দেয় তখনই দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। অগবার্ন-নিমকফের ভাষায় তখনই শত্রুতামূলক প্রতিযোগিতা (antagonastic competition) দেখা দেয়।

এই কারণে কোন কোন সমাজবিদ্ প্রতিযোগিতাকে পরোক্ষ দ্বন্দ্ব (indirect conflict) নামে আখ্যাত করেন।

প্রতিযোগিতার প্রকৃতি (Nature of Compitition) : নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিযোগিতার প্রকৃতি নিরূপণ করে।

প্রথমতঃ, প্রতিযোগিতা কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক (personal) বিষয় নয়। সংঘাত এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে মূলগত পার্থক্য হল যে, সংঘাত হল ব্যক্তি-কেন্দ্রিক--কিন্তু প্রতিযোগিতা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। প্রতিযোগীদের দৃষ্টি থাকে লক্ষ্যের বা কাম্য বস্তুর দিকে, যারা প্রতিযোগিতা করছে তাদের দিকে নয়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিযোগিতার প্রকৃতি হল যে, এটি একটি অবিচ্ছিন্ন কার্য-প্রক্রিয়া। প্রতিযোগিতার কোন শেষ নেই। মানুষের যেমন ধনরত্ন লাভের ইচ্ছার কোন শেষ নেই, সেরকম প্রতিযোগিতারও কোন শেষ নেই।

তৃতীয়তঃ, প্রতিযোগিতার সার্বজনীনত্বকে অগ্রাহ্য করা যায় না। প্রতি-যোগিতা একটি সার্বিক ব্যাপার। প্রত্যেক সমাজে এবং সবরকম শ্রেণীর লোকের মধ্যেই প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। যেমন—ছাত্র, উৎপাদনকারী মালিক, শ্রমিক এবং শিল্পী—এককথায় সব শ্রেণীর লোকের মধ্যেই প্রতিযোগিতা দেখা যায়।

চতুর্থতঃ, বিষয়কে কেন্দ্র করেই প্রতিযোগিতা দেখা দেয়, ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে নয়।

পঞ্চমতঃ, নিয়ন্ত্রণহীন প্রতিযোগিতা (unrestricted competition) বলে কিছু নেই। কিংসলে ডেভিস বলেন, 'নিয়ন্ত্রণহীন প্রতিযোগিতা' কথা দুইটির মধ্যেই বিরোধ লক্ষ্য করা যায়।

ষষ্ঠতঃ, কোন সাংগঠনিক ব্যাপারেই প্রতিযোগিতা বর্জিত হতে পারে না। কোন না কোন ভাবে প্রতিযোগিতা দেখা দেবেই।

সপ্তমতঃ, ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর প্রত্যাশাকে বর্দ্ধিত করে, ব্যর্থতাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে, সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপাদান সৃষ্টি করে প্রতিযোগিতা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে প্রণোদিত করে। এই কারণে জটিল এবং পরিবর্তনশীল সমাজে প্রতিযোগিতা এত প্রবল।

প্রতিযোগিতার শ্রেণীভেদ: বিভিন্ন প্রকারের প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য:

(১) অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা (Economic Competition): অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদনে এবং ভোগ্য বস্তুকে ভিত্তি করে এই ধরনের প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়।

(২) সামাজিক প্রতিযোগিতা (Social Competition): সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য সমাজে যে প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায় তা এই শ্রেণীভুক্ত।

(৩) জাতিগত প্রতিযোগিতা (Racial Competition): কৃষ্ণকায় এবং শ্বেতকায়দের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা এই পর্যায়ভুক্ত।

(৪) সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (Cultural Competition): বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

(৫) রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা (Political Competition): রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে এবং দলের সদস্যদের মধ্যে এই ধরনের প্রতিযোগিতা দেখা যায়। এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়।

উপরিউক্ত প্রতিযোগিতার প্রকারভেদ ছাড়াও আরও দুই ধরনের প্রতিযোগিতার মধ্যে অনেকে পার্থক্য করে থাকেন। একটি ব্যক্তিগত এবং অপরটি গোষ্ঠীগত। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু শেষোক্ত ধরনের সহযোগিতা কেবল গোষ্ঠীর মধ্যেই বিরাজ করে, ব্যক্তিগত সদস্যদের মধ্যে নয়।

সমাজে প্রতিযোগিতার ভূমিকা: প্রতিযোগিতা সমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ব্যাসাঞ্জ এবং ব্যাসাঞ্জ (*Biasanz and Biasanz*) বলেন "যখন সহযোগিতা কোন একটি কাজের সুষ্ঠভাবে সম্পাদনে সহায়তা করে তখন প্রতিযোগিতা স্বীকৃতি দেয় যে, তাহা আরও ভালভাবে সম্পাদন করা যায়।"

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীরা একই মত ব্যক্ত করে বলেন যে, প্রতিযোগিতা আছে বলেই ভোগ্যবস্তু অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হয়। তবে সমাজবিদ্ রাও একথা বলেন যে, প্রতিযোগিতা কোন সময়েই নিয়ন্ত্রণহীন হওয়া উচিত নয়, তাহলে প্রতিযোগিতার খারাপ দিকগুলি তার ভাল দিকগুলিকে নষ্ট করে

ফেলে। তাই বোগারডাস (*Bogardus*) ঠিক কথাই বলেছেন—"প্রতিযোগিতা নিয়মানুসারে দ্বন্দ্বে পরিণতি লাভ করে।"

সমাজের উপর প্রতিযোগিতার ভাল-মন্দ উভয় ধরনের প্রভাবই পরিদৃষ্ট হয়। **প্রথমতঃ**, সমাজে প্রতিযোগিতা থাকার জন্যই ব্যক্তির দক্ষতা, কর্মকুশলতা ও সৃজনীশক্তির প্রকাশ ঘটে। ব্যক্তির উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিচিত্রভাবে আত্ম-প্রকাশ করে নানাভাবে সমাজজীবনের সমৃদ্ধি ঘটায়। **দ্বিতীয়তঃ**, প্রতিযোগিতা সমাজকে গতিশীল করে তোলে, সমাজে প্রতিযোগিতা না থাকলে সমাজ একটি জায়গায় স্থির হয়ে থাকতো। **তৃতীয়তঃ**, মর্যাদানুসারে ক্রমবিন্যস্ত সমাজে প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা ও অবস্থান নিরূপিত হয়। **চতুর্থতঃ**, প্রতিযোগিতা ব্যক্তির 'অহং' ভাবের প্রসারতা ঘটায় এবং তার মনে সন্তোষ আনে। প্রতিযোগিতার সাফল্য ব্যক্তির মানসিক তৃপ্তিসাধন করে তাকে আরও আন্তরিক ভাবে কর্ম সম্পাদনে প্রণোদিত করে। **পঞ্চমতঃ**, গিডিংস্ (*Giddings*)-এর মতে প্রতিযোগিতা ব্যক্তি বিশেষের বা গোষ্ঠী বিশেষের হাতে অযৌক্তিক ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে দেয় না। **ষষ্ঠতঃ**, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগীদের কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়। তার ফলে সাধারণভাবে নিয়ম মেনে চলার প্রবণতা সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে সৃষ্টি হয়, যা পরোক্ষভাবে সমাজের সংগতি আনার ব্যাপারে সহায়ক হয়।

তবে প্রতিযোগিতার মন্দ দিকও আছে। প্রতিযোগিতা দ্বন্দ্বের বা সংঘাতের সৃষ্টি করে, যা গোষ্ঠী সংহতিকে ব্যাহত করে। পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা একচেটিয়া অধিকার সৃষ্টি করতে পারে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা বা পরাজয় প্রতিযোগীর মনে নৈরাশ্য বোধের সংঞ্চার করে তার উদ্যমকে বিনষ্ট করতে পারে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জয়লাভের তীব্র আকাঙ্খা প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত নিয়মগুলিকে লঙ্ঘন করার মনোভাব সৃষ্টি করে এবং এর ফলে সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। কিংসলে ডেভিস্ বলেন, প্রতিযোগিতা প্রাচুর্যের মধ্যে অভাব সৃষ্টি করতে পারে, ভীতি, অ-নিরাপত্তা, অস্থিরতা এবং উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে। প্রতিযোগিতা অপরকে লক্ষ্য রূপে গ্রহণ না করে, উপায়রূপে গণ্য করে। প্রতিযোগিতার নিজস্ব ধরনই হল অনুভূতি বর্জিত হওয়া। নিয়ন্ত্রণহীন প্রতিযোগিতা একচেটিয়া ভোগবৃত্তির জন্ম দেয় এবং শক্তিমানের জয় দুর্বলের উপরে এমন প্রভাব বিস্তার করে ও সমাজে এমন বৈষম্যের সৃষ্টি করে যাতে সমাজের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। তাছাড়া,

সমাজের সর্ব স্তরে প্রতিযোগিতার প্রয়োজন আছে বলেও অনেকে মনে করেন না। অনেকে মনে করেন, শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মনোভাব শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে বাধার সঞ্চার করে।

(৩) **দ্বন্দ্ব (Conflict) :** দ্বন্দ্ব মানব সমাজের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। এমনও বলা যেতে পারে যে, দ্বন্দ্ব মানব সমাজের একটা অংশ। দ্বন্দ্ব নানাভাবে, বিভিন্ন মাত্রায় এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের প্রতিটি স্তরে নিজেকে প্রকাশ করে। দ্বন্দ্বের প্রকাশের একটা ধরন আছে, কিন্তু পরিবর্তনশীল সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তারও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ম্যাকাইভার এবং পেইজ্ সামাজিক দ্বন্দ্বের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন, 'সেই সব ধরনের ক্রিয়াই সামাজিক দ্বন্দ্বের অন্তর্ভুক্ত, যে-সব ক্ষেত্রে কোন লক্ষ্য লাভের জন্য মানুষ পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে।

ম্যাকাইভার ও পেইজ দ্বন্দ্বকে দুভাগে ভাগ করেছেন—**প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দ্বন্দ্ব**। যখন একাধিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোন লক্ষ্য লাভ করার জন্য বিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করে, বিপক্ষকে প্রকাশ্যভাবে বাধা দেয়, বিপক্ষকে আঘাত করে, বা ধ্বংস করে তখন প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, যেমন—মামলা, বিতর্ক, বিপ্লব, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা, সশস্ত্র যুদ্ধ ইত্যাদি। যখন একাধিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিপক্ষকে প্রকাশ্য-ভাবে বাধা দেয় না, অথচ নিজ নিজ লক্ষ্য লাভের জন্য এমনভাবে ক্রিয়া করে যাতে অপরের লক্ষ্য লাভে বাধা ঘটে, তখন তাকে পরোক্ষ দ্বন্দ্ব আখ্যা দেওয়া হয়। ম্যাকাইভার ও পেইজ-এর মতে প্রতিযোগিতা হল পরোক্ষ দ্বন্দ্বের উদাহরণ।

কিংসলে ডেভিস এবং অন্যান্য সমাজবিদ্‌রা এতখানি ব্যাপক অর্থে দ্বন্দ্বের সংজ্ঞা নিরূপণ করেননি। কিংসলে ডেভিস দ্বন্দ্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'এটি অনুমান করে নেয় যে দুই পক্ষের মধ্যে কোন সাধারণ ভিত্তি নেই, যে স্বার্থ তাদের বিভক্ত করে তার থেকে উচ্চতর কোন লক্ষ্য নেই এবং একমাত্র সমাধান হল মৃত্যু, বিতাড়ন, পরিহার, বা কোন চূড়ান্ত অর্থনৈতিক বা সামাজিক জয়লাভের মাধ্যমে হয় এই পক্ষ বা অপর পক্ষকে সরিয়ে দেওয়া।' অনেকে এই সংজ্ঞাকে সন্তোষজনক মনে করেন কারণ, এই সংজ্ঞানুসারে প্রতিযোগিতাকে দ্বন্দ্ব বলে আখ্যাত করা যায় না।

কিংসলে ডেভিস দু-প্রকার দ্বন্দ্বের মধ্যে পার্থক্য করেছেন—আংশিক (partial) এবং সামগ্রিক (total)। যখন কোন এক বিষয়ে মতের মিল দেখা দিলেও, অন্য বিষয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখন সেই দ্বন্দ্ব আংশিক। যেমন, হয়ত

দুই পক্ষের মধ্যে লক্ষ্য বস্তু নিয়ে মতের মিল দেখা গেল কিন্তু যে উপায়ের মাধ্যমে সেই লক্ষ্য লাভ করা যাবে তা নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিল। এ হল আংশিক দ্বন্দ্ব। সামগ্রিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে কোন স্তরেই মতের মিল লক্ষ্য করা যায় না এবং স্বার্থের বৈষম্যের সমাধানের একমাত্র উপায় হল বলপ্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণ করা।

যদিও দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে সর্বত্রই যুক্তি দেখান হয়, তবু দ্বন্দ্বকে আংশিক বা সামগ্রিক, যাই হোক না কেন, মানবসমাজের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ গণ্য করা হয় কেন? কিংসলে ডেভিস্ এর একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, এর কারণ হল মানুষের সমাজ খুব একটা আটসাঁট জিনিস নয়। এর সম্পূর্ণতা বা অখণ্ডতার মধ্যে একটা শিথিলতার ভাব আছে। মানবসমাজের অখণ্ডতার বা সম্পূর্ণতার ভিত্তি কিন্তু জৈবিক নয়, মনস্তত্ত্বমূলক। সমাজের সদস্যদের সাধারণ লক্ষের অর্থাৎ ব্যক্তিস্বার্থের অতিরিক্ত লক্ষ্যের উপরেই সমাজের ঐক্য ও অখণ্ডতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। এই লক্ষ্য মানুষের জৈবিক প্রকৃতি থেকে আসতে পারে না—আসে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ থেকে। কাজেই সমাজে সমাজে এর তারতম্য দেখা যায়। কারণ সংস্কৃতির পার্থক্যের সঙ্গে বিষয়টি জড়িত। এক ধরনের সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি যখন ভিন্ন ধরনের সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে অপছন্দ করে তখনই দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আমার চরম লক্ষ্য যদি অপরের চরম লক্ষ্য না হয় তাহলেই তাকে অপছন্দ হয় এবং তার জন্যও দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়।

দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতা (Conflict and Competition): প্রতিযোগিতা ক্রমে ক্রমে শত্রুতায় রূপান্তরিত হয় এবং কার্যতঃ শেষে দ্বন্দ্বের রূপ গ্রহণ করে। তাই কিংসলে ডেভিস (*Kingsley Devis*) বলেন যে—"দ্বন্দ্ব হল—প্রতিযোগিতার পরিবর্তিত রূপ"। প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব উভয়ই এমনই সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়া যার প্রকৃতি হল অসহযোগিতামূলক এবং উভয়ই সমাজের সংহতি নষ্ট করে। কিন্তু দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে মূলগত পার্থক্য বর্তমান। কয়েকটি দিক থেকে প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্বের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যেতে পারে। (১) প্রতিযোগিতা চিরস্থায়ী কারণ একটি ব্যক্তি শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা রকম গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়, কিন্তু দ্বন্দ্ব চিরস্থায়ী নয়, এ হল ক্ষণস্থায়ী। ব্যক্তিগত ক্রোধ যখন চরম রূপ ধারণ করে তখনই তা দ্বন্দ্বে পরিণত হয় কিন্তু কালপ্রবাহে তাও স্তিমিত হয়ে পড়ে। (২) প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যক্তি অথবা লক্ষ্য বস্তুই মুখ্য কিন্তু দ্বন্দ্ব নিতান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। (৩) প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে হিংসার কোন স্থান নেই। লক্ষ্য বস্তু লাভ করাই

একমাত্র উদ্দেশ্য কিন্তু যখনই প্রতিযোগিতা হিংসার রূপ ধারণ করে তখনই তা দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। (৪) প্রতিযোগিতায় যারা অংশগ্রহণ করে সকলে সমান ফল লাভ করতে সমর্থ না হলেও প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ফল লাভ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু দ্বন্দ্বে বাদী এবং বিবাদী উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। (৫) প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগীরা লক্ষ্য বস্তু অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। এক কথায় বলা যায়, প্রতিযোগিতা কঠোর পরিশ্রমকে উৎসাহিত করে; কিন্তু দ্বন্দ্বে বিবদমান ব্যক্তি পরিশ্রমে পরান্মুখ হয়। প্রতিযোগিতার ধর্ম হল সৃষ্টিকারী কিন্তু দ্বন্দ্বের প্রকৃতিই হল ধ্বংসকারী। (৭) সামাজিক নিয়মকানুন মান্য করেই প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে কিন্তু দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে বিবদমান পক্ষ সামাজিক নিয়ম কানুনকে অমান্য করে। (৮) প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিস্বার্থ পূরণ করা কিন্তু দ্বন্দ্বে ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষা করা ছাড়াও বিরোধীপক্ষের ক্ষতিসাধন করাও উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই গিলিন এবং গিলিন (*Gillin and Gillin*) বলেন যে—দ্বন্দ্ব হল এমন সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে, তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রতিপক্ষকে বিপর্যস্ত করতে হিংসার আশ্রয় নেওয়ায়। এ ছাড়া প্রতিশোধ গ্রহণ করাও দ্বন্দ্বের অভিপ্রায়। গ্রীনের (*Green*) কথায় বলতে হয়—দ্বন্দ্ব হল অপরের ইচ্ছাকে প্রতিহত করার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা।

দ্বন্দ্বের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমাজবিদেরা বলেন যে, দ্বন্দ্ব হল পুরোপুরি সহযোগিতার বিপরীতধর্মী। দ্বন্দ্বের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার প্রতিপক্ষের কার্যকে প্রতিহত করে। কখনও কখনও ব্যক্তিরা তাদের প্রতিপক্ষকে অপদস্থ করার জন্য হিংসার পথ অবলম্বন করে। তবে একথা বলা সমীচীন নয় যে, দ্বন্দ্বের সঙ্গে সব সময় হিংসার প্রশ্ন জড়িত থাকে। কখনও কখনও আইনগত শৃঙ্খলার মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সংগঠিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে দ্বন্দ্বের প্রকৃতি সহজেই নিরূপণ করা যায়। **প্রথমতঃ**, দ্বন্দ্বে প্রতিযোগীরা ইচ্ছাকৃতভাবে একজন অপরকে পরাজিত করতে চেষ্টা করে। **দ্বিতীয়তঃ**, দ্বন্দ্ব হল নিতান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক পদ্ধতি। কোন উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেই একজন অপরজনকে পরাজিত করতে সচেষ্ট হয়। **তৃতীয়তঃ**, দ্বন্দ্বের কোন স্থায়ীত্ব নেই। ক্রোধ প্রশমিত হলেই দ্বন্দ্বও স্তিমিত হয়ে পড়ে। **চতুর্থতঃ**, দ্বন্দ্ব একটি সার্বজনীন ঘটনা কারণ দেশ-কাল-পাত্র ভেদে দ্বন্দ্ব লক্ষিত হয়; কোন সমাজই দ্বন্দ্ববিহীন নয়।

প্রতিযোগিতার মত দ্বন্দ্বের প্রকারভেদ আছে। সমাজে বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্বের যে পরিচয় পাই তা হল নিম্নরূপ :

(i) **ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব** (Personal Conflict) : বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যখন বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তখন এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যেমন—যদি দুজন শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের একটি পদের জন্য প্রতিযোগিতা করে তখন তা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে পরিণত হয়।

(ii) **শ্রেণী দ্বন্দ্ব** (Class Conflict) : যখন দুটি শ্রেণী তাদের বিপরীত-মুখী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তখন তা শ্রেণী দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। তাই কার্ল মার্কস (*KarlMarx*) অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সমাজের শ্রেণীবিভাগ করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, শোষক শ্রেণী এবং শোষিত শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব অপরিহার্য।

(iii) **জাতিগত দ্বন্দ্ব** (Caste Conflict) : উচ্চবংশজাত এবং নিম্ন-বংশজাত ব্যক্তিদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব সমাজে দেখা যায়। ভারতবর্ষের সমাজে ব্রাহ্মণরা তাঁদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য নিম্নবংশজাত ব্যক্তিদের উপর প্রভুত্ব করতে ইচ্ছুক হলে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

(iv) **গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব** (Group Conflict) : রাজনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের বিভিন্ন রকম উদ্দেশ্য এবং মতের জন্য বিভিন্ন পথ অবলম্বন করে। এর ফলে দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটে।

(v) **আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব** (International Conflict) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও দ্বন্দ্ব দেখা যায় যখন একটি জাতি অপর জাতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে সচেষ্ট হয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শ্রমিক ও মালিকের এবং মালিকদের নিজেদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব দেখা যায়। একই জায়গায় কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্যে যেমন দ্বন্দ্ব দেখা যায় আবার বিভিন্ন স্থানে কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক জীবনে সহযোগিতা এবং দ্বন্দ্বের সংযোগ (The Combination of Co-operation and Conflict in social life) : সহযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব সামাজিক জীবনের দুটি মৌলিক কার্যপ্রক্রিয়া। মানুষের জীবনে তারা হল সার্বিক ঘটনা। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের এবং ক্রিয়ার এক ব্যাপক পরিধি জুড়ে এদের অবস্থিতি। প্রাকৃতিক জগতে দেশ (space) জুড়ে যে সব জড়পিণ্ডের অবস্থিতি সেখানে যেমন যুগপৎ আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, তেমনি সামাজিক জগতে মানুষ এবং গোষ্ঠীর

সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং দ্বন্দ্বের সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। সমাজবিদ্ চার্লস কুলে (*Charles Cooley*) বলেন, "দ্বন্দ্ব এবং সহযোগিতা বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, একই কার্যপ্রক্রিয়ার একটি দিক যার মধ্যে উভয়ের কিছু অন্তর্ভুক্ত।" মানুষের সঙ্গে মানুষের সহযোগিতার সম্পর্ক ততদিনই চলতে থাকে যতদিন পর্যন্ত তাদের স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকে। সব আন্তরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, ধরা যাক সমবয়সী বন্ধুদের গোষ্ঠীতে বা পরিবারে এমন একটা অবস্থা এসে পড়ে যখন স্বার্থের ঐক্য আর দেখা যায় না; স্বার্থকে কেন্দ্র করে মতবিভেদ পরিলক্ষিত হয় বা সদস্যদের সবার মনোভাবে সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় না। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা দেখা যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিবাদ বিসংবাদকে কেউ ঠেকাতে পারে না। তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হয়। রাজনৈতিক দল, কোন সেবা প্রতিষ্ঠান, কোন সাংস্কৃতিক সংঘ, যারা একটি সাধারণ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সিদ্ধ করার জন্য আন্তরিকভাবে আগ্রহী, তাদের মধ্যেও সময় সময় মতান্তর বা সংঘাত দেখা দেয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, কোন বিশিষ্ট সমাজবিদের ভাষায়, "অপরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবসময়ই যেমন পারস্পরিক সহযোগিতার উপাদানের উপস্থিতি থাকবে তেমনি দ্বন্দ্বের উপাদানের অস্তিত্বও থাকবে, মানুষের সমগ্র জীবনের পরিকল্পনাই হয়ত এটা চায়, আমাদের চেহারা বা বাহ্যিক গঠনের মধ্যেই এটা প্রতিফলিত হয় এবং মানুষের ললাটের উপর পাশাপাশিই বসে রয়েছে ভালবাসা আর সংঘাত।'

বস্তুতঃপক্ষে সামাজিক দ্বন্দ্বের এমন কোন রূপ দেখা যায় না, যার মধ্যে সহযোগিতামূলক ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত নয়। দ্বন্দ্বের নানা রূপ আছে, এই দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যে, বিতর্ক, প্রতিযোগিতা, বা গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর, যেমন—অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় গোষ্ঠীদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, এই সব দ্বন্দ্বের মধ্যে সহযোগিতার উপাদান রয়েছে। এমনকি সশস্ত্র যুদ্ধের সময়ও যুদ্ধরত দুটি দলকে কয়েকটি বিষয়ে আন্তর্জাতিক নিয়মের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে সহযোগিতা করতে হয়। অনুরূপভাবে বলা যেতে পারে যে, সমাজে এমন কোন সহযোগিতা-মূলক ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না, যেখানে দ্বন্দ্ব কোন না কোন ভাবে অনুপস্থিত। সেকারণে ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন যে, সহযোগিতার সঙ্গে দ্বন্দ্ব আড়াআড়ি-ভাবে যুক্ত, তা-ই সমাজের লক্ষণ (Society is co-operation crossed by conflict)।

ম্যাকাইভার ও পেজ-এর উপরিউক্ত উক্তিটিকে স্বীকার করে নেওয়া যায় কিনা, তা নির্ভর করছে দ্বন্দ্বকে আমরা কি অর্থে গ্রহণ করি। দ্বন্দ্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যদি আমরা বলি, দ্বন্দ্বের লক্ষ্য হল প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করা, ধ্বংস করা, তাকে একেবারে বিতাড়িত করা, তাহলে দ্বন্দ্বের সঙ্গে সহযোগিতার সংযোগের প্রশ্ন আসে না। যেমন কিংসলে ডেভিস বলেছেন যে, দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে দুটি দলের মধ্যে মিল হতে পারে এমন কিছুই উপস্থিত নেই, যে স্বার্থের জন্য দ্বন্দ্ব, তার থেকে উচ্চতর কোন লক্ষ্য নেই এবং একজন আর একজনকে কিভাবে পরাজিত করে হটিয়ে দেবে, তাছাড়া আর কোন সমস্যার সমাধান নেই। যদি দ্বন্দ্বকে এতখানি সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে দ্বন্দ্ব হয়ে পড়ে পুরোপুরি সহযোগিতার বিরোধী। দুটোর সহ-উপস্থিতির প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু 'দ্বন্দ্ব' শব্দটিকে এতখানি সংকীর্ণ অর্থে আমরা গ্রহণ করি না বলেই ম্যাকাইভার ও পেজ-এর উক্তির সত্যতাকে অস্বীকার করা যায় না। সমাজের সর্বস্তরেই আমরা লক্ষ্য করি যে, মানুষ একক প্রচেষ্টায় যা লাভ করতে পারে না, পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে তা লাভ করতে চায়। কিন্তু এইভাবে লক্ষ্য সিদ্ধ করতে গিয়েও মতান্তর, বিবাদ, বিসংবাদ, সংঘাত প্রভৃতি দেখা দেয়, যার ফলে দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে চলা সম্ভব হয় না। কিন্তু সমাজ মাত্রই তার সংহতি ও ঐক্য বজায় রাখার জন্য সমাজের সভ্যদের সহযোগিতা করতে এবং দ্বন্দ্বকে পরিহার করতে উৎসাহিত করে। তবু সহযোগিতামূলক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব দেখা না দিয়ে পারে না। আবার দ্বন্দ্বমূলক ক্রিয়াও সহযোগিতাকে একেবারে বর্জন করতে পারে না, সেকারণে মানুষের সামাজিক জীবনে সহযোগিতা এবং দ্বন্দ্বের সংযোগ লক্ষ্য করা যায়।

(৪) **আত্তীকরণ (Assimilation) :** আত্তীকরণ (Assimilation) বলতে বিপরীতধর্মী দুই বা ততোধিক সংস্কৃতি বা ব্যক্তির সামঞ্জস্য বিধান বোঝায়। বিভিন্ন ব্যক্তির নিজস্ব স্বাতন্ত্র বর্তমান, কাজেই অপর ব্যক্তির আদর্শ বা নীতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, কিন্তু প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলে তাহলে সামাজিক ভারসাম্য (social equilibrium) রক্ষিত হতে পারে না। তাতে সুস্থ সুন্দর সামাজিক জীবন বিঘ্নিত হয়। বর্তমানে যানবাহন বা যাতায়াতের সুবিধার ফলে আত্তীকরণের কাজ অনেক সহজ হয়েছে।

বিভিন্ন সমাজবিদ্ আত্তীকরণের বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। অগবার্ণ এবং নিমকফ্ (*Ogburn and Nimkoff*) বলেন যে, যে কার্যপ্রক্রিয়ার

মাধ্যমে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যারা একসময় অসদৃশ ছিল, সদৃশ হয় অর্থাৎ কিনা স্বার্থ এবং দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে তাদের মধ্যে মিল দেখা দেয়, তাকেই আত্তীকরণ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

বোগারডাস (*Bogardas*) বলেন যে, আত্তীকরণ কার্যপ্রক্রিয়ার দ্বারা বিভিন্ন ব্যক্তির মনোভাব একীভূত হয়ে পড়ে—ক্রমে একত্রীকরণ সম্ভব হয়।" এ হল পরিব্যপ্ত হবার বা একত্র মিশে যাওয়ার কার্যপ্রক্রিয়া যাতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্য ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর, আবেগ ও মনোভাব অর্জন করে এবং তাদের অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের অংশীদার হয়ে একই সাংস্কৃতিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়। পার্ক এবং বার্জেস (*Park and Burgess*) বলেন যে, আত্তীকরণের দ্বারা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মনোভাব (attitude) এবং অভিজ্ঞতা (experience) অর্জন করতে সমর্থ হয় এবং সমবেত ভাবে একটি সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তোলে।

উপরোক্ত সংজ্ঞার ভিত্তিতে আত্তীকরণের প্রকৃতি বোঝা সহজ হয়। সামাজিকীকরণ (socialisation) প্রক্রিয়ার মত আত্তীকরণও একটি শিক্ষাগত কার্যপ্রক্রিয়া। তবে আত্তীকরণ ও সামাজিকীকরণের মধ্যে পার্থক্য হল—আত্তীকরণের দ্বারা একটি ব্যক্তির বা সংস্কৃতির জীবনে ভারসাম্য রক্ষার জন্য কিছুটা পরিবর্তন সম্ভব হয় কিন্তু সামাজিকীকরণ হল একটি শিশুকে সামাজিক জীবে পরিণত করা। আত্তীকরণ হল নিতান্তই সামাজিক কাজ এবং মানসিক পদ্ধতি যা সাংস্কৃতিক সংহতি বজায় রাখার পক্ষে সহায়ক হয়।

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক কারণগুলি (factors) আলোচনা করা প্রয়োজন যা সাংস্কৃতিক সংহতি বজায় রাখার পক্ষে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

(*i*) **বিচ্ছিন্নতা** (Isolation) : কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে আত্তীকরণ তখনই সম্ভব হয় যখন তারা সমাজে বাস করে এবং পারস্পরিক স্বার্থে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু সমাজবিচ্যুত কোন ব্যক্তির পক্ষে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব নয় এবং সেখানে আত্তীকরণের প্রশ্নও অবান্তর।

(ii) **সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা** (Cultural difference) : আত্তীকরণ তখনই দ্রুত এবং সহজ হয় যখন দুটি সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও মূলগত বৈষম্য অবর্তমান। যেমন, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক জীবনে মূলগত পার্থক্য থাকার জন্য আত্তীকরণ সহজ হয় না।

(*iii*) **বর্ণগত এবং দেহগত বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা** (Difference of colour and physiological characteristics) : মানুষে মানুষে সাংস্কৃতিক

জীবনে মিল থাকা সত্ত্বেও দেহগত বা বর্ণগত বৈষম্যের জন্যও আত্তীকরণ সহজতর হয় না। মানুষের সঙ্গে মানুষের দেহগত এবং বর্ণগত পার্থক্যও সামাজিক সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমেরিকার শ্বেতকায় (white) এবং কৃষ্ণকায় (Black) লোকেরা পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, কারণ শ্বেতকায় লোকেরা নিজেদের উন্নতশীল জাতি বলে গণ্য করে এবং কৃষ্ণকায়দের উপর প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়। কাজেই আত্তীকরণ সহজতর হয় না।

(iv) **সামাজিক নির্যাতন** (Social Persecution) : যখন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য অত্যাচার এবং শোষণ চালায় তখন পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই সামাজিক সম্পর্ক স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং আত্তীকরণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

তবে কয়েকটি পদ্ধতির (factor) জন্য পরস্পরের বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও আত্তীকরণ সহজতর করা সম্ভবপর হয়। যথা—

(i) **সহনশীলতা** (Toleration) : বিভিন্নদেশে এবং বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক জীবনে বৈষম্য বিদ্যমান। কিন্তু প্রত্যেকেই যদি তার সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে (ethnocentrism) তাহলে সহাবস্থান সম্ভব হয় না। বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্য তখনই সম্ভব হয় যখন সহনশীলতার মনোভাব বর্তমান থাকে।

(ii) **সাংস্কৃতিক ঐক্য** (Cultural similarity) : বিভিন্ন সংস্কৃতির পার্থক্য হেতু যেমন আত্তীকরণ কষ্টকর হয় তেমনি সাংস্কৃতিক জীবনে সাদৃশ্য থাকলে আত্তীকরণ সহজতর হয়। যেমন পূর্ব বাংলার এবং পশ্চিমবাংলার লোকেদের মধ্যে সাংস্কৃতিক জীবনে মিল থাকার ফলে সহাবস্থান সম্ভব হয় এবং সামাজিক ও পরিবারিক জীবনও দৃঢ় হয়।

(iii) **অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য** (Equality of opportunity for economic progress) : যদি সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মধ্যে বা গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিরাজ করে তবে হিংসা বা ঈর্ষার কারণ দেখা দেয় এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলির মধ্যে হৃদ্যতা নষ্ট হয় কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যদি সকলেই সমান সুযোগ সুবিধা পায় তাহলে আত্তীকরণ সহজতর হয়।

(৫) **উপযোজন (Accommodation)** : দ্বন্দ্বের পর সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ়

করার পক্ষে উপযোজন প্রথম পদক্ষেপ বলা যায়। বিবদমান দুই পক্ষ যদি কোন রকম বোঝাবুঝির মধ্যে না আসে তাহলে সামাজিক সম্পর্ক যেমন গড়ে ওঠে না, আবার সমাজে বাস করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই নিজ স্বার্থেই প্রত্যেককে বোঝাবুঝির স্তরে আসতে হয়। বিবদমান পক্ষের মধ্যে জাতিগত এবং আদর্শগত পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য কিছুটা বোঝাবুঝির পর্যায়ে আসতেই হয়। কোন একটি সভায় বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে যখন সংহতি বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন তারাও সাধারণ কতকগুলি কারণে বোঝাবুঝির পর্যায়ে আসতে বাধ্য হয়। অনেক পরিবারে বাবা-মায়ের উপর সন্তানের নানা রকম অভিযোগ থাকে কিন্তু তা সত্ত্বেও সন্তানকে বাবা-মাকে অশ্রদ্ধা করতে দেখা যায় না। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নানারূপ পরিস্থিতিতে কাজ করতে হয় যা তাকে মানসিক তৃপ্তি দেয় না। কিন্তু সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য উপযোজন করতেই হয়। পার্ক এবং বার্জেস (*Park and Burgess*) তাই বলেন—দ্বন্দ্বের প্রশ্ন থেকেই উপযোজন উদ্ভূত হয়। পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠী যখন স্বল্প-কালের জন্য হলেও শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে তখন দ্বন্দ্ব পরিহার করা সম্ভবপর হয়।

মানুষ শান্তিপ্রিয় জীব। কাজেই শান্তি রক্ষার জন্যও তাকে বোঝাবুঝির সম্পর্কে আসতেই হয়। তাই ম্যাকইভার ও পেজ (*MacIvar and Page*) বলেন যে উপযোজন হল একটি সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়া যার দ্বারা কোন ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করার শক্তি অর্জন করে।

দ্বন্দ্বের ফলেই সমাজ এবং গোষ্ঠীর সংহতি বিনষ্ট হয়। তাছাড়া, সমাজ এবং গোষ্ঠীর উপর দ্বন্দ্বের প্রভাব ক্ষতিকর। সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলার জন্য প্রয়োজন সামাজিক স্থিরতা। কাজেই সব সমাজই দ্বন্দ্বের আবির্ভাবে বাধা দেবার জন্য সচেষ্ট হয়। যখন সমাজে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন তা যাতে সমাজে ছড়িয়ে পড়তে না পারে এবং একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যাতে থাকে তার জন্য সর্বপ্রকারে সতর্কতা অবলম্বন করে দ্বন্দ্বকে দূরীভূত করার চেষ্টা করা হয়।

'উপযোজন' শব্দটির বর্ণনা দিতে গিয়ে সমাজবিদ্‌রা বলেন, এটি হল এমন এক ধরনের কার্যপ্রক্রিয়া যা শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে বোঝাপড়া নির্দেশ করে। এটি এমন এক কার্যপ্রক্রিয়া যার দ্বারা যে সব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পূর্বে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল, কোন সাধারণ লক্ষ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে আবার একত্রে ক্রিয়া করে। এ হল মতবিভেদ বা মতবৈষম্য থাকা সত্ত্বেও এক সঙ্গে এগিয়ে চলা।

এ হল এমন ধরনের কার্যপ্রক্রিয়া যার দ্বারা মানুষ এমন সামাজিক ব্যবস্থা বা সংগঠনের আবিষ্কার করতে চায়, যা তাদের মনোমত না হলেও তাদের এক সঙ্গে কাজ করতে সমর্থ করে। উপযোজনের মধ্যে শত্রুতা প্রচ্ছন্ন থাকায় উপযোজন সাময়িক হতে পারে, কেন না পরবর্তী সময়ে আবার দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। তবে উপযোজন নিছক প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব নয়। শত্রুতা প্রচ্ছন্নভাবে থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সমবেত ভাবে কর্ম করার এক বাস্তব অবস্থা হল উপযোজন। এই কারণেই সামনার (*Sumner*) উপযোজনকে শত্রুতামূলক সহযোগিতা বলে বর্ণনা করেছেন।

উপযোজন এমন অবস্থা নিয়ে আসে যা বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একত্র কাজ করার সুযোগ করে দেয়। আর দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি হিসেবে নূতন ব্যবস্থা, নিয়ম, চুক্তি, সন্ধি, সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট করার জন্য আইন, অধিকার, বাধ্যবাধকতা এবং সহযোগিতার পদ্ধতি প্রভৃতির উদ্ভব হয়। এমন একটা সংগঠনের উদ্ভব হয় যা ব্যক্তিকে এমন ভাবে সংগঠিত করে, যে তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও তাদের এক সঙ্গে কাজ করার অনুমতি দেয়। উপযোজন কার্য-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এই সামাজিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। কাজেই সব সামাজিক সংগঠনের ভিত্তিরূপে রয়েছে উপযোজন। আসলে উপযোজন হল একটি পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সংগতিবিধান। উপযোজন অন্যান্য গোষ্ঠী কার্য-প্রক্রিয়ার মতনই মাত্রাগত ব্যাপার,—উপযোজন কম বেশী হতে পারে। বার্জেস (*Burgess*) বলেন, "সামাজিক সংগঠন হল অতীত এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে উপযোজনের সমষ্টি।"

উপযোজনমূলক সামাজিক আচরণের (accomodative social behaviour) প্রকারভেদ আছে।

দ্বন্দ্বরত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীদের সংহতি (integration) দ্বন্দ্বের ফলাফলের উপর বা উপযোজনের ধরনের উপর নির্ভর করে। বাহ্য দ্বন্দ্ব তখনই শেষ হয়ে আসে যখন এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর জয়লাভ করে। যিনি পরাজিত তাকে হয়ত বিজয়ীর শর্ত পুরোপুরি মেনে নিতে হয়, কিংবা যতদিন পর্যন্ত একেবারে ধ্বংস হয়ে না যায় ততদিন পর্যন্ত দ্বন্দ্ব চালিয়ে যেতে হয়। যে পরাজিত হয় সে যদি ধ্বংস হয়ে যায় তার সঙ্গে স্পষ্টতঃই সামাজিক সম্পর্কও বাহ্যতঃ শেষ হয়ে যায়।

যখন এক পক্ষ প্রবল শক্তিমান এবং অপর পক্ষ সম্পূর্ণ তার দ্বারা বশীভূত হয়, তখন উপযোজনের ধরনটা হল শক্তিমানের অধীনতা স্বীকার করা। যেমন, শ্রমিক সংঘ ধর্মঘটের মাধ্যমে দাবী দাওয়া আদায় করতে না পেরে ব্যর্থ হলে, মালিক-পক্ষের যে কোন শর্তের সঙ্গে শ্রমিক সংঘকে উপযোজন করতে হয়। কিন্তু

যখন উভয় দলই সমান শক্তিসম্পন্ন, তখন তাদের মধ্যে যে উপযোজন তা অনেকটা সমন্বয়মূলক, কেননা কোন দলই অপরকে বশীভূত করতে পারে না। কাজেই অর্থহীন দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে চলার জন্য উভয় দলই একটা মিটমাট করতে চায়। এরূপ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষকেই কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়—কিছু লাভ করার জন্য কিছু বর্জন করতে হয়। রাজনৈতিক দলগুলিকে অনেক সময় এই ধরনের উপযোজনকে স্বীকার করে নিতে দেখা যায়।

উপযোজনের আর একটি প্রকারভেদ হল সহনশীলতার মধ্য দিয়ে উপযোজন। এটা দেখা দেয় তখনই যখন মিটমাট সম্ভব হয় না। কিন্তু দ্বন্দ্বরত দলগুলি প্রকাশ্য শত্রুতাও করে না। সহনশীলতার ক্ষেত্রে গোষ্ঠীদের মধ্যে কোন মিটমাট হয় না এবং তাদের মূল নীতিরও কোন পরিবর্তন দেখা দেয় না। প্রত্যেক গোষ্ঠীই অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে মানিয়ে চলতে চায়। ধর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধরনের উপযোজন দৃষ্ট হয়। প্রতিটি ধর্ম-সম্প্রদায়ই মনে করে যে, তার ধর্ম বিশ্বাসই যথাযথ, তবু অন্য ধর্মসম্প্রদায়কে তারা একই ধরনের অধিকার দিতে চায়।

উপযোজন এবং সহযোগিতা (Accomodation and Co-operation)ঃ প্রশ্ন হল, সহযোগিতা এবং উপযোজন উভয়ই সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি, তাহলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

উপযোজন এবং সহযোগিতা, উভয় কার্যপ্রক্রিয়াই মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে সুযোগ দেয়। উভয়ই গোষ্ঠী-জীবনকে ধরে রাখে। সহযোগিতা সব রকম সম্পর্ককেই তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। কোন সাধারণ লক্ষ্যকে সামনে রেখে যখন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করে, তখন মানুষের সব রকম সম্পর্ক এর অন্তর্ভুক্ত। আর উপযোজন সহযোগিতামূলক কার্যপ্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর বা মাত্রা নির্দেশ করে। উপযোজনের ক্ষেত্রে দুটি দলের মধ্যে যে ব্যবধান তা অংশতঃ দূরীভূত হয়, সামাজিক দূরত্ব কমে আসে এবং গোষ্ঠী যাতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারে তার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিধিবদ্ধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বোঝা যায় যে, উপযোজন যেমন এককথায় পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য বোঝায় না, আবার পুরোপুরি দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কও নির্দেশ করে না। দুই বিপরীতমুখী সম্পর্কের মধ্যে যে ভারসাম্যের অবস্থা তাই হল উপযোজন।

উপযোজন (Accomodation) এবং প্রতিযোজনের (Adjustment) মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। উপযোজন হল প্রতিযোজনের পরবর্তী স্তর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন কোন দেশ অপর দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হয়, আক্রান্ত দেশ প্রথমে আক্রমণ রুখবার জন্য সচেষ্ট হয় কিন্তু যখন পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে তখন বিজয়ী পক্ষের সঙ্গে প্রতিযোজনে তৎপর হয় এবং এই প্রতিযোজনই ধীরে ধীরে উপযোজনের পথ সুগম করে দেয়।

অনুশীলনী

১। সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়া হিসেবে সহযোগিতার স্বরূপ বর্ণনা কর। সহযোগিতা কি প্রতিযোগিতার বিপরীত ধারণা? (Describe the nature of co-operation as a social process. Is the idea of co-operation opposed to the idea of competition ?)

২। সাধারণ স্বার্থ এবং অনুরূপ স্বার্থের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক কি? (What is the relation of co-operation to Common Interest and Like Interest.)

৩। প্রত্যক্ষ সহযোগিতা এবং পরোক্ষ সহযোগিতার মধ্যে পার্থক্য কর। (Distinguish between Direct Co-operation and Indirect Co-operation.)

৪। সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়া হিসেবে প্রতিযোগিতার প্রকৃতি বর্ণনা কর। প্রতিযোগিতার প্রকারভেদ আলোচনা কর। (Describe the nature of competition as a social process. What are the different types of competition ?)

৫। সমাজে প্রতিযোগিতার ভূমিকা বর্ণনা কর। (Describe the role of competition in society.)

৬। দ্বন্দ্ব কাকে বলে? প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দ্বন্দ্বের মধ্যে পার্থক্য কর। (What is conflict ? Distinguish between Direct and Indirect conflict.)

৭। সহযোগিতা ও দ্বন্দ্বের মধ্যে পার্থক্য কর? দ্বন্দ্বের শ্রেণীভেদ বর্ণনা কর। (Distinguish between co-operation and conflict. Describe the different types of conflict.)

৮। সামাজিক জীবনে সহযোগিতা এবং দ্বন্দ্বের সংযোগ ব্যাখ্যা কর। (Explain the combination of co-operation and conflict in social life.)

৯। 'সমাজ দ্বন্দ্ব-সংযুক্ত সহযোগিতা'—ব্যাখ্যা কর। ('Society is co-operation crossed by conflict.'—Discuss)

১০। আত্তীকরণ ও উপযোজনের মধ্যে প্রভেদ কর। (Distinguish between Assimilation and Accomodation.)

১১। সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়া হিসেবে আত্তীকরণ ও উপযোজনের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। (Explain the nature of Assimilation and Accomodation as social processes.)

সপ্তম অধ্যায়

সামাজিক সংগঠনের প্রকারভেদ

(Different froms of Social Organisation)

১। সামাজিক সংগঠন কাকে বলে (What is a Social Organisation ?) :

আধুনিক সমাজে সামাজিক সংগঠনের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বস্তুতঃ, আধুনিক সমাজে সামাজিক সংগঠনের সংখ্যাধিক্য ও বৈচিত্র্য দেখে এমন কথাই মনে হতে পারে যে, সামাজিক সংগঠন বুঝি আধুনিক সমাজেরই সৃষ্টি। কিন্তু আসলে তা নয়। অতীতেও নানাধরনের কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য, আইন বিষয়ক সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার জন্য, সরকারী-নীতি নিরূপণ ও সে অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের জন্য সামাজিক সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল। অবশ্য বর্তমান সামাজিক সংগঠনের তুলনায় তাদের আকার ছিল খুবই ক্ষুদ্র।

সামাজিক সংগঠনের সংজ্ঞা নিরূপণে সমাজবিদেরা খুব সন্তোষজনক সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারেননি। সাধারণতঃ তাঁরা বলে থাকেন যে সংগঠন হল সংঘ, 'যেগুলির কিছুটা স্থায়ীত্ব আছে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য লাভ করার জন্য যেগুলি সংগঠিত হয়।' যেখানেই মানুষ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক রচনা করে সেখানেই সেই গোষ্ঠী সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্য থাকে সত্য কিন্তু যেহেতু সে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে যুক্ত এবং তার চিন্তাধারা অপরকে প্রভাবিত করে ও সে নিজেও অপরের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেজন্যই সামাজিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সামাজিক সংগঠনকে কেন্দ্র করে, তা যে কোন প্রকারের সংগঠনই হোক না কেন, মানুষ তার বিভিন্ন চাহিদা পরিপূরণ করতে সমর্থ হয়। আবার মানুষের চাহিদাও বহুমুখী। জৈবিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যও যেমন সংগঠনের প্রয়োজন, আবার মানসিক বা আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধনের জন্যও সামাজিক সংগঠনের প্রয়োজন। সেইজন্য সংগঠনের প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়; কোনটি অর্থনৈতিক, কোনটি রাজনৈতিক, কোনটি সাংস্কৃতিক। এছাড়া ধর্মীয় এবং আরও বিভিন্ন ধরনের সংগঠনের অস্তিত্ব সমাজে লক্ষ্য করা যায়।

প্রত্যেক সংগঠনের আবার কাজের (functional) দিকটিও লক্ষ্যণীয়। প্রত্যেকটি সংগঠনের সঙ্গে সভ্যগণ কর্মসূত্রে আবদ্ধ। প্রত্যেকটি সংগঠনই সভ্যগণের ক্রিয়াকর্মের প্রকাশ মাত্র। সংগঠনগুলি আবার বিভিন্ন বিভাগের সম্পর্ক নির্ণয় করে। তাছাড়া সংগঠনগুলি সুসংহত এবং সুশৃঙ্খলভাবে কার্য করবার রীতিও নির্ণয় করে। সেদিক থেকে সামাজিক সংগঠনগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

২। সামাজিক সংগঠনের প্রকারভেদ (Different forms of Social Organisation) :

(i) সামাজিক গোষ্ঠী (Social Groups) : গোষ্ঠির স্বরূপ (Nature of Groups) : সামাজিক গোষ্ঠী কাকে বলে ? বিশেষ উদ্দেশ্য লাভের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ একাধিক ব্যক্তির সমষ্টিকেই সামাজিক গোষ্ঠী বলা হয়। গিস্‌বার্ট (*Gisbert*) বলেন, "সামাজিক গোষ্ঠী হল ব্যক্তির সমষ্টি, যারা একটি স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে থেকে পরস্পরের উপর কর্ম সম্পাদন করে"। যেমন—কোন রাজনৈতিক দল বা কোন ফুটবল ক্লাব। ম্যাকাইভার ও পেজ (*MacIver and Page*) বলেন, "গোষ্ঠী বলতে আমরা বুঝি কোন সামাজিক ব্যষ্টির সমষ্টি, যারা পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। আমরা যেভাবে বুঝি তাতে গোষ্ঠীর অর্থ হচ্ছে এর ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ।"

কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি মাত্রকেই সামাজিক গোষ্ঠী বলা চলে না। সমাজ-বিজ্ঞানের দিক থেকে এ জাতীয় সমষ্টির সঙ্গে কোন জড়দ্রব্যের সমষ্টির পার্থক্য নেই, যেহেতু এ জাতীয় গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক নেই। ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক চেতনা না থাকলে সামাজিক গোষ্ঠীর কোন অস্তিত্বও থাকে না। যখন সমষ্টির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুস্পষ্ট সামাজিক সম্পর্ক থাকে এবং একটা স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে থেকে কোন সাধারণ স্বার্থ বা লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিরা পরস্পরের উপর কার্য করে তখনই সামাজিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। সামাজিক গোষ্ঠী হল এক 'মানসিক-সামাজিক ঐক্য' (psycho-social unity) এবং যান্ত্রিক সমষ্টি থেকে সব সময় পৃথক।

সমাজ (Society) এবং সামাজিক গোষ্ঠীর (Social Groups) মধ্যে প্রভেদ আছে। যে কোন সামাজিক গোষ্ঠীকেই সমাজ বলে গণ্য করা যেতে পারে না। সামাজিক গোষ্ঠীর তুলনায় সমাজের স্থায়িত্ব এবং সংগঠন অনেক বেশী।

সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে 'আপাত-গোষ্ঠী'র (Quasi-group) পার্থক্য আছে। সামাজিক গোষ্ঠীর একটা নির্দিষ্ট সংগঠন আছে, যা সকলের স্বীকৃতি লাভ করে। আপাত-গোষ্ঠীর বেলায় এরূপ কোন স্বীকৃত সংগঠন নেই। অবশ্য আপাত-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির মধ্যে অনেক বিষয়ে হয়ত সাদৃশ্য থাকতে পারে। যেমন—একই ব্যবসায়ে নিযুক্ত যে জনসমষ্টি, যাদের পেশাগত উদ্দেশ্য এক, কিন্তু যাদের নির্দিষ্ট কোন সংগঠন নেই। যখনই এসব ব্যক্তি সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের সংগঠিত করে তখনই আপাত-গোষ্ঠী সামাজিক গোষ্ঠীর স্তরে উন্নীত হয়। অনেক সময় দেখা যায় অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণবশতঃ, ব্যবসায়ীরা দলবদ্ধ হয়ে এক সুদৃঢ় সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের দাবী-দাওয়াকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট হয় এবং এর ফলে সামাজিক-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়।

(ii) সামাজিক গোষ্ঠী : কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য (Some general characteristics of social group life) : সামাজিক গোষ্ঠী তার অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মনে এক অখণ্ডতা বা সমগ্রতার চেতনা সৃষ্টি করে। যখন কোন ব্যক্তি কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয় বা তার মধ্যে থেকে কাজ করে তখন সে উপলব্ধি করে যে, সে কেবল নিজেকে নিয়েই কেন্দ্রীভূত নয়, সে এক অখণ্ড সমগ্রতার অংশস্বরূপ যা কোন কোন সময় তার ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কাজ করতে পারে। যখন সমস্ত পরিবারটিই কোন একটি কাজ করার জন্য সংকল্পবদ্ধ, তখন সেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত কোন বিশেষ সভ্য উপলব্ধি করতে পারে যে, এ ব্যাপারে তার অনিচ্ছার বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে, গোষ্ঠী তার থেকে বড় এবং তার স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার আছে।

গোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দ আরও অবহিত হয় যে, গোষ্ঠী তার অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের কার্যকলাপের উপর চাপ দিতে পারে। ব্যক্তির উপর এই চাপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আসতে পারে। ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে স্বাধীনভাবে খুশীমত যে-কোন কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় এবং সমষ্টিগত স্বার্থের সংরক্ষণের জন্য ব্যক্তি-স্বার্থকে অনেক সময় বিসর্জন দিতে হয় বা ব্যক্তিকে স্বার্থমূলক কার্য সম্পাদন থেকে বিরত থাকতে হয়। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তি গোষ্ঠীর স্বার্থকেই নিজেদের স্বার্থ মনে করে এবং তার সঙ্গেই নিজেকে অভিন্ন মনে করে।

সামাজিক গোষ্ঠী তার সভ্যদের মধ্যে একটা দলীয় মনোভাব (group-spirit) বা চেতনার সঞ্চার করে। গোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দ পরস্পরের সাহচর্য পছন্দ করে, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ও শ্রদ্ধাশীল হয়, গোষ্ঠীর সাধারণ জীবনের

অংশীদার মনে করে গর্বিত বোধ করে। প্রতিটি সভ্যই গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে একটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। এই মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই ব্যক্তি নিজের স্বার্থের কথা বিস্মৃত হয়ে গোষ্ঠীর বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থকে অভিন্ন মনে করে।

গোষ্ঠী-জীবন তার সভ্যদের মধ্যে এই চেতনা আনে যে, যারা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয় সেইসব ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের কোথায় যেন কিছু পার্থক্য আছে। গোষ্ঠীর যারা সভ্য এবং গোষ্ঠীর যারা সভ্য নয়—উভয়ের মাঝে যে একটা ব্যবধান আছে, এ বোধ তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়।

পরস্পরের আবেদনে সাড়া দেওয়া, পরস্পরের ভাব-বিনিময়ে ক্রিয়া করা সামাজিক গোষ্ঠীর সংহতি বা ঐক্যের ভিত্তিস্বরূপ। গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে প্রথম শুরু হয় সংযোগ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কিন্তু অচিরেই সভ্যরা উপলব্ধি করে যে পারস্পরিক স্বীকৃতির প্রয়োজন। অপরের আচরণের সঙ্গে নিজের আচরণের সামঞ্জস্য সাধন, গোষ্ঠীর সাধারণ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের কথা স্মরণে রেখে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা গোষ্ঠীর সংহতি বা ঐক্য সংরক্ষণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। মোটামুটি স্থায়ী কোন গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে এই পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেমন—পরিবারে মাতাপিতা সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সন্তান মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রদর্শন করে তার প্রতিদান দেয়।

প্রত্যেক সামাজিক গোষ্ঠীই কিছু সাধারণ সম্পত্তির মালিক। এই সম্পত্তি জাগতিক বস্তু হতে পারে বা ভাবমূলক আধ্যাত্মিক কিছু হতে পারে। নির্দিষ্ট বাসস্থান, অট্টালিকা, পতাকা, এক বা একাধিক্য লক্ষ্য এই জাতীয় সম্পত্তির উদাহরণ।

(iii) সামাজিক গোষ্ঠী, সামাজিক বর্গ এবং সামাজিক সমষ্টির মধ্যে প্রভেদ (Difference between Social Groups, Social Categories and Social Aggregates) :

বিশেষ উদ্দেশ্য লাভের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ একাধিক ব্যক্তির সমষ্টিকেই সামাজিক গোষ্ঠী বলা হয়। সামাজিক গোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দ পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত; যেমন, কোন রাজনৈতিক দল, কোন ফুটবল ক্লাব।

সামাজিক বর্গ (Category) হল একটা সামাজিক শ্রেণী যা সম্প্রদায়ের কোন একটি অংশ, যেটি সামাজিক পদ মর্যাদার দ্বারা অবশিষ্ট অংশ থেকে স্বতন্ত্র; যেমন, অবিবাহিতের শ্রেণী, উপন্যাস পাঠকের দল, চলচ্চিত্র দর্শক শ্রেণী,

চিত্রকর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ারদেরও সামাজিক বর্গরূপে গণ্য করা যেতে পারে। সামাজিক বর্গের মানদণ্ড হল পদমর্যাদা (Status)।

সামাজিক গোষ্ঠী এবং সামাজিক বর্গের মধ্যে পার্থক্য আছে। সামাজিক বর্গ সামাজিক অর্থে কোন গোষ্ঠী নয়। সামাজিক গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু সামাজিক বর্গ হল সম্প্রদায়ের এমন একটি অংশ, যার ব্যক্তিরা পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত নয়। শুধুমাত্র পদমর্যাদার ভিত্তিতে তাদের একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ধরা যাক ঔপন্যাসিক—একটি সামাজিক বর্গ। এক্ষেত্রে পেশার দিক থেকে ঔপন্যাসিকদের একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তারা পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত নয়। কিন্তু যখন ঔপন্যাসিকবৃন্দ পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত হয়ে কোন নির্দিষ্ট সংগঠনের মধ্যে থেকে পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে তখনই তারা একটি সামাজিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। উদাহরণ স্বরূপ : ভারতীয় লেখক সংঘ একটি সামাজিক গোষ্ঠী কিন্তু ভারতীয় লেখক শ্রেণী একটি সামাজিক বর্গ, কোন সামাজিক গোষ্ঠী নয়। কাজেই সামাজিক বর্গের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলেই, তারা সামাজিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়।

সামাজিক সমষ্টি (Social Aggregate) হল কোন একটি স্থানে অল্প বা বহুলোকের একত্র সমাবেশ, যাদের মধ্যে কোন সামাজিক সম্পর্ক নেই। যেমন, স্বাধীনতা উৎসব দেখার জন্য রাজপথে সমবেত জনমণ্ডলী, বা আমোদ প্রমোদের জন্য একই উদ্যানে সমবেত একাধিক ব্যক্তি। সামাজিক সমষ্টির সঙ্গে সামাজিক গোষ্ঠীর পার্থক্য হল, প্রথম ক্ষেত্রে ব্যক্তিদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের অভাব, যা শেষোক্ত ক্ষেত্রে উপস্থিত। সামাজিক গোষ্ঠীও একটা সামাজিক সমষ্টি তবে, এই সমষ্টির ক্ষেত্রে সভ্যদের মধ্যে সুস্পষ্ট সামাজিক সম্পর্ক থাকে এবং একটা স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে থেকে কোন সাধারণ স্বার্থ বা লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে সভ্যরা পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে ; যেমন, কোন ফুটবল ক্লাবের সভ্যবৃন্দ।

সামাজিক সমষ্টির সঙ্গে সামাজিক বর্গের পার্থক্য আছে। প্রথম ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি একই স্থানে সমবেত, অথচ তাদের মধ্যে কোন সামাজিক সম্পর্ক নেই। কিন্তু সামাজিক বর্গের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা যে কোন বিশেষ স্থানে সমবেত বা উপস্থিত, তা নয়। পদ মর্যাদার ভিত্তিতে তারা একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মাত্র।

৩। গোষ্ঠীর বিভিন্ন রূপ (Different kinds of groups) :

বিভিন্ন আদর্শের মাপকাঠিতে সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে বিভিন্ন ভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন—গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বা ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বা গোষ্ঠীর স্থায়িত্বের ভিত্তিতে এবং আরও নানা ভিত্তিতে সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ হতে পারে। এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে যেগুলি উল্লেখযোগ্য সেগুলিই আমরা আলোচনা করব :

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক গোষ্ঠী : কুলে (*C. H. Cooley*) সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে (i) প্রাথমিক গোষ্ঠী (Primary Groups) এবং (ii) মাধ্যমিক গোষ্ঠী (Secondary Groups)—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলিকে বলা হয় মুখোমুখী গোষ্ঠী (Face-to-Face Group)। এ নামে অভিহিত করার একটা কারণও আছে। প্রাথমিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যে সম্পর্ক বর্তমান, সে সম্পর্ক হল প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ঠ। মুখোমুখি পরিচয়ই তার বৈশিষ্ট্য। একটা নিবিড় সম্পর্ক এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গড়ে ওঠে। পরিবার, ছোট শিশুদের খেলার দল, পাড়া ইত্যাদি প্রাথমিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। প্রাথমিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন সভ্যরা পরস্পর মিলিত হয়ে এক আঙ্গিক ঐক্য গড়ে তোলে।

অনেক সময় এ সব প্রাথমিক গোষ্ঠী কোন বৃহত্তর সংগঠনের অঙ্গীভূত হয়েও নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে। যেমন, 'কলেজ ক্রিকেট ক্লাব'। এই ক্ষুদ্র সংগঠনটি 'কলেজ'—এই বৃহত্তর সংগঠনের অঙ্গীভূত, কিন্তু 'কলেজ ক্রিকেট ক্লাব' হিসেবে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। প্রাথমিক গোষ্ঠী কৃষ্টিমূলকও হতে পারে; যেমন, কোন সাংস্কৃতিক সংগঠন।

পূর্বোক্ত ছোট ছোট গোষ্ঠী ভিন্ন সমাজে অনেক বড় বড় গোষ্ঠী আছে। যেমন—ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল, শিক্ষকদের সমিতি ইত্যাদি। এ সব গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একটা সাধারণ গোষ্ঠী-চেতনা আছে এবং চেতনা-উদ্ভূত একটা ঐক্যবোধও আছে। কিন্তু ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক, সে সম্পর্ক তত প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ নয়। প্রাথমিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মত এদের সকলের মধ্যে কোন মুখোমুখী পরিচয় নেই। এ জাতীয় গোষ্ঠী হল মাধ্যমিক গোষ্ঠী (Secondary Group)।

প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Primary Groups) : প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় :

প্রথমতঃ, প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি সুসংগঠিত হলে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা দেয় নিবিড় অন্তরঙ্গতা, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও সহানুভূতি এবং পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করার আগ্রহ ও উৎসাহ। প্রাথমিক গোষ্ঠীর কোন সভ্য নিজের সঙ্গে সমস্ত গোষ্ঠীর একাত্মতা অনুভব করে। প্রাথমিক গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে 'আমরা' এই ভাবটা (we-feeling) খুব প্রবল হয়ে ওঠে এবং পরস্পর পরস্পরকে অত্যন্ত কাছে টেনে নেয়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি আকারে ছোট হওয়াতে এর ব্যক্তির সংখ্যা সাধারণতঃ সীমিত হয়। বস্তুতঃ, গোষ্ঠীগুলির বৈশিষ্ট্যই এমন যে এর ব্যক্তির সংখ্যা সীমিত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রাথমিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রুচির যদি সাদৃশ্য না থাকে, তাহলে ক্রমশঃ তাদের পারস্পরিক আচরণ কৃত্রিম হয়ে পড়ে।

তৃতীয়তঃ, প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি সার্বিক এবং মানব সমাজের ক্রমবিকাশের সর্বস্তরে এগুলি দৃষ্ট হয়।

চতুর্থতঃ, সব সামাজিক সংগঠনের মূল কেন্দ্র হল প্রাথমিক গোষ্ঠী। এই প্রাথমিক গোষ্ঠী হল মানব প্রকৃতির সৎগুণগুলির উৎসস্থল। ভালবাসা, সহানুভূতি, সহযোগিতা, ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা, মমতা, সাধুতা, মানব প্রকৃতির সর্ববিধ সদগুণের উদ্ভব হয় এই প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি থেকে।

পঞ্চমতঃ, মানব সমাজের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির আবির্ভাব হয়। শুধু মাত্র সামাজিক জীবনের কয়েকটি ক্ষেত্র জুড়েই যে তাদের অস্তিত্ব তা নয় ; পরিবার, খেলার দল, পাড়া এ ছাড়াও অনেক প্রাথমিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আছে।

খুব জটিল বিধিবদ্ধ সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রেও প্রাথমিক গোষ্ঠীর উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। একটি বড় কারখানার মধ্যেও ছোট ছোট শ্রমিক গোষ্ঠী দেখা যায় যারা সমবেতভাবে কোন একটা কাজে নিযুক্ত। এই সব গোষ্ঠীগুলির মধ্যে নিবিড় আন্তরিকতা, মুখোমুখি পরিচয়, প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। এইসব গোষ্ঠীগুলি বিধিবদ্ধ গোষ্ঠী নয়। এইভাবে প্রায় সব বিধিবদ্ধ সামাজিক সংগঠনে তা' সরকারী, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক যাই হোক না কেন, প্রাথমিক গোষ্ঠীর উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। এই সব অবিধিবদ্ধ প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে

উদ্ভূত হয়। এই সব গোষ্ঠীগুলির মধ্যে 'আমরা' ভাব প্রবল হয়ে দেখা দেয় এবং ব্যক্তিরা পরস্পরের মধ্যে স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশ করে।

ষষ্ঠতঃ, প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির সভ্যদের পারস্পরিক সম্পর্কেরও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সভ্যদের মধ্যে উদ্দেশ্যের অভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তাছাড়া এই গোষ্ঠীতে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক স্বতঃস্ফূর্ত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ঐচ্ছিক, এবং একান্ত নিবিড়।

সমাজজীবনে প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা (Role of Primary Groups in Social Life) ঃ সমাজ জীবনে প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। এই প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি ব্যক্তির জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই সব গোষ্ঠীগুলির নীতি ও আদর্শ ব্যক্তির চরিত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সি. এইচ. কুলে (*C. H. Cooley*)-এর মতে নানা অর্থে এই গোষ্ঠীকে প্রাথমিক বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রধানতঃ এদের প্রাথমিক এই কারণে বলা হয় যেহেতু ব্যক্তির সামাজিক প্রকৃতি এবং আদর্শ গঠনে এরাই মৌলিক গোষ্ঠী।

ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে প্রাথমিক গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। সামাজিকীকরণের (socialization) ক্ষেত্রেও প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সামাজিকীকরণ বলতে বোঝায় সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিশু তার সমাজের বা গোষ্ঠীর কর্তব্য সম্পাদনকারী এবং সমাজের কার্যে অংশ গ্রহণকারী সভ্য হতে শিক্ষা করে। সমাজের প্রচলিত আচরণ পদ্ধতি শিক্ষা করার আর এক নাম সামাজিকীকরণ। ব্যক্তির সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে অনেকগুলি প্রক্রিয়া যুগপৎ ক্রিয়া করে। প্রধান প্রধান প্রক্রিয়াগুলি হল— বাস্তবতাবোধের বিকাশ, নিজের সম্পর্কে ধারণার বিকাশ, ভাষা আয়ত্তীকরণ, প্রয়োজনীয় কাজকর্ম শিক্ষা করা এবং জীবনের বিভিন্ন ভূমিকার জন্য প্রস্তুতি। পরিবার, সমবয়সীদের গোষ্ঠী এবং বিদ্যালয়ের খেলাধুলা ব্যক্তির সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এগুলি সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এদের মাধ্যমেই সংস্কৃতির সঞ্চালন সম্ভব হয় এবং এই ব্যাপারে এদের স্থান অন্য কোন গোষ্ঠীর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় পরিবার বা গৃহের ভূমিকা। গৃহেই শিশু তার চিন্তা, আবেগ ও কর্মের অভ্যাস গঠন করে। বস্তুতঃ,

সব মৌলিক অভ্যাস শিশু পরিবারেই শিক্ষা করে। কিভাবে কথা বলতে হয়, নিজের আবেগগুলিকে প্রকাশ করতে হয়, নিজের শরীরের যত্ন নিতে হয়, কিভাবে ভালমন্দ নিরূপণ করতে হয়, কিভাবে সহযোগিতা করতে হয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়, অপরের প্রতি সমবেদনা, সহানুভূতি ও ভালবাসা জানাতে হয়—সবই সে শিক্ষা করে পরিবারের মধ্যে থেকে। ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক অপ্রত্যাশিত অবস্থার সঙ্গে যাতে শিশু মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে তার জন্যে আগে থেকেই গৃহের পরিবেশ তার মধ্যে মানসিক প্রস্তুতি এনে দেয়। গুরুজন, ছোট বড় সবার সঙ্গে কেমন আচরণ করা উচিত, এ সবই পরিবার তাকে শিক্ষা দেয়। বস্তুতঃ, বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করার শিক্ষা পরিবার থেকেই শিশু লাভ করে।

সমবয়সীদের গোষ্ঠীতে শিশু শিক্ষা করে কি দিতে হয়, কি নিতে হয়, সমবয়সীদের সঙ্গে কিভাবে মেলামেশা করতে হয়। কিভাবে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হয়, প্রতিযোগিতা করতে হয়, নিজের ইচ্ছাকে প্রকাশ করতে হয়—সবই সে সমবয়সীদের গোষ্ঠীতে শিক্ষা করে। সমবয়সীদের গোষ্ঠীতে শিশু নিজের আচরণের ভালত্ব ও মন্দত্বের প্রত্যক্ষ এবং খোলাখুলি সমালোচনা শুনতে পায়। বস্তুতঃ, এই ধরনের গোষ্ঠী হল দর্পণের মত, এরা হল 'সমাজদর্পণ'। সমাজস্বীকৃত আচরণ যাতে শিশু শিক্ষা করে, সেহেতু এই সমালোচনার প্রয়োজন আছে। সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে শিশু নিজের সম্পর্কে যথাযথ ধারণা করতে পারে। নিজের সামর্থ্য এবং তার সীমা সম্পর্কে সে সচেতন হতে পারে এবং নিজের সম্পর্কে নির্ভুল ও সুসমঞ্জস ধারণা গঠন করতে পারে। পরিবারকে সমাজের ভিত্তি এবং সমবয়সীদের গোষ্ঠীকে ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরী করার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সংগঠন গণ্য করা হয়।

ম্যাকাইভার এবং পেজ-এর মতে পরিবার সমাজের রহস্যের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করিয়ে দেয়। আর শিশুর খেলার দল ও সমবয়সীদের গোষ্ঠী আমাদের সামাজিক আবেগকে সৃজনমূলক আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেয়।

প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি মানুষের একটা বিশেষ প্রয়োজন সাধন করে যা অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি পারে না। সেটা হল মানুষের অপর মানুষের নিবিড় সান্নিধ্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষা। এর জন্য প্রয়োজন একটা সীমিত গোষ্ঠী যেখানে মানুষ নিবিড়ভাবে পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করতে পারে, নিজের ব্যক্তিত্বকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও বিনা নিয়ন্ত্রণে প্রকাশ করতে পারে। বৃহত্তর

সামাজিক সংগঠনগুলি ব্যক্তির এই প্রয়োজন মেটাতে পারে না। পরিবার, সমবয়সীদের গোষ্ঠী তার সভ্যদের যত আপন মনে করে কাছে টেনে নেবে, অন্য বৃহত্তর সংগঠনের কাছে কি তা প্রত্যাশা করা যায়?

প্রতিটি বৃহত্তর বিধিবদ্ধ সামাজিক সংগঠনে যে মুখোমুখী অবিধিবদ্ধ গোষ্ঠীগুলির উদ্ভব হয়, সেগুলি প্রথমোক্ত সংগঠনগুলির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শিল্প সংক্রান্ত সংগঠনগুলিতে যেসব মুখোমুখী গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে সেগুলি শিল্প উৎপাদনে, দক্ষতা, শ্রমিকদের নৈতিকতা, শ্রমিক সংসদের কার্যাবলীর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রাথমিক গোষ্ঠীতে ব্যক্তি যে সব আদর্শ শিক্ষা করে, সেগুলি মাধ্যমিক গোষ্ঠীতে সঞ্চালিত হয় এবং মাধ্যমিক গোষ্ঠীর কার্যাবলীকে অনুপ্রাণিত করে। কিংসলে ডেভিস বলেন, এইসব প্রাথমিক গোষ্ঠী ছাড়া, বৃহত্তর মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলি হবে মূলবর্জিত বৃক্ষের মতন, নিজের ভারেই যেগুলি ভূলুণ্ঠিত হবে।

কোন প্রাথমিক গোষ্ঠী যদি অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তাহলে সমাজ-জীবনে নানারকম দুর্নীতির আবির্ভাব ঘটে। কৃষ্টিমূলক প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি, যেমন—'সাহিত্য-সংসদ', 'দর্শন-চক্র' প্রভৃতি যদি সুসংগঠিত হয় তবে এদের সভ্যদের মধ্যে সহযোগিতার ভাব খুবই প্রবল হয়; কারণ তারা তাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে যেমন সচেতন হয় তেমনই লক্ষ্যকে লাভ করার জন্যও সচেষ্ট হয়।

মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Secondary Groups): মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়:

প্রথমতঃ, এই জাতীয় গোষ্ঠীগুলি সাধারণতঃ অর্থনৈতিক অবস্থা ও স্বার্থের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় মাধ্যমিক গোষ্ঠীর বিস্তৃতি একটু ব্যাপক। কিন্তু প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় এ গোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত কৃত্রিম।

তৃতীয়তঃ, এরূপ গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক তেমন আন্তরিক ও নিবিড় হয় না বরং এ সম্পর্ক অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক, পরোক্ষ এবং বাহ্যিক (impersonal, indirect and formal)। মাধ্যমিক গোষ্ঠীতে সভ্যদের সম্পর্ক নৈর্ব্যক্তিক। কারণ এই সব গোষ্ঠীতে ব্যক্তিদের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয় অনেক সময়ই হয় না। মাধ্যমিক গোষ্ঠীতে ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির সঙ্গে মুখোমুখী পরিচয়ে বিশেষ আগ্রহ থাকে না। তাছাড়া আগ্রহ ব্যক্তির দিকে যতটা নয়, তার থেকে বেশী লক্ষ্য তার

অভীষ্টপূরণে। এরূপ গোষ্ঠীতে সমষ্টিগত চেতনার স্থান দখল করে স্বাতন্ত্র্যভাব, সামাজিক কাজকর্ম হয়ে ওঠে নেহাৎ চুক্তির ব্যাপার।

চতুর্থতঃ, প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলির স্থায়িত্ব অনেক বেশী। ছোট শিশুদের খেলার দলের তুলনায় শিক্ষক সমিতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি স্বাভাবিক। মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলি কৃত্রিম। প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলি অনেক বেশী নৈর্ব্যক্তিক ও বাহ্যিক এবং সে কারণে অনেক আইন-কানুনের মাধ্যমে মাধ্যমিক গোষ্ঠীর সভ্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা দেয়।

পঞ্চমতঃ, মাধ্যমিক গোষ্ঠীর সভ্যদের যে পারস্পরিক সম্পর্ক তা অনেকটা চুক্তিনির্ভর। চুক্তির ক্ষেত্রে শর্তগুলি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত থাকে এবং ব্যক্তিকে সেই চুক্তির শর্তগুলিকে মেনে চলতে হয়। তাছাড়া চুক্তিটি কোন লক্ষ্য সিদ্ধ করার উপায়স্বরূপ, নিজেই কোন লক্ষ্য নয়।

মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগতিবিধান করে তার কার্যকলাপ চালাতে পারে না, মুখোমুখী গোষ্ঠীগুলিতে যেটা সম্ভব হয়। মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলিতে কাজকর্ম অনেকটা বিধিবদ্ধ এবং যান্ত্রিক নিয়মকানুনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

ষষ্ঠতঃ, পরোক্ষ সহযোগিতা মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলির বৈশিষ্ট্য। প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির ক্রিয়া একই ধরনের, সকলেই একই কার্যপ্রক্রিয়ার অংশীদার। কিন্তু বড় বড় সংগঠনে, যেখানে শ্রমবিভাগের ব্যবস্থা আছে, সদস্যদের কাজকর্ম সে-সব ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলিতে পারস্পরিক নির্ভরতার মাধ্যমে কার্য সম্পন্ন হয়, কিন্তু একই প্রক্রিয়াতে নয়।

সপ্তমতঃ, মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলিতে সদস্যদের আনুগত্য লাভের জন্য এবং সংগঠনের সংহতি রক্ষা করার জন্য যে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হয়, তা বিধিবদ্ধ, পরোক্ষ এবং নৈর্ব্যক্তিক।

সামাজজীবনে মাধ্যমিক গোষ্ঠীর ভূমিকা (Role of Secondary Groups in Social life) ঃ বর্তমান সভ্যযুগে মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলির সমাজে এক উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে। প্রাচীন সম্প্রদায়গুলিতে জনসংখ্যা ছিল সীমাবদ্ধ। তখন প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি সমাজ জীবনের অনেক চাহিদা পূরণ করতে পারত। কিন্তু সমাজের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন দেখা দিল শ্রমবিভাগের এবং কোন বিশেষ বিষয়ে দক্ষ এমন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন দেখা দিল। তখনই মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলির আবির্ভাব ঘটল। সমাজের বিস্তৃতির

সাথে সাথে মানুষের স্বার্থের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য দেখা দিল। এক এক জনের এক এক ধরনের স্বার্থ। কাজেই মানুষের এই বিশেষ বিশেষ স্বার্থ সিদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন দেখা দিল বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর। এই জাতীয় গোষ্ঠীর কাজকর্মের জন্য প্রয়োজন দেখা দিল বিশেষজ্ঞের। এর ফলে গড়ে উঠল বড় বড় সংগঠনের, যেখানে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ-নয়, নৈর্ব্যক্তিক।

মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলির সামাজিক ভূমিকা অন্য দিক থেকেও আলোচনা করা যেতে পারে। শিশুর সামাজিকীকরণ ও শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির অবদান কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে এ ব্যাপারে অন্যান্য সামাজিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা একেবারে নগন্য নয়। প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবার যে ভূমিকা পালন করে শিশুর সামাজিকীকরণে ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে পরবর্তীকালে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংঘগুলিকে সেই দায়িত্বের গুরুভার কিছুটা বহন করতে হয়। শিশু যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন তার জীবনের অধিকাংশ সময়ই মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলিতে অতিবাহিত হয় এবং এই গোষ্ঠীগুলি তার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে।

একথা সত্য, প্রাথমিক গোষ্ঠীতে ব্যক্তির অপর ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক যতখানি ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ, মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলিতে তা' নয়। কিন্তু জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি মেটাতে পারে না। মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলি থেকে ব্যক্তি আরও নূতন নূতন সংগঠনের সংস্পর্শে আসতে পারে। তার ফলে তার দৃষ্টিভঙ্গীও যেমন প্রসারিত হয়, সমাজ জীবনের নূতন নূতন অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগও সে পেয়ে থাকে। পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে যখন ব্যক্তি তার জীবিকার জন্য কোন বৃহত্তর সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন সেই সংগঠনই তাকে সমাজের অন্যান্য বৃহত্তর সংগঠনের সদস্য হবার সুযোগ করে দেয়। হয়ত সে কোন বৃহত্তর সাংস্কৃতিক সংঘের সভ্য হয় এবং কালক্রমে তার একজন সক্রিয় কর্মী হয়ে অন্যান্য বিবিধ সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে তার চিন্তাধারা যেমন প্রসারিত হয়, তেমনি জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার মধ্যে এনে দেয় আত্মবিশ্বাস, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও কর্ম সাধনের একাগ্রতা। বিভিন্ন মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে সে নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা করে এবং নিজের সম্পর্কেও সে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী সচেতন হয়।

জটিল শহরাঞ্চলে মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলির সামাজিক ভূমিকা প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির তুলনায় কোন অংশে কম নয়। কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য পরিবারে সদস্যদের

পারস্পরিক নৈকট্য নানা ব্যাপারে নিরাপত্তা সূচিত করে; কিন্তু শহরাঞ্চলের জটিল জীবনে পরিবারগুলি সকল ব্যাপারে সেই নিরাপত্তার সূচনা করতে পারে না। চাকুরিজীবি ব্যক্তিদের নানা কারণে মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলির উপর নির্ভর করতে হয় যেগুলি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ছাড়াও সামাজিক অন্যান্য ব্যাপারেও নিরাপত্তার সূচনা করতে পারে।

মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলিতে সদস্যদের কাজকর্মের স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়মকানুনের নিয়ন্ত্রণ হেতু অনেকটা বাধা পায় সত্য, কিন্তু এই মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলিও সদস্যদের হৃদ্যতা ও প্রীতির প্রসারের জন্য নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যার মাধ্যমে সদস্যরা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হতে পারে। সম্পর্কের গভীরতাই মূলতঃ প্রাথমিক গোষ্ঠীকে মাধ্যমিক গোষ্ঠী থেকে পৃথক করে। কিন্তু ঘটনার বিপর্যয় হেতু প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি যেমন সময় সময় মাধ্যমিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয় আবার মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলিও সময় সময় প্রাথমিক গোষ্ঠীর রূপ লাভ করে। তবে ব্যক্তির জীবন ও চরিত্রের উপর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক গোষ্ঠীর প্রভাবের তুলনামূলক আলোচনা করলে প্রথমোক্ত গোষ্ঠীর প্রভাব যে অধিকতর তা অস্বীকার করা চলে না।

৪। অন্তর্গোষ্ঠী ও বহির্গোষ্ঠী (In-group and Out group) :

সাম্‌নার (*W. G. Sumner*) গোষ্ঠীগুলিকে অন্তর্গোষ্ঠী (In-Group) এবং বহির্গোষ্ঠী (Out-group)—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। অন্তর্গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই মধুর এবং গোষ্ঠীর প্রতি তাদের আনুগত্য খুবই প্রবল। অন্তর্গোষ্ঠীর মধ্যে 'আমরা এই ভাবটা' (we-feeling) আছে এবং 'আমরা করি', 'আমরা অনুভব করি', 'আমরা বিশ্বাস করি'—এই সব উক্তির মাধ্যমে সেই ভাবটা প্রকাশিত হয়। যেমন—পরিবার, পাড়া (neighbourhood) হল অন্তর্গোষ্ঠীর উদাহরণ। অন্তর্গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে গোষ্ঠী-সংহতির চেতনা খুবই প্রবল থাকে।

বহির্গোষ্ঠী হল সেই গোষ্ঠী যার প্রতি অন্তর্গোষ্ঠীর সভ্যরা শত্রুভাবাপন্ন, বা যাকে তারা কোন কারণবশতঃ পছন্দ করে না, বা যা তাদের কাছে ভীতির কারণস্বরূপ। আমাদের পাড়া আমাদের কাছে অন্তর্গোষ্ঠী, কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী পাড়া, যাদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতার ভাব লেগেই রয়েছে, আমাদের দিক থেকে সেটি বহির্গোষ্ঠী। শ্রমিকদের কাছে শ্রমিক সংসদ হল অন্তর্গোষ্ঠী, কিন্তু মালিকদের সংসদ হচ্ছে বহির্গোষ্ঠী।

ঐচ্ছিক গোষ্ঠী এবং অনৈচ্ছিক গোষ্ঠী (Voluntary group and Involuntary group) : যখন একাধিক ব্যক্তি একটি স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে থেকে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য স্বেচ্ছায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তখন এই জাতীয় গোষ্ঠীকে ঐচ্ছিক গোষ্ঠী বলা হয়। যেমন, কোন রাজনৈতিক দল, কোন ফুটবল ক্লাব, কেরাণী সংঘ, শ্রমিক সংঘ প্রভৃতি।

যখন কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি সেই গোষ্ঠীর সভ্যের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, তখন সেই গোষ্ঠীকে অ-নৈচ্ছিক গোষ্ঠী (Involuntary Group) বলা হয়। যেমন, পরিবার। কোন একটি বিশেষ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা না হওয়া কোন সন্তানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। পরিবার একটি স্বাভাবিক গোষ্ঠী। পরিবারে কোন সন্তানের যখন জন্ম হয় তখন স্বাভাবিক ভাবে সেই সন্তান সেই পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিধিবদ্ধ গোষ্ঠী এবং অ-বিধিবদ্ধ গোষ্ঠী (Formal and Informal Groups) : বিধিবদ্ধ গোষ্ঠী হল সেই সব গোষ্ঠী যে গোষ্ঠীতে আচার আচরণের জন্য নিয়মকানুন এবং সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার উদ্ভাবন করা হয়। শ্রেণীকক্ষ (Class) বিধিবদ্ধ গোষ্ঠীর উদাহরণ। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে কিছু ব্যবধান বা দূরত্ব থাকে। শিক্ষার্থীদের আচার আচরণে শোভনতা বজায় রেখে চলতে হয়। শ্রেণীকক্ষে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়।

অ-বিধিবদ্ধ গোষ্ঠী হল সেই সব গোষ্ঠী যেখানে নিয়মের কড়াকড়ি থাকে না। সভ্যরা চিন্তার এবং কার্যের স্বাধীনতা ভোগ করে।

ব্যক্তি তার সব রকম চিন্তাকেই প্রকাশ করার এবং সেই চিন্তানুযায়ী কার্য্য করার সুযোগ বিধিবদ্ধ গোষ্ঠীতে পায় না। অ-বিধিবদ্ধ গোষ্ঠীতে সভ্যরা তাদের মনোভাবকে যে রকম সহজে প্রকাশ করার সুযোগ পায়, বিধিবদ্ধ গোষ্ঠীতে সে সুযোগ পাওয়া কঠিন। যেমন, উপরে যে শ্রেণীকক্ষের ছাত্রবৃন্দের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তারা হল শ্রেণীকক্ষে বিধিবদ্ধ গোষ্ঠী। কিন্তু বিদ্যালয়ের ক্যান্টীনে (canteen) তারাই অ-বিধিবদ্ধ গোষ্ঠী। সেখানে তারা এমন অনেক বিষয় আলোচনা করে যা তারা শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করতে সাহস পায় না।

৫। সমাজে গোষ্ঠী এবং ব্যক্তি (Group and Individual in Society) :

সামাজিক গোষ্ঠী হল ব্যক্তির সমষ্টি যারা বিশেষ উদ্দেশ্য লাভের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়। গোষ্ঠীবদ্ধ ব্যক্তি একটি স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে থেকে পরস্পরের উপর

কার্য করে। কাজেই গোষ্ঠী হচ্ছে ব্যষ্টির সমষ্টি যারা পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত।

সমাজে গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের কয়েকটা ভুল বোঝাবুঝি থেকে সতর্ক থাকতে হবে। **প্রথমতঃ**, আমাদের কিছুতেই মনে করা যুক্তিযুক্ত হবেনা যে গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তির কোন রকম বিরোধিতা রয়েছে। বস্তুতঃ উভয়ের সম্বন্ধ সঠিকভাবে অনুধাবন করার উপরই উভয়ের প্রকৃতি যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যাবে। সমাজ-জীবনে অসংখ্য গোষ্ঠীর আবির্ভাবের মূলে মানুষের কোন সহজাত জৈবিক প্রবণতার অস্তিত্ব রয়েছে, অর্থাৎ কিনা সমাজে অসংখ্য গোষ্ঠীর অস্তিত্বের ব্যাখ্যা যদি মানুষের সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের ইচ্ছার মধ্যে সন্ধান না করে তার শারীরবৃত্তি বা জীবনধারা সংক্রান্ত বিজ্ঞানের মধ্যে সন্ধান করতে হয় তাহলে খুব ভুল হবে। আবার কোন কোন চরম আচরণবাদী বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী লেখক গোষ্ঠীর ধারণাকে ভ্রান্ত মনে করে সামাজিক ঘটনার মূলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির আচরণ নিহিত আছে মনে করেন। তাঁদের ধারণাকে যথার্থ মনে করলেও ভুল হবে। এই জাতীয় সিদ্ধান্ত করা থেকেও আমাদের সতর্ক হতে হবে। ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে অনেক ভ্রান্ত ধারণাই প্রচলিত, যেগুলি সম্পর্কেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যদি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্পর্ককে যথাযথভাবে বুঝে নেবার জন্য আমরা সচেষ্ট হই।

আদিম সমাজে আধুনিক সমাজের তুলনায় এত অধিকসংখ্যক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল না। কাজেই আদিম সমাজের সভ্যকে খুব অল্প সংখ্যক গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত হতে হত। আদিম সমাজে গোষ্ঠীগুলির ভিত্তি ছিল জ্ঞাতিত্ব, বয়স, লিঙ্গগত পার্থক্য বা মৌলিক পেশাগত পার্থক্যের উপর। সমাজে প্রচলিত আচার এবং অনুষ্ঠান অনুযায়ী প্রতিটি গোষ্ঠীর সদস্যপদ সদস্যকে এক বিশেষ ধরনের মর্যাদা দান করত এবং এই সদস্য হবার বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রে, যেমন বয়সের ভিত্তিতে গঠিত গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ছিল অনৈচ্ছিক ব্যাপার। আধুনিক সমাজে আদিম সমাজের তুলনায় গোষ্ঠীর সংখ্যা অনেক বেশী। সে কারণে ব্যক্তি অনেক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই সব গোষ্ঠীর মধ্যে, অনেক গোষ্ঠীর সভ্য হওয়া বা না হওয়া, আদিম সমাজের ব্যক্তির মতন, তার ইচ্ছা-নির্ভর নয়। সেকারণে ব্যক্তি তাদের এড়িয়েও যেতে পারে না। ব্যক্তি ইচ্ছা করুক বা না করুক, লিঙ্গগত পার্থক্যের উপর ভিত্তি যে গোষ্ঠীর বা বংশগত পার্থক্যের উপর ভিত্তি যে গোষ্ঠীর তার কোন একটিতে তাকে অন্ত ভুক্ত হতেই হবে। সে ইচ্ছা করুক বা না করুক

সে নাগরিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আধুনিক সমাজে ব্যক্তির কোন গোষ্ঠীর সভ্য সবার বিষয়টি অনেকক্ষেত্রে ঐচ্ছিক ব্যাপার। যেমন, কোন ক্লাবের সদস্য হওয়া বা কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়া। কাজেই ব্যক্তির দিক থেকে গোষ্ঠীর সভ্য হওয়া যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে অনৈচ্ছিক ব্যাপার তেমনি আবার ঐচ্ছিক ব্যাপার। ব্যক্তি কোন্ গোষ্ঠীর সভ্য হবে তার জন্য অনেক সময় তাকে চিন্তা করতে হয় কোন গোষ্ঠীকে সে অন্যগোষ্ঠীর তুলনায় বেশী অন্তরঙ্গ মনে করে। সে হয়ত কোন বৃহত্তর গোষ্ঠী বা সংগঠনের তুলনায় পরিবার, পাড়াকে বেশী অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী মনে করতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে, কোন কোন গোষ্ঠী তার জীবনে বিশেষ তাৎপর্যের সূচক, যেমন তার বৃত্তি বা পেশা সংক্রান্ত কোন গোষ্ঠী যার সভ্য হওয়া তার পেশার দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার এমনও হতে পারে যে, সে কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্য। তবে সে শুধু নামেই, দলের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে তার কোন বিশেষ যোগাযোগ নেই।

গোষ্ঠীর সভ্য রূপে অন্তর্ভুক্ত হবার বিষয়টির ক্ষেত্রে ব্যক্তি হল কেন্দ্রবিন্দু বা উৎসবিন্দু। ব্যক্তির জীবনে যদি গোষ্ঠীকে এক বাস্তব বিষয় বলে আমরা স্বীকার করি তাহলে গোষ্ঠী সম্পর্কে ব্যক্তির ধারণা এবং মনোভাবকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্পর্ককে বোঝার ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে আমাদের গণ্য করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ অন্তর্গোষ্ঠী এবং বহির্গোষ্ঠীর পার্থক্যের কথা বলা যেতে পারে। যেসব গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তি নিজেকে অভিন্ন মনে করে তারা হল তার অন্তর্গোষ্ঠী। যেমন—পরিবার, পাড়া, কলেজ, ইত্যাদি। ব্যক্তির মধ্যে যখন 'আমরা' এই ভাবটা তীব্র হয়ে দেখা দেয় তখনই সে একটা গোষ্ঠীকে অন্তর্গোষ্ঠী মনে করে, আবার যে গোষ্ঠীকে সে পছন্দ করে না, বা যার প্রতি সে শত্রু-ভাবাপন্ন, সে গোষ্ঠী হল তার কাছে বহির্গোষ্ঠী। ব্যক্তির মনোভাবই নির্দেশ করে কোন্টা অন্তর্গোষ্ঠী, কোন্টা বহির্গোষ্ঠী।

সমাজে গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ধারণ করার সময় মনে রাখা দরকার যে ব্যক্তি যে ব্যক্তিত্ব অর্জন করে গোষ্ঠীর তাতে যথেষ্ট অবদান রয়েছে, এবং ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে কোন গোষ্ঠীই সম্ভব নয়। গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির মনে একটা সমগ্রতার চেতনা জাগে। কাজেই গোষ্ঠীর স্বার্থে ব্যক্তিকে অনেক সময় আত্ম-স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়।

গোষ্ঠী জীবনের সামগ্রিক স্বার্থের কথা চিন্তা করে ব্যক্তিকে অনেক সময় স্বেচ্ছায় তার স্বাধীনতা খর্ব করতে হয়, ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়।

ব্যক্তির সামাজিক জীবন সমাজের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলির প্রভাবে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। ব্যক্তির অহং বোধের বিকাশ ঘটে। ব্যক্তি স্বাধীনভাবে কর্ম করার ক্ষমতা অর্জন করে। ব্যক্তির অভ্যাস, আদর্শ, ভাবধারা, চিন্তা, আচরণ, মূল্যবোধ সব কিছুর উপরেই গোষ্ঠীর সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পরস্পরের আবেদনে সাড়া দেওয়া, পরস্পরের ভাব বিনিময়ে ক্রিয়া করা, সামাজিক গোষ্ঠীর সংহতি বা ঐক্যের ভিত্তি স্বরূপ। মোটামুটি স্থায়ী গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে এই পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

গোষ্ঠী ব্যক্তির আত্মবিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করে বা আত্মশক্তিকে ব্যাহত করে—এই জাতীয় সিদ্ধান্ত ভুল। বরং এমন কথা বলাই যুক্তিসঙ্গত যে, গোষ্ঠী জীবনে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়, আত্মশক্তির বিকাশ ঘটে। গোষ্ঠীজীবন যাপনের মধ্য দিয়েই মানুষের মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটে। কাজেই ব্যক্তিই সব, গোষ্ঠী নিছক ভ্রান্তি মাত্র—এ ধারণা ভুল, আবার ব্যক্তি নিয়েই গোষ্ঠী, ব্যক্তি ছাড়া গোষ্ঠীর ধারণা নিছক শূন্যতা, যার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই।

মানুষ কেন স্বেচ্ছায় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে চায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় যে, যদিও ব্যক্তি সাধারণ ভাবে সমাজের অন্তর্ভুক্ত, তার দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যেই সম্পাদিত হয়। গোষ্ঠীর মধ্যে থেকেই ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে, যা গোষ্ঠী-বহির্ভূত জীবনে তার একক প্রচেষ্টায় সম্ভব হয় না।

প্রশ্নাবলী

১। সামাজিক গোষ্ঠীর স্বরূপ বর্ণনা কর। সামাজিক গোষ্ঠী, সামাজিক বর্গ এবং সামাজিক সমষ্টির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। (Discuss the nature of social groups. Distinguish between social groups, social categories and social aggregates.)

২। সমাজজীবনে—প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর। (Discuss the role of Primary groups and Secondary groups in social life.)

৩। প্রাথমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। (Discuss the characteristics of Primary group.)

৪। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। (Distinguish between Primary and Secondary groups.)

৫। (i) অন্তর্গোষ্ঠী ও বহির্গোষ্ঠী, (ii) ঐচ্ছিক গোষ্ঠী ও অনৈচ্ছিক গোষ্ঠী, (iii) বিধিবদ্ধ গোষ্ঠী এবং অবিধিবদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। (Distinguish between : (i) In-group and Out-group, (ii) Voluntary group and Involuntary group and (iii) Formal group and Informal group.)

———

অষ্টম অধ্যায়

পরিবার

(The Family)

১। পরিবার কাকে বলে (What is a Family ?)

সমাজ একটি বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী (Groups of men)। পরিবার সমাজের তুলনায় ক্ষুদ্রতর মানবগোষ্ঠী। বস্তুতঃ, গোষ্ঠী জীবনের প্রথম ধাপই হল পারিবারিক জীবন। জনমানবশূন্য কোন শূন্যতার মাঝখানে মানুষের জন্ম হয় না। প্রতিটি মানুষ একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে।

ম্যাকাইভার (*MacIver*) পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'পরিবার হল একটি গোষ্ঠী যা সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের জন্য সুনির্দিষ্ট এবং স্থায়ী স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত হয়'। পরিবার হল প্রাথমিক সামাজিক সংগঠন, কারণ পরিবার ছাড়া সমাজের অস্তিত্বের কথা ভাবা যায় না। সমাজে পরিবারের অস্তিত্ব প্রাণীদেহে কোষের অস্তিত্বের সমতুল্য। পরিবার একটি প্রাথমিক গোষ্ঠী (primary group)। পরিবার হল একটি সার্বিক প্রতিষ্ঠান। যেখানে মনুষ্য সমাজ সেখানেই পরিবারের অস্তিত্ব।

সন্তানোৎপাদনের একমাত্র স্বীকৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল পরিবার। পরিবার মানুষের জৈবিক প্রয়োজন সাধন করে এবং বংশগতি অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়তা করে। অবশ্য জৈবিক প্রয়োজন ছাড়াও, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক, স্নেহ-সম্পর্কীয়, আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত প্রভৃতি প্রয়োজনও পরিবার মিটিয়ে থাকে।

সাধারণতঃ পরিবারের আকার ক্ষুদ্র হয়। একক পরিবার (Individual family) গঠিত হয় স্বামী-স্ত্রী এবং এক বা একাধিক সন্তান নিয়ে। সময় সময় স্বামী কিংবা স্ত্রীর আত্মীয়স্বজন তাদের সঙ্গে বসবাস করেন। কোন কোন সমাজে ভৃত্যদেরও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, ইংরেজী '*Family*' কথাটি এসেছে 'Famulus' শব্দ থেকে ; যার অর্থ হল 'ভৃত্য' এবং 'familia' শব্দটি বোঝাত 'ভৃত্যের সমষ্টিকে', যারা একই সংসারের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীকালে 'family' বলতে কেবলমাত্র ভৃত্যদের সমষ্টিমাত্রকে না বুঝিয়ে সংসারের সব ব্যক্তিকেই বোঝাত এবং এদের সকলকেই সংসারের কর্তা অর্থাৎ পিতার সম্পত্তিরূপে গণ্য করা হত। আধুনিককালে পরিবার বলতে

ভৃত্যদের আর পরিবারের সভ্যরূপে গণ্য করা হয় না, যদিও অনেক পরিবারেই ভৃত্য অন্তর্ভুক্ত হয়। পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদেরও আজকাল আর গৃহকর্তার সম্পত্তি বলে মনে করা হয় না। এইভাবে কালের গতিতে পারিবারিক গঠন ও ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে।

পরিবারের সঙ্গে বিবাহপ্রথাকে এক করে দেখা যুক্তিযুক্ত নয়, পরিবার একটি ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন, বিবাহ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। বিবাহ একটি বৈধ সামাজিক অনুষ্ঠান যেটি একটি নর ও নারীকে তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার ও সন্তান উৎপাদনের সামাজিক অনুমোদন দান করে। বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই একটি নূতন পরিবারের আবির্ভাব ঘটে।

পরিবারের সবচেয়ে সরল রূপ হল একক পরিবার। পরিবারের জটিল রূপও চোখে পড়ে বহু-বিবাহকারী পরিবারে (Polygamous Family) বা যৌথ পরিবরে (Joint Family)। যদিও বর্তমানে বহু যৌথ পরিবার আছে তবুও আধুনিক সমাজে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কারণে এই যৌথ পরিবারের ভাঙন ধরেছে এবং বর্তমানে একক পরিবার গঠনের মনোভাবই প্রবল।

এককই হোক বা যৌথ হোক, পরিবার হল সমাজ-জীবনের প্রথম ধাপ। কালের গতিতে পারিবারিক জীবনের নানারকম পরিবর্তন ঘটলেও, সমাজ-জীবনে পরিবারের ভূমিকার গুরুত্ব বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায় নি। পরিবারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক। গিস্‌বার্ট (*Gisbert*) বলেন, "এর বিভিন্ন সভ্যদের মধ্যে সাধারণতঃ যে অন্তরঙ্গতা ও স্নেহ বিরাজ করে, তাই হল এর স্বতঃস্ফূর্ত ঐক্য এবং কর্মের সহযোগিতার ভিত্তি; এমন কি যখন মতের অনৈক্য এবং বিবাদ দেখা দেয় তখন অনেক সময় পরিবারের সভ্যদের মধ্যে স্নেহের তীব্রতা হচ্ছে তার কারণ।"[1]

ম্যাকাইভার (*MacIver*) পরিবারের পক্ষে কতকগুলি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা (১) সহবাসের সম্পর্ক (a mating relationship), বিবাহ কিংবা অন্য কোন আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা (a form of marriage or other institutional arrangement)—যে ব্যবস্থা অনুযায়ী এই সহবাস সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত এবং রক্ষিত হয়, (২) নামকরণের ব্যবস্থা এবং বংশ-গণনার পদ্ধতি (a system of nomenclature involving also a mode of reckoning descent), (৩) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (economic provision) যা

1. *P. Gisbert :* Fundamentals of Society ; Page 95.

সন্তানের জন্ম ও প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজন এবং (৪) একটি সাধারণ বাসস্থান (a common habitation)।

পরিবারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য (Distinctive Features of the Family Organization):

সমাজ-জীবনে ছোট-বড় নানারকম সামাজিক সংগঠনের (Organiz ation) অস্তিত্ব আছে। কিন্তু পরিবারের তুলনায় কোনটির সামাজিক গুরুত্ব বেশী নয়। পরিবার সমগ্র সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত করে এবং পারিবারিক পরিবর্তন সমস্ত সমাজ-জীবনের উপর প্রতিক্রিয়া ঘটায়। পরিবারের মধ্যে ভাঙন ধরলে সমস্ত সমাজ-জীবনের ভাঙন ধরতে পারে।

ম্যাকাইভার এবং পেজ (*MacIver and Page*) 'Society' গ্রন্থে পরিবারের নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলেছেন। যথা,

(ক) **বিশ্বজনীনত্ব (Universality):** সমাজ-জীবনের যত রকম রূপ আছে, পরিবার হল সংঘবদ্ধ জীবনের সবচেয়ে বিশ্বজননীন রূপ। সব সমাজেই এবং সমাজ বিকাশের প্রত্যেক স্তরেই পরিবারের অস্তিত্ব রয়েছে। এমন কি নিম্নতর প্রাণীদের মধ্যেও পারিবারিক জীবনের অস্তিত্ব দেখা যায়।

(খ) **আবেগময় ভিত্তি (Emotional Basis):** বংশধারা সংরক্ষণের যে জৈবিক প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য তার উপরই বিশেষ করে পরিবারের ভিত্তি। আমাদের দৈহিক প্রবৃত্তি, মানসিক আবেগ এবং প্রবণতার প্রধান কেন্দ্র পরিবার। যেমন—সহবাস ও সন্তান উৎপাদন প্রবৃত্তি, সন্তানের প্রতি মাতাপিতার স্নেহ ও ও যত্ন, এ ছাড়াও আছে ভালবাসা, আবেগ, অনুরাগ, মায়া, মমতা, নিজের অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি।

(গ) **গঠনমূলক প্রভাব (Formative Influence):** সমাজ-জীবনের প্রাথমিক রূপ হল পরিবার। পারিবারিক পরিবেশেই মানুষ প্রথম বর্ধিত হয় এবং মানুষের জীবনের উপর পরিবারের প্রভাবই সর্বাধিক। দেহ ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেই পরিবার সামাজিক জীবের চরিত্র গঠন করে থাকে।

(ঘ) **সীমিত আকার (Limited Size):** পরিবার হল সবচেয়ে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী-জীবন। সমাজ-জীবনের অন্যান্য সংগঠনের তুলনায় পরিবার সবচেয়ে ক্ষুদ্র, কারণ কতকগুলি জৈবিক প্রয়োজনের দ্বারা পরিবারের সংগঠন নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট হয়। একক পরিবার পরিবারের সরলতম রূপ। স্বামী-স্ত্রী এবং এক বা একাধিক সন্তান নিয়ে একক পরিবার গঠিত হয়।

(ঙ) **সামাজিক সংগঠনের মূল কেন্দ্র (Nuclear Position in the Social Structure) :** অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের মূল কেন্দ্র হল পরিবার। বস্তুতঃ সমাজ-জীবন বহুলাংশে পরিবারেরই সমষ্টি।

(চ) **সভ্যদের দায়িত্ব (Responsibilty of the Members) :** অন্য কোন রকম সংঘ বা সংগঠনের তুলনায় পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক খুবই নিবিড় এবং অন্তরঙ্গ। মানুষ প্রয়োজনে দেশের জন্য যুদ্ধ করে এবং প্রাণ বিসর্জন দেয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ পরিবারের জন্য সমস্ত জীবন ধরেই পরিশ্রম করে। পারিবারিক জীবনেই নরনারীকে কেবলমাত্র নিজের প্রয়োজন ছাড়াও অপরের জন্য কঠিন কাজ করতে হয় এবং কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়।

(ছ) **সামাজিক নিয়মকানুন (Social Regulation) :** সামাজিক বিধিনিষেধ এবং আইন-সম্পর্কীয় বিধি পরিবার জীবনকে সুরক্ষিত করে, পরিবারের বিবাহ-প্রথা নিয়ন্ত্রিত করে। যদিও বিভিন্ন সমাজে এই বিবাহ-প্রথা বিভিন্ন রকম, তবুও কোন একটি প্রথাকে মেনে চলতেই হয়।

(জ) **পরিবারের স্থায়িত্ব এবং অস্থায়িত্ব (Its Parmanent and Temporary Nature) :** পারিবারিক সংগঠন যদিও স্থায়ী এবং বিশ্বজনীন তবু সংঘ হিসেবে পরিবার হল সবচেয়ে স্বল্প-স্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল। একই পরিবারের মধ্যে অসংখ্য পরিবর্তন প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। যে পুরুষ ও নারীকে কেন্দ্র ক'রে একটি পরিবারের শুরু, তাদের মৃত্যুর পর তাদের সন্তানদের কেন্দ্র ক'রে নতুন পরিবার জন্মলাভ করছে। সে কারণে আমরা যখন কোন প্রাচীন পরিবারের কথা উল্লেখ করি তখন বুঝতে হবে যে, একাধিক পরিবার পরম্পরায় তার স্থায়িত্ব বজায় রয়েছে।

২। পরিবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক গোষ্ঠি (Family—the most important primary group) :

প্রাথমিক গোষ্ঠী হল সেই গোষ্ঠী যে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। মুখোমুখী পরিচয় এই গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য। একটা নিবিড় সম্পর্ক এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গড়ে ওঠে। পরিবার, ছোট শিশুর খেলার দল, পাড়া প্রভৃতি প্রাথমিক গোষ্ঠীর উদাহরণ।

পরিবার একটি প্রাথমিক গোষ্ঠী। এটিকে প্রাথমিক গোষ্ঠীরূপে গণ্য করার কারণ, এটি এমন একটি গোষ্ঠী যার প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে নিবিড় আত্মীয়তা

ও মুখোমুখী সম্পর্ক বর্তমান। পরিবারে পিতা, মাতা, সন্তান ও অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।

অন্যান্য প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় পরিবারের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এর কারণ হল, **প্রথমতঃ**, অন্যান্য প্রাথমিক গোষ্ঠীতে সভ্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলেও, পরিবারের সভ্যদের মধ্যে যে আন্তরিক, নিবিড় মুখোমুখী পরিচয় লক্ষ্য করা যায়, তুলনামূলকভাবে অন্যান্য প্রাথমিক গোষ্ঠীতে তার অভাব দৃষ্ট হয়। ফলে পরিবার তার সভ্যদের উপর যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, অন্যান্য প্রাথমিক গোষ্ঠীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। ব্যক্তির জীবনের উপর অন্যান্য প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় পরিবারের প্রভাবই সর্বাধিক। পরিবার যেভাবে তার সদস্যদের চরিত্র গঠন করতে পারে অন্যান্য প্রাথমিক গোষ্ঠীর পক্ষে তা সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক সংগঠনের মূল কেন্দ্র হল পরিবার। অন্যান্য প্রাথমিক গোষ্ঠীকে সামাজিক সংগঠনের মূল কেন্দ্ররূপে গণ্য করা হয় না।

তৃতীয়তঃ, একমাত্র পরিবারের মধ্যে থেকেই নরনারীর সহবাস ও সন্তান উৎপাদন প্রভৃতি ইচ্ছা পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে, যা অন্য প্রাথমিক গোষ্ঠীর পক্ষে মেটান সম্ভব নয়। অর্থাৎ কতকগুলি জৈবিক প্রয়োজন, উদ্দেশ্য, আবেগ বা প্রবণতা পরিতৃপ্ত করার একমাত্র মাধ্যম হল পরিবার।

চতুর্থতঃ, প্রাথমিক গোষ্ঠীদের মধ্যে পরিবারের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী এই কারণে যে, এটি হল প্রথম গোষ্ঠী যার মধ্যে থেকে শিশুর সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এই গোষ্ঠীতেই শিশুর জন্ম এবং এরই মাধ্যমে সমাজের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে।

শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা অন্যান্য প্রাথমিক গোষ্ঠীর ভূমিকার তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিকীকরণের অর্থ হল শিশুকে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জগতে অনুপ্রবিষ্ট করা।[1]

পঞ্চমতঃ, প্রাথমিক গোষ্ঠীদের মধ্যে পরিবারের গুরুত্ব আরও এক কারণে বেশী কারণ পরিবার তার সদস্যদের উপর যত দীর্ঘকাল ধরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, অন্য প্রাথমিক গোষ্ঠীর পক্ষে তা সম্ভব নয়, তাছাড়া অন্যান্য প্রাথমিক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সভ্যদের সঙ্গে গোষ্ঠীর সম্পর্ক দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়না। কিন্তু পরিবারের সঙ্গে তার সভ্যদের সম্পর্ক সে তুলনায় অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী। শিশুর তার পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্ক, তার খেলার দলের সঙ্গে সম্পর্কের তুলনায় অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী।

1 এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠতঃ, পরিবার তার সভ্যদের এমন অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেয়, যা অন্যান্য প্রাথমিক গোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব নয়। অর্থাৎ পরিবারের অনেক কাজ, অন্য প্রাথমিক গোষ্ঠীর পক্ষে সুসংগতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সে কারণেও প্রাথমিক গোষ্ঠীদের মধ্যে পরিবারের এতখানি গুরুত্ব।

পরিবার কেবলমাত্র সন্তানদের পার্থিব প্রয়োজনই মেটায় না, সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ধারণা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির সঙ্গেও সন্তানদের প্রত্যক্ষ পরিচয় করিয়ে দেয়। পরিবারিক জীবনই মানুষের সর্বপ্রথম সমবায় জীবন (collective life) সম্পর্কে জ্ঞান জন্মায়। পরিবারের মত অতি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী জীবনও পরিচালিত করতে হলে যে পারস্পরিক সহযোগিতার এবং নির্দিষ্ট কর্তব্য করার প্রয়োজন, সে সম্পর্কেও মানুষ পারিবারিক জীবন থেকে জ্ঞান লাভ করে। সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক সকল বিষয়েই মানুষ প্রাথমিক শিক্ষা পারিবারিক জীবন থেকেই লাভ করে। এই প্রাথমিক জ্ঞানই সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে। সমাজ-জীবনের উপর পরিবারের প্রভাব কতখানি তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সমাজ-বিজ্ঞানী গিলিন (*Gillin*) এবং ব্লাকমার (*Blackmar*) বলেন, "সমাজ জীবনের প্রথম অণু হল পরিবার। এরই মধ্যে বৃহত্তর সমাজ-জীবনের শিক্ষা মানুষ লাভ করে। এখানে তারা কেবলমাত্র ধন উৎপাদনের পদ্ধতিই শিক্ষা করে না এবং সম্পত্তিতে অধিকারবোধ সম্পর্কেই তালিম পায় না, সংঘবদ্ধ জীবনে তাদের কর্তব্য এবং অধিকার সম্পর্কেও শিক্ষা লাভ করে। গৃহেতেই সকল রকম সংস্কৃতির সূত্রপাত হয়।"

৩। পরিবারের উৎপত্তি (Origin of Family) :

মর্গ্যান (*L. H. Morgan*), লাবক (*J. L. Lubbock*), ফ্রেজার (*J. G. Frazer*) এবং বর্তমানকালে ব্রিফ্যান্ট (*R. Briffault*) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীরা পরিবারের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, আদিম সমাজে পরিবার বা বিবাহ প্রথা বলে কিছু ছিল না। পশুর মত নরনারী ইচ্ছা হলেই নিজেদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করত। কোন সংযম ছিল না, কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না, বা কোন সামাজিক বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হত না। কখনও বা একদল নরনারীর মধ্যে এই যৌন সম্পর্ক সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু তাহলেও তাদের মধ্যে কোন স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হত না। উপরিউক্ত সমাজবিজ্ঞানীদের এই মতবাদ স্বীকার করে নিলে,

আমাদের এই ধারণা করতে হয় যে, পরিবার কোন বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান নয়, সামাজিক ক্রমবিকাশের এক বিশেষ স্তরে পরিবারের আবির্ভাব ঘটেছে। পারিবারিক জীবনযাপন মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য নয় এবং পারিবারিক জীবন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক জীবন নয়—একথাও স্বীকার করতে হয়।

এই মতবাদের সমর্থকবৃন্দ আদিম সমাজে নরনারীর এই অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্পর্ক প্রমাণ করার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোন তথ্য উপস্থাপন করতে পারেন নি। তবে বর্তমান কালেও কোন কোন দেশের সমাজের নরনারীর মধ্যে কতকগুলি প্রচলিত রীতি দেখে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এগুলি আদিম যুগে মানব সমাজের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার অস্তিত্বের পরিচয়বাহক। উৎসব উপলক্ষে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, পত্নী বিনিময় এবং পত্নীর মাধ্যমে অতিথি আপ্যায়ন ইত্যাদি এই সকল রীতির উদাহরণ। তাছাড়া, কোন কোন উপজাতির মধ্যে এখনও পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং কোন কোন উপজাতির মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে শ্রেণীবদ্ধকরণ রীতির প্রচলন (classificatory system of relationship) উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করে বলে তাঁরা মনে করেন। শ্রেণীবদ্ধকরণ রীতি অনুসারে অধিক বয়স্ক এক শ্রেণীর লোককে পিতা বা মাতা, সমবয়স্ক এক শ্রেণীর লোককে স্বামী বা স্ত্রী, এক শ্রেণীকে ভ্রাতা বা ভগ্নী এবং এক শ্রেণীকে পুত্র বা কন্যা বলে সম্বোধন করা হত।

মর্গ্যানের (*Morgan*) মতে এই যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার অবস্থা থেকেই বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফলে পরিবারের আবির্ভাব ঘটেছে এবং নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক-বিবাহকারী পরিবারের উদ্ভব ঘটেছে।

মর্গ্যান (*Morgan*) প্রমুখ উপরিউক্ত সমাজবিজ্ঞানীদের মতামত গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ, তাঁদের মতবাদের সমর্থনে তাঁরা যে-সব প্রমাণ উপস্থিত করেছেন সেগুলিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। **প্রথমতঃ**, অনেক সমাজে নরনারীর মধ্যে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা বা প্রাক্-বিবাহ যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার রীতি থাকলেও, তা কোন স্থায়ী রীতি নয় এবং এই সব সমাজে বিবাহ পদ্ধতি স্থায়ী সামাজিক রীতি হিসেবে প্রচলিত। সুতরাং কোন কোন ক্ষেত্রে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার অস্তিত্ব আদিম সমাজের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার নির্দেশক হতে পারে না। **দ্বিতীয়তঃ**, কোন কোন উপজাতির মধ্যে পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতাও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে না, যেহেতু এই সব উপজাতির মধ্যে সুনির্দিষ্ট আকারে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রয়েছে। আবার কোন কোন সমাজবিজ্ঞানীর মতে এরূপ অজ্ঞতার অস্তিত্বের বিষয়টি নিছক কাল্পনিক। **তৃতীয়তঃ**, শ্রেণীবদ্ধকরণ পদ্ধতিকে

বহির্গোষ্ঠী বিবাহের (exogamy) নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সামাজিক রীতিরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বহির্গোষ্ঠী বিবাহের নিয়ম মেনে চলার জন্য কোন ব্যক্তি হয়ত যে-সব রমণীদের সঙ্গে বিবাহ 'নিষিদ্ধ' তাদের 'ভগ্নী'রূপে, যাদের সঙ্গে বিবাহ সমাজস্বীকৃত তাদের 'পত্নী'রূপে, সম্বোধন করতে পারে। বস্তুতঃ, পৃথিবীর কোন সমাজই অবারিত যৌন সম্পর্ককে স্থায়ী রীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে এমন খবর পাওয়া যায় না। তাছাড়া, বহু আদিম সমাজে, যেমন—আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও নরনারীর অনিয়মিত যৌন সম্পর্কের কথা জানা যায় না। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের অস্তিত্ব-এদের মধ্যে বরাবরই ছিল।

বস্তুতঃ, মানব সভ্যতার বিবর্তনের একটি বিশেষ স্তরে পরিবারের উদ্ভব ঘটেনি, মানব সমাজের আদিতেই পরিবারের অস্তিত্ব ছিল। পরিবার কোন কৃত্রিম সংগঠন নয়, পরিবার ব্যবস্থা মানব প্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক। সন্তানই পরিবারের স্বাভাবিক ভিত্তি, সন্তানোৎপাদনের জন্যই নরনারী বিবাহ করে এবং পারিবারিক জীবন যাপন করে। শুধু তাই নয়, যৌন আবেগ চরিতার্থ করার জন্য, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব লাভের জন্য, সন্তানের মাধ্যমে বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতার জন্য, বার্ধক্যের সময় সেবা শুশ্রূষার জন্য মানুষ পরিবার গঠন করে। এ ছাড়াও আছে এমন একজন জীবনসাথী লাভের আকাঙ্ক্ষা, যে জীবনের সুখে-দুঃখে, ঘাত-প্রতিঘাতে এবং সাফল্য বা ব্যর্থতায় সমান অংশীদার হবে। পারিবারিক জীবনের মাধ্যমেই মানুষের ভালবাসা, স্নেহ, মায়া, মমতা ও অনুরাগ লাভের ইচ্ছার পরিপূরণ ঘটে। স্বামী-স্ত্রী স্নেহ, ভালবাসা ও বন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধনে বাঁধা পড়ে এবং পরিবারে সন্তানের আবির্ভাব এই বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে। বস্তুতঃ, মানুষের জটিল বাসনা এবং সচেতন প্রয়োজন বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে, কোন না কোন এক ধরনের পারিবারিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে।

৪। পরিবারের বিশ্বজনীনত্ব (Universality of Family) ঃ

পরিবার কি একটি বিশ্বজনীন বা সার্বিক প্রতিষ্ঠান? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অনেক সমাজবিজ্ঞানী বলেন যে পরিবার, বিশেষ করে এক বিবাহ-কারী পরিবার যে একটি বিশ্বজনীন বা সার্বিক প্রতিষ্ঠান, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁদের মতে যেখানে মনুষ্য সমাজ সেখানেই পরিবারের

অস্তিত্ব। তাঁদের অভিমতানুসারে সমাজ-জীবনের যত রকম রূপ আছে, পরিবার হল সংঘবদ্ধ জীবনের সবচেয়ে বিশ্বজনীন রূপ। সব সমাজেই এবং সমাজ বিকাশের প্রত্যেক স্তরেই পরিবারের অস্তিত্ব রয়েছে। এমন কি নিম্নতর প্রাণীদের মধ্যেও পারিবারিক জীবনের রূপ দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু কোন কোন সমাজ বিজ্ঞানী যেমন, মর্গ্যান (*L. H. Morgan*), লাবক (*J. L. Lubbock*), ফ্রেজার (*J. G. Fragzer*), ব্রিফ্যাল্ট (*R.Briffault*) প্রমুখ সমাজ বিজ্ঞানীগণ পরিবারের বিশ্বজনীনত্ব স্বীকার করে নিতে চান না। তাঁদের মতে পরিবার কোন বিশ্বজনীন বা সার্বিক প্রতিষ্ঠান নয়। সামাজিক ক্রমবিকাশের এক বিশেষ স্তরে পরিবারের আর্বিভাব ঘটেছে। তাঁদের অভিমতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপিত করতে গিয়ে তাঁরা বলেন যে, আদিম সমাজে পরিবার বা বিবাহ প্রথা বলে কোন কিছু ছিল না। পশুর মত নরনারী ইচ্ছা হলেই নিজেদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করত। মর্গ্যানের মতে এই যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার অবস্থা থেকেই বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফলে পরিবারের আর্বিভাব ঘটেছে এবং নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক-বিবাহকারী পরিবারের উদ্ভব ঘটেছে।

কিন্তু উপরিউক্ত সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত অন্যান্য অনেক সমাজবিজ্ঞানী স্বীকার করতে চান না। তাঁদের বক্তব্য হল, আদিম সমাজে নরনারী অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্ভোগে লিপ্ত থাকত এবং সেহেতু তাদের কোন পারিবারিক ব্যবস্থা ছিল না এবং মানুষ সচেতনভাবে ও ভেবে চিন্তেই পরিবারকেই এক অনিবার্য নিয়ামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানরূপে আবিষ্কার করল—এই অভিমতটি কোন উপযুক্ত তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত বিষয় নয়। এইসব সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, পরিবারকে বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকার করেন না যে-সব সমাজবিজ্ঞানী, তাঁরা আদিম সমাজে নরনারীর অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্পর্ক প্রমাণ করার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোন তথ্য উপস্থাপন করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, যে সব তথ্য তাঁরা উপস্থাপিত করেছেন তার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে আদিম সমাজে নরনারীর মধ্যে প্রাক্-বিবাহ যৌন সম্পর্ক কোন স্থায়ী রীতি। তাছাড়া, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েও বলা যেতে পারে যে, যে সমাজে পরিপূর্ণ যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা বিদ্যমান, সে-সমাজ দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে না। সেই কারণে সব সমাজেই শিশু জারজ নয়, আইনসম্মতভাবে বা বৈধভাবে জাত। এ জন্যই পিতামাতার সামাজিক পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোন নিয়ম বা নীতির অস্তিত্ব আছে।

এই সব কারণেই আধুনিকযুগে অনেক সমাজবিজ্ঞানী যেমন, সোয়ানটন্ (*Swanton*), মলিনাওস্কি (*Malinaowski*), র্যাডক্লিফ ব্রাউন (*Radcliffe Brown*) মনে করেন যে, পরিবার একটি বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সর্বস্তরেই পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের মতে অন্যান্য বৃহত্তর সামাজিক সংগঠনের বহু পূর্বেই পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় এবং সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের সরলতম স্তরে যে সব উপজাতির অস্তিত্ব, তাদের মধ্যেও পরিবার প্রথা প্রচলিত। লাওই (*Lowie*) রাষ্ট্রবিহীন, বংশবিহীন ইয়াঘন (*Yaghan*)-এর উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন। এদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান সন্ততি একত্রে মিলে এক কুড়ে ঘরে বাস করে। তারাই ঐ কুড়ে ঘরের মালিক, আর অতি নিকট আত্মীয়ও তাদের ঐ সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে নিছক অতিথিমাত্র।

সাম্প্রতিককালে মারডক্ (*Murdock*) প্রায় দু'শত পঞ্চাশটি সমাজের উপর সমীক্ষা চালিয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এক-বিবাহকারী পরিবারের অস্তিত্ব সমাজের সর্বস্তরেই ছিল। এক বিবাহকারী পরিবার বলতে তিনি মনে করেন সন্তানসন্ততিসহ একজন বিবাহিত নর ও নারীকে কেন্দ্র করে যে পারিবারিক সংগঠন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়তি দু'চারজন লোকও এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

পরিবার যে একটা বিশ্বজনীন সার্বিক প্রতিষ্ঠান, এই বিষয়টিকে আরও নানা দিক থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। পরিবার একটা স্বাভাবিক গোষ্ঠী (natural group) এবং এমন একটা গোষ্ঠী যা সামাজিক দিক থেকে অনিবার্য। বংশধারা সংরক্ষণের জন্য যে জৈবিক প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য পরিবারের মাধ্যমেই তা সিদ্ধ হয়। ব্যক্তির দৈহিক প্রবৃত্তি, মানসিক আবেগ এবং প্রবণতার প্রধান কেন্দ্র পরিবার। যেমন, সহবাস ও সন্তান উৎপাদন প্রবৃত্তি, সন্তানের প্রতি মাতাপিতার স্নেহ ও যত্ন, এ ছাড়াও আছে ভালবাসা, আবেগ, অনুরাগ, মায়া, মমতা নিজের অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতনতা। এ-সবকিছুই পরিবারের মধ্যে দিয়েই পরিতৃপ্তি লাভ করে। উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবন একান্ত স্বাভাবিক। সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতিপালন অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার। শিশু যখন প্রথম জন্মগ্রহণ করে তখন সে অসহায়। মাতাপিতার যত্ন ছাড়া তাঁর পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। পারিবারিক জীবনের মাধ্যমেই সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন এবং বিকাশ সম্ভব হয়। সন্তানের সকল প্রকার ভার মাতাপিতার যৌথ দায়িত্ব এবং একেই পরিবারের স্বাভাবিক ভিত্তি বলা যেতে পারে। এক বিবাহকারী পরিবারেই সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ,

প্রতিপালন প্রভৃতির দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা যায়। কাজেই পরিবার একটি স্বাভাবিক গোষ্ঠী, কেননা এর মূলে নিহিত রয়েছে ব্যক্তির আবেগ, প্রবৃত্তি এবং সেইসব প্রয়োজনের মধ্যে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক ক্রিয়া সিদ্ধ করে।

আবার পরিবার সমাজের দিক থেকে এক অনিবার্য বা অবশ্য প্রয়োজনীয় গোষ্ঠী এই কারণে যে, নরনারীর যৌন আচরণ এবং মাতাপিতা রূপে সন্তানের প্রতি তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সব সমাজেই এর অস্তিত্ব রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, পরিবার যদি একটি স্বাভাবিক গোষ্ঠী হয় তবে সমাজের দিক থেকে পরিবারের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন ওঠে কেন? এর উত্তর হল, এই দুটি বিষয় পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। মানুষের স্বাভাবিক আবেগ, প্রবৃত্তি, কামনা বাসনারও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে; সমাজের দিক থেকে প্রতিটি নরনারীর দায়িত্ব, কর্তব্য সুন্দররূপে নির্দিষ্ট করতে হলে এই নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে।

উপরের এই আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে যে, পরিবার বিশেষ করে এক-বিবাহকারী পরিবার বিশ্বজনীন বা সার্বিক প্রতিষ্ঠান। আমরা বর্তমান বা অতীত, উচ্চ বা নীচ এমন কোন সমাজের কথা জানিনা, যখন পরিবারের কোন অস্তিত্ব ছিল না।

৩। পরিবারের শ্রেণীবিভাগ (Types of Family) :

যদিও পরিবার একটি বিশ্বজনীন সংগঠন এবং সব সমাজে পরিবারের অস্তিত্ব রয়েছে, তবু পরিবারের গঠন বা রূপ সব দেশের, সব সমাজে এক রকম নয়। দেশভেদে, সমাজভেদে এই পরিবারের বিভিন্ন রূপ বা গঠন দেখা যায়। নানাদিক থেকে এই পরিবারের শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য এরূপ কয়েকটি শ্রেণীবিভাগের আলোচনা করা হচ্ছে :

(ক) **এক-বিবাহকারী ও বহু-বিবাহকারী (Monogamous and Polygamous) :** যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। এক-বিবাহকারী পরিবারে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক একত্রে বসবাস করে। অর্থাৎ এক-বিবাহকারী পরিবারে যৌন সম্পর্ক একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বহু-বিবাহকারী পরিবারে যৌন সম্পর্ক একাধিক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বহু-বিবাহ প্রথা এস্কিমো জাতিদের মধ্যেই খুব দেখা যায়। বহু-বিবাহকারী পরিবার দু'প্রকারের

হতে পারে—বহুপত্নীক (polygyny) এবং বহু-স্বামীক (Polyandry)। বহুপত্নীক পরিবারে একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে বসবাস করে। যে-সব সমাজে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক, সাধারণতঃ সেই সব সমাজেই এক-পুরুষের বহু স্ত্রী গ্রহণের প্রথা আছে। বহু-স্বামীক পরিবার দু'প্রকারের হতে পারে—সহোদর ভ্রাতৃক (fraternal) এবং অ-সহোদর ভ্রাতৃক (non-fraternal)। বহু-স্বামীক পরিবারের স্বামীরা যদি সহোদর ভ্রাতা হয় তবে সে পরিবারকে সহোদর ভ্রাতৃক পরিবার বলে। আর যদি স্বামীরা সহোদর ভ্রাতা না হয়, তাহলে অ-সহোদর ভ্রাতৃক পরিবার বলা হয়। মহাভারতে দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহ সহোদর ভ্রাতৃক পরিবারের উদাহরণ। তিব্বত, সিকিম, লাডাক প্রভৃতি অঞ্চলে বর্তমানে সহোদর ভ্রাতৃক পরিবারের অস্তিত্ব দেখা যায়। মালাবার অঞ্চলে অ-সহোদর ভ্রাতৃক পরিবারের অস্তিত্ব এক সময় বিশেষ প্রচলিত ছিল বলে শোনা যায়।

তবে এক-বিবাহকারী পরিবারই (monogamous family) বর্তমান কালে বিশেষভাবে প্রচলিত। শিশু উৎপাদন এবং শিশু প্রতিপালন—পরিবারের এ দুটি প্রধান কাজ এক-বিবাহকারী পরিবারেই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

(খ) **পিতৃবংশানুক্রমিক এবং মাতৃবংশানুক্রমিক** (Patrilineal and Matrilineal family) : বংশ গণনার পদ্ধতি অনুসারে পরিবারের পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে। পিতার বংশ অনুসারে বংশ গণনা করা হয় যে পরিবার তাকে পিতৃবংশানুক্রমিক (patrilineal) পরিবার এবং মাতার বংশানুসারে বংশ গণনা করা হয় যে পরিবার তাকে মাতৃবংশানুক্রমিক (matrilineal) পরিবার বলে।

(গ) **পিতৃবাসস্থানিক এবং মাতৃবাসস্থানিক** (**Patriolocal and Matriolocal**) : বিবাহের পরে স্বামী-স্ত্রীর বাসস্থানের উপর ভিত্তি করে পরিবারের এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। বিবাহের পর স্বামী যদি নিজের পিতার গৃহে স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করে তাহলে তাকে পিতৃবাসস্থানিক (patriocal) পরিবার বলে এবং যদি বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর মাতার গৃহে বসবাস করে তাহলে তাকে মাতৃবাসস্থানিক (matriolocal) পরিবার বলে।

(ঘ) **'পিতৃকর্তৃক' এবং 'মাতৃকর্তৃক'** (**Patriarchal and Matriarchal**) : পরিবারের কর্তৃত্ব কার উপর ন্যস্ত তারই ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়। পরিবারের কর্তৃত্ব যদি পিতার হাতে থাকে, তাহইলে সে

পরিবারকে 'পিতৃকর্তৃক' (patriarchal বা father-right family) এবং যদি মাতার হাতে ন্যস্ত থাকে তাহলে 'মাতৃকর্তৃক' (matriarchal বা mother-right family) বলা হয়।

(ঙ) **একক এবং যৌথ (Single or Individual Family and Joint Family) :** সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিবারের পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। একক পরিবার (Individual family) গঠিত হয় স্বামী, স্ত্রী এবং এক বা একাধিক সন্তান নিয়ে। যৌথ পরিবারে বিবাহিত পুত্র (অথবা কন্যারা) স্ত্রীর (অথবা স্বামীর) সঙ্গে একই মাতাপিতার কর্তৃত্বাধীন এক সংসারে বাস করে। মাতাপিতার মৃত্যুর পর হয় তারা এক একটি ভিন্ন ভিন্ন একক পরিবার গঠন ক'রে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যেগুলি পরে আবার এক একটি যৌথ পরিবারে রূপান্তরিত হয় অথবা একই পরিবারের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম বা বিধি অনুসরণ ক'রে বসবাস করতে থাকে।

৬। পরিবারের কার্যাবলী (Functions of family) :

সমাজে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় পরিবারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সবচেয়ে অধিক এবং সমাজ-জীবনের উপর এর প্রভাবও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মত পরিবারেরও কতকগুলি নির্দিষ্ট কার্য আছে, যদিও কালের গতিতে এইসব কার্যাবলীর মধ্যে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আমরা সংক্ষেপে পরিবারের কার্যাবলী এবং কিভাবে সেগুলির মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তা আলোচনা করব :

(১) **জৈবিক (Biological) :** নরনারীর জৈবিক ও দৈহিক প্রয়োজন মেটান পরিবারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ। পরিবারই সন্তানোৎপাদনের একমাত্র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। শিশুদের পক্ষে উপযোগী এমন পরিবেশে সন্তানের জন্মদান করা পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কার্য। এই কার্যের মাধ্যমে বংশ বিস্তার সম্ভব হয় এবং নরনারীর যৌন সম্পর্ক ও যৌন আচরণ সুনিয়ন্ত্রিত হয়। যদিও শিশু-প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য বর্তমানকালে সমাজে অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটেছে, তবু সন্তানোৎপাদনের কাজ পরিবারের একক অধিকার।

(২) **অর্থনৈতিক (Eoconomic) :** যেহেতু শিশুপালন পরিবারের অন্যতম প্রধান কাজ, সেহেতু পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানও পরিবারের

অন্যতম কাজ। এই দায়িত্ব প্রধানতঃ এসে পড়ে পিতার উপর, কারণ মাকে সাধারণতঃ শিশুর শারীরিক তত্ত্বাবধানে নিজেকে নিয়োজিত করতে হয়। কিন্তু বর্তমানকালে অনেক ক্ষেত্রে মাতাপিতা উভয়কেই পরিবারের অর্থ নৈতিক প্রয়োজন মেটাবার কাজে রত দেখা যায়। এমন এক সময় ছিল যখন পরিবারই ছিল অর্থ নৈতিক উৎপাদনের কেন্দ্রস্বরূপ। পরিবারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি গৃহেই উৎপাদিত হত। কিন্তু নগরকেন্দ্রিক শিল্প সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন উৎপাদন কেন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছে। বর্তমানকালে মিল্, কারখানা, দোকান, বাজার, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি পরিবারের অর্থ নৈতিক কার্যগুলি কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেছে।

(৩) **শিক্ষামূলক (Educational) ঃ** গৃহ শিশুদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্র। শিশু জন্মের পরে, প্রথম পাঁচটি বছর গৃহেই শিক্ষালাভ করে। তারপর শিশুকে শিক্ষাগ্রহণের জন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠান হয়। যদিও প্রচলিত প্রথানুযায়ী শিক্ষা দেবার দায়িত্ব অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছে তবু সমাজের অতীত সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব এখনও গৃহের উপর ন্যস্ত। সমাজানুমোদিত আচরণ, সহযোগিতা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি বিষয়গুলি শিশু-সন্তানেরা গৃহেই শিক্ষা করে। বস্তুতঃ, গৃহের মাধ্যমেই শিশু বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়।

(৪) **রক্ষণমূলক (Protective) ঃ** সব রকম বিপদ-আপদ থেকে পরিবারের সভ্যদের রক্ষা করা পরিবারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ। কিন্তু বর্তমানকালে পরিবারের সভ্যরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকার জন্য এবং পরিবারের সভ্যদের স্বার্থ পরিবারের সামগ্রিক কল্যাণের উপর কেন্দ্রীভূত না থাকার জন্য, পরিবারে রক্ষণমূলক কাজ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বস্তুতঃ, স্বাস্থ্যরক্ষা, বৃদ্ধবয়সে পেন্সনের ব্যবস্থা, চাকরির নিরাপত্তা, পুলিশী ব্যবস্থা এবং শিশু প্রতিপালন সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যবস্থা সরকারী ও বেসরকারী নানা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কাজ। এমন অনেক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটেছে যার কাজ পরিবারের সংরক্ষণ, তবু পরিবার অনেক ব্যাপারে তার সভ্যদের শারীরিক ও নৈতিক নিরাপত্তা দিয়ে থাকে।

(৫) **স্নেহসম্পর্কীয় (Affectional) ঃ** স্নেহ-ভালবাসা ও বন্ধুত্বের এক নিবিড় বন্ধনে সবাইকে বেধে রাখা পরিবারের অন্যতম কাজ। ছোট ছোট শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য মাতাপিতার স্নেহভালবাসার একান্ত প্রয়োজন।

ছোট শিশু যেন উপলব্ধি করতে পারে যে তাকে তার মাতাপিতা ভালবাসে এবং তার মাতাপিতাও পরস্পরকে ভালবাসে। স্নেহ-ভালবাসার অভাব শিশুর ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশের পথে এক বিরাট বাধাস্বরূপ। আবার মাতাপিতার মধ্যে স্নেহ ভালবাসার অভাবও গৃহের শান্তি ও সুখ হরণ করে।

(৬) **ধর্মসম্পর্কীয় (Religious)ঃ** নৈতিক এবং ধর্ম সম্পর্কীয় শিক্ষা একদিন পরিবারের স্বীকৃত কার্য ছিল কিন্তু বর্তমানে অনেক মাতাপিতা এই ব্যাপারে উদাসীন কিংবা তাঁরা মনে করেন, এ কাজ পরিবারের নয়, ধর্ম প্রতিষ্ঠানের। ভালই হোক আর মন্দই হোক, শিশু নিজ গৃহে নৈতিক শিক্ষালাভ করে এবং যদিও বর্তমানে ধর্ম সম্পর্কীয় শিক্ষা দেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বা ধর্ম সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠানের উপর তবু ঈশ্বর সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা শিশু নিজ গৃহেই লাভ করে।

(৭) **আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত (Recreational)ঃ** এমন এক সময় ছিল যখন গৃহই ছিল সব রকম আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রস্বরূপ। কিন্তু শিল্প-সভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবং যন্ত্রের বহুল ব্যবহারের জন্য মানুষের অবসর সময় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজনও বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে। বর্তমানকালে সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মানুষকে আমোদ-প্রমোদ যোগায়। তাই গৃহের বাইরে পরিবারের সভ্যরা নানা ধরনের আমোদ-প্রমোদের সন্ধান পায়। পার্ক, খেলার মাঠ, সিনেমা, থিয়েটার, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব প্রভৃতি পরিবার বহির্ভূত আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রস্থল। অবশ্য যদিও পরিবারের আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত কার্যাবলী হ্রাস পেয়েছে তবুও এখন পর্যন্ত অনেক ব্যাপারে পরিবারই আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রস্থল। পরিবারের সভ্যদের মিলেমিশে বনভোজন করা, কোন দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে যাওয়া, বন্ধু–বান্ধবের বাড়িতে যাওয়া, ঘরের মধ্যে বসে খেলাধুলা করা এবং সবাই মিলে বসে গল্পগুজব করা ইত্যাদি পরিবারের আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত কাজের অন্তর্ভুক্ত। কোন রকম অবাঞ্ছনীয় ক্রীড়াকৌতুকে উৎসাহ দান করা পরিবারের উচিত নয়। যে-সব আমোদ-প্রমোদ পারিবারিক জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, সেগুলিতে উৎসাহ দেওয়াই পরিবারের কাজ। যদিও আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত অনেক কাজই বর্তমানে পরিবার থেকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চলে গেছে, তবু এমন কয়েক ধরনের আমোদ-প্রমোদ আছে যা একমাত্র পরিবার জীবনেই সম্ভব।

(৮) **মর্যাদা প্রদান সম্পর্কীয় (Status-giving) ঃ** পরিবারের অন্যতম কাজ বৃহত্তর সমাজে পারিবারিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা। প্রতিটি পরিবার তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মর্যাদা দান করে। পরিবারের সভ্যদের কাছে পারিবারিক নামের প্রয়োজনীয়তা খুবই অধিক। কারণ এই নামই বৃহত্তর সমাজে তার মান-মর্যাদা নির্ধারণ করে। পরিবারকে প্রশংসা করলে পরিবারের সভ্যরা তাতে গর্বিত বোধ করে এবং পরিবারের মান বা মর্যাদা নষ্ট হলে ক্ষুণ্ণ ও ক্রুদ্ধ হয়। বর্তমান যুগে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, পরিবারের সভ্যরা ইতঃস্তত ছড়িয়ে থাকার জন্য, পারিবারিক মান-মর্যাদা থেকে ব্যক্তিগত মানমর্যাদার উপরই সবিশেষে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

পরিবারের এই কার্যাবলীর মাধ্যমে পরিবারের সংহতি ও ঐক্য সংরক্ষিত হয়। সাম্প্রতিককালে পরিবার পূর্বোক্ত কার্যাবলীর মধ্যে অনেকগুলিই হারিয়েছে। পরিবারের অর্থনৈতিক কার্য সম্পাদন করছে বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা সম্পর্কীয় কার্যাবলী সম্পাদন করছে বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, যদিও কিছু কিছু শিক্ষামূলক কাজ পরিবারের হাতে রয়েছে। রক্ষণ-মূলক কাজ সম্পাদন করছে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং ধর্ম সম্পর্কীয় কাজ গ্রহণ করেছে ধর্ম প্রতিষ্ঠান। পরিবারের মর্যাদা প্রদান করার কাজও অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে, তবে সন্তানোৎপাদন এবং স্নেহ সম্পর্কীয় কার্যাবলী এখনও পরিবারেই রয়েছে। মাতাপিতার স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ ভালবাসা শিশুরা অন্য কারও কাছ থেকে পেতে পারে না।

পরিবারের কার্যাবলীর কিছু কিছু অংশ অপরের হাতে চলে যাওয়ার জন্য পরিবারের ঐক্য ও সংহতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ফলে বৃহত্তর সমাজের চোখেও পরিবারের প্রয়োজনীয়তা ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং সমাজের ও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের উপর পরিবারের কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছে। তবে যাই হোক না কেন, শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবারের গুরুত্ব এখনও ম্লান হয়নি। নীচে এসম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে :

৭। পরিবারে এবং পরিবারের মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং সামাজিকীকরণ (Social Control and Socialisation in and through family) ঃ

জন্ম থেকে আরম্ভ করে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষই নানারকম সংগঠন ও সংস্থার নিয়ন্ত্রনাধীন। এই সমস্ত সংগঠন এবং সংস্থা বিশেষ কতকগুলি নীতি ও

মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত বা মানুষের সুস্থ সুন্দর জীবনযাপনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। যদি সমাজের সকলেই স্বেচ্ছাচারীর মত জীবনযাপন করত, কোনরকম আইনশৃঙ্খলা মেনে চলার প্রয়োজনবোধ করত না তাহলে সামাজিক জীবন এক-রকম অচল হয়ে পড়ত। কাজেই গতিশীল সুস্থ সুন্দর জীবনযাত্রার পথে কিছু নিয়ম-কানুন আমাদের মেনে চলতে হয়, যা আমরা অনেক সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মেনে নিই আবার অনেক সময় আমরা সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থ রক্ষা করার জন্য মেনে নিতে বাধ্য হই। অধ্যাপক লা-পেয়ার বলেন যে—সামাজিকীকরণের অসম্পূর্ণ-তার ত্রুটি নিবারণের জন্যেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অবশ্যম্ভাবী। এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে ঠিক আমরা কি বুঝি? গিলন এবং গিলন (*Gillian and Gillian*) বলেন যে—সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হল সমাজে প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি নীতি ও মূল্যবোধের মাধ্যমে সামাজিক চাপ (social pressure) সৃষ্টি করা যাতে সমাজের সকলের কার্যকলাপে সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁরা আরও বলেছেন যে—যেহেতু মানুষে মানুষে শারীরিক ও মানসিক, স্বভাবগত ও আচার-ব্যবহারগত পার্থক্য বিদ্যমান, সর্বোপরি যেহেতু শিক্ষা-দীক্ষাগত এবং সংস্কৃতিগত পার্থক্য রয়েছে সেহেতু সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই একই কারণে দার্শনিকরাও সমাজবিদদের মতো সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের যে যে সংস্থা রয়েছে, পরিবারের ভূমিকা তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। পরিবারেই শিশু শৈশবকাল থেকে বয়ঃজ্যেষ্ঠদের সম্মান প্রদর্শন করতে শেখে। গুরুজনেরা শিশুকে তার ছোট বয়স থেকেই কোন্ কোন্ কাজ করণীয় এবং কোন্-গুলি বর্জনীয় শিক্ষা দেন। বাবা-মা প্রথম থেকেই শিশুকে অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন, চৌর্যবৃত্তির প্রতি তার মনে ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করেন এবং অন্যান্য অপকর্ম থেকে তাকে নিবৃত্ত করেন। শৈশবে পরিবারের এই নিয়ন্ত্রণ শিশুর কাছে অনেক সময় বিরক্তিকর মনে হয় কিন্তু ভবিষ্যতে সে নিজেই এর গুরুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয় কারণ তখন সে বুঝতে পারে যে, এই নিয়ন্ত্রণ ছাড়া তার মানসিক এবং চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশ লাভ করতে পারত না।

পরিবারে ছেলে এবং মেয়ের সম্পর্কের পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। আদিম সমাজে যখন অবাধ যৌন সম্পর্কে কোনরূপ বাধানিষেধ ছিল না তখন যে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হোত তা নৃতত্ত্ববিদরা প্রমাণ করেছেন। এই নিয়ন্ত্রণহীন সমাজে

অবাধ যৌন সম্পর্কের ফলে যে অবৈধ শিশু জন্ম নিত, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তার অকাল মৃত্যু ঘটত। কিন্তু বর্তমানে সভ্য সমাজে পারস্পরিক সম্পর্কের নির্দেশ এবং নিয়ন্ত্রণে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এইভাবে পরিবার একটি শিশুর ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক সংগঠন হিসেবে কাজ করে।

প্রত্যেক সমাজেই কতকগুলি মূল্যমান এবং আদর্শ থাকে যা সমাজের প্রায় সকলেই মেনে নেয়, কারণ এই মূল্যমান এবং আদর্শগুলি সাংস্কৃতিক জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এই মূল্যমানগুলি এবং আদর্শগুলি সম্পর্কে সচেতনতা শিশুর মনে সৃষ্টি করার পক্ষে পরিবারই সবচেয়ে উপযোগী সংস্থা।

মহৎ আদর্শ গঠনে পরিবারের ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়, কারণ পরিবারই শিশুর মানসিক উন্নতির ক্ষেত্র প্রশস্ত করে দেয়। একথা অবশ্য সমাজবিদরা স্বীকার করেছেন যে, সামাজিক মূল্যবোধ সকলের কাছে সমানভাবে অনুভূত হয় না এবং সেইজন্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণও যথারীতি সম্ভব হয় না। নিয়ন্ত্রণহীন পরিবারে অসংহতির জন্য শিশুরা পরিণত বয়সে কিভাবে সামাজিক দুষ্কর্মে লিপ্ত হয় সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা তার বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন।

একটি শিশুর ক্ষেত্রে পরিবারের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নির্ভর করে সেই পরিবারের প্রতি শিশুর আকর্ষণ কতখানি তার উপর। যদি আকর্ষণ প্রবল হয় তাহলে নিয়ন্ত্রণের পথও সুগম হয়। যেমন, ধরা যাক্ কোন একটি পরিবারের একটি ছেলে তার বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে এমন একটি কাজ করে ফেলেছে যা তার বাবা-মা ভালচোখে দেখেন না। কিন্তু ছেলেটি যদি বাবা-মাকে সত্যই শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং যদি বুঝতে পারে যে বাবা-মা তার জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধু তাহলে ভবিষ্যতে বন্ধুর প্রতারণা তাকে অসৎ কর্মে লিপ্ত করতে পারে না। কিন্তু ছেলেটি যদি বাবা-মায়ের মহৎ আদর্শ অপেক্ষা অসৎ বন্ধুদের মন্দ আদর্শের দ্বারা চালিত হয় তাহলে বাবা মায়ের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সেক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না।

অধ্যাপক লা-পেয়ার বলেন যে—সংগঠনের সভ্য সংখ্যা যদি সীমিত হয় এবং সংগঠনের স্থিতিকাল যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে সেই সংগঠনই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা হিসেবে সফলতা অর্জন করে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মত সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রেও পরিবারের বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। সামাজিকীকরণ বলতে পূর্ব পুরুষ হতে বর্তমান পুরুষে (present generation) সংস্কৃতির সঞ্চালন বোঝায়।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার অর্থ হল শিশুকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতে অনুপ্রবিষ্ট করা, তাকে সমাজের ও সমাজস্থ নানা ধরনের গোষ্ঠীর কাজকর্মে একজন অংশগ্রহণকারী সভ্যরূপে গড়ে তোলা এবং সমাজের আদর্শ ও মূল্য গ্রহণে তাকে প্রবৃত্ত করা। বোগারডাস (*Bogardus*) সমাজিকীকরণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'এ হল সেই প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তি জনকল্যাণের জন্য একত্রে নির্ভরযোগ্য আচরণ করতে শেখে এবং তা করতে গিয়ে সামাজিক আত্মনিয়ন্ত্রণ, সামাজিক দায়িত্ব এবং সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞতা লাভ করে'। সামাজিকীকরণের অর্থ হল শিশু তার সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, নিয়ম-কানুন, আচরণবিধি, অভ্যাস এবং সংস্কৃতির আরও বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচিত হয় যেগুলি তাকে সমাজের একজন সক্রিয় সভ্য হতে সক্ষম করে।

সামাজিকীকরণ প্রণালীর দ্বারা অর্থাৎ নানারকম আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং নানারকম নিয়মকানুনের ও গোষ্ঠীর বিধিনিষেধের মাধ্যমে একটি শিশু শৈশবকাল থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাই তার ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে। *Dewey* এবং *Tufts* বলেন, একটি জাতির প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিবারের মধ্যেই শিশুটি একাগ্রতা, সহানুভূতি এবং দায়িত্ব সম্পর্কে চেতনা লাভ করে। পরিবারেই সামাজিকীকরণের প্রণালীর মাধ্যমে একটি শিশুর চরিত্রের উন্নতি সাধন হয়—যা পরবর্তী জীবনে তাকে গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। রাইট (*Wright*) বলেন যে—প্রত্যেকটি পরিবারেই শিশু স্বাধীন মত প্রকাশের এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠনের সুযোগ পায়। মনস্তত্ত্ববিদরা প্রমাণ করেছেন যে—পরিবারের যথার্থ পরিবেশ ছাড়া শিশুর যথার্থ সামাজিকীকরণ আদৌ সম্ভব নয়।

পরিবারেই শিশু তার চিন্তা, আবেগ ও কর্মের অভ্যাস গঠন করে। বস্তুতঃ, তার চরিত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় পরিবারে। কিভাবে কথা বলতে হয়, নিজের আবেগগুলিকে কিভাবে প্রকাশ করতে হয়, তার যথাযথ রূপগুলি সে পরিবারের থেকেই শিক্ষা করে। ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক অপ্রত্যাশিত অবস্থার সঙ্গে যাতে শিশু মুখোমুখী দাঁড়াতে পারে তার জন্য বহু পূর্ব থেকে পরিবার তাকে তৈরি করে দেয়। পরিবার তাকে আত্মপ্রত্যয় শিক্ষা দেয়। বস্তুতঃ ভবিষ্যৎ জীবনে বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করায় শিক্ষা পরিবার থেকেই সে লাভ করে। কাজেই যে সব সংগঠনের মাধ্যমে সামাজিকীকরণ সম্পন্ন হয় তাদের মধ্যে পরিবারের ভূমিকা সবচেয়ে প্রধান।

পরিবার একটি শিশুর সমস্ত রকম অভাব পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তা পার্থিব, যেমন খাদ্য এবং পানীয় এবং অপার্থিব যেমন স্নেহ বা নিরাপত্তা, দুই-ই হতে পারে। শাসন বা নিয়মকানুনের মাধ্যমে বাবা-মা শৈশব অবস্থায় যে শিক্ষা প্রদান করেন তার ফল শিশুর সারাজীবনে স্থায়ী হয়। পরিবারে শিশু দু'প্রকার সম্পর্কের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। একটি কর্তৃত্ব—আনুগত্যের (authoritarian relationship) নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যেমন, বাবার সঙ্গে ছেলেমেয়ের সম্পর্ক, অপরটি বন্ধুসুলভ সম্পর্ক (equalitarian relationship) যেমন, একই বয়সী ভাইবোনেদের মধ্যে সম্পর্ক। সামাজিকীকরণে উভয় প্রকার সম্পর্কেরই গুরুত্ব বিশেষভাবে স্বীকার করা হয়। অন্যান্য সামাজিক সংস্থা বা সংগঠনের সঙ্গে শিশুর যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু সারাজীবনব্যাপী সম্পর্ক গড়ে ওঠে শিশুর পরিবারের সঙ্গে। অধ্যাপক কলিংউড (*Collingwood*) বলেন, পরিবারে পিতামাতার হাতেই শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব থাকা উচিত। বাবা-মায়ের কর্তব্য শিশুর প্রত্যেকটি কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করা। সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা শিশু অজ্ঞাতসারেই বাবা-মায়ের কাছ থেকেই অর্জন করে। অন্যান্য সংস্থা যেমন প্রতিবেশীদের সাহচর্য ও সহযোগিতা, খেলার সাথী এবং স্কুল ও কলেজ জীবনের প্রভাব তাকে প্রভাবিত করে অনেক পরে। পরিবারই সামাজিকীকরণের ভিত্তি স্থাপন করে। পরিবারেই শিশুর 'ভাল', 'মন্দ', ও 'উচিত', 'অনুচিত' সম্পর্কে ধারণা জন্মায় এবং এ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা শিশু সর্বপ্রথম পরিবারেই অর্জন করে।

শিশুর শিক্ষা ব্যাপারে পরিবারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর চলাফেরা, কথাবার্তা, ভাষা শিক্ষা দেওয়া, তার গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রিত করা, তার প্রবৃত্তিকে সংযত করার সুকঠিন দায়িত্বও মাতাপিতার। পরিবারেই তার সাংস্কৃতিক মনের বিকাশ ঘটে। একটি শিশুর নৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তার বিকাশসাধনে, সমাজের একজন দায়িত্বশীল সভ্যরূপে তার চরিত্র গঠনে পরিবারের বিশেষ অবদান রয়েছে। কাজেই শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে পরিবারকে স্থপতি বললে অত্যুক্তি হয় না।

পরিবারেই শিশু সামাজিক পরিচিতি বা মর্যাদা (Social status) জন্মসূত্রে অর্জন করে যা পরবর্তী জীবনে বৃহৎ সমাজের সঙ্গে শিশুর পরিচিতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। যেহেতু পরিবার কোন কৃত্রিম সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, পরিবারের সভ্যদের পরস্পরের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসা, প্রীতির সম্পর্ক, রক্তের সম্পর্কের উপর

প্রতিষ্ঠিত, কাজেই সামাজিকীকরণ সংস্থা হিসেবে পরিবারের পক্ষে যা করা সম্ভব, অন্য সংস্থার পক্ষে তা অচিন্তনীয়।

৮। কৃষিভিত্তিক ও শিল্পভিত্তিক সমাজে পরিবার (Family in agrarian and industrial societies) :

ইংরেজীতে একটা কথা আছে "God has made the country and man has made the town." ঈশ্বর গ্রাম সৃষ্টি করেছেন আর শহর সৃষ্টি করেছে মানুষ। প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ গ্রামে বাস করত এবং গ্রামই ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। তার কারণ আগে মানুষের প্রয়োজনের একটা সীমারেখা ছিল; কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর যেমন পরিবর্তন দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার মাপকাঠিও পূর্ববর্তী চাহিদার সংজ্ঞাকে অতিক্রম করল। যখন গ্রামের পক্ষে মানুষের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা মেটানো সম্ভবপর হল না তখনই মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক অবস্থাকে পরিবর্তন করে শহরের সৃষ্টি করল।

যদিও মানুষের বসবাসের অঞ্চলকে গ্রাম ও শহর এই দুইভাগে ভাগ করা হয় তবু এমন কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই যা দিয়ে আমরা গ্রাম ও শহর নির্দেশ করতে পারি। পাশ্চাত্ত্য দেশে গ্রামবাসীরা যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আমাদের ভারতের গ্রামবাসীরা তা একরকম চিন্তাই করতে পারে না। আবার ভারতেই এমন অনেক গ্রাম রয়েছে যাকে পুরোপুরি গ্রাম বলতে পারিনা; কারণ শহরের জীবনের অনেক সুযোগ সুবিধা সেই সব গ্রামে বিদ্যমান।

গ্রাম ও শহরের মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য নির্দেশ করা না গেলেও গ্রামের জীবনের নিশ্চিত কতকগুলি বৈশিষ্ট রয়েছে যা গ্রামকে শহর থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করেছে। গ্রামগুলির আয়তন শহরগুলির আয়তন অপেক্ষা ক্ষুদ্র। গ্রামের লোকসংখ্যাও সাধারণতঃ শহরের লোকসংখ্যা অপেক্ষা কম। তবে কোন কোন গ্রাম আছে যার লোকসংখ্যা ক্ষুদ্র শহরের লোকসংখ্যা অপেক্ষা কম নয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, বিভিন্ন রকম উপজীবিকা—গ্রামকে শহরের জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে রেখেছে। সর্বোপরি গ্রাম ও শহরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে পার্থক্য তা হল—গ্রামের জীবন কৃষিভিত্তিক আর সাধারণতঃ শহরের জীবন হল শিল্পভিত্তিক। এই কৃষি ও শিল্পভিত্তিক সমাজ, গ্রাম ও শহরের সামগ্রিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। পারিবারিক জীবনেও এর প্রভাব কম নয়।

কৃষিভিত্তিক গ্রামসমাজের পারিবারিক জীবনে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় ঃ

(i) গ্রামে সাধারণতঃ যৌথ পরিবার দেখা যায়। এর অবশ্য কারণও আছে। প্রথমতঃ, কৃষিকাজ করার জন্য অনেক লোকের প্রয়োজন হয় এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেকটি লোকের কৃষিকার্যই হল প্রধান এবং বলা যায় একমাত্র উপজীবিকা। জীবিকা অর্জনের জন্য ব্যক্তির অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। কাজেই গ্রামে যৌথ পরিবারের প্রাধান্য দেখা যায়। সম্পত্তিও পরিবারের যৌথ সম্পদ বলেই গণ্য হয়। যৌথ পরিবার তখনই বিকেন্দ্রীকরণের পথ অবলম্বন করে যখন পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। কিন্তু গ্রামে সাধারণতঃ ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু থাকে না। পরিবারের সদস্য হিসেবে সে যৌথ সম্পত্তি ভোগ করে। কাজেই যৌথ পরিবার কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য জীবনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

(ii) কৃষিভিত্তিক পরিবারের অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রাধান্য। পরিবারের যিনি প্রধান বা কর্তা তাঁর কর্তৃত্ব সকলের উপরে। বিবাহ যেমন পারিবারিক কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়, সেরূপ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পরিবার স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। জমিতে যা উৎপন্ন হয় পরিবারের সকল সদস্যরাই তা ভোগ করে। এই ধরনের পরিবার যতখানি সদস্যদের আর্থিক ও সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হয়, শিল্পভিত্তিক পরিবারের পক্ষে ততখানি সম্ভব হয় না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই স্বয়ংসম্পূর্ণতাই কৃষিভিত্তিক পরিবারকে শিল্পভিত্তিক পরিবার থেকে পৃথক করে।

(iii) কৃষিভিত্তিক পরিবারে সন্তানের সংখ্যা সাধারণতঃ বেশী হয় তার কারণ এই জাতীয় পরিবারের জীবন সম্পর্কে ধারণাই স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ পরিবারের বাইরে অবসর যাপন বা আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থা থাকে না। পরিবারই তাদের অবসর বিনোদনের একমাত্র আধার। এ ছাড়াও বেশী সন্তানের জন্ম হওয়াকে তারা ভগবানের দান বলে মেনে নেয়।

(iv) এই ধরনের পরিবারে স্ত্রীলোকেরা অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা একরকম ভোগ করে না বলা চলে। তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা রুচির বিশেষ কোন মূল্য থাকে না। পারিবারিক যৌথ স্বার্থ রক্ষা করাই তাদের কাজ। এমনকি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক সমতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে না।

(v) এই ধরনের সমাজে পরিবারের লোকেদের সামাজিক সচলতা (social

mobility) একরকম থাকে না। ব্যক্তির নিজস্ব পরিচয় অপেক্ষা পরিবারের পরিচয়ই প্রধান হয়ে দেখা দেয়। তার সম্মান প্রতিপত্তি সবই পরিবারের সদস্য হিসেবে, ব্যক্তি হিসেবে নয়। সদস্যদের ভবিষ্যৎ গঠনের (career formation) সুযোগ খুবই সীমিত। পরিবারের সুনাম বা দুর্নাম তার মর্যাদাকে (Status) প্রভাবিত করে। এই ধরনের সমাজে সামাজিক মর্যাদা (social Status) সাধারণতঃ অর্জিত গুণাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। অর্জিত (achieved) মর্যাদা অপেক্ষা অর্পিত (ascribed) মর্যাদাই প্রাধান্য লাভ করে।

(vi) কৃষিভিত্তিক পরিবারের অপর লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল, নিরাপত্তামূলক সংগঠন হিসেবে পরিবার তার সদস্যদের দায়িত্ব গ্রহণ করে। পরিবারের সদস্যদের বার্ধক্যের সময় পরিবার স্বয়ং তাদের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে। সে একেবারে অবহেলার বস্তুতে পরিণত হয় না। রোগের সময় সেবা-শুশ্রূষা করা ও বিপদে-আপদে দেখাশুনা করার সব দায়িত্ব পরিবারই বহন করে। সেই কারণে সদস্যরা অনেক পরিমাণে মানসিক শান্তি ভোগ করে।

(vii) কৃষিভিত্তিক পরিবারের অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সদস্যদের মধ্যে প্রাথমিক সম্পর্কের (Primary relation) প্রাধান্য। পরিবারস্থ শিশুরা অগ্রজদের সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পায়। সমাজ তথা পরিবারের বিশেষ মূল্যবোধ এবং আচার-ব্যবহার শিশুরা গুরুজনদের কাছ থেকে সহজেই আয়ত্ত করে। এ ধরনের পরিবারে সদস্যদের পারিবারিক সম্পর্ক যেমন ঘনিষ্ঠ হয় অপর দিকে সদস্যদের উপর পরিবারের প্রত্যক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণও (direct social control) বর্তায়।

অপরপক্ষে শিল্পভিত্তিক শহুরে পরিবারে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়ঃ

(i) শিল্পভিত্তিক পরিবারে সদস্যদের আয়ের উৎস বিচিত্রমুখী। পরিবারের সদস্যরা হয় কলকারখানায় কাজ করে নতুবা কেহ কেহ নিজের কারখানার তদারকি করে। নিজ নিজ কর্মস্থল থেকে প্রত্যেকে যা রোজগার করে তা তার নিতান্ত নিজেরই সম্পদ বলে গণ্য হয়। কাজেই পরিবারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের প্রাধান্য যৌথ স্বার্থের দিক থেকে চিন্তা করলে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়াও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আয়ের বৈষম্য দেখা যায়। কাজেই এই অর্থনৈতিক পার্থক্য তাদের মানসিক জগতেও মাঝে মাঝে পার্থক্যের সূচনা করে।

(ii) শিল্পভিত্তিক সমাজে স্ত্রী স্বাধীনতাও রক্ষিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, অফিস কাছারিতে মেয়েরা পুরুষদের সাথে সমানতালে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ

করে। গ্রামভিত্তিক পরিবারে নানারকম কুসংস্কারের বাধা নিষেধের ফলে মেয়েরা ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। বদ্ধ সমাজের (closed society) রক্ষণশীলতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চিন্তা তাদের পক্ষে অলীক কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। পক্ষান্তরে শিল্পভিত্তিক পরিবারে মেয়েরা কৃষিভিত্তিক পরিবারের মত পুরুষদের উপর অর্থ নৈতিক ব্যাপারে এত নির্ভরশীল নয়। সে কারণে অনেক মহিলাই নানা ভাবে নিজের ব্যক্তিত্ব্যের বিকাশের সুযোগ লাভ করে।

(iii) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে নানারকম খাদ্যদ্রব্যও যেমন উৎপাদিত হয় অপরপক্ষে নানারকম বিলাসসামগ্রীও মনোরঞ্জনের জন্য তৈয়ারি হয়। খাওয়াপরা ছাড়াও মানুষের নানারকম চাহিদা শিল্পভিত্তিক পরিবারে পরিলক্ষিত হয়। সেজন্য শিল্পভিত্তিক পরিবারের সদস্যরা অবসর বিনোদনের জন্য নানাধরনের আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান যেমন সিনেমা, থিয়াটারে যাতায়াত করেন আবার নানাবিধ সংস্থা থাকার ফলে সদস্যদের বহির্মুখী দৃষ্টিভঙ্গিও গড়ে ওঠে যা তাদের জীবনকে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর জগতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

(iv) শিল্প অঞ্চলে যৌথ পরিবারের স্থলে দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবারের (nucleous family) প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। শিল্পসভ্যতা মানুষের জীবনের অভাবনীয় উন্নতি সাধন করেছে ঠিকই কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা এবং আত্ম-কেন্দ্রিকতার মনোভাব যৌথ পরিবারের কাঠামোকে যে শিথিল করছে তা অস্বীকার করা চলে না।

(v) পরিবারের শিশুদের শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে কৃষিভিত্তিক পরিবার যে মুখ্য ভূমিকা পালন করে শিল্পভিত্তিক পরিবারে তা লক্ষ্য করা যায় না। সময়ের অভাবের জন্য পিতামাতাকে শিশুর শিক্ষার ব্যাপারেও অন্যান্য সংস্থার উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করতে হয়। শিল্পভিত্তিক পরিবার কৃষিভিত্তিক পরিবারের মতন নিরাপত্তামূলক কাজকর্ম করতে পারে না।

উপরের আলোচনা থেকে কৃষিভিত্তিক ও শিল্পভিত্তিক পরিবারের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা জানতে পারি। মানুষের চাহিদা নানাবিধ। জৈবিক চাহিদা পরিতৃপ্ত হলেই যদি মানুষ সন্তুষ্টিবোধ করত তাহলে শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞানের প্রসার হত না এবং এই নিত্য নূতন ধরনের চাহিদার পরিপূরণের জন্যই গ্রাম্য জীবনের স্থলে শিল্পভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠেছে। কিন্তু গতানুগতিক গ্রাম্য জীবনও এমন কতকগুলি স্বীকৃত নীতি ও মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত যা পারিবারিক, এমনকি সামাজিক জীবনে সংহতি রক্ষা করতে সাহায্য করে।

৯। বিবাহ (Marriage) ঃ

পরিবার একটি বিশ্বজনীন সংগঠন এবং সেজন্য সব সমাজেই পরিবারের অস্তিত্ব স্বীকৃত। বিবাহ এমন একটি অনুষ্ঠান যা পরিবারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বস্তুতঃ,বিবাহের মধ্য দিয়েই একটি নূতন পরিবারের আবির্ভাব ঘটে। বিবাহ একটি পারিবারিক বা গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান। আবার বিবাহ একটি আইনসিদ্ধ সামাজিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানই নরনারীকে তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে এবং সন্তান উৎপাদন করতে অনুমতি দেয়। ওয়েস্টারমার্ক (*Westermarck*) তাঁর 'The History of Human Marriage' গ্রন্থে বিবাহের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন, "এ হল এক বা একাধিক পুরুষের, এক বা একাধিক নারীর সঙ্গে সম্পর্ক যা আচার বা আইনের দ্বারা স্বীকৃত এবং এই সম্পর্কে নিজেদের যারা যুক্ত করেছে এবং তাদের মিলনের ফলে যে সন্তানের উৎপত্তি ঘটেছে, উভয়ের ক্ষেত্রেই কতকগুলি অধিকার এবং কর্তব্য যুক্ত।" এই সংজ্ঞাটি বিবাহের জৈবিক অর্থাৎ দেহের দিক এবং সামাজিক দিক, উভয় দিকের কথা উল্লেখ করেছে। ওয়েস্টারমার্ক অন্যত্র বিবাহের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "বিবাহ হল একটি পুরুষ এবং নারীর মধ্যে কমবেশী স্থায়ী সম্পর্ক, যে সম্পর্ক নিছক সন্তান উৎপাদন এবং সন্তানের জন্মের পরও স্থায়ী হয়"। রোসেনথল (*Rosenthal*)-ও বলেন যে, বিবাহের দুটি উপাদানই হল সামাজিক এবং আইনগত স্বীকৃতি। তিনিও বিবাহের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেন, 'এ হল নরনারীর মধ্যে মিলন যা সামাজিক ও আইনের দিক থেকে স্বীকৃত'। রিভারস্ (*Rivers*) মনে করেন, নরনারীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই বিবাহের মাধ্যমে নরনারীর মধ্যে মিলনের ব্যবস্থা সমাজ স্বীকৃত। যৌনসম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য এটি একটি সুসংগঠিত অনুষ্ঠান। রিভারস্ মনে করেন, বিবাহ অনুষ্ঠান যদি সমাজে প্রচলিত না থাকে তাহলে সমাজে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেবে।

বিবাহ এবং পরিবার এই দুটিকে অনেক সময় গুলিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু কোন মতেই দুটিকে অভিন্ন গণ্য করা যুক্তিসঙ্গত নয়। পরিবার একটি প্রতিষ্ঠান। বিবাহ পরিবারের একাধিক অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম। বিবাহ অনুষ্ঠানের উপরই পরিবারের ভিত্তি। বিবাহ পরিবারের একটি অনুষ্ঠান, আবার এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই একটি নূতন পরিবারের আবির্ভাব ঘটে। সাধারণতঃ বিবাহ পরিবার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি পূর্ববর্তী ব্যবস্থা।

আবার বিবাহকে যৌন-সম্পর্কের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলাও যুক্তিযুক্ত নয়। এটি একটি আইনসিদ্ধ এবং নৈতিক অনুষ্ঠান। সভ্য সমাজে বিবাহ-অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বীকৃত নয়, এমন নরনারীর যৌন সম্পর্ক সামাজিক এবং নৈতিক স্বীকৃতি লাভ করে না। প্রায় সব সভ্য সম্প্রদায়েই বিবাহ-পূর্ব যৌন সংসর্গ সমাজানুমোদিত নয় এবং বিবাহ পরবর্তীকালে স্ত্রী ভিন্ন অন্য নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ। সমাজের ও আইনের দিক থেকে বিবাহই একমাত্র স্বীকৃত অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে নরনারী দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।

যৌন-কামনার পরিতৃপ্তিকেও বিবাহিত জীবনের একমাত্র লক্ষ্য গণ্য করা হয় না। সন্তানভিত্তিক পরিবার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিবাহই একমাত্র স্বীকৃত পদ্ধতি। বিবাহের উদ্দেশ্য হল একটি পরিবার প্রতিষ্ঠা করা, বিবাহিত জীবনে নরনারীর মিলনের ফলে যে সন্তান জন্মলাভ করল তাদের আশ্রয় প্রদান করা যাতে শিশুকালে তারা সেখানে লালিত-পালিত হতে পারে। একমাত্র বিবাহের মধ্য দিয়েই বৈধ শিশুর জন্ম সম্ভব। মেলিন্‌ওস্‌কি (*Malinowski*) যথার্থভাবেই বলেছেন, "সামগ্রিকভাবে বিবাহ বরং সন্তান রক্ষণ এবং তাদের প্রতিপালনের জন্য একটি চুক্তি বিশেষ, যৌন সংসর্গের জন্য কোন ছাড়পত্র নয়।"

বিবাহ নরনারীর মধ্যে কোন কৃত্রিম চুক্তিপত্র নয়। এটি একটি স্থায়ী বন্ধন। খুশীমত স্বামী-স্ত্রী এই বন্ধন ছিন্ন করতে পারে না। বিবাহ বিচ্ছেদের জন্যও আইন অনুমোদিত কতকগুলি শর্ত পূরণ করতে হয়। ভারতে হিন্দুরা বিবাহ অনুষ্ঠানকে একটি পবিত্র অনুষ্ঠান বলে গণ্য করে। হিন্দু বিবাহের লক্ষ্য হল ধর্ম, প্রণয় এবং রতি। হিন্দুদের দৃষ্টিতে যৌনসম্ভোগ বিবাহের অন্যতম লক্ষ্য ঠিকই, কিন্তু যৌন তৃপ্তির স্থান বিবাহে মুখ্য নয়, একান্তই গৌণ। হিন্দুর দৃষ্টিতে বিবাহ হল ধর্ম আচরণ। বিবাহ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। অনেক সম্প্রদায়েই বিবাহ নৈতিক অনুষ্ঠান মাত্র নয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানও বটে। গান্ধীজীর মতে বিবাহ হল, 'দেহের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক মিলন'। বিবাহের মধ্য দিয়ে যখন দুটি নরনারীর মিলন ঘটে, তখন নরনারীর পারস্পরিক ভালবাসা, বন্ধুত্ব, শুভেচ্ছা তাদের দৈহিক কামনা বাসনাকে শুদ্ধ ও পবিত্র করে তোলে।

বিবাহের প্রকারভেদ আছে। প্রধান প্রধান বিবাহের জাতিরূপগুলি হল—(১) একগামিতা (monogamy)—একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর দাম্পত্য জীবন, (২) বহুগামিতা (polygamy)—নর বা নারী যখন এককালে একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে দাম্পত্য-জীবন যাপন করে। এর নানা রূপ আছে। (ক) বহু

পত্নীকত্ব (polygyny)—একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস। (খ) বহুভর্তৃকত্ব বা বহুস্বামীকত্ব (polyandry)—একই স্ত্রীলোকের একাধিক পুরুষের সঙ্গে দাম্পত্য-জীবন যাপন। (গ) গোষ্ঠী বিবাহ (group-marriage) বা সমষ্টি বিবাহ—একাধিক পুরুষের একাধিক স্ত্রীলোকের সঙ্গে একই কালে বিবাহ। সভ্য সমাজের এই জাতীয় বিবাহের প্রচলন আজকাল দেখা যায় না।

বর্তমান যুগে সব সমাজেই একগামিতা সবচেয়ে জনপ্রিয় বিবাহ প্রথা রূপে স্বীকৃত। এর জনপ্রিয়তার কারণ হল সন্তান ধারণ ও সন্তান পালন—পরিবারের এই দুই মৌলিক কার্য সিদ্ধ করার পক্ষে এই ধরনের বিবাহ-প্রথা খুবই উপযোগী। এই ধরনের বিবাহ-প্রথায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। বহুগামী বিবাহে একাধিক নরনারীর বিবাহিত সম্পর্ক নানা কারণে জটিল ও মলিন হয়ে ওঠারই সম্ভাবনা। তাছাড়া একগামী বিবাহ-প্রথার মাধ্যমেই বিবাহিত নরনারীর পরিপূর্ণ নৈতিক বিকাশ সম্ভব। কোন কোন সমাজে আইনের মাধ্যমে এই বিবাহ-প্রথা বলবৎ করা হয়েছে।

বিবাহের গুরুত্ব (Importance of Marriage): বিবাহ ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের দিক থেকেই একটি প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান। ব্যক্তির দিক থেকে বিবাহ-প্রথার গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য। যৌনকামনা মানুষের সহজাত জৈবিক তাড়না। এই তাড়না এতই প্রবল যে একে দমন করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। স্বাভাবিক যৌন প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য নরনারীর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। যৌন কামনার মধ্য দিয়েই ব্যক্তি তার একটা প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে যেটি হল বংশগতি অক্ষুণ্ণ রাখা। যদি ব্যক্তির এই যৌন আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক পথে অর্থাৎ বিবাহিত জীবন যাপনের মাধ্যমে পরিতৃপ্তি খুঁজে পায় তবে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিকভাবে বিকাশ সাধিত হয়। কিন্তু যদি বিবাহিত জীবন বর্জন করে কোন অস্বাভাবিক পথে নরনারী তাদের যৌন কামনাকে মেটায় তাহলে তাদের নৈতিক বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক দেখা দেয়। আবার ইচ্ছাপূর্বক যৌন ইচ্ছাকে যদি অবদমন করা হয় তাহলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে নানা ধরনের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। অবদমিত যৌন-কামনা অনেক সময় অসুস্থতা এবং মানসিক বিকৃতির সৃষ্টি করে। মানুষের যৌন আবেগ যদি বিচার বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় এবং তার সৌন্দর্যবোধ, নীতিবোধ ও ধর্মবোধের সঙ্গে যুক্ত না হয় তাহলে মানুষ, মানুষ হয়েও পশুতে পরিণত হয়। বিবাহ নরনারীর মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করে—মধুরতম সাহচর্য সৃষ্টি করে। বিবাহ

বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নরনারী একই সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার হয়, একই আশা-আকাঙ্খায় অনুপ্রাণিত হয়। একই সন্তানের চিন্তায় উভয়ে সমভাবে ব্যাকুল হয়ে উঠে। উভয়ের মনোভাবের এই সাদৃশ্য এমন একটি মধুর সম্পর্কের সৃষ্টি করে যা অন্য কোনরকম সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

বিবাহ একটি নৈতিক অনুষ্ঠান। বিবাহ কেবলমাত্র দুটি নরনারীর মধ্যে একটি চুক্তি নয়। পারস্পরিক ভালবাসা, সহানুভূতি ও সমবেদনাবোধ, নরনারীর জৈবিক কামনাকে আধ্যাত্মিক এবং পবিত্র বন্ধনে উন্নীত করে। বিবাহের মধ্য দিয়েই নরনারীর আত্মোপলব্ধি ঘটে। সামনার (*Sumner*) এবং কেলার (*Keller*) বলেন, "বিবাহ প্রত্যেকের স্বার্থ ও কামনার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি, বিশেষ করে শিশুর জন্ম এবং প্রতিপালন ব্যাপারে, দুটি জীবনের এবং স্বার্থের ঐক্যের দিকে চালিত করে।"

সমাজের দিক থেকেও বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। পরিবার সমাজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। সুসংগঠিত পরিবার সমাজের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করে। বিবাহ-ব্যবস্থা পরিবারের ভিত্তিস্বরূপ। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "পরিবারের প্রাথমিক ভিত্তির একান্ত প্রয়োজনীয়তার জন্যই বিবাহ-প্রথার প্রতি পবিত্রতা এবং স্থায়িত্ব আরোপ করার যথেষ্ট কারণ আছে।" বিবাহ-প্রথার উপরই পরিবার নির্ভরশীল।

সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল সমষ্টিগত স্বার্থে ব্যক্তির যৌন সম্পর্ক এবং যৌন আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করা। সমাজে মানুষ যদি বিবাহ করে স্বাভাবিক দাম্পত্য-জীবন যাপন না করে, যদি সমাজে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজ করে তাহলে সমাজস্থ ব্যক্তির শারিরীক ও নৈতিক বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক দেখা দেয়। দৈহিক কামনার বিকৃতি ব্যক্তির জীবনে নৈতিক অধঃপতনের সূচনা করে এবং নিঃসন্দেহে তা সমাজের সংগঠন ও শৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকারক। বিবাহ প্রথার মাধ্যমেই সমাজ ব্যক্তির অপরিপূরিত যৌন-কামনাকে নিয়ন্ত্রিত করেও তাকে একটা সীমার মধ্যে ধরে রাখার জন্য সচেষ্ট হয়। সমাজের দিক থেকে নরনারীর যৌন-কামনার পরিতৃপ্তির একমাত্র উদ্দেশ্য হল সন্তানোৎপাদন। সামনার এবং কেলার বলেন, "বিবাহ অনুষ্ঠান হল সমাজের নিজেকে আত্ম-বিলোপের হাত থেকে রক্ষা করার সংগঠন যেমন, শিল্প সংগঠনগুলি সমাজের আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত সংগঠন।" বিবাহের মধ্য দিয়ে নরনারী যাতে ভালবাসা, বন্ধুত্ব, গভীর আত্মীয়তার ভিত্তিতে এক সুন্দর সংসার গড়ে তুলতে পারে, সমাজ প্রতিটি নরনারীকে সে সুযোগ দেয়।

বিবাহের পবিত্র বন্ধন নরনারীর কামনাকে ভালবাসা ও পারস্পরিক বন্ধুত্বে রূপান্তরিত করে এবং পশু প্রবৃত্তিকে বিদূরিত করে নরনারীর মনে এক আধ্যাত্মিক মনোভাবের সৃষ্টি করে। ব্যক্তির চরম কল্যাণ সমাজেরও কল্যাণ। বিবাহ হল তাকে লাভ করার উপায় স্বরূপ। বিবাহ-প্রথা একটা সামাজিক রীতি, সমাজের কল্যাণের জন্যই সমাজ নরনারীর এই মিলনকে স্বীকার করে নেয়।

অনুশীলনী

১। পরিবার কাকে বলে? পরিবারের বৈশিষ্ট্যগুলি কি? প্রাথমিক গোষ্ঠী হিসেবে পরিবারের গুরুত্ব নিরূপণ কর। (What is a family? What are the main features of the institution of family? Indicate the importance of the family as a primary group.)

২। পরিবারের উৎপত্তি কিভাবে ঘটেছে, আলোচনা কর। (Explain, how family as an institution has originated.)

৩। পরিবারের বিশ্বজনীনত্বের ব্যাখ্যা কিভাবে দিতে পার? (How can you account for the universality of family?)

৪। পরিবারের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা কর। (Explain the different types of family.)

৫। পরিবারের কার্যাবলীর ব্যাখ্যা কর। (Explain the functions of family.)

৬। পরিবারের এবং পরিবারের মধ্য দিয়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিকীকরণ কিভাবে সম্ভব হয়? (How social control and socialization is possible in and through family?)

৭। কৃষিভিত্তিক ও শিল্পভিত্তিক সমাজে পরিবারের ভূমিকা বর্ণনা কর। (Describe the role of the family in agrarian and industrial societies.)

৮। বিবাহ কী? বিবাহের গুরুত্ব বর্ণনা কর। (What is marriage? Explain its importance.)

সমাজবিদ্যা

দ্বিতীয় পত্র

প্রথম অধ্যায়

সামাজিক স্তরবিন্যাস ও সামাজিক সচলতা (Social stratification and Social mobility)

১। সমাজে সভ্যদের সমতা ও অসমতা (Equality and inequality of members in a society) :

প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রের যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কাল পর্যন্ত সাম্যনীতির গুরুত্ব অনেকেই উপলব্ধি করে আসছেন। ইউরোপের বিভিন্ন উন্নতশীল দেশগুলিতে যে আন্দোলনের জোয়ার সমাজকে আন্দোলিত করেছিল তার উদ্দেশ্যই ছিল সাম্যবাদের ভিত্তিতে ব্যক্তির অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা। অবশ্য বর্তমান সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সাম্যনীতি বলতে মুখ্যতঃ অর্থ নৈতিক সাম্যকেই বোঝায়। কিন্তু সমাজে সাম্য বা সমতার যে তাৎপর্য তা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার্য নয়। তাই সমতার প্রশ্ন সমাজবিদ্দের চিন্তাভাবনাকেও আলোড়িত করেছে, এমন কি সমাজ সম্পর্কে চিন্তাশীল লেখক, নাট্যকার, দার্শনিকবৃন্দ সকলেই এই প্রশ্নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ষ্টোয়িক দার্শনিকরা মানবাত্মার সম-অধিকারের যে প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রাচীন রোমের আইনে তার মর্ম সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে। রুশো তাঁর সামাজিক চুক্তিতে (Social Contract) গণতন্ত্রকে সাধারণের ইচ্ছার (General will) উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তিনি উদাত্তকণ্ঠে প্রকাশ করেন যে, মানুষ স্বাধীন হয়েই জন্মগ্রহণ করে কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলাবদ্ধ। অবশ্য এ কথা বলা সমীচীন যে রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্‌রা সাধারণতঃ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই সাম্যনীতির জয়গান করেছেন কিন্তু মানুষ নিয়েই সমাজ, আবার মানুষ নিয়েও রাষ্ট্র। ফলে রাজনৈতিক সমস্যা সামাজিক সমস্যাকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনি সামাজিক সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যাকেও প্রভাবিত করে। যেমন—সামাজিক স্তরবিন্যাসে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে বৈষম্য তার ভিত্তি হল ক্ষমতাগত, মর্যাদাগত, জাতিগত এবং অর্থনীতিগত। এই বিভিন্ন পর্যায়ের বৈষম্যের কারণ হিসেবে অর্থ নৈতিক বৈষম্যও কম দায়ী নয়। সমাজে সমতার নীতি প্রচারে যাঁরা উৎসাহী ছিলেন তাঁদের চিন্তা রাজনৈতিক জগতকেও কম আন্দোলিত করে নি। ডাইসী (*Diecy*) তাঁর পুস্তকে আইনের দৃষ্টিতে সাম্যের কথা বলেছেন। আইনের দৃষ্টিতে

একই অপরাধের জন্য প্রধানমন্ত্রী থেকে ঝাড়ুদার পর্যন্ত সকলেই সমভাবে শাস্তির যোগ্য। কার্লমার্কস (*KarlMarx*) তাঁর Manifesto-তে পরস্পর বিরোধী শ্রেণীর অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এই শ্রেণীবিন্যাসের মূল কারণ হিসেবে তিনি অর্থনৈতিক বৈষম্যের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফলে 'তথাকথিত' রাষ্ট্রর উচ্ছেদের কথা তিনি ঘোষণা করেছেন।

সমাজে সব সভ্যই সমান—এই চিন্তা প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত রাজনৈতিক এবং সামাজিক চিন্তাবিদদের চিন্তাধারাকে আলোড়িত করেছে, যা বিভিন্ন দেশের সংবিধানে স্থপরিস্ফুট। ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কথা বলা হয়েছে এবং মন্দির, পুষ্করিণী, রেস্তোরা ও জনসাধারণের সম্পত্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যক্তিদের সমান অধিকারের উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত বিষয়গুলিতে জাতিভিত্তিক বৈষম্যকরণ আইনতঃ দণ্ডনীয় বলে ঘোষিত হয়েছে। তা ছাড়াও সাম্য আনয়নের জন্যে নিম্নপর্যায়ভুক্ত তপসিলী এবং উপজাতির ক্ষেত্রে বিশেষ স্থযোগ স্থবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ফলে সামাজিক সচলতার পথও স্থগম হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, ফলে সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা প্রথার বিলোপ সাধন করে সাম্যবাদের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তা ছাড়া অন্যান্য দেশও সমাজে সমতা নীতির প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছে। স্থইজারল্যাণ্ডে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের (Direct Democracy) মাধ্যমে জনগণের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে মতামত প্রকাশের এবং শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। আমেরিকায় শ্বেতকায় (White) এবং কৃষ্ণকায় (Black) ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেণীবৈষম্যের বিরুদ্ধে অনেক চিন্তাবিদই প্রতিবাদে মুখর।

সাম্যবাদের মূল অর্থই হল সমাজজীবনে কোন মানুষেরই এমন কোন অধিকার থাকবে না যা অপরের অধিকার ভোগের পরিপন্থী এবং কোন শ্রেণী বা ব্যক্তি বিশেষের জন্য বিশেষ কোন স্থযোগ-স্থবিধা থাকা নীতিগতভাবে অবাঞ্ছনীয়। সাম্যবাদের মূলকথাই হল সম অধিকারের স্বীকৃতি। একটি শ্রেণী যদি তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পক্ষে তা পরিপন্থী। বিভিন্ন দেশের সংবিধানে, মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে সমতার উপর তাই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সমাজবিদ্দের মধ্যে অনেকেই এই মত পোষণ করেন যে, যতই সমাজে সাম্যবাদের জয়গান করা হোক না কেন, শ্রেণীবৈষম্য সামাজিক জীবনে অবশ্যম্ভাবী। সামাজিক জীবনে প্রাত্যহিক ক্রিয়া প্রক্রিয়াই

অনেক ক্ষেত্রে এই বৈষম্যের সৃষ্টি করে থাকে। গতিশীল জীবনে, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসেরও স্থায়ী কোন রূপ নেই। পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার সাথে সাথে নিত্য নতুন শ্রেণীর উদ্ভব স্বাভাবিক। ফলে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা স্থাপনে যারা দৃঢ়সঙ্কল্প তাদের পক্ষে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ করা সম্ভব হলেও সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সকল প্রকার সামাজিক বৈষম্য দূর করা সম্ভব নয়। শ্রেণীগত বৈষম্যের অন্তরালে যে মনোভাব ক্রিয়া করে তার কারণ একমাত্র অর্থনীতিই নয়, সাংস্কৃতিক মূল্যের চেতনার অভাবও তার মূলে ক্রিয়াশীল। এমনকি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সামাজিক ক্ষেত্রে পুরোপুরি সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষমতা যাদের হাতে ন্যস্ত তারা অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের মাধ্যমে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতাও করায়ত্ত করে। ফলে এই অর্থনৈতিক অসাম্য সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করে যার ফলে সমাজস্থ ব্যক্তির সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রেও যেমন বৈষম্য দেখা যায় আবার সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রেও এ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক বৈষম্যহেতু সমাজে মর্যাদা অর্জনের পথও রুদ্ধ হয়ে পড়ে। সেজন্য সমাজবিদেরা বৈষম্যের কারণ হিসেবে পরিবেশের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে সমাজে অসাম্যের কারণ নির্দেশ করেছেন। সামাজিক সচলতা এবং সামাজিক অসাম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু শিক্ষার বিস্তারও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে সকলের পক্ষে শিক্ষা গ্রহণও সম্ভব হয় না, যার জন্য সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে সমতার কথা চিন্তা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

সরোকিন (*Sorokin*)-এর মতে পুরোপুরি সাম্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত অবিভক্ত সমাজের চিন্তা কল্পনাবিলাস ছাড়া কিছুই নয়। শ্রেণীবিভাগ ও তজ্জনিত বৈষম্য শুধু বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার ফলস্বরূপ নয়, এমনকি প্রাচীন সমাজও এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত ছিল না। প্রাচীন গোষ্ঠী জীবনেও দলপতির প্রাধান্যের অসংখ্য নজীর পাওয়া যায়।

কয়েকজন সমাজবিদ্ যেমন ডেভিস (*Davis*) এবং মুর (*Moore*) অসাম্যের কারণ হিসেবে সমাজে বিভিন্ন কাজকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের শ্রেণীবিভাগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সমাজে ব্যক্তিদের যে সব কাজ করতে হয় প্রত্যেকটি কাজের গুরুত্ব সমান নয়—কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ আবার কোনটি কম গুরুত্বপূর্ণ। ফলে স্বভাবতঃই নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে। এছাড়া সমাজে সব ব্যক্তিই সমান দক্ষতাসম্পন্ন

নয়, কারও দক্ষতা বেশী আবার কারও দক্ষতা কম, সেহেতু সকলের পক্ষে সকল কাজ সমানভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। ফলে স্বাভাবিক কারণেই কর্মের গুরুত্ব ভেদে সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রেও বৈষম্য এসে পড়ে। এই সুযোগসুবিধা অর্থ নৈতিক এবং মর্যাদাসূচক হতে পারে। বিশেষ সুযোগসুবিধা ছাড়া দায়িত্বপূর্ণ ও কষ্টসাধ্য কাজ সকলে করতে ইচ্ছুক হয় না। তা ছাড়াও কোন কোন কাজ সম্পাদনের জন্য প্রশিক্ষণের (training) প্রয়োজন, যা সকলের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গুণাবলীর জন্যও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য দেখা যায়। একই পরিবেশে যমজ সন্তানদের প্রতিপালনের সমান সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও যে তাদের মধ্যে কর্মকুশলতার পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তা সমাজবিদ্‌রা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। অসাম্যের কারণ কেবলমাত্র অর্থ নৈতিক বৈষম্য এবং যোগ্যতার বৈষম্যের দিক থেকেই বিচার্য নয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অসাম্যের জন্য সমাজের অন্যান্য ব্যবস্থা, ধর্ম ও মনস্তাত্ত্বিক কারণও কম দায়ী নয়।

সাম্য এবং অসাম্যের ক্রিয়া প্রক্রিয়া নিত্যই সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত। সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার গুরুত্বকেও যেমন অস্বীকার করা যায় না, আবার পুরোপুরি সর্ব ব্যাপারে সাম্য প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব বলে মনে হয় না। জীবনের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী মৌলিক প্রশ্নে সাম্য নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত গুণাবলীর ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। কয়েকজন সমাজবিদ্ এ মন্তব্যও করেছেন যে, পুরোপুরি সাম্য সকল সময়ে কাম্য নয়। সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি যদি একই ভাবে চিন্তা করতে এবং বিচারবুদ্ধিতে যদি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য না থাকত তাহলে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতির বিকাশসাধনের পথও রুদ্ধ হয়ে যেত এবং সমাজও গতিহীন হয়ে পড়ত।

২। সামাজিক বৈষম্যকরণের ধারণা (The Idea of social differentiation) :

ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির নানা বিষয়ে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়—দৈহিক, মানসিক, ব্যক্তিগত, প্রকৃতিগত, নৈতিক চরিত্রগত, লিঙ্গগত প্রভৃতি। কিন্তু এই জাতীয় বৈষম্য ব্যক্তিগত বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য নয়। সামাজিক বৈষম্যকরণের প্রশ্ন তখনই আসে যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে কোন এক সমাজিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করি এবং অপর এক ব্যক্তিকে অপর এক সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করি। যেমন, আমরা কথায় বলি রাম

উচ্চবিত্তের অন্তর্ভুক্ত, আর শ্যাম মধ্যবিত্তের অন্তর্ভুক্ত তখনই সামাজিক বৈষম্যকরণের প্রশ্ন এসে যায়। জাতিগত বৈষম্যও সামাজিক বৈষম্য। যখন আমরা বলি রাম ব্রাহ্মণ, যদু শূদ্র, তখন এই বৈষম্য সামাজিক বৈষম্য।

সামাজিক বৈষম্যের সঙ্গে সামাজিক স্তরবিন্যাসের (Stratification) বিশেষ সম্পর্ক আছে। সামাজিক স্তরবিন্যাস হল সমাজের কতিপয় স্থায়ী গোষ্ঠী বা বর্গে (Categories) বিভক্ত হওয়া, যারা কর্তৃত্ব ও বশ্যতার সম্পর্কে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এ ব্যক্তি পুঁজিবাদী, ঐ ব্যক্তি শোষিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—এগুলি হল সামাজিক বৈষম্যকরণের উদাহরণ। পুরুষের সঙ্গে নারীর যে লিঙ্গগত বৈষম্য তা সামাজিক বৈষম্য নয়, ব্যক্তিগত বৈষম্য।

মৃত্তিকার যেমনি বিভিন্ন স্তর থাকে, সমাজেরও তেমনি বিভিন্ন স্তর আছে। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য হল, মৃত্তিকার স্তরগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের কোন সচেতনতা নেই, কিন্তু সমাজের বিভিন্ন স্তর পরস্পরের সম্পর্কে সচেতন। 'শ্রেণী' এবং 'জাতি' সামাজিক স্তর বিন্যাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যা সমাজে কোন ব্যক্তির অবস্থান ও পদমর্যাদা অনেক পরিমাণে নির্দেশ করে। সামাজিক শ্রেণী হল কিছু লোকের সমষ্টি বা একটি গোষ্ঠী, সমাজে যার একটা সুস্পষ্ট মর্যাদা রয়েছে এবং এই মর্যাদাই অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নিরূপণ করছে। কাজেই সামাজিক শ্রেণীকে কেন্দ্র করেই সামাজিক বৈষম্যের উদ্ভব। অর্থ, ধর্ম, জ্ঞান, ক্ষমতা প্রভৃতি নানা বিষয়ই এই মর্যাদার বিষয়টি নির্ধারিত করে এবং তারই ভিত্তিতে এক একটা বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, উচ্চ বিত্ত, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত হল অর্থের ভিত্তিতে গঠিত সামাজিক শ্রেণী। সমাজে উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তি যে মর্যাদা ভোগ করে, নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তি সেই মর্যাদা ভোগ করতে পারে না, যদি অর্থ বা বিত্তই মর্যাদা নিরূপণের একমাত্র মাপকাঠি গণ্য হয়। অনুরূপভাবে, শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একজন ব্যক্তি শাসিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একজন ব্যক্তির তুলনায় সমাজে অধিকতর মর্যাদা লাভ করে। এভাবেই এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর সামাজিক বৈষম্য গড়ে ওঠে। প্রাচীন এবং আধুনিক ভারতে জাতি প্রথা সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি বিশেষ রূপ (form) বলা যেতে পারে। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বৈষম্য সামাজিক বৈষম্যের উদাহরণ।

মানুষে মানুষে যে ব্যক্তিগত বৈষম্য তা বিশেষ কোন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে না। কিন্তু সামাজিক বৈষম্যকরণ বহু সমাজে বহু সমস্যার সৃষ্টি করে। সর্বপ্রকার সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত হয়েছে এমন শ্রেণীহীন সমাজ বাস্তবে দেখা

যায় না। যে কোন সমাজে সামাজিক বৈষম্য কিছু না কিছু মাত্রায় থাকবেই কিন্তু যখন এই বৈষম্য অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করে তখনই সমাজের ঐক্য ও সংহতি বিঘ্নিত হয়। যেমন, জাতিপ্রথার সবচেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থা হল অস্পৃশ্যতা, যা সমাজের মূলে আঘাত করে।

সামাজিক বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে দূর করা হয়ত সম্ভব নাও হতে পারে, তবে সমাজের প্রতিটি সভ্যের লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে এই বৈষম্য সামাজিক সংগঠনকে কলুষিত না করে। শিক্ষা, পারস্পরিক বোঝাপড়া, পারস্পরিক সহযোগিতা, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হবার প্রচেষ্টা, পারস্পরিক মেলামেশা, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা ইত্যাদি সামাজিক শ্রেণীগুলির মধ্যে ব্যবধানের দূরত্ব অপসারিত করে তাদের পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে। তাছাড়া, কোন বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি তার মিথ্যা মর্যাদাবোধকে প্রাধান্য না দিয়ে সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের কথা চিন্তা করতে পারে। সমাজে সকল ব্যক্তিকে সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়া হলে, মিথ্যা জাত্যাভিমান ও শ্রেণী-সচেতনতার বিলোপ সাধিত হতে পারে। কাজেই সামাজিক বৈষম্যকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করতে না পারলেও, সমাজ সচেষ্ট হলে এই বৈষম্যপ্রসূত অনেক সামাজিক অকল্যাণকে প্রতিরোধ করতে পারে। অর্থনৈতিক সমতা অনেকাংশে সামাজিক বৈষম্যজাত দুর্নীতির অবসান ঘটাতে পারে। এই প্রসঙ্গে গিসবার্ট (*Gisbart*) যে কথা বলেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,—'সামাজিক স্তরবিন্যাসকে এড়াবার উপায় না থাকতে পারে, কিন্তু তাকে সমাজের কল্যাণের দিকে চালিত করা উচিত।'

৩। সমাজের সভ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব এবং হীনতা (Superiority and inferiority among members in a Society) :

'প্রাচীন সমাজে এমনকি, বর্তমান সমাজেও সমাজের সভ্যদের মধ্যে কেউ শ্রেষ্ঠ (Superior), কেউ হীন (Inferior), এমন একটা ধারণার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য আধুনিক সভ্য সমাজ এই জাতীয় ধারণার বিলোপ সাধনে বদ্ধ-পরিকর। প্রশ্ন হল, সমাজের সভ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা ও হীনতার শ্রেণীবিভাগ করা চলে কি? আমরা কি বলতে পারি, সমাজের কোন্ কোন্ সভ্য শ্রেষ্ঠ এবং কোন্ কোন্ সভ্য হীন?

মানুষ হিসেবে স্বভাবতঃ সবাই সমান। কিন্তু নানা ব্যাপারে মানুষের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন—রাম ও যদু, স্বভাবতঃই সমান। কিন্তু নামের পার্থক্য ছাড়াও তাদের মধ্যে বর্ণ, আকার, আকৃতি, সামর্থ্য ও অন্যান্য ব্যাপারেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হতে পারে। মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় গুণাবলীর বা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মানুষের মধ্যে যেমন মিল লক্ষ্য করা যায়, তেমনি অপ্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অমিল লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সে কারণে সমাজে কোন ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ, কোন ব্যক্তিকে হীন গণ্য করা যেতে পারে না। দেহাকৃতির দিক থেকেও কোন মানুষের মধ্যে বিশেষ কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হতে পারে, কিন্তু সে কারণে তাকে হীন এবং যার মধ্যে সেই ত্রুটি নেই তাকে শ্রেষ্ঠ গণ্য করা যেতে পারে না।

সমাজের সভ্যদের মধ্যে কেউ শ্রেষ্ঠ কেউ হীন—এই জাতীয় প্রশ্ন কারও কারও মনে জেগেছে, সামাজিক বৈষম্যের (social differences) জন্য। তবে একথা সত্য যে সামাজিক স্তর বিন্যাসের অস্তিত্ব নেই এমন শ্রেণীহীন সমাজ অনেকের কাম্য হলেও, তার বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ নেই। সামাজিক বৈষম্য প্রতিটি সমাজেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সামাজিক স্তরবিন্যাস অনেকের কাম্য না হলেও তাকে এড়াবার উপায় নেই। সেই কারণে আমরা সমাজে মর্যাদার বা জাতিগত ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীর উপস্থিতি লক্ষ্য করি। এই সামাজিক বৈষম্যই সমাজের সভ্যদের মধ্যে কেউ শ্রেষ্ঠ, কেউ হীন—এমন একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছে। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক: প্রাচীন হিন্দুসমাজে গুণ ও কর্ম অনুসারে চারটি বর্ণ ও শ্রেণীর বিভাগ করা হয়েছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। কিন্তু বর্তমান হিন্দু সমাজ বর্ণাশ্রমের উৎপত্তির ভিত্তিটুকু সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হল, যার ফলে বর্তমান হিন্দু সমাজে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে চারটি বর্ণের পরিবর্তে চারটি জাতি (Caste) আমরা দেখতে পাই। সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে ব্রাহ্মণের স্থান সকলের উঁচুতে, সকলের নীচে শূদ্রের। এর ফলে ব্রাহ্মণরা শ্রেষ্ঠ আর শূদ্র হীন—এমন ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হল। এই জাতীয় ধারণা নিঃসন্দেহে সমাজের ঐক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করে। আবার, যে সব সমাজে এক সময় দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল, সেই সব সমাজে ক্রীতদাসদের অত্যন্ত হীন গণ্য করা হত এবং ক্রীতদাসদের মালিকদের শ্রেষ্ঠ গণ্য করা হত। আধুনিক যুগেও যে-সব দেশে বর্ণবিদ্বেষ প্রবল আকার ধারণ করেছে সে-সব দেশে শ্বেতকায় ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদের হীন গণ্য করা হয়।

কাজেই সামাজিক বৈষম্যের জন্যই কোন মানুষ শ্রেষ্ঠ ; কোন মানুষ হীন এমন মনোভাব সমাজের কারও কারও মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু এই জাতীয় মনোভাব অত্যন্ত ঘৃণ্য, যাকে কোন মতেই সমর্থন করা চলে না। অর্থ নৈতিক বৈষম্য হেতুও কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ বা কোন ব্যক্তি হীন, এমন ধারণা অত্যন্ত নিন্দনীয়। অর্থনৈতিক বৈষম্য হেতুই সমাজে কোন কোন শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি এখনও অনেকের দৃষ্টিতে 'ছোট লোক'। ভারতীয় সমাজে শ্রেণী বিশেষকে অস্পৃশ্য জ্ঞানে হীন এবং উচ্চ বর্ণের শ্রেণীকে শ্রেষ্ঠ বলে অনেকে মনে করেন। সব মানুষই মূলতঃ সমান—এই দৃষ্টিভঙ্গীর অভাববশতঃই মানুষ কাউকে শ্রেষ্ঠ, কাউকে হীন গণ্য করে। বিশেষ মর্যাদা ভোগ করার জন্য সমাজে কাউকে শ্রেষ্ঠ, আর যে ঐ মর্যাদা ভোগ করে না তাকে হীন মনে করা যেতে পারে না এবং যদি তা করা হয় তাহলে তা হবে সংস্কৃতিবিহীন মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

সভ্য সমাজে কোন শ্রেণীবিভাগ যদি থাকে, তাহলে সেই শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি হবে ব্যক্তিগত উৎকর্ষ, সুযোগ সুবিধার নয়। সমাজে যে সমতা থাকবে তা মর্যাদার নয়, সুযোগের। সমাজে বিশেষ শ্রেণীর অনুকূলে কোন আইন প্রবর্তিত হবে না। সমগ্র সমাজের সভ্যদের কল্যাণের জন্যই আইন প্রবর্তিত হবে। সমাজে বৈষম্য অবশ্যই থাকবে ; সেই বৈষম্য হল লিঙ্গগত, বয়সগত, উৎকর্ষগত ইত্যাদি। সমাজে স্তরবিন্যাস তখনই সমর্থন যোগ্য, যখন সমাজের সভ্যরা সাধারণভাবে তাতে লাভবান হবে, বা যখন তা সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের পরিপন্থী নয়।

কাজেই সমাজে কোন্ সভ্য শ্রেষ্ঠ, কোন্ সভ্য হীন—এই জাতীয় ধারণার কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই। এই জাতীয় ধারণা সমাজের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করে। প্রতিটি মানুষের স্বতঃমূল্য আছে। মানুষ নিজেই নিজের লক্ষ্য স্বরূপ, অপরের অভীষ্ট সাধনের উপায় মাত্র নয়—এই সত্য সম্পর্কে সচেতন হলে কেউ শ্রেষ্ঠ, কেউ হীন—এই মিথ্যা বা ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটবে। বিশেষ কৃতিত্বের জন্য সমাজে কৃতিসন্তান সকলের প্রশংসা লাভ করবে, সকলের দ্বারা অভিনন্দিত হবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু সে কারণে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ এবং অন্য ব্যক্তি যিনি সেই কৃতিত্ব লাভের অধিকারী হতে পারেননি তিনি হীন—এরূপ ধারণা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। বস্তুতঃ, সমাজের সভ্য হিসেবে শ্রেষ্ঠতা ও হীনতার প্রশ্ন অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক।

৪। সামাজিক স্তরবিন্যাসের অর্থ (The Idea of social stratification) :

সমাজবিদ্যায় স্তরবিন্যাস বলতে সমাজের জনগণকে উচ্চ-নীচ পর্যায়ে বিভক্ত করা বোঝায়। উচ্চ-নীচ পর্যায় বলতে ঠিক আমরা কি বুঝি জানতে হলে এই স্তর বিন্যাস কথাটির বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। 'স্তরবিন্যাস' কথাটি ভূবিদ্যা (Geology) থেকে নেওয়া হয়েছে। তবে ভূবিদ্যার স্তরবিন্যাস কথাটি সেই শাস্ত্রে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সমাজবিদ্যায় সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। মৃত্তিকা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত এবং সব মৃত্তিকাই একরূপ নয়। তবে মৃত্তিকার স্তরবিন্যাসের সঙ্গে সমাজবিদ্যার স্তরবিন্যাসের পার্থক্য রয়েছে। ভূবিদ্যা সংক্রান্ত স্তরবিন্যাসে এক স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরের সম্পর্কের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু সমাজে স্তরবিন্যাস যদিও নানাকারণে প্রতিষ্ঠিত তবে একথা স্বীকার্য যে প্রত্যেক স্তরের বা শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কোন বাধা নেই। দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক স্তরবিন্যাসে প্রত্যেকটি স্তরই নিজ শ্রেণী সম্পর্কে সচেতন সেজন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যেমন দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক বিরাজ করে তেমনি প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কও লক্ষ্য করা যায়। ভূতাত্ত্বিক স্তরবিন্যাসে এ ধরনের সম্পর্কের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ এগুলি জড় পদার্থ। ফলে পরস্পরের সম্পর্কে সচেতনতার কোন প্রশ্ন সেখানে ওঠে না।

সমাজবিদ্যায় সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে কি বোঝায় তা জানতে হলে সমাজবিদ্ প্রদত্ত সংজ্ঞা আলোচনা করা প্রয়োজন। সরোকিন (*Sorokin*) বলেন, 'সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে জনসংখ্যাকে পর্যায়ক্রমে বিভক্তিকরণ বোঝায়।' এই স্তর বিন্যাসে একপ্রান্তে উচ্চশ্রেণী ও অপরপ্রান্তে নিম্নশ্রেণী অবস্থিত। শ্রেণী বিভাগের বৈশিষ্ট্যই হল সুযোগ-সুবিধা, অধিকার, দায়িত্ব, সামাজিক ক্ষমতা এবং সামাজিক প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে উচ্চ-নীচ শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য।

সরোকিন আরও বলেন, সুসংগঠিত সমাজের বৈশিষ্ট্যই হল তার এই স্তর-বিন্যাসে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না এবং বর্তমানেও নেই যা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুরোপুরি সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সদস্যদের প্রকৃত স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত অবিভক্ত সমাজব্যবস্থা কল্পনাবিলাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। সরোকিন তাঁর 'Social Mobility' গ্রন্থে সামাজিক স্তরবিন্যাসের দুটি কারণের উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, তিনি বলেন যে, প্রত্যেকটি শ্রেণীর একত্র বসবাস করার মধ্যেই তাদের

ব্যবহারের, সংগঠনের এবং পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। এভাবে একদিকে যেমন শাসক শ্রেণীর তেমনি অন্যদিকে শাসিত শ্রেণীর অস্তিত্ব রয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হিসেবে তিনি এই পার্থক্যের জন্য পরিবেশগত পার্থক্যকে দায়ী করেছেন। গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, 'সামাজিক স্তরবিন্যাস, সমাজের স্থায়ী গোষ্ঠী বা শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ায় কর্তৃত্ব এবং বশ্যতার সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত।' ম্যাকাইভার এবং পেজ (*MacIver and Page*) বলেন যে, সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে প্রথমতঃ, মর্যাদা-ভিত্তিক স্তরবিভাগ বোঝায়, দ্বিতীয়তঃ, উৎকর্ষ এবং অপকর্ষের ভিত্তিতে স্তরবিভাগ নির্দেশ করে। ম্যাকাইভার এবং পেজ বলেন যে, মর্যাদার ভিত্তি হল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এবং পুরোহিততান্ত্রিক ক্ষমতা, আর এই মর্যাদাবোধই একটি স্তরকে অন্য স্তর থেকে পৃথক করে।

সমাজবিদ্‌দের উপরিউক্ত মন্তব্য এবং সংজ্ঞা থেকে স্তরবিন্যাস সম্পর্কে ধারণা করা যায় যে, সমাজের ব্যক্তিগণ বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত। এই পর্যায়কে বিভিন্ন দিক থেকে বর্ণনা করা যায়। সাধারণতঃ তিনি তিন দিক থেকে সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। **প্রথমতঃ,** অর্থনৈতিক দিক থেকে স্তরবিন্যাসের কথা বলা যেতে পারে—যার মাধ্যমে এক শ্রেণী অপর শ্রেণী থেকে পৃথক। জীবনযাত্রা, চালচলন, মানমর্যাদা সব ক্ষেত্রেই শ্রেণীগুলির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। কার্লমার্কস (*Karl Marx*) এই দিকটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। **দ্বিতীয়তঃ,** মর্যাদার দিক থেকে স্তরবিন্যাসের কথা বলা যেতে পারে। অর্থনীতি ছাড়াও স্তরবিন্যাসে মর্যাদার (Status) বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন, কোন কোন শ্রেণী যে বিশেষ সামাজিক মর্যাদা ভোগ করে তা অন্য শ্রেণীভুক্ত লোকেদের পক্ষে সম্ভব নয়। **তৃতীয়তঃ,** ক্ষমতার দিক থেকে স্তরবিন্যাসের কথা বলা যেতে পারে, শাসক শ্রেণী এবং শাসিতের মধ্যে যে পার্থক্য তা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথাও উল্লেখ করা চলে। (১) সামাজিক স্তরবিন্যাসপ্রায় সকল সমাজেই দেখা যায়। (২) স্তরবিন্যাস অর্জিত (achieved) এবং অর্পিত (ascribed) মর্যাদার দ্বারা নির্ধারিত হয়। সেজন্য যেমন একদিকে জাতিভেদ প্রথার প্রচলন দেখা যায়, তেমনি অপরদিকে অর্থ নৈতিক ভিত্তিতে শ্রেণীরও পরিচয় পাওয়া যায়। (৩) স্তরবিন্যাসে পারস্পরিক সহাবস্থানের সম্পর্কও যেমন চোখে পড়ে (যেমন জাতিভেদ প্রথায়),

আবার দ্বন্দ্বমূলক ও প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কও চোখে পড়ে যা মার্কসের শ্রেণী-বিভাগে এবং মর্যাদা ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগে লক্ষ্য করা যায়। (৪) স্তরবিন্যাস উলম্ব (Vertical) আবার আনুভূমিক (Horizontal) হতে পারে।

অধ্যাপক টিউমিন (*Tumin*) বলেন—স্তরবিন্যাসের সঙ্গে সামাজিকীকরণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। একটি শিশু যে পরিবারে জন্মায় সেই পরিবার যে শ্রেণীভুক্ত তার প্রভাব তার জীবনধারা ও ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে। তা ছাড়াও তিনি বলেন যে, স্তরবিন্যাসের উপর সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতির প্রকৃতি নির্ভর করে। প্রত্যেকটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সেই শ্রেণীর নিজস্ব রীতিনীতি, শিক্ষা, ধর্ম, আচার, ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

৩। সামাজিক শ্রেণীগুলির প্রকৃতি এবং প্রকারভেদ (Nature and Types of social classes):

সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে কি বুঝায়—উপরিউক্ত আলোচনা থেকে তা সুপরিস্ফুট। সামাজিক স্তরবিন্যাসকে আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে পারি। সামাজিক স্তরবিন্যাসে যে বিভিন্ন স্তরের কথা বলা হয় তাকে যথাক্রমে শ্রেণীগত দিক থেকে, মর্যাদার দিক থেকে এবং জাতিগত দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। এক্ষনে আমরা সামাজিক শ্রেণী, মর্যাদাভিত্তিক শ্রেণী এবং জাতির স্বরূপ ও প্রকৃতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব:

(ক) **সামাজিক শ্রেণী (Social Class):** যখন আমরা 'সামাজিক শ্রেণী' কথাটি ব্যবহার করি তখন ঠিক এককথায় আমাদের পক্ষে তার অর্থ বোঝানো সম্ভব হয় না। 'জাতি' (caste) কথাটি যেরূপ সহজবোধ্য, সামাজিক শ্রেণী কথাটি ঠিক সেই অর্থে সহজবোধ্য নয়। তার কারণ, জাতি কথাটি প্রাচীন যুগে এবং বর্তমান যুগেও প্রায় একই রূপে আমাদের কাছে উপস্থাপিত কিন্তু শ্রেণী কথাটির এইরূপ বিশ্বজনীন (universal) কোন সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। তার কারণ, জাতি স্থিতিশীল (Static) সমাজের এবং শ্রেণী গতিশীল (Dynamic) সমাজের ফলশ্রুতি। প্রাচীন যুগে জাতি যে অর্থে ব্যবহৃত হোত বর্তমানে তার বৈশিষ্ট্যের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি, যদিও জাতির কার্যাবলী এবং সামাজিক ভূমিকার কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সামাজিক শ্রেণীর সর্বজনীন কোন সংজ্ঞা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। সে কারণে বিভিন্ন যুগে শ্রেণী সম্পর্কে ধারণাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। প্রাচীন যুগে শ্রেণী বিচারের মানদণ্ডও

ছিল আধুনিককালের থেকে স্বতন্ত্র। বর্তমানে প্রাচীন যুগের অনেক শ্রেণীই অবলুপ্ত এবং সমাজতাত্ত্বিক অর্থে নিত্য নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছে ও ভবিষ্যতেও হবে এবং সেদিক থেকে সামাজিক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সমাজব্যবস্থার কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীর সংজ্ঞাও যেমন পরিবর্তিত হয় সেরূপ নিত্য নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। শ্রেণী বিচারের মাধ্যমও হয়ে পড়ে স্বতন্ত্র। যেমন, কেউ অর্থের দিক থেকে, কেউ মর্যাদার দিক থেকে, আবার কেউ ক্ষমতার দিক থেকে শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ করেন। সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে শ্রেণী বলতে ঠিক কি বোঝায়, তা নিরূপণ করার জন্য বিভিন্ন সমাজবিদ্‌দের মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সমাজবিদ্ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক শ্রেণীর সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। ম্যাকাইভার(*MacIver*) বলেন, 'সামাজিক শ্রেণী হল সম্প্রদায়ের(Community)একটি অংশ যা অপর অংশ থেকে সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে পৃথক। কাজেই বলা যায়, শ্রেণী হল মর্যাদাভিত্তিক গোষ্ঠী। ম্যাকাইভারকে অনুসরণ করে বলা যায় শ্রেণী যেহেতু মর্যাদাভিত্তিক সেহেতু সমাজের শ্রেণীবিন্যাসেও বিভিন্ন মর্যাদার স্তর বিদ্যমান। মর্যাদার ভিত্তিতে সমাজের উচ্চ-নীচ এই পর্যায়কে সামাজিক শ্রেণীভুক্ত করা যায়। এভাবে পারস্পরিক শ্রেণীর পার্থক্য কেবল বাহ্যতই নয় মানসিক দিক থেকেও উল্লেখযোগ্য। ম্যাকাইভার আরও বলেন যে, এই যে মর্যাদার চেতনা যা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতার উৎস তার ফলস্বরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর জীবনধারণের পদ্ধতিতে এবং সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশের ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অগবার্ণ এবং নিমকফ (*Ogburn and Nimkoff*) ম্যাকাইভারের বক্তব্যের সমর্থনে বলেন, যে-কোন একটি সমাজে যখন কিছু লোকের সমষ্টি সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকে তখনই তাকে একই সামাজিক শ্রেণীভুক্ত বলা যায়।

জিনসবার্গ (*Ginsburg*) শ্রেণীর যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন, সেই সংজ্ঞা শ্রেণী সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে অনেকটা সুস্পষ্ট করে তুলতে সহায়তা করবে। তিনি মন্তব্য করেন যে, সামাজিক শ্রেণী হল সমষ্টির একটি অংশ-যারা পরস্পর সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং শিক্ষায়, বৃত্তিতে অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে ভিন্ন। প্রত্যেকটি শ্রেণীরই কতকগুলি মূলগত সমতা রয়েছে। তাদের নিজেদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকলেও তা শ্রেণী বিভাগের অন্তরায় হয় না। মানসিক দিক থেকেও একটি শ্রেণী অন্য শ্রেণীর থেকে পৃথক। এই পার্থক্য দুটি দিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

(১) নিজ শ্রেণীভুক্ত সদস্যদের নিজেদের মধ্যে সাম্যের মনোভাব এবং (২) সামাজিক স্তরবিন্যাসে উচ্চ-নীচ মনোভাব বিদ্যমান। বাহ্যিক দিক থেকেও এক শ্রেণী অপর শ্রেণী থেকে পৃথক। শিক্ষা, বৃত্তি, জীবনধারণের পদ্ধতি, অর্থ ইত্যাদি সবদিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, বিশেষ সামাজিক শ্রেণী সমাজের কাছ থেকে বিশেষ মর্যাদা আদায় করে এবং এই মর্যাদার ফলে কতকগুলি দায়িত্ব, ক্ষমতা এবং সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। প্রত্যেকটি শ্রেণী নিজ শ্রেণী সম্বন্ধে সচেতন এবং প্রত্যেকটি শ্রেণী এক বিশেষ সংস্কৃতির বাহক।

সামাজিক স্তরবিন্যাসে প্রথমেই যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় এবং যে জটিলতার সৃষ্টি হয় তা হল সামাজিক শ্রেণীর পাশাপাশি মর্যাদার ভিত্তিতে গোষ্ঠীর অস্তিত্ব। মাক্সওয়েবারই (*Maxwaber*) সর্ব প্রথম এই দুয়ের পার্থক্য নির্দেশ করে তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর পার্থক্যের ভিত্তি হল উৎপাদনের এবং উৎপন্ন বস্তুর অধিকারের বিভিন্নতা। কিন্তু মর্যাদার ভিত্তিতে গোষ্ঠীর মধ্যে একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর পার্থক্যের কারণ ভোগের নীতি যার মাধ্যমেই তাদের জীবনধারণের বিশেষ পদ্ধতির (Style of life) প্রকাশ পায়। মর্যাদার ভিত্তি সব সমাজেই একরূপ নয়, সমাজভেদে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জন্ম, অর্থ, বৃত্তি, রাজনৈতিক ক্ষমতা, জাতি প্রভৃতির বৈষম্যই মর্যাদার ভিত্তিস্বরূপ। অনেক সময় উপরিউক্ত গুণগুলির সমষ্টিই মর্যাদা নিরূপণ করে।

সামাজিক শ্রেণীর বিশেষ বৈশিষ্ট্যই হল সামাজিক সচলতা (Social mobility) অর্থাৎ এক শ্রেণী থেকে অন্যান্য শ্রেণীতে আরোহণ এবং অবতরণের পথ উন্মুক্ত থাকে। সেইজন্য মুক্ত সমাজেই (open society) সামাজিক শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখা যায়। শিল্পভিত্তিক নগরাঞ্চলে সামাজিক শ্রেণীর প্রাধান্য লক্ষণীয়। জাতির (caste) ক্ষেত্রে সামাজিক সচলতার পথ রুদ্ধ বলা যায়। যদিও জাতির ক্ষেত্রে সচলতা একেবারে নেই বলা চলে না তবে তা খুবই নগণ্য। সেইজন্য বদ্ধ সমাজে (closed society) অর্থাৎ সামাজিক সচলতার সুযোগ যেখানে কম (সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলে) সেখানে জাত্যাভিমানের প্রবণতা দেখা যায়। আর একটি দিক থেকেও সামাজিক শ্রেণী এবং জাতির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। সামাজিক শ্রেণীর মর্যাদা সাধারণতঃ অর্জিত (achieved) গুণাবলীর উপরে নির্ভর করে কিন্তু জাতির ক্ষেত্রে, মর্যাদা নিরূপণের মানদণ্ড হল বংশপরিচয়। কাজেই

সামাজিক শ্রেণী গণতন্ত্রসম্মত এমন কথা বলা যেতে পারে, জাতির ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য নয়।

আধুনিক সামাজিক শ্রেণীকে তাদের নিজেদের ব্যবহারের প্রকৃতি থেকে বিচার করা হয়। যদিও অর্থনৈতিক অবস্থাই হল এর ভিত্তি তবুও একথা বলা যায় যে নিরাপত্তার এবং ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষণীয় যা সব সময় অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার্য নয়। গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন যে, কোন একটি শ্রেণী যে সামাজিক মর্যাদা ভোগ করে এবং সেহেতু যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত সেটি নির্ভর করে সমাজের মূল্যায়নের উপর : অর্থাৎ কিনা, সমাজে প্রচলিত মূল্যের যে মান বর্তমান সেই মান অনুসারে কতকগুলি গুণকে মহৎ এবং কতকগুলিকে নিকৃষ্ট মনে করা হয়। প্রায় সব সমাজেই যে সব ব্যক্তি জ্ঞান, অর্থ, সাহসিকতা প্রভৃতির এবং বংশ কৌলিন্য ও অন্যান্য গুণাবলীর অধিকারী, সেই সব ব্যক্তিকে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। যে সমস্ত গুণাবলী সমাজ ভেদে মর্যাদা নিরূপণ করে, সময় ব্যবধানে তার পার্থক্যও দেখা যায়। তাই গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন যে, আদিম সমাজে দেখা যায় যারা যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল তারা সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে যদি কেউ যাদুবিদ্যায় অনুরূপ পারদর্শিতা প্রদর্শনে তৎপর হয় তাহলে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হতে পারে। রক্তের আভিজাত্য এককালে পশ্চিম ইউরোপে যে মর্যাদার দ্যোতক ছিল বর্তমানে তা মর্যাদাসূচক বলে গণ্য হয় না যদি না তার সঙ্গে অন্যান্য সৎ গুণের সংযোগ সাধিত হয়।

শ্রেণী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হল শ্রেণী সচেতনতা। যেমন—কোন ব্যক্তির বিশেষ দক্ষতা বা অর্থ যদি মর্যাদা নিরূপণের মানদণ্ড হয় তার অর্থ এই নয় যে, এই গুণ বা সামর্থ্য শুধুমাত্র সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রেই বর্তমান। শ্রেণী সচেতনতায় তার মর্ম আরও গভীরে অর্থাৎ সেই ব্যক্তির পূর্বপুরুষেরা এবং সন্তান-সন্ততি এই বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিল বা আছে যার অধিকারী হওয়া অন্যান্যদের সাধ্যের অতীত। প্রাত্যহিক সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রায় তা এমনভাবে প্রতিভাত হয় যে অনেকেই মনে করে এই গুণ বা ক্ষমতা সেই পরিবারের বা শ্রেণীর জন্মগত। শ্রেণী সচেতনতার এখানেই শেষ নয়। কোন একটি শ্রেণী যে বিশেষ গুণ বা ক্ষমতার অধিকারী, সেই শ্রেণী, অন্য ব্যক্তি যারা সেই বিশেষ গুণ বা ক্ষমতার অধিকারী হয়ে এই শ্রেণীভুক্ত হতে সচেষ্ট হয়, তাদের নানানভাবে বাধা সৃষ্টি করে।

অবশ্য বাধা সৃষ্টি করা বা না করা মুক্ত বা বদ্ধ সমাজের উপর নির্ভর করে। যে সমাজে চলাচলের (mobility) পথ উন্মুক্ত সেখানে বাধা বিশেষ কার্যকর হয় না। এ ছাড়াও, উচ্চ শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা, যারা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আইনগত দিক থেকে বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করে অথচ নিম্নশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের এই সুযোগ দানে তারা ঘোর বিরোধী এবং এইভাবেই পারস্পরিক ব্যবধান রচিত হয়।

অবশ্য শ্রেণী সচেতনতার তীব্রতা বিভিন্ন কারণে বেশী কম হতে পারে। **প্রথমতঃ**, যে সমাজে সামাজিক সচলতা সম্ভব অথচ সহজসাধ্য নয় সেই সমাজে শ্রেণী সচেতনতা অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হবার ইচ্ছা যদি প্রবল হয় কিন্তু বাধার প্রাচীর যদি বর্তমান থাকে তাহলে এই সচেতনতা বৃদ্ধি পাবেই। কিন্তু যে সমাজে সচলতার বিশেষ অসুবিধা রয়েছে যেমন জাতিভেদ প্রথা, যেখানে শ্রেণী সচেতনতা প্রবল হয় না, কারণ সে সমাজে এই শ্রেণীবিন্যাস অনেকটা স্বভাবগত হয়ে পড়ে। **দ্বিতীয়তঃ**, দুটি শ্রেণীর স্বার্থ যদি পরস্পর বিপরীতমুখী হয় তাহলে শ্রেণী সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। যেমন, মালিক ও শ্রমিকের স্বার্থ বিপরীতমুখী। এই অবস্থায় নিজ শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একাত্মতা যেমন বৃদ্ধি পায় অপর শ্রেণীর প্রতি ক্ষোভও তেমনি বৃদ্ধি পায়। **তৃতীয়তঃ**, একই আদর্শ, নীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি মূল্যমানের উপর যদি কোন শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয় সেক্ষেত্রে শ্রেণী সংহতি (Class integrity যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি শ্রেণী সচেতনতাও বৃদ্ধি পায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, শ্রেণীর সংজ্ঞা সর্বযুগে সর্বকালে একরূপ ছিল না এবং যে মর্যাদা শ্রেণীর ভিত্তিস্বরূপ সেই মর্যাদার মানদণ্ডও ছিল ভিন্ন। মধ্য যুগে ইউরোপে সামন্ততন্ত্রে সামাজিক স্তরবিন্যাস ছিল অন্যরূপ। তখন সমাজের ব্যক্তিরা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল যথা—যাজক সম্প্রদায়, অভিজাত সম্প্রদায় এবং জনসাধারণ। এরা যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল। তাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি এবং এমনকি আইনের চোখেও পার্থক্য সুস্পষ্ট ছিল। এদের অধিকার ভোগের ক্ষেত্রেও পার্থক্য ছিল, যেমন—যাজক এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরাই রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করত, সাধারণ সম্প্রদায় সেই অধিকার ভোগের সুযোগ পেত না।

আবার ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আমরা ভিন্ন চিত্র পাই। কার্লমার্কসের (*KarlMarx*) মতে মানবজীবনের ইতিহাস শ্রেণী-সংঘাতের ইতিহাস।

মধ্যবিত্তের একাংশের মধ্যে লক্ষণীয়। যেমন—একজন ডাক্তারের অর্থোপার্জন উদ্দেশ্য হলেও সেবামূলক কার্যও এই বৃত্তির সঙ্গে জড়িত। সেরূপ, একজন শিক্ষকের আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিত্বের মধ্যে তাঁর যে পরিচয় প্রকাশিত হয় তা তাঁর সমাজিক মর্যাদার দ্যোতক। কাজেই মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে বিত্তই সামাজিক স্তরবিন্যাসের একমাত্র মাপকাঠি নয়। একজন স্কুল শিক্ষক যা রোজগার করেন তার তুলনায় কারখানার 'ফোরম্যান' আয় করেন অনেক বেশী কিন্তু ফোরম্যানের তুলনায় শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা কম নয়।

সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের শেষপ্রান্তে আছে মজুর শ্রেণী। শ্রমই এদের আয়ের পথ। শ্রমিক, কুলী, ফেরীওয়ালা, বেয়ারা এই শ্রেণীভুক্ত। সমাজের আরও নিম্নতম স্তরে রয়েছে জমাদার, ঝাড়ুদার, মেথর ইত্যাদি।

সামাজিক স্তরবিন্যাসে শ্রেণীর আলোচনা থেকে বলা যায় যে, যদিও সামাজিক মাপকাঠিতে বিভিন্ন স্তর বিদ্যমান এবং প্রত্যেকটি শ্রেণীই বিশেষ মর্যাদার দ্যোতক, তবু একথাও ঠিক যে, সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে সমাজভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন—পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে কলেজ শিক্ষকের যে সামাজিক মর্যাদা ভারতে সে মর্যাদা স্বীকৃত নয়। আবার একই দেশে মধ্যবিত্তের মর্যাদার ক্ষেত্রেপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—সরকারী কেরাণী এবং ব্যাঙ্কের কেরাণীর মধ্যেও পার্থক্য করা হয়। স্কুল শিক্ষক এবং সরকারী কেরাণীর মধ্যে পার্থক্য করা হয় মূলতঃ অর্থনৈতিক কারণে। কাজেই মর্যাদা নিরূপণের একটি মানসিক দিকও আছে। দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যভেদে মর্যাদারও পার্থক্য সূচিত হয়।

(খ) **মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণী (Status Group)ঃ** সামাজিক স্তরবিন্যাসে শ্রেণীর (Class) ভূমিকা আলোচনা করার সময় একথা বলা হয়েছে যে, উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক পার্থক্যে সামাজিক মর্যাদার ভূমিকা বিশেষভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। মর্যাদার ভিত্তিতে এক শ্রেণী অপর শ্রেণী থেকে ভিন্ন। শ্রেণীর সামাজিক ভূমিকা আলোচনা করার সময় আমরা একথাও উল্লেখ করেছি যে—ম্যাক্সওয়েবারই (*Max Waber*) প্রথম সমাজবিদ্ যিনি শ্রেণী এবং মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। অন্যান্য সমাজবিদরাও সামাজিক স্তরবিন্যাস আলোচনা করার সময় সমাজকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। যথা—(১) সামাজিক শ্রেণীর দিক থেকে, (২) মর্যাদা অনুযায়ী যে শ্রেণী সেই দিক থেকে এবং (৩) ক্ষমতার (power) দিক থেকে। মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিদের জীবন-যাপনের ধারা (Style of life) এবং সম্মানই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ক্ষমতার বৈষম্য

বলতে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা যারা ভোগ করেন তাঁরা এবং যারা শাসিত হয় এদের বৈষম্যই উল্লেখযোগ্য। অনেকে মনে করেন, সামাজিক স্তর বিন্যাসে শ্রেণী মর্যাদা এবং ক্ষমতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অগবার্ণ এবং নিমকফ (*Ogburn and Nimkoff*) অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে, মর্যাদা নিরূপণে অর্থ নৈতিক দিকটি উল্লেখযোগ্য কিন্তু সমাজতাত্বিক দিক থেকে মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণীর যখন উল্লেখ করা হয় তখন অর্থনৈতিক এবং মর্যাদার ভিত্তিতে পার্থক্য করা হয়। তার কারণ, শ্রেণীবিন্যাসের মূল কারণ সকল ক্ষেত্রেই অর্থ নৈতিক নয়। আগেই বলা হয়েছে, ম্যাক্স-ওয়েবার (*Max-Waber*) এর মত অনুযায়ী শ্রেণী সংজ্ঞা বিশ্লেষণে উৎপাদন এবং বৃত্তির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণী বিশ্লেষণে তিনি ভোগের (Consumption) দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ম্যাক্সওয়েবারের মতে শ্রেণী নির্ধারিত হয় কোন ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার থেকে। অর্থাৎ ব্যক্তিটি সম্পত্তির অধিকারী কি, অধিকারী নয়—তার ভিত্তিতেই তার উপর শ্রেণী নির্ধারিত হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ফলস্বরূপ নানাবিধ সুযোগ সুবিধাও ঐ শ্রেণী ভোগ করতে সমর্থ হয়। মার্কসবাদে (*Marxism*) মোটামুটি এভাবে সামাজিক স্তরের বিশ্লেষণ করা হয়েছে—সমাজের একটি শ্রেণী, উৎপাদনের যন্ত্র যাদের হাতে তারা নানাবিধ সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে সমর্থ, পক্ষান্তরে যারা এসব কিছু থেকে বঞ্চিত তারা শোষিত শ্রেণী। এই ভাবেই মার্কস্ অর্থ নৈতিক ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করেছেন। মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণী নিরূপণে মর্যাদা বা সম্মানের প্রাধান্য স্বীকৃত। একটি শ্রেণীর সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণীর সামাজিক পার্থক্যের কারণ অর্থ নৈতিক বৈষম্যই নয়, মর্যাদাগত বৈষম্যও। মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণীর বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জীবন যাপনের রীতির (Style of life) মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ কথা বলার ক্ষেত্রে, চিন্তার ক্ষেত্রে, অনুভূতির ক্ষেত্রে, পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে, বস্তু ক্রয় করার ক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র বর্তমান এবং যা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত, তার মাধ্যমেই এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ। অর্থ নৈতিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে বৃত্তিই (profession) প্রাধান্য পায় কিন্তু মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণী নির্ধারণে বৃত্তি প্রাধান্য পায় না। জীবন যাপনের রীতি অর্থাৎ আসবাব পত্র কেনাকাটা, ঘর সাজানো, বাহ্যিক চালচলন এবং ভাবের আদান প্রদানেই তা প্রকাশিত হয়। বটোমোর (*Bottomore*) বলেন যে, অর্থ নৈতিক শ্রেণী এবং মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণীর

মূলগত যে পার্থক্য তা হল—অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বন্দ্বমূলক এবং মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণীগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিযোগিতামূলক। অর্থনৈতিক বৈষম্য হেতু যে শ্রেণীর উদ্ভব তাদের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের রূপটি যেমন আমাদের কাছে সুপরিস্ফুট হয়, প্রতিযোগিতামূলক মর্যাদার ভিত্তিতে উদ্ভূত শ্রেণীগুলির রূপটি তেমন পরিস্ফুট নয়, বিশেষ করে সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে। অনেক সময় এই প্রতিযোগিতার অর্থই খুঁজে পাওয়া যায় না। ভারতের সামাজিক জীবনের উল্লেখ করে বলা যায় যে, বিবাহ বাড়িতে উপহার দেওয়ার একটি রীতি প্রচলিত। অনেক সময় দেখা যায় (সাধারণতঃ শহরাঞ্চলে) নিমন্ত্রণ বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ অপেক্ষা উপহার গ্রহণের প্রতিযোগিতাই প্রাধান্য পায়। তার কারণ, এর মাধ্যমেই সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা নিরূপিত হয়। কাজেই মানসিক সন্তুষ্টি যে কেবল তার নিজের ক্রয় ক্ষমতা বা সম্পত্তির অধিকারের মধ্যেই প্রকাশ পায় তাই নয়, অপরের থেকে তার স্বাতন্ত্র্য কতটুকু সেদিক থেকেও তার প্রকাশ ঘটে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে শ্রেণী এবং মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণীর পার্থক্য সুপরিস্ফুট। সমাজতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভিত্তিতে শ্রেণীর নজীর পাওয়া যায় না কিন্তু তাই বলে একথা আমরা বলতে পারি না যে, সেখানে মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণী অনুপস্থিত। তাছাড়া, একই মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কলেজের অধ্যাপক, উকিল প্রত্যেকেই এক একটি সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী গোষ্ঠীর প্রতীক। তাছাড়া, মানসিক এবং কায়িক শ্রমিকদের মধ্যেও ঐ পার্থক্য বিদ্যমান। তাদের নিজস্ব চালচলন, শিক্ষা-দীক্ষা, অভ্যাস এবং সামাজিক আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এই পার্থক্যের প্রকাশ ঘটে।

মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণীর অস্তিত্ব সাধারণতঃ মুক্ত (Open) সমাজেই লক্ষণীয়। সেজন্য ভারতে এরূপ মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণীর বিশেষ কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, তবে একেবারে নেই বলা চলে না। বড় বড় নগরাঞ্চলের উদ্ভাবনের ও শিল্প-সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে জীবন ধারণের মান বৃদ্ধি পায় এবং এরই ফলে এই শ্রেণীও ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করে এবং তাদের সামাজিক জীবনে এর প্রকাশ ঘটে। অনেক সময় দেখা যায় নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা শহরাঞ্চলে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্তশ্রেণীরব্যক্তিদের সঙ্গেযথাযথ সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হয়, কিন্তু তথাকথিত 'মান' বা 'মর্যাদা' রক্ষারজন্য তারা তা করতে বাধ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয়োজিত

কোন অনুষ্ঠানে নিম্ন মধ্যবিত্তের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হলে নিজ সম্মান এবং মর্যাদা বজায় রাখার জন্য সাধ্যাতীত কোন উপহার দিতে বাধ্য হয়, যা তার স্বল্প আয় কোনভাবেই অনুমোদন করে না।

(গ) জাতি (Caste) ঃ যখনই আমরা 'জাতি' কথাটি ব্যবহার করি তখনই আমরা একজন ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির পার্থক্য নির্দেশ করি। এক্ষেত্রে ব্যক্তির গুণাবলীর প্রশ্ন গৌণ হয়ে পড়ে এবং তার বংশগত প্রশ্নই আমাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। জীববিজ্ঞানীর কাছে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন বিবেচ্য কিন্তু সমাজবিদের কাছে 'জাতি' কথাটির অর্থ আরও ব্যাপক।

বিভিন্ন সমাজবিদ্ "জাতির" বিভিন্নরকম সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। ডি. এন. মজুমদার এবং টি. এন. মদন (*D. N. Mazumder and T. N. Madan*) বলেন যে, জাতি হল একটি বদ্ধ (closed) গোষ্ঠী। যখনই কোন শ্রেণীকে উত্তরাধিকার সূত্রে বিচার করা হয় তখনই তাকে জাতি নামে অভিহিত করা হয়। ম্যাকাইভার এবং পেজ (*MacIver and Page*)এর মতে জাতির সামাজিক মর্যাদা পূর্বনির্ধারিত অর্থাৎ ব্যক্তি যে জাতিভুক্ত তার জীবনে তা পরিবর্তন করা সাধ্যাতীত। অপর একজন সমাজবিদ্ জাতির সংজ্ঞা নির্ধারণে দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, জাতির ক্ষেত্রে সদস্যপদ সামাজিক গণ্ডিতে আবদ্ধ এবং দ্বিতীয়তঃ, কোন একটি জাতিভুক্ত সদস্যের পক্ষে ভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠীতে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। জাতির বৈশিষ্ট্য এবং গুনাগুন সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে শাস্ত্রীয় ও আধুনিক মতামত আমরা আলোচনা করছি।

(i) জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি (Origin of the Caste system) ঃ জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি ঠিক কখন এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। পুরুষ সূক্তের মতানুযায়ী বর্ণ-অনুসারে সমাজ চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল যা পরবর্তী-কালে জাতি বলে পরিগণিত হয়। এই চারটি বর্ণ হল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। ব্রাহ্মণের বৃত্তি হল পূজার্চ্চনা এবং অধ্যাপনা করা ; ক্ষত্রিয়ের কাজ যুদ্ধ পরিচালনা করা ; বৈশ্যের কাজ খাদ্য উৎপাদন করা এবং শূদ্রের কাজ অপর তিন বর্ণের সেবা করা। ঐ সূক্তে আরও উল্লেখ আছে যে, জগৎস্রষ্টার (Creator) মুখ হতে ব্রাহ্মণ, বাহু হতে ক্ষত্রিয়, উরু হতে বৈশ্য এবং পদযুগল হতে শূদ্রের জন্ম হয়। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে (Ideal state)-ও এই ধরনের সামাজিক স্তর-বিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। প্লেটোর মতানুসারে দার্শনিকরা (Philosopher)

যারা যুক্তিবাদী তাঁরাই শাসনকার্য পরিচালনা করার যোগ্য; যোদ্ধাদের (Warriors) হাতে দেশরক্ষার দায়িত্ব এবং শ্রমিক শ্রেণীর কাজ হল অপর দুই শ্রেণীর জন্য কর্মরত থাকা।

অনেকে এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে আর্যরা ভারতে প্রবেশ করবার সময় জাতিভেদ বলে কিছু তাঁরা জানতেন না। কিন্তু যতই তাঁরা অগ্রসর হতে থাকেন অনার্যদের কাছ থেকে তাঁরা নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হন। এই বাধার প্রতিরোধ করতে গিয়ে আর্যদের মধ্যে এক বীরত্বব্যঞ্জক শ্রেণীর জন্ম হয়। উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন কিছু ব্যক্তি আর্যদের স্তোত্রগুলি মুখস্থ রাখতেন। পরবর্তীকালে এঁরাই ব্রাহ্মণ বলে পরিগণিত হলেন। যেসব নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তি আর্যদের বশ্যতা স্বীকার করলেন তাঁরাই শূদ্র বলে পরিগণিত হলেন।

জাতি বা বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রভিত্তিক মতবাদের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বর্তমানে জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিভিন্নরকম মতবাদ প্রকাশ করেছেন। নেসফিল্ড (*Nesfield*)-এর মতে বৃত্তিভেদ হল জাতিভেদের উৎস। প্রাচীন সমাজে জাতিগুলি বৃত্তিভিত্তিক ছিল। ফরাসী পণ্ডিত সেনার্ট (*Senart*) বলেন যে, দেবদেবীর পূজার মাধ্যমেই জাতির উৎপত্তি হয়। অধ্যাপক ঘুড়য়ে (*Ghurye*)-এর মতে আর্য পুরোহিতরা রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যই জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি করেন।

হুটন (*Hutton*) পূর্বোক্ত মতবাদগুলিকে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে আর্যদের ভারতে আসার পূর্বে আদিম অধিবাসীগণ নানাবিধ সাংস্কৃতিক জীবনের সংস্পর্শে আসে। তাঁরা এসময় আচার-অনুষ্ঠানে নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা পালন করে এবং স্বগোত্র বিবাহও চালু করে। আর্যদের ভারতবর্ষে আগমণের পর তাঁরা নতুন সমাজ গঠনে আগ্রহী হন। পরবর্তীকালে এই সমাজ আর্যসভ্যতা বলে পরিগণিত হয়। মনু এই সমাজব্যবস্থার চতুবর্ণকে কেন্দ্র করে জাতিভেদের চিত্র অঙ্কিত করেছেন।

(ii) **জাতির বৈশিষ্ট্য (Features of Caste system)** : জাতি সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট করার জন্য জাতির বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি (features) জানা প্রয়োজন।

(১) জাতির প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, জাতির সদস্যপদ জন্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোন এক জাতিভুক্ত ব্যক্তি স্বচেষ্টায় তার বৃত্তি এবং মর্যাদা পরিবর্তন করতে পারে

কিন্তু সামাজিক দিক থেকে এক জাতি থেকে অন্য জাতিতে সদস্যপদ পরিবর্তন করতে পারে না। অর্থাৎ জাতির ক্ষেত্রে সামাজিক সচলতার পথ রুদ্ধ।

(২) বৈবাহিক ক্ষেত্রেও কঠোরতা লক্ষণীয়। কোন ব্যক্তি নিজ জাতি ভিন্ন অন্য জাতির সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে না। নিজ জাতির মধ্যেই বিবাহ সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। যেমন—কোন ব্রাহ্মণ সন্তান সামাজিক দিক থেকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির সঙ্গে বিবাহে লিপ্ত হতে পারেন না। যদি হন তাহলে তিনি স্বজাতির দ্বারা নিন্দিত হন। অবশ্য আধুনিক সমাজে এই ধরনের মনোভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

(৩) পেশা ও বৃত্তির ক্ষেত্রেও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। মোটামুটি প্রত্যেকটি জাতির পেশাও পূর্ব নির্ধারিত। মনুর সংহিতায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারবর্ণের পেশা বা বৃত্তি নির্ধারিত হয়েছে। বর্তমান সমাজেও দেখা যায় মুচির ছেলে জুতা তৈরির কাজে, কুমোর মাটির হাঁড়ি তৈরির কাজে, ব্রাহ্মণ দেবদেবীর পূজার কাজে নিযুক্ত থাকে।

(৪) জাতির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, জাতির সঙ্গে অস্পৃশ্যতার (untouchability) প্রশ্নও জড়িত। প্রত্যেকটি জাতি সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। সামাজিক মর্যাদায় উচ্চ, মধ্য, নীচ—এইভাবে ভাগ করা হয়েছে। কোন একটি জাতির সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার সম্পর্কের দ্বারা। তাকেই উচ্চ জাতির মর্যাদা দেওয়া যায়, যার কাছ থেকে ব্রাহ্মণই একমাত্র রান্নাকরা খাবার গ্রহণ করে। পরবর্তী উচ্চ জাতি হল—যার কাছ থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য রান্নাকরা খাবার গ্রহণ করে। নিম্ন জাতি অর্থাৎ শূদ্রের কাছ থেকে অন্য তিন বর্ণের লোকেরা খাবার বা পানীয় গ্রহণ করে না। হিন্দু সমাজে সামাজিক ক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদায় ব্রাহ্মণকে এবং যারা অস্পৃশ্য তাদের সমাজে নিম্ন স্তরে স্থান দেওয়া হয়েছে। যারা অস্পৃশ্য তারা নানাপ্রকার সামাজিক সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত; যেমন, তাদের সর্বত্র পূজার্চনা করার অধিকার নেই। এমনকি বিশেষ বিশেষ পুষ্করিণী ব্যবহার করার অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত।

(৫) জাতির অন্য বৈশিষ্ট্য হল, জাতির ক্ষেত্রেও আচার অনুষ্ঠানের শুদ্ধতা বা শুচিতা রক্ষার উদ্দেশ্যে কতকগুলি নিষেধাজ্ঞা (Taboos) পালন অপরিহার্য মনে করা হয়। যেমন, কোন একজন ব্যক্তি কি ধরনের খাদ্য গ্রহণ করবে এবং কি কি খাদ্য তার পক্ষে নিষিদ্ধ তা' তাকে মেনে চলতে হয়। রন্ধনকার্যেও নিষেধাজ্ঞা

রয়েছে। সকলে রন্ধনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারবে না, যে যে পারবে তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে। খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রেও কতকগুলি নিয়ম এবং অনুষ্ঠান মেনে চলার প্রশ্ন রয়েছে। ধূমপান এবং পানীয় গ্রহণের ব্যাপারেও নানাবিধ বাধানিষেধ রয়েছে। একজনের ব্যবহৃত পানীয় অপরের ক্ষেত্রে গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে হয়।

(iii) **শ্রেণী ও জাতির মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Class and Caste) :** উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে শ্রেণী (Class) এবং জাতির (Caste) মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যেতে পারে। **প্রথমতঃ,** শ্রেণীর সঙ্গে জাতির পার্থক্য হল শ্রেণীর ক্ষেত্রে পদমর্যাদার বিষয়টি পূর্ব নির্ধারিত নয়, তা পরিবর্তনীয়। যেমন, যে ব্যক্তি আজ কেরাণী শ্রের অন্তর্ভুক্ত, উচ্চতর পদে উন্নীত হলে তার পদমর্যাদার পরিবর্তন ঘটবে বলে তিনি মনে করেন এবং কালক্রমে সেই পদ অর্জনের দ্বারা তিনি উচ্চপদস্থ কর্মচারীর শ্রেণীভুক্ত হন। জাতিব্যবস্থার দ্বারা পদমর্যাদার কোন পরিবর্তন ঘটে না। প্রচুর সম্পদ অর্জন করলে, প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী হলেও তার জাতি সম্পর্কীয় পদমর্যাদার পরিবর্তন ঘটবে না। কাজেই শ্রেণীর ক্ষেত্রে সদস্যপদ সামাজিক মর্যাদা, জীবনের মান এবং কতকগুলি বাহ্যিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু জাতির ক্ষেত্রে সদস্যপদ নিতান্তই জন্মসূত্রে নিয়ন্ত্রিত। **দ্বিতীয়তঃ,** সামাজিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে সামাজিক সচলতার (social mobility) পথ উন্মুক্ত অর্থাৎ প্রত্যেকেরই এক বৃত্তি থেকে অন্য বৃত্তিতে যোগ দেবার অধিকার বর্তমান কিন্তু জাতির ক্ষেত্রে কোন এক জাতি-ভুক্ত ব্যক্তি অন্য জাতিতে উত্তীর্ণ হতে পারে না। **তৃতীয়তঃ,** সামাজিক শ্রেণী গণতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কারণ প্রত্যেকেরই নিজ শ্রেণী পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে কিন্তু জাতি গণতন্ত্রসম্মত নয়—কারণ সদস্যপদ জন্মসূত্রে নিয়ন্ত্রিত, ফলে সামাজিক সচলতার পথও রুদ্ধ। **চতুর্থতঃ,** সামাজিক দূরত্বের (social distance) দিক থেকেও আলোচনা করলে শ্রেণী এবং জাতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যায়। শ্রেণীর ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর সামাজিক দূরত্ব নেই একথা বলা যায় না, তবে তার ব্যবধান অপেক্ষাকৃত কম; কিন্তু জাতির ক্ষেত্রে উচ্চ বর্ণ ও নিম্ন বর্ণের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রক্ষা করা হয় এবং আচারে, ব্যবহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে ও সামাজিক জীবনে তা প্রতিফলিত হয়। **পঞ্চমতঃ,** বিবাহের ক্ষেত্রেও শ্রেণী এবং জাতির মধ্যে স্বাধীনতার তারতম্য ঘটে। এক শ্রেণীর অপর শ্রেণীতে বিবাহে কোন সামাজিক বাধা নেই কিন্তু জাতির ক্ষেত্রে উচ্চ বর্ণের লোক

নিম্ন বর্ণে বিবাহ করতে পারে না। **ষষ্ঠতঃ,** শ্রেণীর ক্ষেত্রে যে শ্রেণী-সচেতনতা (class consciousness) বিদ্যমান তা জাতির ক্ষেত্রে দেখা যায় না। যেমন, মালিক শ্রেণী ও মজুর শ্রেণী উভয়েরই আত্মাভিমান প্রবল এবং উভয় শ্রেণীই নিজ শ্রেণীর মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন কিন্তু জাতির ক্ষেত্রে কিছুটা সহাবস্থানের নীতি মানা হয় ; সকল সময়ই যে তারা দ্বন্দ্বে লিপ্ত তা নয়।

(iv) **জাতি এবং উপজাতির মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Caste and Tribe) :** জাতি এবং উপজাতির মধ্যে কতকগুলি ব্যাপারে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিবাহের ব্যাপারে জাতি এবং উপজাতির ক্ষেত্রে একই নিয়ম পালন করা হয়। জাতি এবং গোষ্ঠী (clan) নিজ গোষ্ঠীর বাইরে বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করে। কিন্তু উপরিউক্ত বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও দুয়ের মধ্যে যে-সব পার্থক্য বিদ্যমান তা' হল :

(১) জাতিকে কোন অবস্থায়ই রাজনৈতিক সংগঠন আখ্যা দেওয়া চলেনা কিন্তু উপজাতি একটি রাজনৈতিক সংগঠন।

(২) প্রাচীন হিন্দুসমাজে বৃত্তি এবং পেশা বা কর্ম বিভাজনের জন্যই জাতির জন্ম হয় কিন্তু ইতিহাসের বিবর্তনে একই ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য উপজাতির জন্ম হয়।

(৩) জাতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতি জাতিগত বৃত্তি অনুসরণ করে এবং তা কর্ম বিভাজনের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু উপজাতির লোকেরা যে-কোন বৃত্তি অনুসরণ করতে পারে।

(v) **জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্বের কারণ (Reasons for exsistence of Caste system) :** বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদ হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্বের জন্য বিভিন্নরকম কারণ প্রদর্শন করেছেন, তার মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(ক) **স্থিতিশীল সমাজ (Static Society) :** প্রাচীন হিন্দু সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক জীবনে বড় রকমের কোন আলোড়ন দেখা দেয়নি। বর্তমানে জাত্যাভিমানের (Casteism) ক্ষেত্রে সামাজিক আলোড়ন দেখা দিয়েছে, যার কারণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক সচেতনতা। কিন্তু প্রাচীন হিন্দু সমাজের মূল ভিত্তিই ছিল ধর্ম, আচার এবং লোকনীতি যা গতিশীল সমাজ জীবনের অন্তরায় বিশেষ। ফলে জাতিভেদ প্রথার স্থায়িত্বের জন্য সমাজের এই নিস্তরঙ্গ বা স্থিতিশীল অবস্থা কিছুটা পরিমাণে দায়ী।

(খ) **শিক্ষার অভাব (Lack of Education) :** প্রাচীন হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথার স্থায়িত্বের জন্য শিক্ষার অভাব অনেকাংশে দায়ী। অশিক্ষিত সমাজ যতখানি কুসংস্কার, গতানুগতিকতা এবং লোকনীতির উপর আস্থা স্থাপন করে শিক্ষিত সমাজ তা পারে না। নিম্ন বর্ণভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষার অভাবের জন্য উচ্চ বর্ণের লোকেরা তাদের উপরে নানারূপ সামাজিক নিষ্পেষণ চালাতে সমর্থ হয়েছিল।

(গ) **ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা (Geographical Isolation) :** প্রাচীন-যুগে জাতিভেদ প্রথার স্থায়িত্বের অন্যতম কারণ শহরাঞ্চলের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগের অভাব। ফলে শিল্পকেন্দ্রিক শহরাঞ্চলের আচারব্যবহার, চিন্তাধারা প্রভৃতি সুদূর পল্লীসমাজকে প্রভাবিত করতে পারেনি। ফলে ধর্ম, আচার ইত্যাদি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে ক্রিয়া করতে সমর্থ হয়েছিল।

(ঘ) **বৈদেশিক আক্রমণ (Foreign Aggression) :** ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্বের জন্য বৈদেশিক আক্রমণ বহুল পরিমাণে দায়ী। নৃতত্ত্ববিদ এবং ঐতিহাসিকরা মন্তব্য করেছেন যে, যখন আর্যরা এদেশ আক্রমণ করে তখন থেকেই এদেশে জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি হয়। তার পূর্বে জাতিভেদ প্রথার কোন অস্তিত্ব ছিল না। আর্যদের সঙ্গে এদেশের লোকেদের বর্ণে, আচার-ব্যবহারে দুস্তর পার্থক্য ছিল। ফলে ভারতে দুটি জাতির উৎপত্তি হয়। আর্যরা নিজেদের উচ্চ বর্ণভুক্ত এবং অনার্যদের নিম্ন বর্ণভুক্ত মনে করত। এইভাবে পারস্পরিক আচার-ব্যবহার, বিবাহ, খাদ্যগ্রহণ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কঠোর অনুশাসন পালন করা হোত।

(ঙ) **ধর্মের প্রভাব (Influence of Religion) :** জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে ধর্মের অনুশাসন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধর্মের প্রভাব মানুষের জীবনে, বিশেষ করে অশিক্ষিত সমাজে খুবই ব্যাপক। জাতিভেদ প্রথা যে সামাজিক ব্যবধান সৃষ্টি করে তা অমানবিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উচ্চবর্ণের লোকেরা তখন যে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারত তা অন্যান্য বর্ণের কাছে অকল্পনীয় ছিল এবং ধর্মই ছিল উচ্চবর্ণের নেতৃত্বের ও অত্যাচারের অস্ত্র। হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথাকে পবিত্র প্রথা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ধর্মের অনুশাসনের ফলে নিম্ন বর্ণের লোকেরা এই অনুষ্ঠানের (institution) আইনকানুন লঙ্ঘন করতে কোনকালে সাহসী হয়নি।

(vi) **জাতিভেদ প্রথা হীনবল হওয়ার কারণ (Factors Unfavourable for Caste system)** ঃ একথা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে বা হিন্দু সমাজে জাতিভেদপ্রথা যতখানি কঠোর ছিল বর্তমানে তা অনেক পরিমাণে হীনবল হয়ে পড়েছে। বর্তমানে জাতিভেদ প্রথার পুরোপুরি অবসান ঘটেছে এমন কথা বলা যায় না। তবে প্রাচীন সমাজে জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্ব যেরূপ ছিল বর্তমানে তার প্রকৃতির পরিবর্তন হয়েছে বলা চলে। নিম্নোক্ত কারণগুলি বিশ্লেষণ করলেই জাতিভেদ প্রথার এই হীনবল (Unfavourable) হওয়ার কারণগুলি খুঁজে পাওয়া যায় ঃ

(১) **শিল্প সভ্যতার প্রভাব (Influence of Industrialism)** ঃ শহরে রুজি রোজগারের জন্য বিভিন্ন জাতের লোকেদের পাশাপাশি কল-কারখানায় কাজ করতে হয়; হোষ্টেলে, রেস্তোরায় খাওয়া এবং ট্রামে বাসে একসঙ্গে যাতায়াত করতে হয়, ফলে অস্পৃশ্যতার কুসংস্কার মনের মধ্যে থাকলেও বাস্তবে প্রয়োগ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। একথাও বলা সমীচীন যে, শিল্প সভ্যতা যে শুধুমাত্র জাতিভেদ প্রথাকে বাধা দিতে সমর্থ হয়েছে তাই নয়, সমাজের ব্যক্তিরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ প্রথাকে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে। তার কারণ, শিল্পকেন্দ্রিক সভ্যতা সমাজস্থ ব্যক্তির মনে একদিকে যেমন রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে তেমনি পক্ষান্তরে মানুষের উদারপন্থীর মনোভাব গঠনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যেমন—শিল্পপ্রধান সমাজে শ্রমিকেরা দিনের অধিকাংশ সময় কারখানায় বা অন্য কোন কর্মক্ষেত্রে সহ-কর্মীদের সঙ্গে কর্মে নিযুক্ত থাকে; ফলে যে সহনশীলতা এবং উদারপন্থী মনোভাব গঠিত হয়, পারিবারিক জীবনেও তার প্রভাব ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। এই প্রভাবের ফলে পারিবারিক জীবনে নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাত বিচারের প্রশ্নও শিথিল হয়ে পড়ে। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে অসবর্ণ বিবাহের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা যায়। আজ আর অসবর্ণ বিবাহের জন্য কাকেও সমাজচ্যুত করা হয়না।

(২) **আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা (Mordern Education)** ঃ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে ধর্মের অন্ধ কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা বিজ্ঞান ভিত্তিক হওয়ার ফলে বাস্তব সমস্যার কারণ বিশ্লেষণে বাস্তব (materialistic) তথ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, অতিপ্রাকৃতিক (supernatural) কোন শক্তি (spirit) বা প্রভাবের ওপর গুরুত্ব আরোপ

করে না। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা গণতান্ত্রিক নীতি অর্থাৎ সাম্য, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই ব্যক্তিকে কুসংস্কারের বেড়াজাল হতে মুক্ত করে। এ ছাড়াও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা স্বাধীনভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদী মন নিয়ে সব কিছুকে বিচার বিশ্লেষণে উৎসাহিত করে। আধুনিক শিক্ষা প্রচার করে যে, সব মানুষই মূলতঃ সমান, অসাম্য সমাজেরই সৃষ্টি। মানুষের পরিচয় তাঁর কর্মে, মানুষ কোন জাতিভুক্ত তা তার মনুষ্যত্বের বিচারের মাপকাঠি নয়। আধুনিক সাহিত্যে, নাটকে এবং কথোপকথনে এ মনোভাবের প্রকাশ সর্বত্র প্রকাশমান।

(৩) **অর্থনৈতিক সমাজের প্রভাব (Influence of society based on wealth)** ঃ প্রাচীন সমাজে জাতিভেদ প্রথার সমীক্ষায় দেখা যায় যে, উচ্চবর্ণভুক্ত ব্যক্তিরা যে কেবলমাত্র সমাজের উচ্চাসনেই অধিষ্ঠিত ছিলেন তাই নয়, নানাবিধ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাও তাঁরা ভোগ করতেন এবং জাতিই ছিল সামাজিক মর্যাদা নিরূপণের একমাত্র মানদণ্ড। কিন্তু শিল্পকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রসার এবং নগরজীবনের নানাবিধ সুযোগ সুবিধার ফলে নিম্নবর্ণের লোকেদের পক্ষেও নানাবিধ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়েছে। তা ছাড়া সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে জাতি অপেক্ষা অর্থের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জাতিভিত্তিক বৃত্তি বর্তমানে একেবারে নেই বললেই চলে। বর্তমানে যে কাজ যে ব্যক্তির পক্ষে লাভজনক বলেবিবেচিত হয়, বা যে কাজের প্রতি ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে সে তা করতে আগ্রহী হয়। শিক্ষার প্রসারের ফলেও অনেকের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা সম্ভবপর হয়েছে যা পূর্বে অকল্পনীয় ছিল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে ব্যক্তিগত গুণাবলীর ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়, জাতিকে মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করা হয় না। অর্থনৈতিক প্রভাবের ফলে একজন ধনী শূদ্র একজন গরীব ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেক বেশী সামাজিক মর্যাদা ভোগ করেন।

(৪) **রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা (Political Agitation)** ঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, জাতিভেদে প্রথার বিরুদ্ধেও আন্দোলন কম হয়নি। এ ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর নাম স্মরণীয়। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে তাঁর দান ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। জাতীয় আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জাতিভেদের বিরুদ্ধে তাঁদের মহৎ অভিযান বিশেষ স্মরণীয়।

(৫) **যাতায়াতের সুযোগসুবিধা (Means of Communication) ঃ** শিল্পসভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াতের সুযোগ সুবিধাও পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ বেড়েছে। ফলে নগরাঞ্চলের শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা গ্রামীণ জীবনকেও আলোড়িত করেছে। যাতায়াতের সুবিধার ফলে গ্রামের লোকেদের পক্ষে শহরাঞ্চলের নানাবিধ আধুনিক পোশাক পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিস ক্রয় করা সম্ভব হয়েছে। ফলে গ্রাম এবং শহর জীবনের দুস্তর ব্যবধান বিলুপ্ত হয়েছে বলা যায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বাসে ট্রামে কারও পক্ষে সব সময় ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র রক্ষা করা সম্ভবপর নয়। রিসলে (*Rislay*) একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, যখন একটি ট্রেন কোন প্লাটফরমে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ায় তখন কোন ক্রেতা কোন জিনিস ক্রয় করার সময় বিক্রেতা কোন্ জাতিভুক্ত সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না।

(vii) **জাতিভেদ প্রথার পক্ষে যুক্তি (Argument for Casteism) ঃ** বর্তমানে জাতিভেদ প্রথার তীব্রতা আর নেই সত্য কিন্তু প্রশ্ন হল, জাতিভেদ প্রথার যদি কোন সামাজিক ভূমিকা না থাকত তাহলে এ ধরনের প্রথা এতদিন যাবৎ টিকে থাকতে পারত না। এমনকি পাশ্চাত্য সভ্যতার এবং আধুনিকতার প্রভাবে এ প্রথা আজও টিকে আছে। আসল প্রশ্ন হল, বর্তমানে যখন আমরা কোন প্রথার সমালোচনা করি তখন বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীতে সেই প্রথাটির উপযোগিতা কতটুকু বিশ্লেষণ করে বিচার করে দেখি। প্রাচীন যুগে উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিরা যে সৎ এবং নিতান্ত সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল একথা বলা আদৌ ঠিক হবে না। তবে একথা সত্য, বর্তমান জাতিভেদ প্রথায় যে বিকৃতি দেখা যায় তা প্রাচীন যুগে ছিলনা। সামাজিক শোষণের মাত্রা যখন তার সীমা অতিক্রম করে তখনই আন্দোলনের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে ওঠে। বর্তমানে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের কথা শোনা যায় তার প্রধান কারণ বর্তমানে বিভিন্ন জাতির পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য অপেক্ষা অসমাঞ্জস্যই বিদ্যমান। সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির ভূমিকা বা কর্তব্য কি সে সম্পর্কে জাতিগুলি সজাগ নয়। পূর্বে সমাজে ব্রাহ্মণের যে ভূমিকা ছিল বর্তমানে ব্রাহ্মণই তা পালন করেন না, এমনকি অনেকে অসামাজিক কাজেও লিপ্ত থাকেন। তা ছাড়া, প্রাচীন হিন্দু সমাজে জাতির সঙ্গে ধর্মের অনুশাসন ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ফলে জাতিগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার মূলে ধর্মের বিশেষ ভূমিকা ছিল। ধর্ম গ্রহণীয় কি বর্জনীয় সে

প্রশ্ন গৌণ, কিন্তু আধুনিককালে ধর্মের বাণী উচ্চারিত হয় সত্য, কিন্তু ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী সামাজিক কর্তব্য পালন করা হয় না। ফলে আধুনিক দৃষ্টিতে এই প্রাচীন প্রথার অর্থাৎ জাতিভেদ প্রথার সমালোচনা অনেক সময়ই যথাযথ হয়না। তার অবশ্য নানাবিধ কারণও আছে এবং কারণগুলিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। কোন প্রথাই সমাজ নিরপেক্ষ নয় এবং তার স্থায়িত্ব নির্ভর করে যে সমাজে সেই প্রথা প্রচলিত সেই সমাজের প্রকৃতির উপর। ফলে গতিশীল সমাজ ব্যবস্থায় প্রাচীন প্রথার অবস্থা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে অনেক সমাজবিদ সামাজিক মূল্যায়নের দিক থেকেও এই প্রথাকে সমর্থন করেছিলেন। যাঁরা এই প্রথাকে সমর্থন করেন তাঁরা জাতিভেদ প্রথার কতকগুলি গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেন :

(১) কোন একটি দেশের সংস্কৃতি সেই দেশের বিভিন্ন গোষ্ঠীর এবং তাদের আচার-ব্যবহার, প্রথা, লোকাচার এবং লোকনীতির ওপর নির্ভর করে। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে যে ধরনের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় আমরা পাই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তা অনেকাংশে গ্রহণীয় নয়। অনেকে তাই বলেন, বর্ণবহুল দেশে জাতিভেদ প্রথা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি প্রধান অস্ত্র ছিল। বিভিন্ন জাতির নিজ নিজ কর্তব্য পালন ও পারস্পরিক সহযোগিতা সমাজের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় সহায়ক হয়ে উঠেছিল। ফলে পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক দৃষ্টিতে এ প্রথা অচল হতে পারে তবে তদানীন্তন ভারতবর্ষে এই প্রথার উপযোগিতা একেবারে ছিলনা একথা বলা চলে না।

(২) অনেকে জাতিভেদ অনুসারী বৃত্তি বিভেদকেও একেবারে অবহেলা করতে পারেন নি। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, একটি লোকের পক্ষে উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রহণীয় বৃত্তিতে (Heriditary Profession) প্রতিষ্ঠিত হওয়া যতটা সহজ, অন্য বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ততটা সহজ নয়। তা ছাড়া জন্মসূত্রে গ্রহণীয় বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকার ফলে সহজে ব্যক্তি যে দক্ষতা অর্জন করে অন্য বৃত্তিতে অত সহজে দক্ষতা অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।

(৩) জীববিজ্ঞানের (Bio-science) দিক থেকেও অনেকে এই প্রথাকে সমর্থন করেন। নিজ জাতির মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠানকে সীমাবদ্ধ না রাখলে অনেক সময় নানাবিধ ব্যাধির সম্ভাবনাও দেখা যায়। নৃতত্ত্ববিদেরা প্রাচীন গোষ্ঠীর (Clan) বৈবাহিক সম্পর্ক গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ রাখার কারণ হিসেবে এই যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

(৪) অনেকে শ্রমবিভাজনের দিক থেকেও এই প্রথাকে সমর্থন করেন। কোন একটি সমাজব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারেনা যদি না তার সদস্যদের শ্রমবিভাগের (Division of Labour) ভিত্তিতে পারস্পরিক বোঝাপাড়া থাকে। কুসংস্কারই একমাত্র জাতিভেদের ভিত্তি ছিল না, এই প্রথা ধর্মের সঙ্গে কর্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল।

(viii) **জাতিভেদ প্রথার বিপক্ষে যুক্তি (Argument against Casteism):** উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা যেন ভুল না করি যে জাতিভেদ প্রথার কোন দোষত্রুটি ছিল না। সমাজ গতিশীল, কাজেই সমাজ এক সময় যা গ্রহণ করেছে তা চিরকালই গ্রহণীয় হবে এমন কোন কথা নেই। সামাজিক পরিস্থিতির ওপর সামাজিক মূল্যমানও নির্ভর করে। গতিশীল সমাজে প্রাচীন প্রথা তাই সব সময় সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে না। এমন কি তদানীন্তন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেও জাতিভেদ প্রথা সর্বজনগ্রাহ্য ছিল না। মানুষের পরিচয় তার সৃষ্টিতে, তার ব্যক্তিত্বে। সমাজের দায়িত্ব মানুষকে তার সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের সুযোগ দেওয়া নতুবা সমাজের পক্ষে অগ্রগতির পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে পড়ে। জাতিভেদ প্রথায় ব্যক্তির পক্ষে নিজ নিজ বৃত্তি নির্বাচন এবং অবাধ প্রতিযোগিতায় যোগদানের সুযোগ ছিল না। জাতির প্রশ্নে সামাজিক ব্যবধান (Social-distance)-এর প্রশ্নও এসে পড়ে। ফলে মানুষ কেবল নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনেই সন্তুষ্ট হয় না কারণ এই প্রথার সঙ্গে উচ্চতা, নিম্নতা, অহমিকা, মানসিক জটিলতার প্রশ্নও জড়িত। সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে উচ্চ বর্ণের প্রাধান্য যেমন স্বীকৃত ছিল তেমনি উচ্চ বর্ণের নিম্নবর্ণের ওপর অত্যাচারের ইতিহাসও অবিদিত হয়। সামাজিক সচলতার (Social Mobility) ক্ষেত্রেও জাতিভেদ প্রথা এক বাধাস্বরূপ। মানুষের মর্যাদা অর্জিত (achieved) গুণাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত, অর্পিত (ascribed) মর্যাদা সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ তা গণতান্ত্রিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তা ছাড়া জাতীয় ঐক্যের দিক থেকে চিন্তা করলেও এই প্রথা জাতীয় ঐক্য সাধনের পথে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করে।

(ix) **আধুনিক ভারত এবং জাতিভেদ প্রথার ভবিষ্যৎ (Present India and the prospect of caste system):** ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করার পর থেকেই জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণের জন্য নানাভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রচেষ্টার মূলে মহাত্মা গান্ধীর অবদান উল্লেখযোগ্য।

জাতিভেদ প্রথার অবাঞ্ছনীয় বৈশিষ্ট্য অস্পৃশ্যতাকে ভারতীয় জনগণ সমর্থন করতে নারাজ। ভারতীয় সংবিধানে অস্পৃশ্যতার উচ্ছেদ সাধন করা হয়েছে এবং এই প্রথার কোন রকম সমর্থনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদি কেহ এই প্রথাকে সমর্থন করে সে আইনের চোখে শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। জনসাধারণের হিন্দু মন্দিরে প্রবেশাধিকারে, স্কুল, কলেজ, হোটেল, রেস্তোরা, পুষ্করিণী ইত্যাদি ব্যবহারে সমতার নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে তপশিলী জাতিভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এবং উপজাতিদের ক্ষেত্রে আইনসভায় আসন সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারী অফিসে চাকরির ক্ষেত্রেও ঐসব শ্রেণীর পদের সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তপশিলী ছাত্রদের জন্য সরকারী অনুদানের বিশেষ ব্যবস্থাও স্বীকৃত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, যদিও ভারতীয় সংবিধানে এই অবাঞ্ছনীয় প্রথার বিলোপ সাধনের কথা বলা হয়েছে তবুও এ কথা মনে করা উচিত যে, কেবলমাত্র আইন দ্বারা এই অস্পৃশ্যতা নিবারিত হতে পারে না। এর জন্য দরকার জনসাধারণের মানসিক পরিবর্তন। ভারতে বর্তমানে সাহিত্যে, নাটকে, রাজনৈতিক দলের প্রচারে এই প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে। ভারতে জণগণও এই জঘন্য প্রথার স্থায়িত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর। তাই দেখা যাচ্ছে, অসবর্ণ বিবাহ একরকম সামাজিক রীতি হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের সরকারী মহল থেকেও অসবর্ণ বিবাহে উৎসাহ দান করা হচ্ছে। এই মানসিক পরিবর্তনের জন্য অবশ্য বিভিন্ন কারণ দায়ী, যেমন শিল্পকেন্দ্রিয় সভ্যতা, পাশ্চাত্ত্য দেশের আধুনিকতাবাদ, যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ভূমিকা ইত্যাদি। জাতিভেদ প্রথার শক্তির উৎস যে জাতি পঞ্চায়েত (Caste-Panchayats) তার কার্যাবলীও ক্রমশঃ অন্যান্য সংস্থার ওপর অর্পণ করা হয়েছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য আগের তুলনায় অনেক খর্ব করা হয়েছে। পূজানুষ্ঠানে অন্যান্য জাতিদের নিজ নিজ পুরোহিতের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। বৃহৎ বৃহৎ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে নিম্ন বর্ণের ব্যক্তিরাও শাসনতান্ত্রিক পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিধবা বিবাহের প্রচলন এবং আইন দ্বারা অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে ভারতবর্ষই প্রথম বর্ণবিদ্বেষ সংক্রান্ত প্রশ্নটি রাষ্ট্রপুঞ্জে উত্থাপন করেছিল। বর্ণবিদ্বেষ সংক্রান্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের দলিলে একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৪৬ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের

(General Assembly) প্রথম বৈঠকেই ভারত বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখে। আনন্দের কথা, ভারত আজও একই সুরে তার কথা বলে যাচ্ছে। গত দশকে ভারত আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনে তার এই ভূমিকাকে সমর্থন করেছিল। ১৯৭৬ সালের আগষ্ট মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জের বর্ণবিদ্বেষ সংক্রান্ত কমিটির রাষ্ট্রদূত ল্যাসলি ও হ্যারিম্যান বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী নেতাদের প্রশংসা জানাতে ভারতে আসার কথা ব্যক্ত করেছিলেন এবং ভারত তাঁকে সাদরে আহ্বান জানিয়েছিল। এই বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী মনোভাব যে কেবলমাত্র ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাই নয়, ভারতের জনগণের দিক থেকেও।

উপরিউক্ত ব্যবস্থা সত্ত্বেও একথা আমরা বলতে পারিনা যে, ভারতে এই প্রথা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছে। জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদসাধনে যে কয়েকজন সমাজ-সংস্কারক বিশেষভাবে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দয়ানন্দ সরস্বতীর নাম বিশেভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু এ প্রথার পুরোপুরি অবলুপ্তি ঘটে নি, বরং বিভিন্নভাবে তা আজও ভারতীয় সমাজে বিরাজমান। জাতিভেদপ্রথার পরিবর্তে শ্রেণী সচেতনতা (class consciousness) বর্তমান সমাজে প্রাধান্য লাভ করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানে, এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও সাধারণতঃ উচ্চ শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরাই অগ্রাধিকার পায়। এমনকি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে জাতিভেদে প্রথার ওপর অনেকক্ষেত্রে আস্থা স্থাপন করতে দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করেন নির্বাচন-পদ্ধতি জাতিভেদ প্রথাকে একদিক থেকে উৎসাহিত করেছে কারণ নির্বাচকদের মধ্যে অনেক সময় নিজ জাতিভুক্ত প্রার্থীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায়। রাজনৈতিক দলগুলিও এই দোষত্রুটির উর্ধ্বে নয়।

কাজেই একথা সত্য যে জাতিভেদ প্রথার নানা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু একেবারে অবলুপ্ত হয়েছে তা বলা চলেনা।

৬। সামাজিক স্তরবিন্যাসের উপযোগিতা (Utility of social Stratification) :

কয়েকজন সমাজবিদ্ সামাজিক স্তর-বিন্যাসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং মন্তব্য করেন যে একটি জটিল সমাজের পক্ষে সামাজিক স্তরবিন্যাস অবশ্যম্ভাবী, তাকে এড়ান সম্ভব নয়। সমাজের সুষ্ঠু কার্যাবলীর জন্যই স্তর-বিন্যাসের উপযোগিতা বৃদ্ধি লাভ করেছে।

জটিল সমাজের বৈশিষ্ট্যই হল তার বৃত্তির বিভিন্নতায় এবং প্রত্যেকটি বৃত্তির কার্যাবলীর সঙ্গে সামাজিক মূল্যমানের প্রশ্ন জড়িত। যদি বৃত্তি এবং সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা না থাকত তাহলে প্রত্যেকেই সুবিচার থেকে বঞ্চিত হোত। সাম্যবাদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক সময় অনেকে মনে করে যে, প্রত্যেকেই যখন মানুষ তখন তাদের সব চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এবং জীবনধারণের পদ্ধতিও সাম্যের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কিন্তু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আচার-ব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গী, সংস্কৃতি, চিন্তাভাবনা এবং ব্যক্তিগত গুণাবলীর ক্ষেত্রে বৈষম্য দৃষ্ট হয়। একজনের কাছে যা প্রিয় অপরের কাছে তাহা পরিত্যজ্য। একজন কোন এক শ্রেণীর কাজ বিশেষ পছন্দ করে, অপরজন অন্য ধরনের কাজ পছন্দ করে। কাজেই সামাজিক স্তরবিন্যাস যদি না থাকত তাহলে প্রত্যেকেই নিজ মনোমত কাজও অনুসন্ধান করতে পারত না, ফলে কাজটিও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হত না। অন্য দিক থেকেও স্তরবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যোগ্য ব্যক্তি যদি তার যোগ্য কাজে সুযোগ না পায় তাহলে সে তার সামাজিক কর্তব্যও ঠিকমত পালনে সক্ষম হয় না। সামগ্রিক সমাজের স্বার্থেই প্রতিটি কার্য সঠিকভাবে সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন। সমাজে এমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে যা সকলের পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ধরনের দক্ষতা, সামর্থ্য এবং দায়িত্বশীলতার প্রয়োজন আছে। তা ছাড়াও একথা বলা অসমীচীন হবেনা যে, জন্মগত দক্ষ ব্যক্তির সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। একজনের পক্ষে যা সহজসাধ্য অপরের পক্ষে তা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সমান সুযোগসুবিধা সত্ত্বেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে গুণাবলীর ক্ষেত্রে যে পার্থক্য সূচিত হয় তা সমাজবিদ্ এবং মনোবিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন। বিভিন্ন রকম বৃত্তি যদি বিভিন্নরকম মর্যাদার এবং সম্মানের সূচক না হয় তাহলে কাজের প্রতি অনীহা আসাও স্বাভাবিক। বৃত্তির গুরুত্বের তারতম্য অনুসারে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তারতম্য ঘটে। সেজন্য দেখা যায় যে কাজগুলির জন্য অধিক দক্ষতার প্রয়োজন সেই কাজের পদাধিকারী ব্যক্তিদের অধিক বেতন দেওয়া হয়। সামগ্রিকভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, বস্তুতান্ত্রিক জগতে বৃত্তির বিশেষীকরণের জন্য যোগ্য ব্যক্তিরা যদি সুযোগ না পায় তাহলে সামগ্রিকভাবে সামাজিক কল্যাণই ব্যাহত হয়। এই দিক থেকে সামাজিক স্তরবিন্যাসের উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। যে কাজগুলির গুরুত্ব সামাজিক স্বার্থে অধিক সে কাজগুলিও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। যে কাজগুলি সাধারণতঃ সকলের পক্ষেই

সহজসাধ্য সে কাজগুলির সামাজিক মর্যাদাও কম। সকল সময় অর্থনৈতিক তারতম্যে যে বৃত্তিগুলির মর্যাদার তারতম্য ঘটে তা নয়, কাজটির সামাজিক গুরুত্ব অনুযায়ীই মর্যাদার ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটে। যেমন, শাসনসংক্রান্ত কার্যাবলীর জন্য, সৈন্যবাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য যেখানে বুদ্ধিগত যোগ্যতার প্রয়োজন, সমাজের বৃহত্তর স্বার্থেই সেইসব বৃত্তির ব্যক্তিদের অধিক মর্যাদা অর্পণ করা উচিত।

৭। সামাজিক স্তরবিন্যাসের সুবিধা এবং অসুবিধা (Merits and Demrits of Social Stratification) :

সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে বর্তমান সমাজে অর্থ নৈতিক, মর্যাদাভিত্তিক এবং জাতিভিত্তিক স্তরবিন্যাসই বোঝায়। কয়েকজন সমাজবিদ্ সামাজিক স্তরবিন্যাসের পক্ষে নানাধরনের যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের মতে স্তরবিন্যাসের সুবিধাগুলি নিম্নরূপ :

(১) প্রথমতঃ, অনেকেই স্বীকার করেন যে বিশেষ ধরনের কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন। দক্ষতা এবং দায়িত্বশীলতার তারতম্য হেতু প্রতিটি কাজ প্রত্যেকের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। পারিবারিক বা পরিবেশের প্রভাব স্বীকার করে নিলেও, একথাও ঠিক যে জন্মগত গুণাবলীর দিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য বিদ্যমান। ব্যক্তিগত গুণাবলীর তারতম্য হেতু দৃষ্টিভঙ্গীর যেমন পার্থক্য ঘটে তেমনি বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতির বিকাশলাভ এই বৈচিত্রেরই ফলশ্রুতি। স্তরবিন্যাসের ফলে যোগ্য ব্যক্তি মনোমত বৃত্তি লাভের জন্য সচেষ্ট হয় এবং তার পক্ষে তা লাভ করাও সহজসাধ্য হয় ও সামগ্রিকভাবে সমগ্র সমাজই তার দ্বারা উপকৃত হয়।

(২) শিল্পভিত্তিক সমাজে স্তরবিন্যাসের প্রাধান্য যেমন আছে তেমনি সেখানে সামাজিক সচলতারও সুযোগ অধিক। উচ্চ বা নিম্নমানের কাজ করার জন্য পূর্বসিদ্ধান্ত অর্থাৎ পূর্বস্থিরীকৃত মতামত জোড় করে চাপিয়ে দেওয়া চলে না। স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে যাবার সুযোগ পায় এবং এটি তার মৌলিক অধিকার। যদি সমস্ত জীবনই কোন ব্যক্তিকে একটি বিশেষ অর্থ নৈতিক অবস্থায় থাকতে হয় অথবা একই মর্যাদার গ্লানি বহন করতে হয় তাহলে স্বভাবতই কাজে শিথিলতা দেখা দেয়।

(৩) শ্রেণীভিত্তিক সমাজের অপর প্রধান সুবিধা হল—বৃত্তি নির্বাচন করার ব্যাপারে ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকে। মুচির ছেলেকে যে সারা জীবনই

জুতা তৈরি করতে হবে এমন কোন কথা নেই। যদি যথার্থ সুযোগ সে পায় তাহলে অন্য বৃত্তি গ্রহণ করে তার পক্ষেও উচ্চপদে আরোহণ করা সম্ভব হয়। কাজেই সামাজিক স্তরবিন্যাস গণতন্ত্রসম্মত এরূপ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে।

(৪) কোন কোন শ্রেণীর সদস্যদের জীবনের ক্ষেত্রে কতকগুলি সুযোগের (life chances) প্রয়োজন হয়। যেমন—কোন এক শ্রেণীর ব্যক্তিদের পক্ষে অবকাশ ও স্বাধীনতার প্রয়োজন যা সমাজের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণীভিত্তিক সমাজেই এ সুযোগ অপেক্ষাকৃত বেশী।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের অসুবিধাগুলি নিম্নরূপ :

(১) প্রথমতঃ, শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্যের প্রশ্ন আলোচনা করা যেতে পারে। সামাজিক শ্রেণী বিভাগের ফলে সকলের পক্ষে সমান শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। আমেরিকা এবং ইংলণ্ডে সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে কলেজ ছাত্রদের খুব কম সংখ্যকই আসে শিল্প-শ্রমিক বা হস্তশিল্পীর ঘর থেকে, তার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য যা শ্রেণীভিত্তিক সমাজের বিষময় ফল।

(২) কার্লমার্কস রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণে করতে গিয়ে বলেন যে—অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বিভক্ত দুটি বিরুদ্ধ শ্রেণীর সহাবস্থান কখনই সম্ভব নয়। কারণ উৎপাদনের যন্ত্র যাদের হাতে সেই পুঁজিবাদীর দল, যারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত সেই শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করে। ফলে শ্রমিক তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

(৩) অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাসের আর একটি কুফল হল যারা জীবনে উচ্চ মর্যাদায় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত, তারা নিম্নশ্রেণী-ভুক্ত ব্যক্তিদের কাছে ঈর্ষার পাত্র হন যা ব্যক্তিগত ক্রোধ বা আক্রোশের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। ফলে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করা যেমন অসম্ভব হয়ে পড়ে, তেমনি সমাজে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখাও কষ্টকর হয়।

(৪) সামাজিক বিচারের ক্ষেত্রেও সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের মন্দ দিকটি বিশেষ লক্ষণীয়। আদালতে বিচারের প্রার্থনা অনেক সময় অর্থের ওপর নির্ভর করে। একটি ধনী লোকের পক্ষে দক্ষ আইনজ্ঞের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা সম্ভব, একজন দরিদ্র লোকের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। অর্থনৈতিক বৈষম্যই এই অবস্থার জন্য দায়ী।

(৫) শ্রেণীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল সামাজিক সচলতা। সামাজিক সচলতার জন্য পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় না এবং সামাজিক

সচলতা মনস্তাত্ত্বিক একাকীত্বের (psychological isolation) জন্ম দেয়। অথচ একথা সত্য যে, নিঃসঙ্গ জীবন মানুষের পক্ষে অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় এবং বেদনাদায়ক।

যদি ক্রমাগত বৃত্তি পরিবর্তনের সুযোগ থাকে তাহলে সহকর্মীদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক যেমন গড়ে উঠতে পারে না, তেমনি করণীয় কাজটি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করাও সহজ হয় না। ফলে অনেক সময় তা ব্যক্তির মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

এবার জাতিভেদ প্রথার গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। **অনেকে জাতিভেদ প্রথার নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি উল্লেখ করেন।**

(১) জাতিভেদ প্রথার প্রধান সুবিধা হল—এই প্রথা ঈর্ষা প্রশমিত করে। প্রত্যেক জাতির একটা নিজস্ব বৃত্তি আছে। ফলে জাতিভিত্তিক বৃত্তিতে একজন যে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে তা অপরের পক্ষে সম্ভব নয়। একটি মুচির ছেলের পক্ষে জুতো তৈরী করা যত সহজ, অপরের পক্ষে তা সহজ হয় না। জাতিগত পেশা গ্রহণের জন্য তাকে অর্থনৈতিক দুরবস্থার সম্মুখীন হতে হয় না; সমাজও তার দ্বারা উপকৃত হয়।

(২) জাতিভেদ প্রথা শ্রম বিভাগের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ফলে একদিকে যেমন সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়েছে আবার কার্যের বিশেষীকরণের (specialisation) দিকেও প্রবণতা বেড়েছে। প্রত্যেক জাতিই যদি নিজ নিজ বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকে তাহলে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করাও সহজতর হয়। কর্ম বিভাজনের ফলে সমাজও প্রগতির পথে এগিয়ে চলে।

(৩) ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সৌহার্দ্য রক্ষায় সহায়ক ছিল। জাতিভেদ প্রথা সমাজে স্থায়িত্ব এবং শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা করেছিল। জাতিভেদ প্রথা হিন্দুসমাজের সংস্কৃতি রক্ষায় যেমন সাহায্য করেছিল, বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধেও জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে উৎসাহিত করেছিল। প্রাচীন গ্রাম্য জীবনেও এই প্রথা সমাজে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা এবং নিরাপত্তা রক্ষায় সহায়ক হয়েছিল। প্রত্যেকটি জাতি যেন একটি ছোটখাট সম্প্রদায় যারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্যে করতে সবসময় আগ্রহী থাকত এবং সুষ্ঠু সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন রক্ষায় বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিল।

জাতিভেদ প্রথার দোষত্রুটিগুলি নিম্নরূপ :

(১) জাতিভেদ প্রথার সর্বপ্রথম ত্রুটি হল, এই প্রথায় সামাজিক সচলতার পুরোপুরি অভাব। প্রত্যেকের সামাজিক মর্যাদা জন্মসূত্রে নিয়ন্ত্রিত। ফলে এই প্রথা সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। কোন ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা দৈব নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তাছাড়া, এই প্রথা অ-গণতান্ত্রিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমান সুযোগ সুবিধার অভাবে নিম্ন জাতের ব্যক্তিদের পক্ষে উচ্চপদ লাভ করা সম্ভবপর হয় না।

(২) দ্বিতীয়তঃ, অস্পৃশ্যতা (untouchability) জাতিভেদ প্রথারই মর্মান্তিক পরিণতি। প্রত্যেক মানুষই সমান। জাতিভেদ প্রথার দ্বারা তাদের মধ্যে ভেদরেখা টানা মানুষেরই সৃষ্টি। এই প্রথার ফলেই সব মন্দিরে নীচুজাতের লোকেদের প্রবেশাধিকার ছিলনা, এমনকি সাধারণের পুষ্করিণী ব্যবহারেরও অধিকার ছিল না। সমাজের এক শ্রেণীর লোকের প্রতি এই ধরণের আচরণ নিঃসন্দেহে মানবতা বিরোধী।

(৩) মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও এই প্রথা বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ শ্রেণী বৈষম্যের ফলেই মানুষের মধ্যে অহমিকার জন্ম হয় এবং ফলে নিম্নজাতির লোকেদের প্রতি ঘৃণার ভাব সৃষ্টি হয়। অনেক সময় উচ্চজাতির লোকেরা নিম্নজাতির লোকের ওপর অত্যাচার করে যা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

(৪) জাতিভেদের নীতি শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রমের ক্ষেত্রেও পার্থক্য নির্দেশ করে। যারা উচ্চবর্ণ তাদের মানসিক পরিশ্রমের জন্য উৎসাহিত করা হয়। কায়িক পরিশ্রম তাদের ক্ষেত্রে মর্যাদাজনক গণ্য করা হয় না। অপরপক্ষে নিম্নবর্ণের ক্ষেত্রে কায়িকপরিশ্রমের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু প্রত্যেক জাতিরই উভয় প্রকার শ্রমের প্রতি নিষ্ঠা থাকা উচিত।

(৫) পঞ্চমতঃ, একথা বলা অসমীচীন হবে না যে—যারা সমাজের উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত তারা যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, তপশীলি জাতিভুক্ত ব্যক্তিরা তা থেকে বঞ্চিত এবং অর্থ নৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য হেতু সমাজের উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের এক দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়। এর ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে অসন্তোষ দেখা দেয় যা সামাজিক ঐক্য ও সংহতিকে ব্যাহত করে।

৮। সামাজিক সচলতা (Social Mobility) :

আধুনিক সমাজের শ্রেণী কাঠামো (class structure) ক্রমাগতই পরিবর্তিত হচ্ছে। সমাজবিদ্ লা-পায়ার (*La Piere*) বলেন—একটি চলমান এবং পরিবর্তিত সামাজিক কাঠামোয় যেখানে সামাজিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ক্রমাগতই চলছে সেখানে সামাজিক শ্রেণীগুলি যুক্তভাবে কাজ করতে সমর্থ হয়। এহেন গতিশীল সমাজে ব্যক্তিদের উচ্চ-শ্রেণীতে উন্নীত হবার সম্ভাবনার পথ যেমন প্রশস্ত সেরূপ শ্রেণী পর্যায়ে নিম্নগামী হবার সম্ভাবনাও কম নয়। সামাজিক কাঠামোয় সামাজিক শ্রেণীগুলির বিপরীতধর্মী ক্রিয়া ক্রমাগতই চলতে থাকে—একদিকে ব্যক্তিদের উচ্চ-সামাজিক মর্যাদায় (upper social status) উন্নীত হবার ক্রিয়া অপরদিকে উচ্চ-সামাজিক মর্যাদার ব্যক্তিদের নিম্ন সামাজিক মর্যাদায় অধঃপতিত হবার ক্রিয়া।

উচ্চ-সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত কোন পরিবারে বিবাহের মাধ্যমে নিম্ন সামাজিক শ্রেণীভুক্ত কোন ব্যক্তি উচ্চ-সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পায়। আবার এমনও ঘটনা ঘটে যখন কোন একটি মেয়ে মর্যাদায় তার সামাজিক স্তরের থেকে নিচে অবস্থিত কোন পরিবারে বিবাহ করে তখন তার সামাজিক মর্যাদা নিম্নমুখী হয়। এভাবে সামাজিক স্তরের উচ্চ-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত পরিবারের কোন ব্যক্তির নিম্নমর্যাদায় অধিষ্ঠিত পরিবারে অবতরণ অবার নিম্নমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত পরিবারে আরোহণকে সামাজিক সচলতা বলে।

অধ্যাপক সরোকিন (*Sorokin*)-ও অনুরূপ মন্তব্য করেন। সামাজিক সচলতা বলতে তিনি মনে করেন যে, যখন কোন ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় তার সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন ঘটায়, তখন সেই পরিবর্তিত সামাজিক স্তরই হল সামাজিক সচলতা। তিনি আরও বলেন, যখন আমরা উচ্চ শ্রেণীতে আরোহণ বা নিম্ন শ্রেণীতে অধঃগমণের কথা বলি তখন সামাজিক ব্যবধানে (social space)-এর প্রশ্ন এমনিতেই আমাদের মনে জেগে ওঠে। সামাজিক ব্যবধানেই সামাজিক সচলতা মূর্ত হয়ে ওঠে। এখন প্রশ্ন হল, সামাজিক ব্যবধান বলতে ঠিক আমরা কি বুঝি ?

প্রথমেই এ কথা বলা সমীচীন যে, জ্যামিতিক ব্যবধান (geometrical space) এবং সামাজিক ব্যবধানের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। জ্যামিতিক ব্যবধানে দুটি ব্যক্তি কাছাকাছি অবস্থান করতে পারে, তাই বলে যে তাদের

সামাজিক দূরত্ব কম এ কথা বলা যায় না। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা বুঝে নেওয়া যাক: রাজা এবং প্রজা কাছাকাছি অবস্থান করতে পারে, ফলে—তাদের মধ্যে জ্যামিতিক দূরত্ব কম হলেও সামাজিক ব্যবধান অনেক। আবার দেখা যায় যে—উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের দুটি ব্যক্তি অথবা একই ধরনের উচ্চ পদাধিকারী দুটি ব্যক্তি ভিন্ন জায়গায় অবস্থান করতে পারে, ফলে তাদের মধ্যে জ্যামিতিক ব্যবধান থাকলেও সামাজিক ব্যবধান থাকে না।

কোন ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ করতে হলে তার পারিবারিক মর্যাদা, কোন্ রাষ্ট্রের সে নাগরিক, কোন্ ধর্মীয় গোষ্ঠীর বা রাজনৈতিক দলের সে অন্তর্ভুক্ত, তার অর্থনৈতিক মর্যাদা, তার বৃত্তিগত শ্রেণীর কথা জানা প্রয়োজন। এভাবে সবদিক বিচার করলেই তার সামাজিক মর্যাদা নিরূপণ করা যায়।

জ্যামিতিক ব্যবধানকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায় কিন্তু সামাজিক ব্যবধান বিচিত্রমুখী। তবে সামাজিক ব্যবধানকে বোঝার সুবিধার জন্য মোটামুটি দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি উল্লম্বী ব্যবধান (vertical dimension) এবং অপরটি অনুভূমিক ব্যবধান (horizontal dimension)।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে সামাজিক সচলতাকে আমরা দুইটি মুখ্য ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি অনুভূমিক সচলতা (horizontal mobility) এবং অপরটি উল্লম্বী সচলতা (vertical mobility)। একই সামাজিক স্তরের মধ্যে সমমর্যাদাসম্পন্ন একটি পদ পরিবর্তন করে আর একটি পদে যাওয়াকে অনুভূমিক সচলতা বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—কোন একজন স্কুল শিক্ষক, যে চাকুরীতে তিনি নিযুক্ত, সেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে অন্য একটি জায়গায় স্কুল শিক্ষকের কাজে যোগ দিলেন। কর্মক্ষেত্রের এই পরিবর্তনের সাথে তার পদমর্যাদার কোন উন্নতি বা অবনতি ঘটল না। অপরপক্ষে, উল্লম্বী সচলতা (vertical mobility) বলতে কোন ব্যক্তির একটি সামাজিক স্তর থেকে অন্য সামাজিক স্তরে পরিবর্তনকে বোঝায়। এই পরিবর্তন দুই প্রকারের হতে পারে—প্রথমতঃ, পরিবর্তনের ফলে কোন ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদার উন্নয়নও ঘটতে পারে আবার অবরোহণও হতে পারে অর্থাৎ একদিকে সামাজিক স্তরে আরোহণ অপর দিকে সামাজিক স্তরে নিম্নাবতরণ।

এই উর্ধমুখী গতি মূলতঃ দুইভাবে কার্য করে। (১) প্রথমতঃ, নিম্ন সামাজিক স্তরের ব্যক্তিদের উচ্চ সামাজিক স্তরে অনুপ্রবেশ এবং (২) দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যক্তিরা যখন কোন সামাজিক গোষ্ঠী গঠন করে সেই গোষ্ঠীর উচ্চস্তরে উন্নয়ন। সেইরূপ

নিম্নমুখী গতিও দুটি পদ্ধতিতে কার্য করে। (১) উচ্চ-সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যক্তির নিম্ন সামাজিক মর্যাদায় অবরোহণ এবং (২) দ্বিতীয়তঃ, কোন সামাজিক গোষ্ঠীর সামগ্রিক অবরোহণ বা উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তরে গমন।

উল্লম্বী সামাজিক সচলতার গুরুত্ব দুই দিক থেকে লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, উল্লম্বী সামাজিক সচলতা গণতান্ত্রিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ এই প্রকার সচলতার পথ যদি প্রশস্ত হয় তাহলে প্রত্যেকেই সমান সুযোগ সুবিধা লাভে সমর্থ হয়। যোগ্য ব্যক্তি সামাজিক মর্যাদা লাভে বঞ্চিত হয় না, ফলে সামাজিক প্রগতিও অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য সামাজিক সচলতার পথ খোলা রাখা দরকার। যদি সামাজিক সচলতা সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হয় অর্থাৎ যথার্থ ব্যক্তি যোগ্য মর্যাদা লাভে বঞ্চিত হয় তখন নানাবিধ সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়।

সামাজিক সচলতার ক্ষেত্রে সাধারণ নীতিগুলি কি কি?

(১) এমন সমাজ বিরল যেখানে সামাজিক সচলতার পথ রুদ্ধ অথবা এমন কোন সমাজ নেই যেখানে উল্লম্বী সচলতা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং পেশাগত —এই তিনটি রূপে দেখা যায় না। জাতিভিত্তিক সমাজ অবশ্য স্বতন্ত্র, কারণ এ ধরনের সমাজে উল্লম্বী সচলতা খুবই দুর্বল। তবে জাতিভিত্তিক সমাজে সামাজিক সচলতা একেবারেই কার্য করে না এ কথা বলা যথাযথ হবে না। ভারতবর্ষের জাতিভেদের কথা আলোচনা করলেই বুঝা যায় যে, প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা যেরূপ প্রবল ছিল বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশের আধুনিকতার জোয়ারে তা অনেকাংশে শিথিল হয়ে পড়েছে এবং গতানুগতিক সামাজিক মূল্যমানেও আঘাত হেনেছে। ফলে—জাতিভিত্তিক সমাজেও সামাজিক উল্লম্বী সচলতা লক্ষণীয়। সামাজিক স্তরবিহীন সমাজ এক রকম অলীক কল্পনা মাত্র।

(২) অপর পক্ষে এ কথাও সত্য যে, পৃথিবীতে এমন কোন সমাজ দেখা যায় না যেখানে সামাজিক সচলতা অবাধে কাজ করতে সমর্থ হয় এবং কোন বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হয় না। সামাজিক অস্থিরতা অথবা স্বেচ্ছাচারিতায় সামাজিক কাঠামো বজায় রাখা সম্ভব হয় না।

(৩) উল্লম্বী সামাজিক সচলতার গভীরতা এবং প্রকৃতিও সব সমাজে একরূপ নয়। উল্লম্বী সচলতার ক্ষেত্রে একটি সমাজের সঙ্গে অন্য সমজের পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, ভারতবর্ষে জাতিভেদের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয় আমেরিকার সমাজে তা বিরল।

(৪) অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একই সমাজে উল্লম্বী সচলতার পার্থক্য দেখা যায়। সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নত অবস্থায় উল্লম্বী সামাজিক সচলতার যে গভীরতা লক্ষ্য করা যায় অন্য সময় সেরূপ দৃষ্ট হয় না।

এখন প্রশ্ন, **উল্লম্বী সামাজিক সচলতার পিছনে কারণগুলি কি কি ?**

(১) উচ্চতর এবং নিম্নতর শ্রেণীর জন্মহারের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, উচ্চতর শ্রেণীর জন্মহার নিম্নতর শ্রেণীর জন্মহার অপেক্ষা অনেক কম। সেজন্য উচ্চতর শ্রেণীর কাজকর্ম করার জন্য যে লোকের প্রয়োজন তা সব সময় পাওয়া যায় না, ফলে স্বভাবতঃই নিম্নতর শ্রেণীর লোকেদের উচ্চতর শ্রেণীর কাজ করার সুযোগ আসে এবং এইভাবে সচলতার পথও সুগম হয়।

(২) অনেক সময় দেখা যায়, উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা নিজ শ্রেণীভুক্ত কাজ করতে অসমর্থ হয়, ফলে তার পদ মর্যাদার অবনতি ঘটে। যেমন, অনেক সময় দেখা যায়, পিতা হয়ত কলেজের অধ্যক্ষ পদে আসীন কিন্তু পুত্রের পক্ষে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব হল না। ফলে স্বভাবতঃই সেই পুত্রের পক্ষে পিতা যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সেই শ্রেণীর মর্যাদা অর্জন করা সম্ভব হয় না এবং মর্যাদার গতি হয় নিম্নমুখী। এর পিছনে অবশ্য নানাবিধ কারণ জড়িত। যেমন, পরিবেশের প্রভাব এবং বংশগতি। পক্ষান্তরে দেখা যায়, নিম্ন স্তরভুক্ত শ্রেণীর লোকেরা ব্যক্তিগত গুণাবলীর প্রভাবে সমাজে উচ্চতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়। অনেক নিম্ন শ্রেণীভুক্ত দরিদ্র ঘরের ছেলে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তের সংখ্যা কম নয়। এক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত গুণাবলীই কাজ করে। বর্তমানে কাজের বিশেষীকরণের (specialisation) জন্য সকলের পক্ষে সকল কাজ করা সম্ভব হয় না, ফলে উল্লম্বী সচলতার পথও প্রশস্ত হয়।

(৩) সামাজিক স্তর-বিন্যাসের সঙ্গে কতকগুলি মূল্যবোধের প্রশ্নও জড়িত থাকে। যেমন, শিক্ষকের কাজ শিক্ষা প্রদান করা, কিন্তু বৃহত্তর সমাজ তাঁর কাছ থেকে আরও অনেক কিছু আশা করে। যেমন, মার্জিত রুচি, সহৃদয়তা, ব্যক্তিত্বের প্রসারতা ইত্যাদি। কিন্তু কোন শিক্ষক যদি এই মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন না থাকেন, স্বাভাবিক কারণেই তাঁর সামাজিক পদমর্যাদারও পতন ঘটে। আবার নিম্নতর শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির আচার-আচরণ এবং ব্যবহার অনুশীলন করে উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত হবার চেষ্টা করে। অনেকসময় কারখানার শ্রমিকের মার্জিতরুচি এবং আচার-ব্যবহারের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা সভ্য সমাজেও দেখা যায় না।

(৪) প্রত্যেকটি পদাধিকারী ব্যক্তিদের কার্যকাল সীমিত থাকে। ফলে নিম্নতর শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ পায়। যেমন, প্রত্যেক দেশেই মন্ত্রীদের কার্যকাল সীমিত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে হয় বলেই নিম্নতর শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা এ সুযোগ পেয়ে থাকে।

সমাজবিদেরা উল্লম্বী সামাজিক সচলতার মূলে যে কারণগুলি ক্রিয়া করে তা যেমন বিশ্লেষণ করেছেন আবার কতকগুলি পথের নির্দেশ দিয়েছেন যার দ্বারা উল্লম্বী সচলতার পথ সুগম হয়। যেমন, (১) সৈন্য বাহিনীতে যোগদান অনেক সময় সামাজিক সচলতার পথকে প্রশস্ত করে। অনেক সময় দেখা যায়, নিম্ন শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরাও সৈন্যবাহিনীতে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ অর্জন করে, অন্যান্য সামাজিক স্তরে যা অধিক বিলম্বে ঘটে। (২) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিও সামাজিক সচলতার পথ সুগম করে। প্রাচীন যুগে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সামাজিক মর্যাদার ধারক হিসেবে কাজ করত। ফলে প্রাচীনকালে নিম্ন শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের উচ্চ শ্রেণীভুক্ত হবার পথে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অবদান কম নয়। (৩) উল্লম্বী সচলতার পিছনে স্কুলগুলির অবদানও কম নয়। যে সমস্ত সমাজে স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে সমঅধিকার স্বীকৃত সেখানে নিম্ন স্তরভুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে উচ্চস্তরে যাবার পথও প্রশস্ত। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যতীত উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হয় না। (৪) রাজনৈতিক দলগুলিও উল্লম্বী সচলতার সহায়ক হয়। সরকারী অফিসে স্বাভাবিক উন্নতির পথ খোলা থাকে। রাজনৈতিক দলগুলিই এরূপ সচলতার পথকে সুগম করে। তবে রাজনীতিবিদ্ এবং রাজনৈতিক নেতৃবর্গের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, তাঁরা অনেকেই দরিদ্র ঘরের সন্তান ছিলেন। তাই নিত্সে (*Nitchels*) বলেন যে—রাজনৈতিক সংগঠন না থাকলে অনেকের পক্ষেই সামাজিক শ্রেণী পরিবর্তন করা সম্ভবপর হত না। (৫) বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিও সচলতার পথকে সুগম করে। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত গুণাবলীর এবং প্রতিভা বিকাশের পথ প্রশস্ত থাকে। যারা এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় প্রদানে সমর্থ হয় তাদের পক্ষে সচলতার পথ সুগম হয়। (৬) অর্থকরী প্রতিষ্ঠানগুলিও সচলতার পথকে সুগম করে। অর্থবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি লোকের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যারা ধনী তারা যে সামাজিক মর্যাদা অর্জন করে, যারা দরিদ্র ঘরের সন্তান তাদের পক্ষে তা সম্ভবপর হয় না।

এখন প্রশ্ন, সামাজিক সচলতা ব্যাহত হয় কেন? বিভিন্ন ধরনের পরিবারের অবস্থিতির জন্য সচলতার ক্ষেত্রেও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যেমন, পরিবার স্বচ্ছল বা অস্বচ্ছল, ধনী বা দরিদ্র, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, উচ্চজাত বা নিম্নজাতের হতে পারে, ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধারও তারতম্য ঘটে। প্রত্যেক পরিবারের শিশুরা শিক্ষার ক্ষেত্রে, ভরণপোষণের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পায় না, ফলে সমান সুযোগের অভাবে সচলতার গতি অনেকাংশে ব্যহত হয়। দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক সচলতার বাধার কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। অর্থের প্রাচুর্যের ফলে জীবনধারার গতিকে উর্ধ্বমুখী করা সম্ভব হয় এবং মর্যাদাও অর্জিত হয়, অপরপক্ষে, অর্থের অভাবের দরুণ জীবনযাত্রার মান অধোমুখী হতে বাধ্য। কাজেই সামাজিক সচলতা কি পরিমাণে বাড়ে বা কমে তা অনেকাংশে অর্থ নৈতিক অবস্থার দ্বারা নির্ণীত হয়।

অধ্যাপক সরোকিণ (*Sorokin*) সামাজিক সচলতার কতকগুলি সম্ভাব্য ফলাফলের কথা উল্লেখ করেছেন।

(১) প্রথমতঃ, তিনি ব্যক্তির আচার ব্যবহার এবং মনের ওপর সচলতার প্রভাবের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, যে সমাজে সচলতার পথ রুদ্ধ সেখানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ওপর তার প্রভাব অপরিসীম। যদি কোন ব্যক্তি সারা জীবনে একই পদে অধিষ্ঠিত থাকে এবং একই অর্থ নৈতিক অবস্থায় জীবনযাপন করে, স্বভাবতঃই তার আচার ব্যবহারে জটিলতা বৃদ্ধি পায় এবং অনেক সময় সে অন্যান্যদের সঙ্গে ব্যবহারে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে অসমর্থ হয়। অন্যদিকে যে সমাজে সামাজিক সচলতার পথ মুক্ত অর্থাৎ যে সমাজ পরিবর্তনশীলতাকে আবাহন করে সেখানে ব্যক্তির স্বভাবেরও পার্থক্য ঘটে। সামাজিক মর্যাদা পরিবর্তনের সুযোগের জন্য অভিজ্ঞতা অর্জন যেমন সহজতর হয় তেমনি দৃষ্টিভঙ্গীরও পার্থক্য ঘটে। নতুন কাজে উৎসাহ বর্ধিত হয় এবং ফলে উৎপাদনও বাড়ে। দ্বিতীয়তঃ, সচলতার সুযোগের জন্য নানাবিধ আবিষ্কারও সম্ভব হয়। যখন কোন ব্যক্তি তার ইচ্ছানুরূপ কাজে যোগদানের সুযোগ পায় তখন তা গঠনমূলক হয়। কোন একটি জিনিস উদ্ভাবনের পিছনে নানাবিধ মানসিক চিন্তার সংমিশ্রণ ঘটে যা একমাত্র গতিশীল সমাজেই সম্ভব। কোন একটি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির মেলামেশা নিত্য নতুন আদর্শের সৃষ্টি করে যা নতুন মূল্য মানের ভিত্তি স্বরূপ। তৃতীয়তঃ, অনেকে বলেন সামাজিক সচালতার ফলে যেমন আবিষ্কার, অভিজ্ঞতা, উদারতা বৃদ্ধি পায়, তেমনি সচলতার কতকগুলি কুফলও দৃষ্টিগোচর হয়। সমাজবিদরা

বলেন যে, সমাজে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে অনেকে নিত্য নতুন কাজের চাপ সহ্য করতে অসমর্থ হয় এবং ফলে তাদের স্নায়ুতন্ত্রের ওপর চাপ পড়ে। তাছাড়া, পরিবর্তিত সমাজে ভারসাম্য রক্ষায় অসামর্থের জন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে নানাবিধ মানসিক রোগের সৃষ্টি হয়।

অনুশীলনী

১। সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে কি বুঝ? (What do you mean by social stratification ?)

২। সামাজিক পৃথকীকরণের সঙ্গে স্তরবিন্যাসের পার্থক্য নির্দেশ কর (Indicate the difference between social differentation and social stratification)

৩। সামাজিক শ্রেণীগুলির প্রকারভেদ কর এবং শ্রেণীগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। (Differentiate the social classes and discuss their characteristics.)

৪। ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথার ভবিষ্যত সম্বন্ধে আলোচনা কর (Discuss the prospect of castcism in India)

৫। সামাজিক স্তরবিন্যাসের কার্যাবলী আলোচনা কর (Discuss the functions of social stratification)

৬। সামাজিক স্তরবিন্যাসের দোষ-ত্রুটিগুলি আলোচনা কর (Discuss the merits and demerits of social stratification)

৭। সামাজিক সচলতা বলতে কি বুঝ? সামাজিক সচলতা বৃদ্ধির কারণগুলি কি কি? (What do you mean by social mobility ? What are the factors which account for the increase of social mobility ?)

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
(Social Control)

১। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সমস্যা (Problem of Social Control):

দার্শনিক এবং সমাজবিদরা একটি প্রশ্নে একই অভিমত পোষণ করেন যে, সুষ্ঠু, সুন্দর সামাজিক কাঠামোর জন্য একতাবদ্ধতার (Solidarity) প্রয়োজন। পারস্পরিক সম্পর্কই যখন সামাজিক জীবনের ভিত্তি তখন কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নে যদি সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে চিন্তা ভাবনার সঙ্গতি না থাকে তাহলে কোন স্থায়ী সুন্দর সামাজিক জীবনের ভিত্তি গঠিত হওয়া সম্ভব নয়।

অনেকেই প্রশ্ন করেন যে, সমাজটা কি স্থায়ী (Static) কোন ধারণা (concept)? তাই যদি হয় তবে যে সামাজিক মূল্যগুলি সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে তার প্রয়োজন কোথায়? এর উত্তরে তাঁরা বলেন, সমাজ নদীর স্রোতের মত প্রবহমান। আমরা প্রবহমান নদীর জলে যখন স্নান করতে গিয়ে ডুব দিই এবং ডুব দিয়ে যখন উঠি তখন আগের ও পরের এই দুই জল কিন্তু এক নয়, সেইরূপ সমাজও নিত্য পরিবর্তনশীল। সমাজের এই গতিশীল (Dynamic) প্রবাহে সামাজিক বিশিষ্ট মূল্যগুলি (Social dominant values) তাই কারও কারও দৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয়।

সমাজবিদেরা কিন্তু মনে করেন সমাজ পরিবর্তনশীল হলেও এমন কতকগুলি স্থায়ী বা স্থিরীকৃত (Static) সামাজিক মূল্য আছে যা সুস্থ সুন্দর সামাজিক জীবনযাপনের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই সমস্ত মূল্যগুলি সমাজ-বহির্ভূত কোন ধারণা নয় বরং সমাজ থেকেই উদ্ভূত, কারণ এই বিশিষ্ট মূল্যগুলি মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেইজন্যই সমাজবিদেরা মনে করেন যে, সমাজ পরিবর্তনশীল হলেও এই বিশিষ্ট সামাজিক মূল্যগুলির জন্যই সমাজের ভারসাম্য (Social equilibrium) রক্ষিত হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশের সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে ধনতান্ত্রিক দেশের সামাজিক কাঠামোর দুস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু, বিশিষ্ট সামাজিক মূল্যগুলি কোন সমাজব্যবস্থাতেই যে অচল একথা বলা চলে না। এই কারণেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। এই মূল্যগুলিকে প্রধানতঃ দুটিভাবে

ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, সমাজে এমন কতকগুলি মূল্য আছে যেগুলিকে ব্যক্তি অগ্রাহ্য করলেও সমাজ মূল্যগুলিকে রক্ষার জন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনা। যেমন, অনেকেই রুচিসম্মত পোশাক পরিধান করেনা। কিন্তু সমাজ এ ব্যাপারে নীরব, তার কারণ সামাজিক মূল্যমান থেকে সাময়িক এই যে বিচ্যুতি তা সামাজিক জীবনকে অচল করে না। কিন্তু এমন কতকগুলি বিশিষ্ট মূল্য (Dominat values) আছে যেগুলি যে-কোন অবস্থাতেই রক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি সমাজস্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট হয় তাহলে এই জাতীয় কার্যের নিয়ন্ত্রণ একান্ত কর্তব্য। তাই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন সর্বদেশে সর্বকালে স্বীকৃত।

এমন কথা বলা যেতে পারে যে, সমাজে অনেক সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না। কাজেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে নানাবিধ সমস্যা জড়িত। একটি কথা ঠিক যে, কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারা সমাজস্থ ব্যক্তিদের সুদীর্ঘকাল দমিত রাখা যায় না এবং তা বাঞ্ছনীয়ও নয়। সমাজস্থ ব্যক্তিরা নিজেরাই নিজেদের মঙ্গলের জন্য যে বিধি-নিয়ম প্রবর্তন করে তা দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক ঐক্য বজায় রাখার ব্যাপারে সহায়ক হয়।

বিভিন্ন সমাজবিদেরা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কথা বলেছেন যা সামাজিক স্থিতাবস্থা রক্ষায় বাধা স্বরূপ। যেমন, কিশোরদের দুষ্ক্রিয়তা (Juvenile Delinquency) কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। অনেক শিশু বা কিশোর এমন কতকগুলি অপরাধ করে যা সমাজ জীবনকে বিঘ্নিত করে। সমাজবিদরা তাই মনে করেন যে, শিশুর সামাজিকীকরণ (socialisation) যদি সুষ্ঠু না হয় তাহলে তার পরিণাম পরিবার তথা সমাজকে ভোগ করতে হয়। একটি বালকের জীবনে তার পরিবার এবং পারিপার্শ্বিকতা যতখানি প্রভাব বিস্তার করে তুলনামূলকভাবে অন্যান্য সামাজিক সংস্থা ততখানি করে না। কিন্তু অনেক পরিবারের সদস্যরা এ সম্পর্কে উদাসীন থাকেন যার ফল হয়ে ওঠে মারাত্মক। সেইজন্য সমাজবিদদের মধ্যে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, অপূর্ণাঙ্গ সামাজিকীকরণ (inadequate socialisation) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাধাস্বরূপ। কেবলমাত্র অপূর্ণাঙ্গ সামাজিকতা নয়, অনেক সমাজে বিকৃত মূল্যমানও বিদ্যমান। একজন প্রখ্যাত সমাজবিদ মন্তব্য করেছেন যে, আমেরিকার সমাজে মর্যাদা নিরূপণের মাপকাঠি হিসেবে কোন ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার উপর যতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সেই অনুপাতে অর্থ উপার্জনের পদ্ধতির

উপর অর্থাৎ ব্যক্তি কিভাবে অর্থ উপার্জন করছে, সমাজ অনুমোদিত পথে করছে, কি করছে না তার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সেই কারণে সমাজস্বীকৃত পদ্ধতিতে অর্থোপার্জনের প্রশ্ন অনেকেরই কাছে নিরর্থক হয়ে পড়ে। তা ছাড়াও অনেক সময় দ্বন্দ্বমূলক মূল্যমান (conflicting values) সমাজে প্রচলিত থাকে যা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। কোন্‌টি সঠিক এবং কোন্‌টি সঠিক নয় তা অনেক সময় নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না যা ব্যক্তিকে উদ্বেগগ্রস্থ করে তোলে। সামাজিক গতিকে অব্যাহত রাখার জন্য সঠিক পথের নির্দেশ যদি ব্যক্তি না পায় তাহলে তা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। সমাজ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শিশুদের দুষ্ক্রিয়তার জন্য সমাজই অনেকাংশে দায়ী। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজের যা কর্তব্য বা দায়িত্ব তা যথাযথ পালন না করার জন্যই সমাজে কিশোর কিশোরীরা দুষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

গিলন এবং গিলন (*Gillian and Gillian*) আরও কয়েকটি সমস্যার কথা বলেছেন যা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে বাধা স্বরূপ। যেমন, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে জৈবিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য বিদ্যমান। দ্বিতীয়তঃ, তাদের আচার আচরণ এবং সামাজিক আচারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দুস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। এ ছাড়াও তাঁরা মন্তব্য করেন—অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পথে বাধাস্বরূপ। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা এবং তাদের জীবনের পটভূমিও (background) ভিন্নরূপ, ফলে—সামাজিক স্থিতাবস্থা রক্ষা করা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তা ছাড়া পরিবর্তনশীল সমাজে অনেকে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে অপারাগ হয়ে পড়ে, যার ফলে সমাজ সুসংগঠিত হতে পারে না। ফলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পথও সুগম হয় না।

২। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা (Definition of Social Control) :

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে আমরা কি বুঝি ? সাধারণ অর্থে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে ব্যক্তির আচার-আচরণের ওপর সমাজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বোঝায়। আমরা অনেক সময় অবাস্তব স্বর্গীয় রাজ্যের কল্পনা করি যেখানে কোন কলুষতা নেই, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মতপার্থক্য নেই অথবা সামাজিক মূল্যায়ণের দিক থেকে সকলেই আদর্শস্থানীয় ব্যক্তি। কিন্তু বাস্তবে

এমন রাজ্যের কোন অস্তিত্ব দেখা যায় না। কিছু কিছু ব্যক্তির মানসিক প্রবণতা যে সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের সহায়ক, একথা অস্বীকার করা যায় না। কারণ, তা যদি না হোত তাহলে নিরাপত্তাবিহীন অবস্থা থেকে সমাজকে রক্ষা করা সম্ভব হোত না এবং সমাজের স্থায়িত্বও ক্ষীণ হয়ে পড়ত। সামাজিক চুক্তি মতবাদে (Social Contract theory) হবস্ (*Hobbes*) প্রাকৃতিক অবস্থায় জঘন্য, দরিদ্র, পাশবিক এবং ক্ষণস্থায়ী জীবনের উল্লেখ করেছেন এবং তা নিরসনের জন্য চুক্তি বা শৃঙ্খলার প্রশ্নের যে গুরুত্ব তার অবতারণা করেছেন। কাজেই নিঃসন্দেহে একথা সর্বদেশে, সর্বকালে স্বীকৃত যে, সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে এমন প্রবণতাও রয়েছে যা সামাজিক সংহতি রক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর।

ব্যক্তির যে সমস্ত গুণাবলী সামাজিক স্বার্থে মঙ্গলজনক তা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন ওঠে না, প্রশ্ন ওঠে নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তির সেই সব অবাঞ্ছনীয় অসামাজিক এবং সমাজবিরোধী প্রবণতার যা সমাজের ভারসাম্য রক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর। কাজেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হল, ব্যক্তির ক্ষতিকারক এবং অবাঞ্ছনীয় প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করা। তবে একটা কথা এ প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে—সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাজ কি কেবলমাত্র নেতিবাচক (Negative) অর্থাৎ যা কেবলমাত্র অবাঞ্ছনীয় বা ক্ষতিকর, সমাজের দিক থেকে তারই কি একমাত্র নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন ? সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ইতিবাচক (Positive) কার্যাবলী যদি না থাকত তাহলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণেরও বিশেষ কোন মূল্য থাকত না। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এমন কতকগুলি সামাজিক অবস্থার (Condition) সৃষ্টি করে যেগুলি ব্যক্তির সামাজিকীকরণের পথকে প্রশস্ত করে এবং ব্যক্তির সমাজবিরোধী কার্যের প্রবণতার পথে বাধার সৃষ্টি করে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কতকগুলি পদ্ধতি, প্রক্রিয়া এবং রীতিনীতির মাধ্যমে সমষ্টিগত সামাজিক কল্যাণলাভের পথকে সুগম করে।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায়। গিলন এবং গিলন(*Gillian and Gillian*) বলেন যে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে এমন কতকগুলি সামাজিক চাপ (Social pressure) সৃষ্টি করা বোঝায় যা ব্যক্তির কার্যের এবং মনোভাবের (attitude) সামঞ্জস্য বিধানের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কতকগুলি পদ্ধতি, প্রস্তাবনা, অনুসরণ নীতি ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজস্থ ব্যক্তিদের সমাজ-স্বীকৃত আচরণ পদ্ধতিতে (Pattern of beheviour) সামঞ্জস্য রক্ষা করে। ব্রিয়ারলির (*Brearly*) মতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হল স্বতঃস্ফূর্তভাবে অথবা কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট

কতকগুলি পদ্ধতি ও সংস্থা (agencies) যার মাধ্যমে ব্যক্তি শিক্ষিত হয় এবং যেগুলি অনুকরণে সে ব্রতী হয় অথবা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের ভিত্তি যে সামাজিক মূল্যমানগুলি (values), সেগুলি রক্ষা করার জন্য ব্যক্তিকে বাধ্যও করা হয়। গুরভিচ এবং মুর (*Gurvitch and Moor*) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে সামগ্রিকভাবে সাংস্কৃতিক জীবনধারণের আচার-আচরণ, সামাজিক প্রতীক, আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা, মূল্যমান, আদর্শ অথবা কতকগুলি পদ্ধতি বোঝায় যা ব্যক্তির জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং যার মাধ্যমে ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী উত্তেজনা অথবা দ্বন্দ্ব পরিহার করতে শেখে।

বিভিন্ন সমাজবিদ্‌দের উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা যেতে পারে। সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, সেগুলি কার্যকরী হয় তাড়াতাড়ি এবং তাদের স্থায়িত্বও হয় অনেক বেশী। পক্ষান্তরে যে সমস্ত পদ্ধতি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রযুক্ত হয় যেগুলি সামাজিক স্বার্থে মূল্যবান ঠিকই কিন্তু সেগুলির মূল্য ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত গৌণ।

৩। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রকারভেদ এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা (Types and Agencies of Social Control) :

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রকারভেদ (Types of Social Control) : বিভিন্ন সমাজবিদ বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের যে শ্রেণী বিভাগ করেছেন তার আলোচনার প্রয়োজন আছে। কার্ল মেনহেম (*Karl Mannheim*) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের দুটি বিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হল প্রত্যক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Direct Social Control) এবং অপরটি পরোক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Indirect Social Control)। প্রত্যক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে তিনি সেই সমস্ত গোষ্ঠীর সমালোচনা, প্রশংসা ও প্রস্তাবের কথা বলেছেন যা পারস্পরিক নৈকট্যের জন্য ব্যক্তির জীবনধারা নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষভাবে কার্যকরী হয়। যেমন—পরিবার, প্রতিবেশী, খেলার সঙ্গী এবং অন্যান্য প্রাথমিক গোষ্ঠীর কথা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তি তার পিতা-মাতা, সহকর্মী এবং প্রতিবেশীদের আদর্শ ও মতবাদ দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়। পক্ষান্তরে অপ্রত্যক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে নিয়ন্ত্রণের সেই সমস্ত পদ্ধতিই বোঝায় যার

প্রভাব ব্যক্তির জীবনে প্রত্যক্ষভাবে কার্যকরী নয়। এ প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠান, যুক্তিবাদী আচার, আচরণ, আইন ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়, কারণ জটিল সমাজে এগুলি অপ্রত্যক্ষভাবে সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। অপ্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্যই হল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয়, কোন প্রতিষ্ঠানিক মূল্য বা আদর্শই এর ভিত্তি। কিমবল ইয়ং (*Kimball Young*) ব্যবহারিক দিক থেকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে দুইটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। একটি ইতিবাচক (Positive) এবং অপরটি নেতিবাচক (Negative)। ইতিবাচক নিয়ন্ত্রণ বলতে বুঝি, এমন কতকগুলি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম যেগুলি ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে। তার কারণ, ব্যক্তি সেগুলিকে সামাজিক মূল্যবোধের দিক থেকে সঠিক মনে করে। সমাজের এক বৃহৎ অংশই সমাজের দ্বারা প্রশংসিত হবে, এই ইচ্ছা মনে পোষণ করে। ফলে তারা এমন কোন কাজে লিপ্ত হতে চায় না যা সকলের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। সে সমাজে প্রতিষ্ঠিত চিরা-চরিত আচার, লোকনীতি এবং আদর্শগুলি গ্রহণ করতে সচেষ্ট হয় এবং সমাজের কাছ থেকে শ্রদ্ধা, খ্যাতি এবং স্বীকৃতি লাভ করতে চায়। নেতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন প্রত্যেকে ইতিবাচক দিকগুলি গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয়। সমাজ যে কেবলমাত্র কতকগুলি আদর্শ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে তাই নয়, এমন কতকগুলি অসামাজিক কার্য আছে যেগুলি সম্পাদনে ব্যক্তিকে বাধাদানেরও চেষ্টা করে। এই বাধাদানের জন্য মৌখিক (Verbal) এবং শারীরিক (Physical) দু' প্রকার পন্থাই অবলম্বন করা হয়। মৌখিক দিক হল তিরস্কার, লাঞ্ছনা, নিন্দা, ধিক্কার প্রভৃতি আর শারীরিক দিক হল অসামাজিক কার্য থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য বলপ্রয়োগ। এই শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও অনেকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে বিধিবদ্ধ (Formal) এবং অ-বিধিবদ্ধ (Informal)—এই দু' ভাগে ভাগ করেছেন। বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় যা নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তই কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট, যেমন—সরকার, আইন, পুলিস, সৈন্যবাহিনী ইত্যাদি। অপরদিকে অ-বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় সেই সমস্ত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি যেগুলি সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত যেমন, আচার কিন্তু যেগুলি কৃত্রিকভাবে সৃষ্ট নয় তা হল রীতিনীতি, লোকনীতি, লোকাচার ইত্যাদি। এগুলি সমাজস্থ ব্যক্তিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গ্রহণ করে। অনেক সমাজবিদ্ আবার পিতৃতান্ত্রিক (Paternal) এবং গণতান্ত্রিক (Democratic) নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। পরিবারে

পিতার নিয়ন্ত্রণ, কারখানায় মালিকের নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রধানের নিয়ন্ত্রণ এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে পুরোহিতের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু বর্তমানে এই অগণতান্ত্রিক-পদ্ধতির পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহের ওপরই অধিক গুরুত্ব অরোপ করা হয়।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংস্থাগুলি (Agencies of Social Control) : সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কি কি পদ্ধতির মাধ্যমে সম্ভবপর হয় তা' জানতে হলে প্রথমেই আমাদের মনে রাখা দরকার যে, প্রত্যেক সমাজের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি একরূপ নয়। তবে একথা বলাও ঠিক নয় যে, একটি সমাজে যে পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা হয় অপর সমাজের ক্ষেত্রে সেগুলি মূল্যহীন। আসল বক্তব্য হল, সব সমাজে পদ্ধতিগুলির গুরুত্ব সমান নয়। যেমন, গতিশীল (Dynamic) সমাজের নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি গতিহীন (Static) সমাজের পদ্ধতির অনুরূপ নয়। গতানুগতিক সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অ-বিধিবদ্ধ (Informal) পদ্ধতি যেমন—আচার, লোকাচার, লোকনীতি ও ধর্মের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অংশ-গ্রহণকারী মুক্ত সমাজ ক্ষেত্র (Participating open society) জনমত, আইন, শিক্ষা ও প্রচারের (Propaganda) ওপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। অংশগ্রহণকারী সমাজের বৈশিষ্ট্যই হল, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনমতকে মূল্য দেওয়া হয়। ফলে অংশগ্রহণকারী সমাজে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কাঠামোগত (Structual) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। গতানুগতিক গ্রাম্য সমাজের নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে এই পদ্ধতির পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করাই বাঞ্ছনীয়। আচার, লোকাচার, লোকনীতি এবং ধর্ম প্রথম পর্যায়ভুক্ত এবং জনমত, আইন, শিক্ষা এবং প্রচারকে আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত করতে পারি।

(ক) **আচার (Custom) :** সামাজিক জীবনে আচারের গুরুত্ব এত প্রবল যে—কেউ কেউ আচারকে পরপীড়ক (Tyrant), কেউ 'উগ্র স্কুল শিক্ষিকা' (Violent school mistress), কেউ বা শাসক (Magistrate)-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। আচার বলতে সাধারণতঃ দীর্ঘদিনের অভ্যাসগত সামাজিক ব্যবহারের রীতিনীতি বোঝায়। বিভিন্ন সমাজে আচার বিভিন্নভাবে উদ্ভূত হয়। হিন্দু সমাজে যে আচার আমরা অনুসরণ করি অন্যত্র ঠিক একই রকম আচার অনুসরণ করা হয় না। এর থেকেই বোঝা যায় আচারগুলি সামাজিক জীবনে

এমনভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে সামাজিক প্রয়োজনেই তারা উদ্ভূত। পুরুষানুক্রমে যে সমাজে যে আচার প্রচলিত পরবর্তী বংশধররাও তা বহন করে নিয়ে যায়। সেই জন্যই আচারগুলি সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা যে সমাজে বসবাস করি সে সমাজের আচারই অনুসরণ করি। তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গিনসবার্গ (*Ginsberg*) বলেন যে, সহজাত (instinctive) প্রবৃত্তির মতনই আমাদের জীবনে আচারের প্রভাব আমরা অবচেতনভাবেই অনুসরণ করি। তাহলে বোঝা যায় যে, বলিষ্ঠ সামাজিক জীবনযাপনে আচারগুলি সহায়তা করে, তা না হলে দীর্ঘকালের জন্য তারা প্রচলিত থাকতে পারত না।

অভ্যাস কাকে বলে?ঃ অনেকে ভুলক্রমে আচার এবং অভ্যাসকে (Habit) অভিন্ন মনে করেন। অভ্যাস ও আচার অভিন্ন নয়। অভ্যাস হল কম বেশী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্জিত আচরণ পদ্ধতি যা সামান্যতম সজ্ঞান প্রচেষ্টার মাধ্যমে কতকগুলি ক্রিয়া সম্পাদনকে সম্ভব করে তোলে এবং ব্যক্তির পক্ষে সেই কাজগুলি সম্পাদন করা বিশেষ সুবিধাজনক ও সন্তোষজনক মনে হয়। যেমন, সকালে উঠে দাড়ি কামান, বা শুতে যাবার আগে এক কাপ কফি খাওয়া। কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে একটা অনুষ্ঠানে যাবার আগে যখন দাড়ি কামাতে ইচ্ছা করছে না, তখন বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তিরা নোংরা দেখাচ্ছে বা অভদ্রজনোচিত হবে মনে করে যখন তাকে দাড়ি কামাতে বাধ্য করে তখন তা হয়ে ওঠে আচার। কারণ এক্ষেত্রে অভ্যাস একটা সামাজিক অর্থ অর্জন করেছে এবং এর সঙ্গে একটা মূল্য বিচারের প্রশ্ন জড়িত হয়ে পড়েছে, আর এই মূল্য বিচারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটা নিয়ন্ত্রণের (Sanction) ব্যাপার। কাজেই আচার নিছক কোন প্রচলিত অভ্যাস নয়, একটা নিয়ম, একটা কার্য পদ্ধতি। প্রথমতঃ, অভ্যাস হল ব্যক্তিগত ব্যাপার (individual phenomena)। কিন্তু আচারের গুরুত্ব হল, যেখানে সামাজিক সম্পর্কের প্রশ্ন জড়িত সেখানেই আচারের প্রভাব। সমাজবর্জিত কোন ব্যক্তির কাছে আচার মূল্যহীন। দ্বিতীয়তঃ, চিরাচরিত আচার ভংগকারীকে নানাবিধ সামাজিক চাপ (social pressure) সহ্য করতে হয়, অভ্যাসের ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন ওঠে না, যদি না তা সামাজিক জীবনের প্রতিকূল হয়। তবে তাই বলে অভ্যাসের সঙ্গে আচারের যে একেবারেই সাদৃশ্য নেই তা বলা চলে না। অভ্যাস যেমন আচারের সৃষ্টি করে, আচারও সেরূপ অভ্যাসের সৃষ্টি করে। দীর্ঘকালের অভ্যাস যা গোষ্ঠী

জীবনে সাধারণ হয়ে পড়ে, ক্রমে তাই আচারে পরিণতি লাভ করে। সেইরূপ নিত্য নতুন অভ্যাসের দ্বারাও আবার আচার পরিবর্তিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আচারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। **প্রথমতঃ**, আচারের ধর্মই হল এর সামাজিকতা। **দ্বিতীয়তঃ**, সামাজিক জীবনের মূল্যমানের প্রশ্নও আচারের সঙ্গে জড়িত। আচার যদি সামাজিক জীবনে ক্ষতিকর হোত তাহলে দীর্ঘদিন তা প্রচলিত থাকতে পারত না। আমাদের সুন্দর জীবন যাপনে আচারের সামাজিক মূল্য অপরিসীম।

আইনের সাথে আচারের পার্থক্য বিদ্যমান। **প্রথমতঃ**, আচার স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত এবং সেইজন্য অবচেতনভাবেই আমরা তা মেনে চলি। কিন্তু আইন সুচিন্তিতভাবে সৃষ্ট এবং আমরা আইন সম্পর্কে সবসময়ই সচেতন থাকি। **দ্বিতীয়তঃ**, আচার ভংগকারীকে নানাবিধ সামাজিক চাপ সহ্য করতে হয়। আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী না হলেও তাকে এই চাপ সহ্য করতে হয়। কিন্তু আইন ভংগকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। **তৃতীয়তঃ**, আইন প্রয়োগের জন্য নানাবিধ সংস্থা (agency) প্রয়োজন। যেমন, পুলিস, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী অথবা বিচারালয়। কিন্তু আচার কেউ মেনে চলছে কিনা দেখার জন্য সেরূপ কোন নির্দিষ্ট সংস্থা নেই। সমাজের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই আচারকে সজীবতা দান করে। **চতুর্থতঃ**, বিশেষ কোন জটিল অবস্থার সৃষ্টি হলে আইনও পরিবর্তিত হয়। আচারের কিন্তু সহজে পরিবর্তন হয় না। তবে আইনের সঙ্গে আচারের সাদৃশ্য এখানে যে, জনস্বার্থে গঠিত চিরাচরিত আচারই আইনের রূপ ধারণ করে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম মাধ্যমরূপে আচারের যে একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তা কোনমতেই অস্বীকার করা চলেনা। যদি, গোষ্ঠীর কল্যাণের উপযোগী সমস্ত কার্য, সকল ব্যক্তি না হলেও, অধিকাংশ ব্যক্তি সম্পাদন করে, তাহলে আচার পালনের মধ্য দিয়ে সমষ্টিগত কল্যাণ সাধিত হচ্ছে এবং তার ফলে সামাজিক জীবনের স্বচ্ছন্দ গতি অক্ষুণ্ণ থাকছে এমন একটা চিন্তাধারা আচারের সঙ্গে জড়িত। সেই জন্যই সকলেই কিছুটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আচার মেনে চলে। আচারের সঙ্গে সমষ্টিগত কল্যাণ জড়িত—এই ধারণাই আচারের ক্ষেত্রে একটা আবেগগত মূল্য আরোপ করে। এই মূল্য সম্পর্কে সচেতনতা জাগে যখন আচার ভঙ্গ করা হয়। আচার লঙ্ঘন করা গোষ্ঠীর পক্ষে অপমানজনক কাজ এবং তা অপরাধ বলে গণ্য

করা হয়। কেননা গোষ্ঠীর জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী, গোষ্ঠীর আশা, প্রত্যাশা, আদর্শ, আচারের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়, বিশেষ করে আচার পালন যখন এক পবিত্র কর্ম ও ধর্মীয় ব্যাপার বলে গণ্য হয়। এসব ক্ষেত্রে আচার লঙ্ঘন শুধু যে অপরাধজনক কাজ তা নয়, এ যেন কোন কিছুকে অপবিত্র করার মত কাজ, এমন কাজ যা দেবতাদেরও রুষ্ট করে তোলে এবং মানুষকে প্রতিশোধ নেবার জন্য উত্তেজিত করে। ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ আচারের সঙ্গে যুক্ত থাকুক বা নাই থাকুক, মানুষের ওপর আচারের এই প্রভাব লক্ষ্য করেই আচারকে 'রাজা' বা 'অত্যাচারী' রূপে বর্ণনা করা হয়।

সামাজিক জীবনে রয়েছে দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার। ব্যক্তি যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আচার মেনে চলে তখন সমাজ জীবনে কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। কিন্তু যখন কোন আচার মানা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না, বা সে মনে করে যে বৃহত্তর কোন কল্যাণের কথা চিন্তা করে আচার না মানাই যুক্তিযুক্ত, তখন সমাজ তার ওপরে চাপ সৃষ্টি করে যা তার কাছে বেদনাদায়ক মনে হয়। আধুনিক কোন ভারতীয়, যে, জাতিগত বাধানিষেধে অবিশ্বাসী, সামাজিক বা পারিবারিক চাপের ফলে বাধানিষেধ মানতে বাধ্য হয়। অভ্যাসের ক্ষেত্রে এই চাপ সৃষ্টির প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সমাজ তো শুধুমাত্র অভ্যাসের দ্বারা শাসিত হতে পারে না। মানুষ যদি সামাজিক না হত তাহলে আচার পালন তার পক্ষে তেমন অত্যাবশ্যক ক্রিয়া বলে বিবেচিত হত না। কিন্তু যেহেতু সে সামাজিক, সমাজস্থ অপর ব্যক্তির সাহায্য ও সহযোগিতার প্রত্যাশী, আচারের সুবিধা ও অসুবিধা দুটোই তাকে স্বীকার করে নিতে হবে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে আচারের গুরুত্ব যেমন অনেকে স্বীকার করেছেন, তেমনি অনেকে অস্বীকার করেন। ম্যাকডুগাল (*McDougall*) বলেন, অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রামে সেইসব সমাজই টিঁকে থাকতে পেরেছে যারা আচারের বেড়াজাল সৃষ্টি করে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে, সমাজ অনুমোদিত আচরণের মান বা আদর্শ অনুযায়ী মানুষকে কাজ করতে এবং তার আত্মকেন্দ্রিক প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করতে বাধ্য করেছে এবং যে সব মানুষ তা করতে বিফল হয়েছে তাদের ধ্বংস করতে সমর্থ হয়েছে। আবার রুশো (***Rousseau***)-র দৃষ্টিতে আচার হল নিছক বশ্যতা, উদ্বেগ এবং দমনের ব্যাপার।

আচার হল আমাদের সামাজিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ব্যক্তি যেভাবে ঘটনার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া করে, ব্যক্তির পেশা, খেলাধূলো, আমোদ-প্রমোদ,

পূজা, উপাসনা প্রভৃতি অভ্যাসের এবং আচারের মাধ্যমেই তার কাছে উপস্থাপিত হয়।

গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন যে, সংস্কৃতির বিকাশসাধনের বিষয়টি মানুষের মধ্যে সহজাত, কিন্তু এর বাস্তব সম্পাদন এবং বৈচিত্র্য নিয়ে সে জন্মায় না। আচার ও ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে তা বংশ পরম্পরায় অর্জিত ও সঞ্চালিত হয়। আধুনিক সমাজে আচারের সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা যতখানি, প্রাচীন সমাজে যে এই ক্ষমতা অনেক বেশী ছিল তা অস্বীকার করা চলে না। প্রাচীন সমাজে ব্যক্তি যে সব সময় আচারের অনুশাসন দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিত তা নয়, তবে তার সামাজিক জীবনের অধিকাংশই আচারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।

প্রাচীন সমাজে আচার ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের নিয়ামক; এমন কি যখন দুপক্ষ যুদ্ধরত, তখনও তাদের আচরণ কিরূপ হবে আচার তা নিয়ন্ত্রণ করত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোন একটি সম্প্রদায় যখন যুদ্ধের ব্যাপারে ধ্বংসে মত্ত তখনও সে শত্রুপক্ষের পানীয় জলাশয় ধ্বংস করত না।

প্রাচীন সমাজে আচারকে অনেক সময় পবিত্র মনে করা হত। আচার মেনে চলা, ঈশ্বরের বা কোন অলৌকিক শক্তির নির্দেশ, এমনও ধারণা করা হত। সে যাই হোক না কেন, প্রাক্-অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সমাজে আচার মেনে চলা সমাজ জীবনের একটা অঙ্গ ছিল। কেউ আচার সম্পর্কে প্রশ্ন তুললে তাকে বলা হত, "পূর্বপুরুষেরা যখন এটা মেনে এসেছে, তখন কোন যুক্তি নেই কেন আমরা এটা মানব না"।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংস্থা (agency) হিসেবে আচারের মূল্য অনুমেয়। আচার সুসংগঠিত সামাজিক জীবনের ভিত্তি তৈরি করে। শৈশবাবস্থা থেকে ব্যক্তি কোনরূপ বাধাদানের চেষ্টা না করেই আচার মেনে নেয়। সামাজিক জীবনে আচারের প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে একজন সমাজবিদ্ মন্তব্য করেছেন যে, অনেক সময় ক্ষতিকর আচারও সমাজে প্রচলিত থাকে। কারণ, বেশীরভাগ ব্যক্তি তা ক্ষতিকর মনে করে না, যারা তাকে ক্ষতিকর মনে করে সামাজিক চাপের ভয়েও তারা তার বিরোধিতা করতে সাহস পায় না।

(খ) **লোকাচার (Folkways) :** আচার বা অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আর একটি বিষয় যা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, তা হল লোকাচার। কোন একটি সম্প্রদায় ভৌগোলিক দিক থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী

হলেও জীবন ধারণের পদ্ধতির ব্যাপারে তারা কতকগুলি ব্যাপারে বোঝা-বুঝির মধ্যে আসে যা তাদের সহযোগিতায় সাহায্য করে। কতকগুলি কার্যপদ্ধতি সমাজ অনুসরণ করে যা খাদ্যের উৎপাদন, প্রস্তুত এবং ভোগের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। তা ছাড়া চালচলনের বেশভূষার পদ্ধতিতেও তা প্রতিফলিত হয়। এই পদ্ধতিগুলির অনুসরণই সমাজে লোকাচার বলে প্রচলিত। এই লোকাচারগুলি কার্যকরী হওয়ার উপরেই জীবনের তথা সমাজের স্থিতাবস্থা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এগুলি প্রায় প্রত্যেক সমাজেই মান্য করা হয় এবং এগুলি এক হিসেবে বিশ্বজনীন হয়ে ওঠার দাবী করে।

সামনার (*Sumner*) মনে করেন মানুষ তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি, দক্ষতা এবং স্বভাব লাভ করেছে যেগুলি তার যৌনজীবন, খাদ্য যোগান প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানে সহায়তা করে। এই সমস্যাগুলি যেমন মানুষের সঙ্গে মানুষের মত পার্থক্য ঘটায় তেমনি মতের ঐক্যও সাধন করে। ফলে মত বিনিময় বা মতের সাদৃশ্য থেকেই লোকাচার উৎপন্ন হয়। সমাজে একত্র বসবাস করার সময় বিভিন্ন অবস্থায় এগুলি গড়ে ওঠে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আচরণ পদ্ধতিগুলি প্রায় সকলের দ্বারাই অনুসৃত হয়। যেমন, হাত জোড় করে নমস্কার করা, বিবাহিত মেয়েদের মাথায় ঘোমটা দেওয়া ভারতীয়দের উল্লেখযোগ্য লোকাচার। সামনার-এর মতে লোকাচারগুলি হল সমাজের কতকগুলি অভ্যাস এবং আচার যা পরবর্তী বংশধরদের জীবনযাপনের রীতির নিয়ামক হিসেবে কার্য করে। পূর্বপুরুষ যে লোকাচার মান্য করে পরবর্তী বংশধরেরা তা সহজেই অনুসরণ করে।

লোকাচারগুলি কোন সচেতন পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলশ্রুতি নয় অথবা কোন যুক্তিবাদী চিন্তাধারা এগুলির উদ্ভবে সাহায্য করে না। বরং বলা যায় কোন একটি গোষ্ঠীর আচরণে, প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের পদ্ধতির ফলেই এগুলি স্থায়িত্ব লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রাচীনকালের লোকেদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াই লোকাচারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেদের মাথায় টুপী পরিধান করা, জুতা ব্যবহার করা, বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করা লোকাচারের অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবতঃ তুষার এবং রৌদ্র থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই মাথায় টুপী পরিধানের রীতি প্রচলিত হয় এবং কোন কোন জায়গায় শত্রুপক্ষ থেকে নিরাপত্তার জন্যও টুপী ব্যবহৃত হোত। অনাদিকাল ধরে এগুলি প্রচলিত হওয়ার ফলে লোকাচারগুলি ক্রমশঃ সমাজজীবনের সঙ্গে এমনভাবে ওতপ্রোত-

ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে যে এগুলি ছাড়া সুস্থ সুন্দর সমাজজীবনের কথা এক রকম ভাবাই যায় না।

লোকাচারের মধ্যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের যে বিষয়টি রয়েছে তা স্বাভাবিক এবং নিঃসর্তভাবেই কার্য করে। কোন ব্যক্তি একথা মনে করে না যে, সমাজ কর্তৃক অত্যাচারিত হবার ভয়ে সে লোকাচারগুলি অনুসরণ করে। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সে সমাজ স্বীকৃত কাজগুলি করে এবং সামাজিক নিয়মকানুন মান্য করে। তা ছাড়া লোকাচারে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন বর্হিভূত। এগুলি মান্য করার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ বাইরে থেকে চাপ সৃষ্টি করে না। যে লোক এই লোকাচারগুলি অমান্য করে, বড় জোড় তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপের সম্মুখীন হতে হয়। এর কারণ হল, সমাজে যৌথ প্রয়োজনের পক্ষে লোকাচারগুলি উল্লেখযোগ্য কিছু প্রভাব বিস্তার করে না। কাজেই যে ব্যক্তি লোকাচার মান্য করে না তাকে সামাজিক শান্তির বিঘ্নকারী বলে মনে করা হয় না এবং তাকে সমাজচ্যুত করাও হয় না।

তবে একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, লোকাচারগুলির সমাজজীবনে বিশেষ কোন প্রভাব নেই। যদিও লোকাচার অমান্যকারী আইনের চোখে দণ্ডনীয় হয় না, তবুও সামাজিক শক্তির কাছে নতি স্বীকার তাকে করতেই হয়। এগুলির যদি প্রয়োজন না থাকত তাহলে এগুলি সমাজে এতদিন প্রচলিত থাকত না এবং কিছুদিন পরই অবলুপ্ত হয়ে যেত। কালক্রমে সমাজস্থ ব্যক্তিরা উপলব্ধি করে যে লোকাচারগুলির সামাজিক মূল্য এবং উপযোগিতা বিদ্যমান। নীতির দিকে লক্ষ্য রেখেই অনেকে মনে করে যে, এগুলি সমাজে মান্য হওয়া খুবই প্রয়োজন। কাজেই সমাজজীবনে এগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নীতিগত মূল্যমানের দিক থেকে এগুলি স্বীকৃতি লাভ করে। যদি কেউ এগুলি অমান্য করে সে সমাজের চোখে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে পরিগণিত হয় এবং অবজ্ঞার পাত্র হয়ে দাঁড়ায় যা তার পক্ষে নিতান্তই বেদনাদায়ক। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি কোন ভদ্রমহিলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে বাক্যলাপ শুরু করেন তাহলে সামাজিক লাঞ্ছনা এবং ধিক্কারের চাপ তাকে সহ্য করতে হয়।

অবিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণই লোকাচারের পিছনে কাজ করে। ব্যঙ্গ, ঠাট্টা, বিদ্রুপ, রটনা এ সবই লোকাচার মেনে চলার ব্যাপারে নিয়ামকের কাজ করে, যদিও কে লোকাচার মেনে চলছে, কে চলছে না, এ নিয়ে বিশেষ কেউ মাথা ঘামায় না। তবে একথাও ঠিক যে লোকাচার একেবারে মেনে না চলাও সম্ভব নয়। কারণ, তাহলে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক বলতে কিছু থাকে না।

সামাজিক জীবনে যখন লোকাচারগুলি বিচারমূলক মননের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে তখন কোন কোন লোকাচার সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করে এবং নৈতিক তাৎপর্য যুক্ত হয়।

সমাজে ঐক্যবদ্ধ এবং সহজ সরল জীবনযাপনের জন্য এগুলি খুবই সহায়ক। কোন্ অবস্থায় কোন ব্যক্তি কিরূপ আচরণ করবে তা যদি পূর্ব থেকে জানা থাকে তাহলে তার পক্ষে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে সংগতিবিধান করে চলা সম্ভব হয়। ফলে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কও সহজ ও সরল হয়। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি ব্যক্তিদের আচরণের একরূপতার ফলে বিরোধ মুক্ত হয়, আর লোকাচার সমাজের স্বচ্ছন্দ গতিতে সহায়তা করে, যার ফলে সামাজিক নিরাপত্তা-বোধও সুদৃঢ় হয়।

সহজ সরল গ্রাম্য জীবনে যেখানে প্রাথমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান সেখানে লোকাচারগুলির ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। লোকাচারগুলি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু শহরাঞ্চলে, যেখানে ব্যক্তিদের সম্পর্ক নৈর্ব্যক্তিক এবং চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেখানে লোকাচারের মত অবিধিবদ্ধ আচারের সামাজিক নিয়ামকরূপে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই।

(গ) লোকনীতি (Mores)ঃ সমাজজীবনের একটা বিশেষ স্তরে মানুষ চিন্তা করে দেখেনি যে, লোকাচার সমষ্টিগত কল্যাণের পক্ষে উপযোগী কি উপযোগী নয়। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের সঞ্চার হল, তখন মানুষ ব্যক্তিস্বার্থ অপেক্ষা সমষ্টিগত কল্যাণের কথা চিন্তা করতে শিখল। এই সমষ্টিগত কল্যাণের চিন্তাধারাই তাকে সামাজিক আচরণের ভালত্ব এবং মন্দত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে শেখায় এবং তখন সে অনুভব করে যে, বিধিনিষেধের দ্বারা ব্যক্তিগত আচরণের নিয়ন্ত্রণ সমাজের সাধারণ কল্যাণ রক্ষার জন্য অবশ্য পালনীয়। তখন কিছু কিছু লোকাচার লোকনীতিতে রূপান্তরিত হল। কাজেই যখন লোকাচারকে কেবলমাত্র আচরণের নির্দিষ্ট রীতি রূপে গণ্য না করে আচরণের নিয়ামকরূপে গণ্য করা হয়, তখনই সেগুলি লোকনীতিরূপে গণ্য হয়। অবশ্যপালনীয় লোকাচার-গুলিই লোকনীতি বলে অভিহিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই অনুমেয় যে, লোকনীতি সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কার্য করে। গোষ্ঠী

আচরণের মানদণ্ড, গোষ্ঠীর ভালমন্দ, উচিত অনুচিতের প্রশ্ন, গোষ্ঠীর কল্যাণের পক্ষে কোন্ ধরনের আচরণ উপযোগী কি অনুপযোগী—তা সবই লোকনীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাই সামনার (*Sumner*) বলেন যে, যখন লোকাচারের সঙ্গে গোষ্ঠীগত কল্যাণের চেতনা, উচিত অনুচিতের ধারণা যুক্ত হয় তখনই তা লোকনীতি আখ্যা লাভ করে। অর্থাৎ আসল কথা হল, ভাল মন্দের মূল্য সম্পর্কীয় বিচার (value judgment) যখন লোকাচারের সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই লোকাচার নীতিগত তাৎপর্য লাভ করে।

সামাজিক নিয়ামক হিসেবে লোকনীতির ভূমিকা জানতে হলে এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, লোকনীতির সঙ্গে উচিত-অনুচিত বা ভাল-মন্দের প্রশ্ন যদি জড়িত না থাকত তাহলে এগুলির সামাজিক মূল্যও বিশেষ থাকত না এবং এগুলি পালনের জন্যও সমাজ চাপ সৃষ্টি করত না। লোকাচারের সঙ্গে এ জাতীয় প্রশ্ন তেমন জড়িত নেই। কাজেই দেখা যায়, যদি কোন ব্যক্তি লোকাচার না মানেন তাহলে বিশেষ কিছু সামাজিক চাপ তাকে সহ্য করতে হয় না। কেউ লোকাচার মানছে বা মানছে না সে ব্যাপারে সমাজও কিছুটা উদাসীন থাকে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি লোকনীতিগুলি উপেক্ষা করে তাহলে কেবলমাত্র তাকে নিন্দাই করা হয় তা নয়, অনেক সময় তাকে শাস্তিও পেতে হয়। যেমন, ধরা যাক, সভ্য সমাজে ভদ্রজনোচিত পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করা লোকনীতির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এই নীতি লঙ্ঘন করে তাহলে তাকে নিন্দিত হতে হয়। সময় সময় তাকে শাস্তিও পেতে হয়। তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, সামাজিক নিয়ামক হিসেবে লোকনীতিগুলি কখনই আইনের সমপর্য্যায় ভুক্ত হয় না। ব্যক্তিকে লোকাচারগুলি মেনে চলতে বাধ্য করা হয় সামাজিক চাপ সৃষ্টি করে, কোনরূপ বিধিবদ্ধ নিয়মের দ্বারা নয়। তবে লোকনীতিগুলি জীবনের সঙ্গে এমন-ভাবেই জড়িত যে, চাপ সৃষ্টির ভয়েই যে এগুলি মান্য করা হয় তাই নয়, ব্যক্তি তার অজ্ঞাতসারেই এগুলি মেনে চলে। যেমন, সন্তানের প্রতি পিতামাতার বা পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য কি হবে তা এক রকম সব সমাজেই নির্ধারিত থাকে এবং সকলেই এক প্রকার স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেগুলি মান্য করে।

লোকনীতি যেমন আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি আচরণবিশেষকে নিষিদ্ধও করে। যেমন—স্বামী-স্ত্রী, ভ্রাতা-ভগিনী, পিতা-পুত্রের সম্পর্ক কিরূপ হবে তা লোকনীতি দ্বারা নির্ধারিত। যদি স্বামী বা স্ত্রী অপর স্ত্রীলোক বা

পুরুষের সঙ্গে নিন্দনীয় সম্পর্কে লিপ্ত হয় তা হলে তা হবে সমাজ গর্হিত কাজ এবং দণ্ডনীয়। গোষ্ঠী জীবনে যাতে সদস্যরা আচরণের মাধ্যমে গোষ্ঠী জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে, লোকনীতি সেই উদ্দেশ্যে সদস্যদের প্রভাবিত করে। লোকনীতি ব্যক্তির সুস্থ মানসিক প্রবণতা গঠন করে ও ব্যক্তিকে সংযত হতে শেখায়। যারা লোকনীতি মান্য করে তাদের কাজ সমাজ দ্বারা অনুমোদিত হয় এবং যারা তা করে না তাদের কার্যপদ্ধতি সমাজ দ্বারা অনুমোদিত হয় না।

তবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা হিসেবে লোকনীতি যে সব সমাজে একইরূপ ক্রিয়া করে তা নয়—সমাজভেদে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যেমন, অসবর্ণ বিবাহ ভারত-বর্ষে কোন কোন সমাজে অনুমোদিত, আবার কোন কোন সমাজে তা নিন্দিত। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে গোষ্ঠীগুলি প্রাক-বিবাহ প্রণয়ে উৎসাহ দান করে, ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজে তা নিন্দিত। তাবে এ কথাও ঠিক যে, সমাজভেদে যে কেবলমাত্র লোকনীতিগুলি পৃথক হয় তাই নয়, একই সমাজে সময় ভেদেও এইগুলির পরিবর্তন ঘটে। যে সমাজে আজ যেগুলি অবশ্য পালনীয় লোকনীতি বলে অভিহিত, ভবিষ্যতে সেগুলির কিছু কিছু লোকাচারের রূপ গ্রহণ করে। যেমন, হিন্দু পরিবারে নববধূর ঘোমটা দেওয়ার যে রীতি এককালে বাধ্যতামূলক ছিল, আজ তা অবলুপ্ত না হলেও অনেক পরিবারেই এ বিষয়ে পরিবারের সদস্যরা উদাসীন নয় এবং এ কাজকে নিন্দনীয় বলেও মনে করেন না। আবার সামাজিক স্তর বিশেষেও এগুলির গুরুত্ব কমে বাড়ে। সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেদের কাছে যেগুলি অবশ্য পালনীয় লোকনীতি, সমাজের নিম্ন শ্রেণীতে তা নিতান্ত লোকাচারে পরিগণিত হয়।

সমাজভেদে, সামাজিক স্তরভেদে এবং সময় ব্যবধানে লোকনীতিগুলির গুরুত্ব কমতে বা বাড়তে পারে ঠিকই তবে কোন সমাজে এমন কোন লোক-নীতির লঙ্ঘন বরদাস্ত করা হয় না, যা সমাজের সংহতি ক্ষুণ্ণ করে। সেগুলি লঙ্ঘন করা হলে শারীরিক শাস্তি, এমন কি সমাজ থেকে বহিষ্কার বা একঘরে পর্যন্ত করা হয়। তাই সভ্যরা এই শাস্তির ভয়েও অনেক সময় এগুলি মেনে চলে। তাই এগুলির সঙ্গে কিছুটা বাধ্যতার ভাব যুক্ত আছে বলা চলে।

লোকনীতিগুলির কার্যকারিতা বা গুরুত্ব নির্ভর করে সামাজিক স্থিতাবস্থার ওপর। যদি জনসাধারণের ভৌগোলিক সচলতা বৃদ্ধি পায় তাহলে জনসাধারণ স্বভাবতঃই সমাজের ওপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল হয় না। এই অবস্থায় ব্যক্তির উপরে সমাজের প্রভাবও অপেক্ষাকৃত কম হয়। তাছাড়াও শুধুমাত্র নির্ধারিত

সময়ের জন্য লোকনীতিগুলি অবশ্য পালনীয় এবং যুক্তি গ্রাহ্য হতে পারে। তবে যদি লোকনীতি মান্য করার বিষয়টি কোনরূপ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহলে গোষ্ঠীর স্থিতাবস্থা এবং একরূপতা কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃত্ব না থাকলে সকলকেই পুলিসের ভূমিকা পালন করতে হয় এবং তা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

(ঘ) **ধর্ম (Religion)** ঃ সামাজিক নিয়ামকরূপে ধর্মের ভূমিকা আলোচনা করতে হলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে ধর্ম বলতে আমরা কি বুঝি।

ফ্লিন্ট (*Flint*) ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "ধর্ম হল এক বা একাধিক সত্তায় মানুষের বিশ্বাস যে, তার থেকে অনেক শক্তিশালী ও তার ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য অথচ তার আবেগ ও কাজের প্রতি উদাসীন নয় এবং যে বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে তার অনুভূতি ও কার্য।" ঈশ্বরই ধর্মের কেন্দ্রীয় বিষয়। ধর্মের সঙ্গে ঈশ্বরের ধারণা এমনভাবে যুক্ত যে ঈশ্বরের কল্পনা ছাড়া ধর্মের কোন ধারণা করা যায় না। যে ঈশ্বরের ওপর মানুষের নির্ভরতা বোধ জাগে সেই ঈশ্বরের প্রতি সক্রিয় বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পনই ধর্ম। ধর্মের দুটি দিক আছে—একটি তার অন্তরঙ্গ দিক, অপরটি তার বহিরঙ্গ দিক। ধর্মের অন্তরঙ্গ দিক হল ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ব্যক্তির মনে যে ভাব, ধারণা, চিন্তা এবং অনুভূতির আবির্ভাব ঘটে সেগুলি এবং বহিরঙ্গ দিক হল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব যার মাধ্যমে ঐ অনুভূতির প্রকাশ ঘটে।

প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ব্যক্তির ধর্মীয় চেতনা তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতাশালী শক্তি হিসেবে কাজ করে এসেছে। কিন্তু শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবন নিয়ন্ত্রণে নয়, সমাজের নিয়ন্ত্রণেও ধর্মের ভূমিকা আছে।

প্রাচীন সমাজে সামাজিক নিয়ামকরূপে ধর্মের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন সমাজ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পশ্চাতে একাধিক অতীন্দ্রিয় দেবতার সত্তায় বিশ্বাসী ছিল। রহস্যময় প্রাকৃতিক শক্তিগুলি সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ভীতির ভাব আদিম নরনারীর মনে জেগেছিল এবং সে কারণে তারা তাদের চারপাশের প্রতিকূল শক্তিগুলিকে নিজেদের অনুকূলে আনার জন্য এই সব শক্তির আড়ালে অবস্থিত অতীন্দ্রিয় দেবতাদের প্রসন্ন করার জন্য নানাধরনের আচার অনুষ্ঠান পালন করত। ধর্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়ার মূলে অকল্যাণকর দেব-দেবীর সম্পর্কে ভয়ের ভাব বর্তমান ছিল। তাছাড়া আদিম সমাজে ব্যাপক কুসংস্কার, ভ্রান্ত বিশ্বাস ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সুচতুর পুরোহিতেরা নানারকম ফন্দি করে এগুলিকে

প্রবর্তিত করেছিল। এদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের ভয় প্রবণতা ও বিশ্বাস প্রবণতার সুযোগ গ্রহণ করা এবং তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। অনেক সমাজে গোষ্ঠী দলপতিরা ধর্মকে হাতিয়ার করে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নরনারীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করত। ফলে প্রাচীন সমাজে ধর্ম আদিম নরনারীকে সামাজিক জীবনে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যাপারে একটা শক্তিশালী হাতিয়ার ছিল।

মধ্য যুগেও আমরা দেখি সমাজে ধর্মের মাধ্যমে কিভাবে সমাজস্থ ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণ করা হত। যেহেতু মানুষের ধর্মবিশ্বাসের বিষয়বস্তু, লোকাতীত সত্তা বা অপার্থিব শক্তি মানুষের ইন্দ্রিয়গোচর নয় এবং যেহেতু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যেও এই লোকাতীত সত্তাকে জানা যায় না, সেহেতু ঈশ্বরবিষয়ক উপদেশ ও বাণীর মাধ্যমেই একমাত্র লোকাতীত সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু ঈশ্বরবিষয়ক এসব বাণী ও উপদেশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ব্যাখ্যা একান্তই প্রয়োজন এবং এর দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল মধ্য যুগের ধর্মযাজকদের ওপর। তাঁরা ধর্মের এসব বাণীর উপযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করে ঈশ্বরের স্বরূপকে ধর্মবিশ্বাসী জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতেন। সে কারণে ধর্মবিশ্বাসী জনসাধারণের ওপর তখন গীর্জার ও অন্যান্য ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রবল কর্তৃত্ব ছিল। ধর্মযাজকদের মনোভাব সাধারণতঃ রক্ষণশীল এবং তাঁরা মনে করেন যে, সব সত্যের একমাত্র ভিত্তি ও স্তম্ভ হল গীর্জা এবং তাঁরাই একমাত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যাঁরা ঈশ্বরের উপদেশ ও বাণীগুলিকে ব্যাখ্যা করে যথার্থ সত্যের সন্ধান মানুষকে দিতে পারেন। এজন্য ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে নানারকম অপ্রাকৃতিক ধারণাকে যুক্ত করে তাঁরা তাঁদের কর্তৃত্বকে আরও সুরক্ষিত করতে চাইতেন।

ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির এই কর্তৃত্বের ফলে মধ্য যুগে মানুষের ধর্মচেতনা স্বাধীনভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেনি। তাঁদের ধর্মচেতনা কতকগুলি বাঁধাধরা ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছে এবং প্রকৃত ধর্মবোধের স্থান দখল করেছে বাইরের কৃত্রিম নীতি, ঘোষণা ও বাণী। এর ফলে মানুষের বিচারশক্তি চাপা পড়ে যায়, ধর্ম হয়ে পড়ে বিচারবিযুক্ত (dogmatic) মতবাদেরই সমষ্টি।

মধ্য যুগে এই ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃত্ব এতই ব্যাপক ছিল যে সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সমাজ-জীবনে যে নতুন ভাব, ধারণা বা চিন্তার আবির্ভাব ঘটত সেগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং স্বাধীনভাবে প্রকাশের পথ পেত না। শুধু যে মানুষের ধর্মবিশ্বাস ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তা নয়; অধিকন্তু পরোক্ষভাবে অনেক বিষয়ে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের সামাজিক জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করত। এর

ফলে মানুষের স্বাধীন চিন্তাধারা ব্যাহত হত ও সামাজিক চিন্তাধারার মধ্যে রক্ষণশীলতার মনোভাব দেখা দিত। অবশ্য সভ্যতার অগ্রগতি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরবিচারক্ষমতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির এই রক্ষণশীল ও অনুদার মনোভাব এবং তার একচ্ছত্র কর্তৃত্বের ওপর আঘাত এসে পড়েছে।

মানুষের সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তনশীল। মানুষের চিন্তা, ধারণা নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করে, নতুন নতুন কারণ নির্ণয় করে, যার জন্য সামাজিক পরিবেশকে নতুনভাবে সাজিয়ে নেবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেখা গেছে যে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক সময় সামাজিক পরিবর্তনের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে। এদের রক্ষণশীল মনোভাব নতুন ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেয় না এবং প্রগতিশীল জনমতের বিরুদ্ধেই নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে জোর করে মানুষের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি চিরকালই মনে করে যে, তাদের প্রচারিত সত্য হচ্ছে চিরন্তন, স্থান-কাল নিরপেক্ষ; সময় ও কালের গতির সঙ্গে যেন ঐ সব সত্যের কোন যোগাযোগ নেই এবং তাদের প্রচারিত সত্যগুলি অপরিবর্তনীয়। সুতরাং সকল রকম সামাজিক অনুষ্ঠানকে ধর্মীয় মাপকাঠির মানদণ্ডে বিচার করে দেখতে হবে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব মেনে নিতে হবে। এর ফলে ধর্মের দ্বারা সমর্থিত হয়ে অনেক ক্ষতিকর সামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে যেমন, ভারতে জাতি বিভাগ।

আধুনিক যুগে ধর্মবিশ্বাসের বিবর্তন ঘটেছে। সব উন্নত ধর্মই এখন একেশ্বরবাদী। ধর্ম এখন ভ্রান্ত বিশ্বাস, কুসংস্কার ও মিথ্যা আচার অনুষ্ঠান থেকে অনেকাংশে মুক্ত। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ধর্মের বহিরঙ্গ। সেকারণে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান একেবারে লুপ্ত হতে পারেনা। তবে যথার্থ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বাহ্য আচার অনুষ্ঠানের ওপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন না। তাহলেও আধুনিক যুগে সামাজিক নিয়ামকরূপে ধর্মের কোন ভূমিকা নেই, একথা বলা যায়না। সামাজিক আচরণের যে নৈতিক মানদণ্ড সমাজ নির্দিষ্ট করে, ধর্ম সেই মানদণ্ড অনুযায়ী মানুষকে আচরণ করার নির্দেশ দেয়। নৈতিক আদেশগুলিকে ধর্ম ঈশ্বরের আদেশ বলে গণ্য করতে বলে। ধার্মিক লোক সাধারণতঃ সৎ ও নীতিনিষ্ঠ হয়। ধার্মিক ব্যক্তি স্বভাবতঃই বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি যিনি নীতিসম্মতভাবে তার কর্তব্য সম্পাদন করেন এবং নৈতিক আদর্শকে অনুসরণ করে তার জীবন যাপনের সংকল্প গ্রহণ করেন। এর ফলে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়, সামাজিক ঐক্য ও সংহতি সাধিত হয়। ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তির মনে সামাজিক মূল্যের

বোধ সঞ্চারিত করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তিকে সামাজিক নিয়ম মেনে চলতে, অপরের চিন্তা ও অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে, সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে এবং চিন্তায় ও কার্যে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন হতে শিক্ষা দেয়। তাছাড়া ধর্ম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পরিহার করতে বলে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি কেবলমাত্র এক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির প্রতি নয়, ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের প্রতিও প্রীতি ও শুভেচ্ছার ভাব পোষণ করার কথা বলে।

ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করে মানুষ কোন লোকাতীত সত্তার সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন করে। এই লোকাতীত সত্তায় বিশ্বাস মানুষের মনে এমন শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব সৃষ্টি করে যে, মানুষ তার বাহ্যিক আচরণকে সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত করতে বাধ্য হয়। তাছাড়া, ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি এমন এক ভাবগম্ভীরপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় যে, মানুষ তার আচরণকে সংযত না করে পারে না। বাহ্য আচরণকে সংযত করার নির্দেশ দিয়ে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তির নৈতিক উন্নতি সাধন করে। ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তিকে মন্দ পথ পরিহার করে সৎপথে চলার নির্দেশ দেয়, আচরণে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হতে শিক্ষা দেয় এবং সভ্যদের মধ্যে ঐক্যবোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে।

সমাজ তার ব্যক্তির সামনে যে আদর্শ তুলে ধরে, ধর্ম তার প্রতি অনুমোদন জানিয়ে আদর্শের সংরক্ষণে সহায়তা করে। ধর্মই সমাজানুমোদিত আচরণের সংজ্ঞা নির্দেশ করে এবং ভাল কাজের প্রতি সমর্থন জানায়। মানুষকে তার আচরণে মধ্যপন্থা অবলম্বনের কথাও বলে। মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধকে জাগরিত করে। এই সব ক্রিয়া সামাজিক ঐক্যকে সুদৃঢ় করে।

ধর্ম সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম রূপেও সামাজিক ঐক্যকে সুদৃঢ় করে। ধর্ম নির্দেশ করে যে, সৎ কাজের জন্য মানুষকে পুরস্কৃত এবং অসৎ কাজের জন্য শাস্তি পেতে হবে। অনেক আচরণই যে শুধু সমাজের বিরুদ্ধে আচরণ তা নয়; ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আচরণ, এই কথা বলে ধর্ম ব্যক্তিকে নানা মন্দকার্য থেকে বিরত করতে চায়। ধর্ম বলে অনেক সামাজিক আচরণ ঈশ্বরানুমোদিত। সমাজস্থ ব্যক্তিদের আচরণকে যথার্থ পথে চালিত করে ধর্ম সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা করে।

এমিল ডুর্খীন (*Emile Durkheim*)-এর মতে সমষ্টিগত চেতনা বা গোষ্ঠী চেতনার প্রকাশই হল ধর্ম। ধর্মের প্রধান কাজ সামাজিক ঐক্য বা সংহতিকে সুদৃঢ় করে তোলা। ধর্ম বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ সাধন করে তাদের পরস্পরকে বন্ধু করে তোলে, নানা ধরনের মতভেদ

থাকা সত্ত্বেও উপাসনালয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি উপাসনা বা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে জন্য সমবেত হয়। অনেক সময় বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি গরীব দুঃখীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে বা অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কার্য করে। ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষ যে সকল মনগড়া ধারণার সৃষ্টি করেছে, সেগুলিকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়ার কোন সংগত কারণ নেই। রাধাকৃষ্ণণ তাই বলেন, "যখন আমরা সংজ্ঞা বা সংস্কার নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করি তখন আমরা পৃথক হয়ে পড়ি। কিন্তু যখন আমরা ধর্ম জীবনে প্রার্থনা এবং ধ্যানকে আশ্রয় করি তখনই আমরা একত্র হই।"

সকলেই ধর্মকে সামাজিক নিয়ামকরূপে গণ্য করতে প্রস্তুত নন। কার্ল মার্কস-এর মতে ধর্ম হল জনগণের আফিং (Religion is the opium of the people)। মার্কস্ এবং তার সমর্থকবৃন্দের মতে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির দ্বারা অগণিত শ্রমজীবীদের শোষণের ওপরই আধুনিক সমাজের অস্তিত্ব। এই শোষণ নীতিকে অব্যাহত রাখার জন্য নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পুঁজিপতিরা বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে। ধর্ম একপ্রকার আধ্যাত্মিক মাদক যা অগণিত শ্রমজীবিকে সম্মোহিত করে রাখে।

মার্কসবাদে ধর্মের সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে তা সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। কারণ ধর্ম যদি ব্যক্তির জীবনে আফিং স্বরূপই হোত তাহলে ধর্মের অবলুপ্তি অনেক আগেই ঘটত। অনেক সময় ধর্মের নামে নানাবিধ অন্যায় বা অত্যাচার সংগঠিত হয় কিন্তু প্রকৃত ধর্ম, মহৎ আদর্শ এবং ভ্রাতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য ধর্ম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংস্থা হিসেবে আজও যে শক্তিশালী মাধ্যমরূপে কার্য করে তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই।

(ii) (ক) **জনমত (Public Opinion)**: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত সামাজিক নিয়ামক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেকে ভুল করেন যে, জনমতের অর্থই হল জনসাধারণ (Public)-এর সকলেই একই অভিমত পোষণ করে। আসলে জনমত বলতে ঠিক এ কথা বোঝায় না। একটি বিষয়ের ওপর জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করা অস্বাভাবিক নয়। কোন একটি বিষয় সম্পর্কে জনগণের যে অভিমত তাই হল জনমত।

জনমত বলতে বোঝায় জনগণের পুঞ্জীভূত ধারণা যা কোন একটা সমস্যার সময় জনগণ যেগুলিকে প্রকাশ করে। জিন্সবার্গ (*Ginsberg*) জনমতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "জনগণের পুঞ্জীভূত ধারণা এবং অভিমত, যেগুলি একটি

সম্প্রদায়ে সক্রিয়, যেগুলি কমবেশী সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশিত হয় ও যার একটা স্থিরতা আছে এবং যেগুলি বহু মনের একত্রে ক্রিয়া করার ফলস্বরূপ।" রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেমস্ টি ইয়ং (*James T. Young*) বলেন, "জনমত হল একটি আত্মসচেতন সম্প্রদায়ের সাধারণ বিচারমূলক আলোচনার পর কোন সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে সামাজিক অবধারণ।"

জনমতের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা বলা যেতে পারে। কোন একটা মূল আলোচ্য বিষয় বা সমস্যা থাকে যার সমাধান করতে হয়। সমাধানের জন্য সে সম্পর্কে কিছু বুদ্ধি সম্মত আলোচনা হবে, আগের ধারণা বা পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাও এ ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। আলোচনার সময় মতের মিল এবং অমিল ঘটবে। শেষ পর্যন্ত আলোচনা এক ধরনের মিল বা ঐক্যে এসে পরিণতি লাভ করবে। তা ছাড়া যেহেতু জনসাধারণের সমস্যাকে নিয়েই জনমত সেহেতু জনমত হল কর্মমুখী। জনমতের ক্ষেত্রে প্রথম একটি সমস্যার আলোচনা, তারপর একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা কর্মপন্থার জন্য বাসনা। তারপর সেই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহারিক উপায়ে বিশ্বাস স্থাপন।

জনমতের বিকাশে দুটি উপাদান বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ, জনমতের পুরোভাগে মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির অবস্থান এবং সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন।

দ্বিতীয়তঃ, জনমতের মধ্যে আবেগপ্রবণতার স্থান নেই সে কথা বলা যায় না। তবে জনতা (crowd) যে অর্থে আবেগতাড়িত ঠিক সেই অর্থে জনমত আবেগ দ্বারা চালিত নয়। কম বা বেশী যাই হোক না কেন, দায়িত্বশীলতা (responsibility) জনমতের উল্লেখযোগ বৈশিষ্ট্য।

সামাজিক নিয়ামক হিসেবে জনমতের ভূমিকাকে আমরা দুদিক থেকে আলোচনা করতে পারি। প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্রে জনমতের প্রভাব এবং দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক জীবনে জনমতের প্রভাব। পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন না। কিন্তু প্রতিনিধিরা জনগণের দ্বারা প্রেরিত হয় জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য। জনগণ যদি রাজনৈতিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে উদাসীন থাকে তাহলে শাসকগোষ্ঠী জনসাধারণের অধিকারকে উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু কোন দায়িত্বশীল সরকারই জনমতকে অবজ্ঞা করতে পারে না কারণ বলিষ্ঠ জনমতের ওপর সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। অধ্যাপক লাস্কি (*Laski*) তাই সুন্দর মন্তব্য করেছেন, 'সদাজাগ্রত জনমতই স্বাধীনতার

রক্ষাকবচ।' সরকারকে স্বৈরাচারিতার পথে বাধাদানে জনমতের প্রভাব প্রত্যেক দেশে স্বীকৃত। জনমতের সংস্থা হিসেবে সংবাদপত্র, সিনেমা, বেতার ইত্যাদির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন কার্যাবলী সংবাদ পত্রে ছাপা হয় এবং বেতারের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। ফলে সরকারকে যাতে সকল সময়ই জনগণের সমালোচনার সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে সদাজাগ্রত থাকতে হয়।

সমাজ জীবনের ব্যক্তিদের আচার আচরণ এবং চালচলন জনমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজে অনেক কিছুই ঘটে যা আইন করে দমন করা যায়না, কিন্তু জনমত যদি সুগঠিত হয় এবং সজাগ থাকে তার প্রভাব আইনের এবং ধর্মের প্রতি যে ভীতি তার তুলনায় অনেকগুণ বেশী। যেমন ধরা যাক, কোন পাড়ায় কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক ক্রমাগত অনিষ্ট করে যাচ্ছে কিন্তু এর বিরুদ্ধে জনমত যদি গঠিত হয় তাহলে আইন ব্যতিরেকেই এই অনিষ্টজনক কার্য রোধ করা যায়। শহর এবং গ্রাম্য এলাকায় জনমতের প্রভাব ভিন্ন রকম এবং তার মাধ্যমও সাধারণতঃ ভিন্ন। গ্রাম্য এলাকায় জনগণের নৈকট্য (Proximity) এবং প্রাথমিক (Primary) সম্পর্ক জনমত গঠনের পক্ষে সহায়ক এবং তা শক্তিশালীও হয় অনেক বেশী। যেমন, হিন্দু সমাজে অসবর্ণ বিবাহ বা বিধবার পুনর্বিবাহের বিরোধিতা করার জন্য যেভাবে জনমত গড়ে উঠেছিল তা থেকেই জনমতের প্রভাব বোঝা যায়। শহর অঞ্চলে জনমতের মাধ্যম সাধারণতঃ সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। এই মাধ্যমগুলি শহরাঞ্চলে বিভিন্ন উপায়ে ব্যক্তিদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে।

(খ) **আইন (Law)**: আদিম সমাজে আচার এবং গতানুগতিক পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তির এবং গোষ্ঠীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হোত কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জটিলতাও বৃদ্ধি পেল। ফলে গতানুগতিক পদ্ধতির মাধ্যমেই কেবলমাত্র সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই কারণে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিধিবদ্ধ উপায় (formal) বা পদ্ধতি হিসেবে আইনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। আইনের গুরুত্ব সম্পর্কে গিলন এবং গিলন (*Gillian and Gillian*) তাই উক্তি করেন যে, আইনের মাধ্যমে ব্যক্তির জীবন পরিচালিত হয় এবং তাদের অধিকার, কর্তব্য এবং সামাজিক সুযোগ সুবিধার পথও সুগম হয়। আইনভংগকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সরকার এবং এজন্য সরকারকে পুলিস বাহিনী মোতায়েন করতে হয়। এ ব্যাপারে বিচার বিভাগের সহায়তায় সরকারকে আইন প্রনয়ণ করতে হয়। রস (*Ross*)-এর মতানুসারে আইন হল সামাজিক নিয়ন্ত্রণের

একটি বিশেষ ধরনের ইঞ্জিন। তিনি আইনের দুটি কার্যাবলীর কথা উল্লেখ করে আইনের ভূমিকার কথা বলেছেন। তাঁর মতে আইনের কাজ ব্যক্তির অসামাজিক এবং সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করা এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপরের অধিকারের প্রতি সদাজাগ্রত রাখা। বর্তমান দিনে আমরা জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রে (Welfare State) বসবাস করি। ফলে রাষ্ট্রের কাজ কেবল আইন প্রণয়ন এবং শাসন পরিচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। রাষ্ট্রকে সামাজিক জীবনের নানাধরনের সমস্যারও সমাধান করতে হয়, ফলে আইনের গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইন যে কেবল সমাজবিরোধীদের কার্যে বাধাদান করে তাই নয়, সমাজস্থ ব্যক্তিদের সুস্থ মানসিকতা গঠনে এবং সৎভাবে তাদের জীবন যাপন করার পথে ব্যক্তি তথা সমাজকে সাহায্য করে। ফলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ভয়ে অনেকে দুষ্কার্যে লিপ্ত হতে ভয় পায়। কাজেই নেতিবাচক (Negative) এবং ইতিবাচক (Positive) কার্যাবলীর দিক থেকে আইনের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায়না। অনেকেরই মনে প্রশ্ন জাগে যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আইন যেহেতু বিধিবদ্ধ (fornal) এবং ভীতিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে কাজেই সমাজ জীবনের সঙ্গে আইনের সম্পর্ক কিভাবে সৌহার্দ্যপূর্ণ হতে পারে? কিন্তু এ চিন্তা ঠিক নয়, কারণ কোন দেশেই এমন উদাহরণ দেখা যায় না যে কেবলমাত্র ভীতি প্রদর্শনের দ্বারাই জনসাধারণকে অনাদিকাল দমিত রাখা হয়েছে এবং জনগণকে শোষণ করা সম্ভব হয়েছে। আইনের সঙ্গে নীতির (Morality) এখানেই সম্বন্ধ। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের দিক থেকে যা নীতিগতভাবে গ্রহণীয় বলে মনে হয়, আইনের সম্মতি থাকে তার পিছনে। নীতি যদিও ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ ব্যাপার তাহলেও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নীতির প্রশ্ন যখন জড়িত তখন তা প্রয়োগের জন্য আইনের কর্তৃত্বেরও দরকার। পরিবর্তিত সমাজের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত তথা সামাজিক প্রয়োজনও যেমন পরিবর্তিত হয়, সেরূপ নিত্যনতুন আইনেরও উদ্ভব হয়। নিত্যনতুন প্রয়োজন মেটাতে এবং বর্তমানের দৃষ্টিতে যা বর্জনীয় বলে বিবেচিত হয় তা অপসরণের জন্যও আইনের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়। সেইজন্য দেখা যায় অনেক আইনই হল আচারের (Custom) লিখিত রূপ। তবে আচারের সঙ্গে আইনের মূলগত পার্থক্য হল, আচার সাধারণত গতিশীল (Static) সমাজে প্রচলিত। ফলে গতিশীল সমাজে নিত্য নতুন সমস্যার উদ্ভব এবং তার সমাধানে আইনের যে মুখ্য ভূমিকা রয়েছে, আচারের পক্ষে সে ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়।

(গ) **শিক্ষা (Education) :** 'শিক্ষা কথাটির তাৎপর্য ব্যাপক বা সঙ্কীর্ণ দু অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল এমন প্রক্রিয়া যা আমাদের সমস্ত জীবন ধরে চলতে থাকে এবং জীবনের সবরকম অভিজ্ঞতাই এই শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করে। এই অর্থে এটি হল সাধারণ প্রক্রিয়া যার দ্বারা আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় এবং যার দ্বারা মানুষ তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে ও যে বিশ্বে তারা বসবাস করে তার সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে উপলব্ধি করতে পারে। সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষা, বলতে মনে করা যেতে পারে আমাদের ক্ষমতাকে বিকশিত এবং অনুশীলন করার জন্য সচেতনভাবে পরিচালিত কোন প্রচেষ্টা। সঙ্কীর্ণ অর্থে যে শিক্ষা সে শিক্ষা, মানুষ সচেতন-ভাবেই গ্রহণ করে। সাধারণতঃ, সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলতে বোঝায় যখন রাষ্ট্র, পরিবার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কোন একটি সংগঠনের বা ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যক্তির ক্ষমতাকে বিকশিত করার জন্য চেষ্টা করে। সামাজিক নিয়ামক হিসেবে শিক্ষার ভূমিকার কথা যখন বলা হচ্ছে তখন শিক্ষা কথাটিকে ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করা হচ্ছে। বটোমোর (*Bottomore*) বলেন, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক পর্যন্ত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি প্রাণবন্ত মাধ্যম।

ডুরখীম্ (*Durkheim*) শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছেন যে, শিক্ষা হল এমন একটি ক্রিয়া যা পূর্বসূরীরা উত্তরসূরীদের মধ্যে সঞ্চালিত করে, যাদের মধ্যে সমাজ জীবনের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি এখনও আসেনি। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিশুর মধ্যে শারিরীক, বুদ্ধিগত এবং নীতিগত বিকাশ সাধন করা, যে কাজ ব্যক্তিগত ও সমাজের স্বার্থেই প্রয়োজন। গিলন এবং গিলন (*Gillian and Gillian*) বলেন যে, কেবল তথ্য সংগ্রহ করাই ব্যক্তির জীবনে শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক। শিক্ষা ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ দান করে এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণের ক্ষমতা দান করে। কি উপায়ে সত্যে পৌঁছানো যায় সে সম্পর্কে শিক্ষাই যথার্থ পথের নিশানা দেয় এবং ব্যক্তি ও তার বুদ্ধিকে যথাযথ স্থানে কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় সে সম্পর্কে অবহিত হয়। শিক্ষা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পথ সুগম করে কারণ শিক্ষা ব্যক্তিকে প্রতিটি বিষয় বিচার বিশ্লেষণ করে দেখার জন্য তার যুক্তিকে সঠিক পথে চালিত করতে শেখায় এবং আবেগবশতঃ ব্যক্তি যাতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হয় তার জন্য তাকে শিক্ষা দেয়। যে ব্যক্তি বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিজের আবেগ,

প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারে তার পক্ষে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ব্যক্তির মধ্যে দায়িত্ব এবং সামাজিক চেতনা থাকলেই ব্যক্তি তার কর্তব্যগুলি সুচারু রূপে সম্পন্ন করতে পারে। শিক্ষার দ্বারাই ব্যক্তির মনে এই দায়িত্ববোধ ও সামাজিক চেতনার সৃষ্টি হয়, ফলে মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধিকে অতিক্রম করে বৃহত্তর জীবনে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়। ব্যক্তি আত্মস্বার্থের কথা চিন্তা না করে সমষ্টিগত কল্যাণের কথা চিন্তা করতে সমর্থ হয়। তাই স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছেন—'মানুষের মধ্যে যে পবিত্রতা বিদ্যমান, শিক্ষা হল তারই প্রকাশ।' শিক্ষার উদ্দেশ্য সমাজের ঐক্য বা সংহতিকে সুদৃঢ় রাখা। শিক্ষার বিকাশসাধনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কুসংস্কার, ভ্রান্তবিশ্বাস প্রভৃতি দূরীভূত হয়। যে শিক্ষা একটি শিশু তার পরিবারে, স্কুলে, খেলার মাঠে, সংঘে গ্রহণ করে তা তার সামাজিকীকরণে সহায়তা করে এবং সমাজের প্রতিষ্ঠিত মূল্যগুলি সম্পর্কে তাকে সচেতন করে তোলে। সব সমাজই প্রধানতঃ তার সভ্যদের সামাজিকীকরণের ওপরে নির্ভরশীল। এর জন্য সমাজ তার সভ্যদের সার্থক সমাজানুমোদিত অভ্যাস, আচরণ শিক্ষা করতে বলে। সমাজের আদর্শ, ভাবধারা, সমাজের স্বীকৃত আচার-আচরণ যাতে বংশপরম্পরায় সঞ্চালিত হয় তার জন্য সব সমাজই তার তরুণ সভ্যদের শিক্ষিত করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। তরুণেরা যাতে সামাজিক আদর্শ ও মূল্যগুলি সম্পর্কে অবহিত হয়ে সমাজে তাদের নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে তার জন্য তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষা হল এমন একটা সামাজিক প্রক্রিয়া যা ব্যক্তি সামাজিক জীবনে যথাযথ সংগতি বিধানের জন্য শিক্ষা করে। সামাজিকীকরণে সহায়তা দ্বারা শিক্ষা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাজ সম্পাদন করে। অবশ্য শিক্ষার এই ভূমিকা পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ নয়। শিক্ষার দ্বারা শিশুরা গুরুজনদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে এবং ভদ্রভাবে জীবন যাপন করতে শেখে। শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে যখন বিরোধ দেখা যায় অথবা শিক্ষা ঠিকমত কাজ করতে পারে না তখন সমাজে এক জটিলতার সৃষ্টি হয়, ফলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণও কষ্টকর হয়ে ওঠে। অন্যান্য সামাজিক নিয়ামকের সঙ্গে শিক্ষার পার্থক্য হল শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তি নিজে নিজেকেই নিয়ন্ত্রিত করতে শেখে। একটি শিক্ষিত ব্যক্তি ভ্রান্ত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে বিশ্বাসী নয়। সব সমাজই প্রধানতঃ তার সভ্যদের সামাজিকীকরণের ওপর নির্ভর করে। এর জন্য সমাজ তার সভ্যদের সমাজানুমোদিত অভ্যাস, আচরণ শিক্ষা করতে বলে। সমাজের আদর্শ, ভাবধারা, সমাজের স্বীকৃত আচার-আচরণ যাতে বংশ-

পরম্পরায় সঞ্চালিত হয় তার জন্য সব সমাজই তার তরুণ সভ্যদের শিক্ষিত করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। তরুণরা যাতে সামাজিক আদর্শ ও মূল্যগুলি সম্পর্কে অবহিত হয়ে সমাজে তাদের নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে তার জন্য তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষা হল এমন একটা সামাজিক প্রক্রিয়া যা ব্যক্তি সামাজিক জীবনে যথাযথ সংগতি বিকাশের জন্য শিক্ষা করে।

(ঘ) প্রচার (Propaganda) : ইংরাজী শব্দ 'propaganda' কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'propagatte' থেকে যার অর্থ হল 'বিস্তৃত করা', 'জন্ম দেওয়া' বা 'পুনরুৎপাদন করা'। শব্দটির মূল অর্থ হল কোন একটি মতবাদের বিস্তৃতির বা প্রসারের জন্য সুগঠিত পরিকল্পনা।

প্রচার বলতে বোঝায় ব্যক্তির মত এবং মনোভাবকে প্রভাবিত করার জন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সুসংগঠিত এবং সুসমঞ্জস প্রচেষ্টা। অনেক সম্ভাব্য বিশ্বাসের মধ্য থেকে ব্যক্তিকে কোন একটি বিশেষ বিশ্বাস গ্রহণ করতে বলা এবং যখন নানাভাবে কার্য করার সম্ভাবনা রয়েছে তখন বিশেষ একভাবে তাকে কার্য করতে বলার প্রচেষ্টা হল প্রচার। ডুব (*Doob*) প্রচারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "প্রচার হল কোন স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবৃন্দের অভিভাবনের মাধ্যমে কোন গোষ্ঠীর ব্যক্তিবৃন্দের মনোভাবকে নিয়ন্ত্রিত করার এবং ফলতঃ তাদের কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করার এক সুসমঞ্জস প্রচেষ্টা।"

অংশগ্রহণকারী সমাজে (participating society) জনমত নিয়ন্ত্রণের সংস্থা হিসেবে প্রচারের নাম (propaganda) উল্লেখ করা যায়। প্রচারের দ্বারা ব্যক্তি অথবা একটি গোষ্ঠী সুসংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনমতকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে। প্রচারের মাধ্যমে প্রচারক অপরের বিশ্বাস এবং আদর্শের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং স্বপক্ষে বলিষ্ঠ মতামত গঠন করার জন্য সচেষ্ট হয়। প্রচার যে কোন রকমেরই হতে পারে, যেমন রাজনৈতিক, ধর্মীয়, ব্যবসায়িক প্রভৃতি।

প্রচারের মাধ্যমে জনগনের কাছে নানাবিধ তথ্য (information) পরিবেশন করা হয়। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, প্রচারক সেই সমস্ত তথ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে যা তার সপক্ষে জনমত গঠনের পক্ষে অনুকূল। যে বিষয়ের জন্য জনমত গঠনের প্রচেষ্টা কেবলমাত্র সেই তথ্য সম্পর্কীয় বিষয়কে প্রচারকার্যে কাজে লাগান হয়। কেবলমাত্র জ্ঞান বিতরণ প্রচারের উদ্দেশ্য নয়, জনসমর্থন লাভও উদ্দেশ্য। সেজন্য সত্য বিষয়ের সম্পর্কে তথ্য যেমন পরিবেশন করা

হয় আবার মিথ্যা প্রচারের চেষ্টাও করা হয় যে ঘটনা জনসমর্থন লাভের প্রতিকূল তা গোপন রাখার চেষ্টা হয়। সেজন্যই প্রচারের সঙ্গে শিক্ষার পার্থক্য বিদ্যমান। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব গঠনের সুযোগ পায় এবং তার শিক্ষা মানসিক উন্নতির পথকে সুগম করে। এর কারণ হল শিক্ষার পদ্ধতি এবং প্রচারের পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। শিক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তিবাদী মানসিকতা গঠনে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু প্রচারের উদ্দেশ্যই হল নিজ মতে বিশ্বাসী করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। ফলে প্রচার যে সম্পূর্ণরূপে আবেগবর্জিত তা বলা চলে না। তবে অনেকে এ মত পোষণ করেন যে শিক্ষা এবং প্রচারের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই বলা চলে না। প্রচারের মত শিক্ষারও উদ্দেশ্য অপরের বিশ্বাস ও আদর্শকে প্রভাবিত করা এবং অপরের অবাঞ্ছনীয় প্রতিন্যাস বা মনোভাব (attitude) এবং আচার-আচরণের পরিবর্তনের চেষ্টা করা। দ্বিতীয়তঃ, অনেকে এ মতও পোষণ করেন যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচারক যেভাবে অপরকে নিজ মতে বিশ্বাসী করায় সেরকম কোন চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না, তা সত্য নয়। যেমন—বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা জাতীয়তাবাদ (Nationalism), গণতান্ত্রিক(democratic) বা সমাজতান্ত্রিক (Socialistic) শাসনব্যবস্থার এবং সমাজে প্রচলিত মূল্যমান-গুলি বজায় রাখার অনুকূলে শিক্ষাব্যবস্থাকে চালিত করা হয়। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রচারের অস্তিত্ব রয়েছে।

প্রত্যেক দেশের প্রচারের জন্য বিভিন্ন রকম পদ্ধতি (Technique) অবলম্বন করা হয়। প্রথমতঃ, বক্তব্য বিষয়কে ছদ্মবেশে পরিবেশন করার চেষ্টা করা হয়। এ পদ্ধতি অবলম্বনের মনস্তাত্ত্বিক দিকটিই আমাদের চোখে পড়ে। বিভিন্নভাবে প্রচারক নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মনোমুগ্ধকর আলোচনা করে। অর্থাৎ স্বার্থ চরিতার্থই যে তার উদ্দেশ্য, শ্রোতা যাতে সে সম্পর্কে অবহিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। দ্বিতীয়তঃ, নিজ বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বারবার (Repetition) একটি বিষয় বলা হয়। এটা খুব স্বাভাবিক যে একটি কথা যদি অধিকবার উচ্চারণ করা হয়, তাহলে অনেক সময় তা সত্য বলে অনেকেই মনে করে। তৃতীয়তঃ, প্রচারের ক্ষেত্রে নানাবিধ মর্যাদাভিত্তিক প্রস্তাবের (Prestige Suggestion) ওপর গুরুত্ব অরোপ করা হয়, তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও হতে পারে। যেমন—নিজ মত প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ দলের স্বপক্ষে বিশিষ্ট জনপ্রিয় নেতার নাম অনেক সময় যুক্ত করা হয়। ব্যবসার ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় বিক্রয়যোগ্য জিনিসটি কোন্ জনপ্রিয় নেতার দ্বারা

ব্যবহৃত তা উল্লেখ করা হয়। চতুর্থতঃ, শ্লোগান বা দলগত ধ্বনি (Slogan) প্রচারের দ্বারা প্রচার কার্য চালনার চেষ্টা করা হয়। শ্লোগানের মাধ্যমে এমন বিশিষ্ট কতকগুলি আবেগপ্রবণ (emotional) বাক্য উচ্চারণ করা হয় যা জনগনের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়—শিল্পভিত্তিক শহরে প্রচার একটি বিশিষ্ট উপায় যার মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়।

শিল্পায়ণের ফলে প্রাচীন পদ্ধতিতে উৎপাদন ব্যবস্থা বর্জিত হয়েছে, গ্রাম্য লোকেদের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, মর্যাদার ক্ষেত্রে সচলতা (Mobility) বৃদ্ধি পেয়েছে, যাতায়াতের ব্যবস্থার আগের তুলনায় অধিকতর উন্নতি সাধিত হয়েছে। ফলে গতানুগতিক পদ্ধতির দ্বারা জনমত নিয়ন্ত্রণ আর তেমন কার্যকর নয়। ফলে প্রচারের গুরুত্ব ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে।

৪। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কিভাবে কার্যকর হয় (How social conirol is effective) :

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম (Means) হিসেবে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এই উপায়গুলি বা পদ্ধতিগুলি সব সমাজে যে সমানভাবে প্রযোজ্য, তা নয়। তার কারণ কাঠামোগত পার্থক্য। কিন্তু একটি কথা ঠিক যে প্রত্যেক সমাজেই এমন কতকগুলি কারণ (Factors) কাজ করে যার মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত কারণগুলি উল্লেখযোগ্য।

(১) অনেক সময় দেখা যায় শিশুর সামাজিকীকরণ ঠিকমত হয় না, ফলে সমাজস্বীকৃত আচার-আচরণ অমান্য করার প্রবণতা শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। অনেক পরিবারেই শিশুর মানসিক উন্নতির যে একটা দিক আছে একথা অনেকেই চিন্তা করেন না। ছোটবেলায় মাতাপিতার কাছ থেকে একটি শিশু যা শেখে তারই প্রতিফলন হয় তার সমস্ত জীবন জুড়ে। দুষ্কর্ম এবং সমাজবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের ইতিহাস থেকে অনেক সময় দেখা যায় মানসিক বিকাশের উপযোগী পরিবেশের অভাবের দরুণ তার সার্থক সামাজিকীকরণ হয় না। অপর দিকে সামাজিকীকরণ যদি ঠিকমত হয় তবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণও কার্যকর হয়।

(২) সমাজ যদি সুসংহত (organised) হয় তাহলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণও সহজে কার্যকর হয়। গ্রাম্য সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ যেরূপ কার্যকর হয়

শহরের সমাজে তা সম্ভব হয় না। তার কারণ শহরাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের সংঘ থাকতে ব্যক্তির আনুগত্য বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে কেন্দ্রীয় সুসংহত কোন সংস্থা এককভাবে কার্য করতে পারে না। এই কারণে শহরাঞ্চলে গ্রামের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ-সংস্থাগুলির কার্যকারীতাও হ্রাস পায়।

(৩) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কার্যকারীতা নির্ভর করে অভিযুক্ত ব্যক্তির মুখ্য এবং গৌণ অপরাধের তারতম্য অনুসারে। সমাজে যারা প্রতিষ্ঠিত তাদের ক্ষেত্রে যে আইনশৃঙ্খলা লঙ্ঘিত হয় না একথা বলা যায় না। যেমন, অনেকেই রাস্তায় চলার সময় নির্দিষ্ট পথ দিয়ে চলেন না। কিন্তু সমাজ ইচ্ছাকৃতভাবেই এই অপরাধের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। কারণ এই আইন লঙ্ঘনের ফলে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের বিশেষ ক্ষতি হয় না। সেজন্য সব সমাজই গৌণ বিষয়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের বিচ্যুতিকে কিছুটা সহ্য করে নেয়। ফলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশী কার্যকর হয়।

(৪) অনেকে বলেন যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার কার্যকারীতা নির্ভর করে নিয়ন্ত্রণকারীদের এবং যারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সম্পর্কের ওপর। ফলে দেখা যায় পিতামাতার শাসন একটি শিশুর জীবনে যতখানি কার্যকর হয় অন্যান্য গোষ্ঠীর শাসন সেই অনুপাতে হয় না। তার কারণ পিতামাতার প্রয়োজনীয়তা এবং আকর্ষণ একটি শিশুর ক্ষেত্রে অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক বেশী।

(৫) সামাজিক রীতিনীতি এবং আইন যদি গণতন্ত্রসম্মত হয় তাহলে নিয়ন্ত্রণের কার্যকারীতাও বৃদ্ধি পায়। আর আইন যদি এক পক্ষের স্বার্থ ই সিদ্ধি করে এবং অপর শ্রেণীকে বঞ্চিত করে তাহলে বঞ্চিত শ্রেণীর আইনের ওপর আস্থা থাকা স্বাভাবিক নয়। সেজন্য অনেক দেশেই গণতান্ত্রিক নীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রত্যেকেরই যদি মতামত দানের সুযোগ সমাজ স্বীকার করে নেয় তাহলে আইনভঙ্গের প্রবণতাও হ্রাস পায়।

(৬) সমাজ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এমন কোন শাস্তি প্রদান করে না যা সমাজের মঙ্গলের দিক থেকে ক্ষতিকর। জনমতের চাপ যদি প্রবল হয় তাহলে দণ্ডিত ব্যক্তির পরবর্তীকালে সামাজিক বিধি লঙ্ঘন করার দিকে প্রবণতা হ্রাস পায়। কিন্তু জনমতের চাপ সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে কার্যকর হয় না এবং ব্যক্তিত্বের এই বৈচিত্র্যের ওপর নিয়ন্ত্রণের কার্যকারীতা যে নির্ভর করে তা অস্বীকার করা যায় না।

গিলন এবং গিলন (*Gillian and Gillion*) আরও কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন যার মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়।

(১) তাঁদের মতে প্রথমতঃ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি নির্ভর করে সংস্কৃতির মূল্যমানের ওপর। সংস্কৃতির যে অংশ সমাজের কাছে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় সমাজস্থ ব্যক্তিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা মান্য করে। দ্বিতীয়তঃ, জনগণের সঙ্গে যদি সংস্কৃতির সংযোগ থাকে তাহলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণও সহজতর হয়। তৃতীয়তঃ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে যদি ক্রমাগতই দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে তাহলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করা অসম্ভব হয়। অপরদিকে যদি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বোঝাবুঝির সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে তাহলে নিয়ন্ত্রণও কার্যকর হয় অনেক সহজভাবে।

সমাজবিদ্ লা-পায়ার (*La-Piere*) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কার্যকারীতার কয়েকটি দিকের প্রতি আলোক সম্পাত করেছেন। প্রথমতঃ, তিনি বলেন গোষ্ঠীর সভ্য সংখ্যা কম বেশী হওয়া বা গোষ্ঠীর আকার ক্ষুদ্র বৃহৎ হওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নির্ভর করে। গোষ্ঠী যদি ছোট হয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অনেক বেশী হয়। দ্বিতীয়তঃ, কোন গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের মধ্যে যোগাযোগ যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাহলে—তাদের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দৃঢ় হওয়া অসম্ভব। অপর পক্ষে যদি গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের মধ্যে উপর্যুপরি সাক্ষাতের সুযোগ থাকে তাহলে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দৃঢ় হওয়া স্বাভাবিক। তৃতীয়তঃ, তিনি বলেন যে—ব্যক্তির ওপর কোন গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নির্ভর করে গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কের স্থায়িত্ব কি রকম তার ওপর। যে সম্পর্ক অস্থায়ী সে সম্পর্কের গুরুত্ব ব্যক্তির জীবনকে কম প্রভাবিত করে; সাধারণতঃ সেজন্য পরিবারের একটি শিশুর ওপর যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে, অন্যান্য গোষ্ঠীর তা থাকে না।

৩। সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ যেভাবে কার্যকর হয় (Social order and social Control as enforced through different institutions) :

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অর্থ সমাজে যা কিছু অবাঞ্ছনীয় তা কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করা এবং যা বাঞ্ছনীয় তা যাতে আরও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে তার চেষ্টা করা এবং ধ্বংসের হাত থেকে তাকে রক্ষা করা।

গিলন এবং গিলন (*Gillian and Gillian*) তাই বলেন যে, প্রাচীন যুগ থেকে সুবিধা ভোগকারী (Privileged) এবং বঞ্চিত (Unprivileged) শ্রেণীর মধ্যে যে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব চলেছিল কতকগুলি সামাজিক মূল্যের (Values) প্রতিষ্ঠা হল তার ফলশ্রুতি। ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনের পক্ষে এই বিষয়টি অতি প্রয়োজনীয়। এই সমস্ত সামাজিক মূল্যগুলি হল প্রধানতঃ আইনের ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শিক্ষাগত সুবিধার ক্ষেত্রে এবং সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষেত্রে সমতা। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যই হল এখানে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কোন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের (Institution) পক্ষে সম্ভব হয় না যদি না সেই অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের কাছে ব্যক্তি তথা সমাজ কোন না কোন ভাবে উপকৃত হয়। যে সমস্ত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে তাদের মধ্যে পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

শিশুর চলাফেরা, কথাবার্তা, এবং তার গতিবিধি ও প্রবৃত্তিকে সংযত করার কঠোর দায়িত্ব মাতাপিতার। প্লেটো তাঁর রিপ্লাবিক (*Republic*)-এ বলেছেন, ঐ কাজ উচ্চপদস্থ, কর্মচারীদের ওপর ন্যস্ত থাকা উচিত। কিন্তু এ ধারণা যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয় না। কারণ শৈশবে একটি শিশু পরনির্ভর রক্ত মাংসের পিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। একমাত্র মাতাপিতার পক্ষে যে কঠিন দায়িত্ব পালন করা সম্ভব তা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় না। পরিবার সকল সময়ই শিক্ষার কেন্দ্র। কোন্‌টি করা উচিত এবং কোন্‌টি করা উচিত নয় এ ধারণা একটি শিশু প্রথম তার মাতাপিতার কাছ থেকেই শেখে এবং মাতা পিতা তাকে নানাবিধ দুষ্কর্ম করায় বাধাদান করেন। তার ভাল কাজের জন্য যেমন তাঁরা তাকে প্রশংসা করেন—তেমনি খারাপ কাজের জন্য ভর্ৎসনা করেন। এমন কি শিশু যখন বড় হয়ে বিদ্যালয়ে যায় তখনও পরিবারের শিক্ষাসম্বন্ধীয় কাজ শেষ হয় না। শিক্ষার কতকগুলি বিশেষ বিষয়, যেমন শিশুকে সৎ আচরণ এবং নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেওয়া এবং তাকে স্নেহ, দয়া, মায়া মমতা প্রভৃতি সদগুণগুলির অনুশীলনে উৎসাহিত করা পরিবারের অন্যতম কাজ। পারিবারিক সুন্দর পরিবেশে শিশু যা গ্রহণ করে অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে সে তা করে না। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে পরিবারের প্রধানের ওপর পরিবারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকত। যৌথপরিবারেও পরিবারের যিনি কর্তা তাঁর হাতেই সমস্ত দায়িত্ব থাকত, ফলে তিনি নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখার দিকে গুরুত্ব দিতেন।

বর্তমানে যদিও যৌথপরিবারের সংখ্যা সীমিত কিন্তু সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা হিসেবে পরিবারের ভূমিকা আজও গৌণ নয়। শিশুকে উপযুক্ত নাগরিক করার উত্তম প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হল সুগঠিত পরিবার, রাষ্ট্র নয়।

পরিবার ছাড়া অন্যান্য যে সব প্রতিষ্ঠান সামাজিক নিয়ামক হিসেবে কাজ করে তাদের মধ্যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (Religious institution) উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মতো—ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ধর্ম কোন অতিপ্রাকৃতিক সত্তায় বিশ্বাস সূচনা করে এবং সেই সত্তার সঙ্গে ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হয়। ধর্মের আভ্যন্তরীণ দিক হল ব্যক্তির বিশ্বাস, ধারণা, অনুভূতি ও আবেগের দিক এবং ধর্মের বাহ্য দিক হল কতকগুলি আচার ও অনুষ্ঠান, যেমন উপাসনা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ব্যক্তির ধর্মীয় মনোভাব প্রকাশ পায়। ধর্মের এই বাহ্য দিককে কেন্দ্র করে কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটে যেগুলি বাহ্য আচার অনুষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মের আভ্যন্তরীণ দিকও সামাজিক নিয়ন্ত্রণে উপেক্ষিত নয়। ধর্মবোধ থেকেই অনেকের মধ্যে পাপপুণ্যের ধারণা জন্মায়। ধর্মবোধের সঙ্গে নীতিবোধের গভীর সম্পর্ক বর্তমান। যথার্থ ধর্মপ্রবণ ব্যক্তি নৈতিক আদর্শকে উপেক্ষা করেন না। ফলে অনেকে পরবর্তী জীবনে পূর্বজন্মকৃত অপরাধের ফলভোগের ভয়ে সমাজস্বীকৃত কোন আচরণ ভংগ করতে চায় না। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সামাজিক নিয়ামক হিসেবে গুরুত্ব অবশ্য তুলনায় কমে গেছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে ধর্মের ভয় মানুষের মন থেকে অপসারিত হয়েছে। তবে সামাজিক নিয়ামক হিসেবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-গুলির গুরুত্বকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিও (Educational institutions) সামাজিক নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। আদর্শ সমাজ তখনই গড়ে উঠতে পারে যখন প্রতিটি ব্যক্তি তার আচরণকে বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজ জীবনে প্রতিটি ব্যক্তিরই উচিত অপরের অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া।

বর্তমানে স্কুল এবং কলেজগুলি ব্যক্তির সামাজিক আচার-ব্যবহারের নিয়ামক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবারের পরেই এ বিষয়ে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব উল্লেখ করা যায়। কেননা, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের নিয়মকানুন এবং নীতি সম্পর্কে কোন ধারণাই শিশুর মনে জন্মায় না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমেই 'ভাল' 'মন্দ', 'উচিত' 'অনুচিত' ধারণা জন্মায়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাগুলি শিশুর সামাজিকীকরণের পথ সুগম করে যাতে তার সামাজিক মূল্য, বিশ্বাস এবং রীতিনীতি সম্পর্কে ধারণা যথাযথ হয় এবং তার আত্মসংযমের সহায়ক হয়। যা বাস্তব, যা সত্য সে সম্পর্কে ধারণা ছাত্ররা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকেই গ্রহণ করে। তা ছাড়া, ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে যে প্রীতি সম্পর্ক এবং সহৃদয়তা গড়ে ওঠে, ব্যক্তিগত জীবনে তার প্রভাব কম নয়। এক কথায় আদর্শ ব্যক্তিত্ব গঠনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি মহৎ ভূমিকা পালন করে।

বিদ্যালয় শুধু লেখাপড়া শিক্ষা দেবার প্রতিষ্ঠান নয়। সামাজিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এটি একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয়ের কাজ শিশুকে বৃহত্তর সমাজ জীবনের দীক্ষা দেওয়া। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব সমাজের ঐতিহ্যের মধ্যে যা কিছু শুভ ও শ্রেয় তার সঙ্গে শিশুর পরিচয় করিয়ে দেওয়া। উচ্চশিক্ষা বলতে সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই বোঝান হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানকে উন্নত করে ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গীকে ব্যাপক করে ব্যক্তির আশা আকাঙ্ক্ষায় উপযুক্ত লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করে। তাছাড়া, মহৎ ধারণা ও চিন্তার সঙ্গে ব্যক্তির পরিচয় স্থাপন করে তার চেতনাকে তীক্ষ্ণ করতে সহায়তা করে। নিউম্যান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দেয় কিভাবে বস্তুকে যথার্থরূপে দেখতে হয়, সঠিকভাবে বিষয়-বস্তুকে জানতে হয়, চিন্তাকে জটিলতা থেকে মুক্ত করতে হয়, ভুলভ্রান্তি নির্ধারণ করতে হয় ও যা অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তরতাকে বাতিল করতে হয়। সমাজ জীবনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। নাস (*Nush*) বলেন, 'সমাজের কি চাওয়া উচিত সে সম্পর্কেও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে সচেতন করে তুলবে এবং যে সমস্ত যথার্থ অভাব সমাজের আছে সেগুলি পূর্ণ করবার চেষ্টা করবে।'

উপরের এই আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সমাজে মোটেই তুচ্ছ নয়।

শিল্প সভ্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের (economic institutions) গুরুত্ব ক্রমাগত বর্ধিত হচ্ছে। ব্যক্তির ব্যক্তিগত এবং সামাজিক আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণেরও সংস্থা হিসেবেও তারা কার্য করছে।

প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানই কতকগুলি নিয়ম দ্বারা চালিত এবং প্রত্যেক কর্মরত ব্যক্তিই এই সব নিয়মের অধীন। চাকরি হতে বরখাস্ত হবার ভয়ে সহজে কেউ প্রতিষ্ঠানের নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে সাহসী হয় না।

তাছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তিই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে নিয়মানুবর্তিতা (discipline) এবং সময়ানুবর্তিতা (punctuality) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে যা তাদের ভবিষ্যত জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়তা করে এবং যথেচ্ছাচারী হওয়া থেকে বিরত করে।

সামাজিক নিয়ামক হিসেবে রাষ্ট্রের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এমন কতকগুলি সামাজিক কাজ আছে যার দায়িত্ব গ্রহণ করা কেবলমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। রাষ্ট্রের পক্ষেই জটিল সমাজ জীবনে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যেহেতু প্রয়োজনানুসারে বলপ্রয়োগ করার অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রেরই আছে। ব্যাপক আইনকানুন একমাত্র রাষ্ট্রই প্রণয়ন করতে পারে এবং সমাজের সকলকে সুখ-সুবিধা ও সমান সুযোগ দেওয়া একমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। সকলের পক্ষে বাধ্যতামূলক কতকগুলি কর্তব্য স্থির করাও রাষ্ট্রের কাজ। সুস্থ ও ভদ্র জীবন যাপনের জন্য সর্বনিম্ন মান রাষ্ট্রই নির্ধারণ করতে পারে। রাষ্ট্রের অধীনস্থ অন্যান্য ক্ষমতাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার এবং রাষ্ট্রের মধ্যে যে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন বর্তমান সেগুলিকে সংযোজিত করার এবং তাদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করার বিরাট দায়িত্ব একমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব।

ম্যাকাইভার এবং পেজ (*MacIver and Page*) বলেন, "সংক্ষেপে রাষ্ট্র হল জনসাধারণের শৃঙ্খলা রক্ষার অছি ও অভিভাবক।" কেবলমাত্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষাতেই রাষ্ট্রের কাজ শেষ হয় না। কাউকে অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে বা সকলকে সমান সুযোগ দান করে বা দুর্বলকে শক্তিশালীর বশীভূত করেও শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায়। কিন্তু ন্যায়ের ভিত্তিতেই সামাজিক রীতিনীতিগুলি নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেওয়াই হল ন্যায় (Justice)। কিন্তু কার কতটুকু প্রাপ্য তা স্থির করাই কঠিন ব্যাপার। কঠিন হলেও এ দায়িত্ব রাষ্ট্রই পালন করতে পারে, কারণ সমাজের সকল লোকের ওপর একমাত্র রাষ্ট্রেরই সার্বভৌম ক্ষমতা আছে। যারা রাষ্ট্রের আইন অমান্য করে এবং অপরের অধিকারে অযথা হস্তক্ষেপ করে তাদের শাস্তিবিধান করা রাষ্ট্রেরই কাজ। তা ছাড়া, সুস্থ সুন্দর সামাজিক জীবন রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রের হাতে চরম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে।

অনুশীলনী

১। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা নির্দেশ কর।
(Define Social Control)।

২। সামাজিক নিয়ন্ত্রণে বাধা সৃষ্টি করে সেই উপাদানগুলি কি কি ?
(What are the factors those act as barriers to Social Control)

৩। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংস্থাগুলি কি কি ?
(What are the agencies of Social Control)

৪। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কিভাবে কার্যকরী হয় ?
(How is Social Control made effective ?)

৫। সামাজিক নিয়ন্ত্রণে সামাজিক প্রতিষ্ঠাগুলির ভূমিকা আলোচনা কর।
(Discuss the role played by different institutions as the factors of Social Control)।

৬। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নিয়ামক হিসেবে ধর্মের ভূমিকা বর্ণনা কর।
(Disscuss the role played by Religion as a factor of Social Control)

৭। লোকনীতি এবং লোকোচার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হিসেবে কিভাবে কার্য করে।
(How do the folkways and Mores act as the agents of Social Control ?)

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান
(Economic institution)

১। ভূমিকা (Introduction) :

সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয় সমাজ এবং সমাজস্থ ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক। সেইজন্য অনেকেই মনে করেন যে, অর্থনীতি সমাজ বিদ্যার আলোচ্য বিষয় হতে পারে না এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (Economic institutions) আলোচনা সমাজবিদ্যার পরিধি বহির্ভূত হওয়া উচিত। কিন্তু এ অভিমত আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ব্যক্তি নিয়েই সমাজ এবং সমাজস্থ ব্যক্তিদের জন্যই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীতা। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যে আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত শুধু তাই নয়, তারা সমাজস্থ ব্যক্তিদের পারস্পরিক আচার-ব্যবহার এবং সম্পর্ক নির্ধারণের অন্যতম নিয়ামক। সমাজের স্তরবিন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি—উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত ইত্যাদি সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব এই অর্থনৈতিক বৈষম্যকেই ভিত্তি করে। সমাজস্থ এই বিভিন্ন শ্রেণীর আচার-আচরণ, চালচলন এবং পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণে অর্থনীতির এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কার্ল মার্ক্স (*Karl Marx*)ও অর্থনীতি কিভাবে সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে তা নির্দেশ করেছেন। কাজেই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আলোচনা সমাজবিদ্যায় পরিসর বহির্ভূত হতে পারে না।

২। শিল্পায়ন-পূর্ব অর্থনীতি (Pre-industrial Economy) :

আমরা উন্নত এবং অনুন্নত সমাজের মধ্যে যখন ভেদরেখা নির্দেশ করি তখন মূলতঃ সমাজস্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা তা করি। শিল্পবিপ্লবের পরে উন্নত অর্থনীতি এবং প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে যেভাবে আলোড়িত করেছে, শিল্পায়ণ-পূর্ব অর্থনীতি ঠিক সেভাবে করে নি। এই শিল্পায়ণের প্রভাব আমাদের জীবনে এতই ব্যাপক যে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শিল্পায়ণ-পূর্ব অর্থনৈতিক অবস্থার চিন্তা করাই এক কষ্টকল্পিত ব্যাপার। শিল্পায়ণ যে শুধুমাত্র সমাজস্থ ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক

উন্নতিই সাধিত করে তাই নয়, শিল্পায়ণের প্রভাব সমাজ জীবনের সমগ্র অংশেই অনুভূত হয়। শিল্পায়ণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে শিল্পায়ণ-পূর্ব অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় লাভ করা আমাদের প্রয়োজন, কারণ শিল্পায়ণ সমাজস্থ অর্থনীতির বিবর্তনের শেষ পর্যায়।

যে পদ্ধতির দ্বারা ব্যক্তি পরিবেশকে তার প্রয়োজন মেটানোর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে সেই অর্থনৈতিক বিবর্তনের পর্যায়কে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—সমষ্টিগত অর্থনীতি (The Collective Economy), সহজ পরিবর্তনশীল অর্থনীতি (Simple Transformative Economy) এবং জটিল পরিবর্তনশীল অর্থনীতি বা শিল্পায়ণ (The complex transformative Economy or industrialisation)। জটিল পরিবর্তনশীল অর্থনীতি বা শিল্পায়ণের প্রকৃতি বুঝতে হলে প্রাক-শিল্পায়ণের উপরিউক্ত দুই পর্যায়ের স্বরূপ বুঝে নেওয়া দরকার।

সমষ্টিগত অর্থনীতির পর্যায়টির বৈশিষ্ট্য হল প্রকৃতির উৎপাদিত অপরিবর্তনশীল বস্তুর ভোগ্য দ্রব্যরূপে ব্যবহার বা ভোগ্য দ্রব্যের প্রয়োজনে কাজে লাগান। এই পর্যায়ে আদিম লোকেরা বনে জঙ্গলে ফলমূল সংগ্রহ করত এবং নানা ধরনের ইতর প্রাণী শিকার করে প্রাণ ধারণ করত। গাছতলা অথবা গুহাই ছিল তাদের বাসস্থান। এইভাবে প্রকৃতিদত্ত বস্তু ভোগ্য দ্রব্য রূপে ব্যবহার করা যেমন তাদের রীতি ছিল আবার বিভিন্ন প্রাণীর চর্ম ও হাড় তারা যথাক্রমে পরিধানের জন্য এবং অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত। বর্তমান সভ্য সমাজে যন্ত্রপাতির যে ব্যবহার প্রচলিত অথবা কোন বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে দ্রব্যের ভোগ্য দ্রব্যে রূপান্তরকরণ, এই পর্যায়ে, পুরোপুরি অনুপস্থিত ছিল। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে মানুষকে যন্ত্রপাতি নির্মাতা প্রাণী বলে অভিহিত করতে পারি। তাই আদিম সমাজ থেকে আরম্ভ করে সভ্য সমাজ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়কে যন্ত্রপাতির উৎকর্ষের দিক থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়; যেমন—প্রাচীন প্রস্তর যুগ (Paleolithic), মধ্যবর্তী প্রস্তর যুগ (mesolithic) এবং ধাতুযুগ (Neolithic)। ফিলিপাইনের নিগ্রোদের উদাহরণ থেকে জানা যায়, তারা যে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত তা সাধারণতঃ বিভিন্ন জন্তুর হাড় দ্বারা নির্মিত। সিংহল আদিবাসীদের ক্ষেত্রে জানা যায় যে, তারা তীর ধনুকের ব্যবহার জানত এবং তা হরিণ ও বিভিন্ন প্রাণী শিকারের জন্য ব্যবহার করত। এছাড়া, বন্য মধু সংগ্রহের জন্যও নানাধরনের কৌশল তারা অবলম্বন করত।

বর্তমানে শিল্পভিত্তিক সমাজে শ্রমবিভাগ যেভাবে দেখা যায়, আদিম সমাজে ঠিক সেই অর্থে শ্রমবিভাগ ছিল না। পুরুষেরা সাধারণতঃ শিকার কার্যে নিযুক্ত থাকত, অন্যদিক স্ত্রীলোকেরা ফলমূল সংগ্রহ এবং রন্ধনকার্যে নিজেদের নিযুক্ত রাখত। এইভাবে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে শ্রমবিভাগ প্রচলিত ছিল। অনেক সময় একাধিক গোষ্ঠীর পুরুষেরা যৌথভাবে শিকার করতে বেরোত। এভাবে পরিবার এবং গোষ্ঠী একদিকে যেমন ভোক্তা আবার অন্যদিকে উৎপাদক হিসেবে কাজ করত।

সহজ পরিবর্তনশীল অর্থনীতির পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যই হল মূলধন সামগ্রীর সঞ্চয় এবং তা উৎপাদনের কার্যে বিনিয়োগ করা, যেমন—খনন কার্যে অস্ত্র ব্যবহার, গৃহপালিত জন্তুর ব্যবহার ইত্যাদি। এই পর্যায়ের আরও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল উন্নত ধরনের শিকারের অস্ত্র ব্যবহার এবং কৃষিকার্যে অংশগ্রহণ। ভূমি ব্যবস্থা যখন মোটামুটি স্থিতিশীল অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হল তখন আর উপজাতিরা অন্যান্য অঞ্চলে পূর্বের মত বিশেষ যেত না। কৃষিকার্যের সঙ্গে সঙ্গে পশম সংগ্রহ ও গৃহপালিত পশু পালন শুরু হয়। মূলতঃ এই অবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে শিকার কার্য এবং কৃষিকার্য একসাথে চলত, ফলে একরকম যৌথ অর্থনীতি (Mixed Economy) প্রচলিত ছিল বলা যায়। এর ফলে ক্রমে ক্রমে সেচকার্যের উন্নতিও সাধিত হয়।

ভারতবর্ষের উপজাতিদের মধ্যে এই প্রকার উন্নত ধরনের অর্থনীতির পরিচয় পাওয়া যায়, যাকে সভ্যতার প্রারম্ভিক পর্যায় বলে অভিহিত করা যেতে পারে। তখন মুদ্রা বা দ্রব্য বিনিময়ের প্রচলন ছিল না। তবে পরবর্তীকালে দ্রব্য বিনিময়ের দ্বারাই সে-অভাব পূরণ করা হত। যে সকল দ্রব্যের চাহিদা বেশী সেই সকল দ্রব্যই অতি সহজে বিনিময়যোগ্য হোত। এমনকি গৃহপালিত পশুও সেই সময় বিনিময় সামগ্রী রূপে ব্যবহৃত হোত।

যে সকল কাজ সকলে মিলে মিশে করত তার ফলভোগও সকলে মিলে মিশেই করত। যদি কাউরও অভাব থাকত অন্যান্যদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করে সে অভাব মেটাত। এমনকি অনেক অতিথি আপ্যায়নের জন্য নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত দান করতে কুণ্ঠিত হোত না। কয়েকজন নৃতত্ত্ববিদ যৌথভাবে বস্তুর ব্যবহার এবং ভোগের অবস্থাকে আদিম সামভোগবাদ (Primitive Communism) বলে আখ্যাত করেছেন। তবে এই পর্যায়কে পুরোপুরি সাম্যবাদ বলা চলেনা। জমির যৌথ মালিকানা ছিল ঠিকই—কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানা যে একেবারে ছিল না

তা বলা যায় না। তখন সমাজে কোন বিশেষ ধরনের জমি হয়ত সকলের অধিকারে ছিল কিন্তু অন্যান্য জমি বা সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত ছিল। হবহাউস (*Hobhouse*) মন্তব্য করেন যে, যে কোন সমাজ ব্যবস্থাতেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথা কোন না কোন প্রকারে প্রচলিত ছিল তবে নিতান্ত প্রারম্ভিক অবস্থায়, অর্থাৎ শিকারের পর্যায়ে, অর্থনৈতিক উৎসগুলি যৌথভাবে সকলে ভোগ করত। কৃষি জমির ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার চেতনা বৃদ্ধি পায়। ম্যালোনেশিয়ার উপজাতিদের উদাহরণ থেকে জানা যায় যে, একজনের জমিতে অন্য একজন বৃক্ষ রোপণ করতে পারত কিন্তু জমির মালিক গাছ বা ফলের অধিকারী হত না। সেজন্য এই অর্থনৈতিক পর্যায়কে সঠিকভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী (Individualism) বা সাম্যবাদ (Communism) বলা যায় না। এই পর্যায়ের অর্থনীতি, এই দুয়ের মধ্যবর্তী পর্যায়ভুক্ত বলাই সমীচীন। এই পর্যায়ে যে কেবলমাত্র মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনের সামগ্রীই যেমন—খাদ্য, বাসস্থান এবং পরিধান ব্যবস্থা ছিল তাই নয়, জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে শিল্প এবং জটিল রাজনৈতিক সংগঠনেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

সরল এবং জটিল অর্থনীতির যে পার্থক্য তা মূলতঃ পরিমাণগত, তবে সমাজ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি এই দুয়ের পার্থক্য করা যায় তাহলে সরল অর্থনীতিকে আদিম অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সমাজের পর্যায়ভুক্ত এবং জটিল অর্থনীতিকে সভ্য সমাজের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। তবে সভ্য সমাজের অর্থনীতিকেও দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল শিল্পায়ন-পূর্ব অর্থনীতি এবং অপরটি পুরোপুরি শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি। শিল্পায়ন-পূর্ব অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি হল যে, এই পর্যায়ে হস্তচালিত যন্ত্রের ব্যবহারের প্রচলন ছিল—গৃহপালিত পশুর দ্বারাও যন্ত্র চালনা করা হত। দ্বিতীয়তঃ, এই অবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং তা অধিকতর উৎপাদনের কাজেই ব্যবহৃত হত। তৃতীয়তঃ, উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমবিভাগও অধিকতর জটিলাকার ধারণ করে। চতুর্থতঃ, পশমজাত দ্রব্যের মত কাঁচামালের গুরুত্বও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হয়। যে অর্থনৈতিক অবস্থায় এই ধরনের অর্থনীতি বিকাশলাভ করে সেগুলি হল সামন্তপ্রথা বা ভূস্বামী প্রথা (Feudal or Manorial system), সংঘবদ্ধপ্রথা (Guild system) এবং গার্হস্থ্যপ্রথা (Domestic system)। ইংলণ্ডে যা সামন্তপ্রথা অথবা ভূস্বামীপ্রথা বলে অভিহিত তা নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর ইউরোপের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। এই সমস্ত জমিদারদের

অধীনে যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করত তাদের মধ্যে যেমন দাসও (serfs) ছিল তেমনি স্বাধীন ব্যক্তিও ছিল। এই জমিদারেরা সার্বভৌম অধিকার ভোগ করত যা পূর্বে রাজারা ভোগ করত। চুক্তির মাধ্যমে এই অবস্থায় এক ব্যক্তি অপরের সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারত। যে ব্যক্তি জমি অধিকারে রাখত তাকে চুক্তি অনুযায়ী জমিদারকে সাহায্য করতে হত এবং সরকারী কর্তব্যও পালন করতে হত। এই জমি যারা ভাড়া নিত তাদেরকে জমিদারের জমিতে শ্রমদান করতে হত। তাছাড়া বিচার এবং নিরাপত্তার সুবিধাভোগের জন্য জমিদারকে তার জমির উৎপাদিত কিছু অংশ দিতে হত। সামন্ততন্ত্রের অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যক্তিগত চুক্তি যা জমিদার এবং শ্রমিকদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করত। সামন্তপ্রথায় জনগণকে আনুগত্য প্রদর্শন করতে হত ব্যক্তির প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি নয়।

সামন্ততন্ত্রে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ইতিহাস প্রাচীন রোমেরও দেখা যায়। কোন ব্যক্তি জমিদারের কাছে জমির জন্য প্রার্থনা জানাত—সেই প্রার্থনা অনুসারে তাকে জমি দেওয়া হত। নীতির দিক থেকে এজন্য আবেদনকারীকে কোন মূল্য দিতে হত না; বাস্তবক্ষেত্রে এই জমি অর্পণের কোন লিখিত চুক্তি ছিল না। ফলে যে কোন অবস্থাতেই জমিদার তা ফিরিয়ে নিতে পারত এবং খাজনা না দিতে পারলে জমির অধিকারও তার থাকত না। কিন্তু ঠিকমত খাজনা দিলে জমি ব্যবহারে কোন অসুবিধা ছিল না এবং সেই অধিকার সে সন্তানদের ওপরও প্রত্যর্পণ করতে পারত। ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যদিও এই পদ্ধতির বিলোপ সাধিত হয়, তবু ইউরোপের কিছু কিছু অঞ্চলে এই প্রথা আরও অনেকদিন স্থায়ী হয়েছিল।

সামন্তপ্রথা (Feudal system) অথবা ভূস্বামী প্রথার (Manorial system) আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে আসে তখন, যখন শিল্পীগোষ্ঠী একত্র হয়ে সংঘ (Guild) প্রতিষ্ঠা করে। মধ্যযুগীয় ইউরোপে এই সংঘ-শিল্পগোষ্ঠীর ভূমিকা অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এমনকি উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সংঘগুলি কোন না কোনভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিরাজ করেছে। ত্রয়োবিংশ এবং চতুর্বিংশ শতাব্দীতে এই সংঘগুলি চূড়ান্ত বিকাশলাভ করে। সংঘগুলি ছিল একই পেশায় নিযুক্ত এবং একই স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত। শহরাঞ্চলের উদ্ভব এবং কারিগরী উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্যাগুলি প্রকট হয়ে পড়ে সেই সমস্ত সমস্যাগুলির

সমাধানকল্পে এই সংঘগুলির সৃষ্টি হয়। এই সংঘগুলি সাধারণতঃ দুইরূপে বিরাজ করত—একটি হল বণিক সংঘ (Merchant guild) এবং অপরটি হল হস্তশিল্পী সংঘ (Craft guild)।

বণিক সংঘগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যে নিজেদের নিযুক্ত রাখত এবং এদের উদ্দেশ্যই ছিল এই সংঘের সদস্যদের স্বার্থরক্ষা করা। সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এই সংঘগুলি প্রভাব বিস্তার করত। এই বণিক সংঘগুলির উদ্ভব হয় একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। হস্তশিল্পী সংঘগুলির গুরুত্বও কম ছিল না। এই গোষ্ঠীগুলির কোনটি চর্ম সংঘ, কোনটি কর্মকারদের সংঘ অথবা কোনটি কাষ্ঠশিল্পী সংঘ নামে বিরাজ করত। এইগুলি সাধারণতঃ দক্ষ কারিগর শ্রেণীর দ্বারাই গঠিত ছিল এবং বংশানুক্রমিক ধারায় এরা চালিত হত। এই সংঘগুলির প্রাথমিক উদ্দেশ্যই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করা এবং সে কারণে যাতে বণিক সংঘগুলি অনধিকার প্রবেশের সুযোগ না পায় এবং অন্যান্য প্রতিযোগিরা যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ না হয় সেই দিকে বিশেষভাবে নজর রাখা। এই উভয় প্রকার সংঘগুলিই স্ব-পরিচালিত সুবিধাভোগী সংঘ ছিল বলা যেতে পারে।

এই সংঘগুলিকে শহরের সংগঠন (organisation) থেকে পৃথক বলা যায় তবে বণিক সংঘগুলি শহরের সংস্থার (corporation) সঙ্গে অভিন্ন ছিল, কেননা সংঘের খ্যাতনামা ব্যক্তিরা সাধারণতঃ সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরূপে পরিচিত ছিল। হস্তশিল্পী সংঘগুলি যদিও বণিকসংঘ অপেক্ষা নিম্নপর্যায়ভুক্ত ছিল তবুও একথা ঠিক যে এগুলির সামাজিক ভূমিকা একেবারে নগণ্য ছিল না। হস্তশিল্পী সংঘগুলি তাদের নিজেদের শিল্পী তদারকী ব্যাপারে শহরের কর্মসভা সম্বন্ধীয় আমলাদের (municipal officials) মতই কাজ করার অধিকারী ছিল।

এই উভয়প্রকার সংঘের যেমন নিজ নিজ সদস্যদের স্বার্থরক্ষা করার দায়িত্ব ছিল আবার বাজারে একচেটিয়া (monopoly) কারবার রক্ষা করাও তাদের উদ্দেশ্য ছিল। উৎকর্ষের দিক দেখে যাতে দ্রব্যের (goods) মধ্যে পার্থক্য না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখা এবং নিজেদের মধ্যে সমতা রক্ষা করার জন্য যাতে কেউ অতিরিক্ত মাত্রায় মূলধন বিনিয়োগে উদ্যোগী না হয় তা দেখা, এই সংঘগুলির অন্যতম প্রধান কাজ ছিল। বিদেশী বণিকদের মধ্যে যারা এই সংঘগুলির সদস্য ছিল না তারা বিভিন্ন রকম অসুবিধার সম্মুখীন হত, কেননা তাদের উৎপাদিত বস্তু কেবলমাত্র এই সংঘের সদস্যদের কাছেই বিক্রি করতে হত এবং কোন কোন বস্তু

তাদের ক্রয় করার বা বিক্রয় করার অধিকার ছিল না। এই হস্তশিল্পী সংঘের সদস্যভুক্ত না হলে কোন বিদেশী, শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারত না।

সংঘের সদস্যগণ একতা বজায় রাখার জন্য নানাভাবে সচেষ্ট হত—যেমন, প্রত্যেক সদস্যেরই স্থানীয় বাজারে জিনিস ক্রয়-বিক্রয়ের সমান সুযোগ থাকত এবং এই সুযোগগুলি নানা ধরনের আইনকানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। কাজের সময়, মজুরী, কারিগরদের সংখ্যা, উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য প্রভৃতি নিয়মকানুনের দ্বারাই নির্ধারিত হত। যদি কেউ অধিক মাত্রায় কোনরূপ অবাঞ্ছিত সুযোগ গ্রহণে সচেষ্ট হত তাহলে তাকে প্রচণ্ড বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হত এবং সংঘ তাকে দণ্ডও দান করত। কেউ তার শ্রমিককে অধিক সময় খাটাতে পারত না বা অধিক মজুরী দিতে পারত না। একই জিনিসের জন্য একই মূল্য ধার্য করতে হত।

টমসন এবং জনসন (*J. W. Thomson and E. N. Johnson*)—এই উভয় ঐতিহাসিকের মতে সংঘগুলির উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের মধ্যে সংহতি বজায় রাখা। এটা খুবই সহজবোধ্য যে, যদি এই সংঘগুলিকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হয় এবং একচেটিয়া কারবার চালিয়ে যেতে হয় তাহলে তাদের যে কেবলমাত্র দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণই করা দরকার তাই নয়, দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা এবং কোনরূপ অসদুপায় গ্রহণ না করাও তাদের লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। সেজন্য সংঘকর্তৃক নিযুক্ত পরিদর্শকদল উৎপাদন পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করত।

কোন একটি শহরে অ-ধনতান্ত্রিক সংঘগুলি নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পাদনের ব্যাপারে যথেষ্ট উপযোগী ছিল বলা চলে। যেমন, উৎপাদন ব্যবস্থায় এবং বণ্টনে এই সংঘগুলি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বেকারত্ব, ধর্মঘট ইত্যাদি দূরীকরণে সমর্থ ছিল, তবে আন্তপ্রাদেশিক এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা ক্ষেত্রে এই সংঘগুলির বস্তুতঃই কোন যোগ্যতা ছিল না। তাই ঐতিহাসিক টমসন এবং জনসন মন্তব্য করেন যে, সংঘগুলির এই ধরনের দুর্বলতার মধ্যেই ধনতন্ত্রের বীজ লুক্কায়িত ছিল[1]।

যখন হস্তশিল্পীসংঘ রপ্তানীর জন্য দ্রব্য উৎপাদন করত তখন ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারত না, কেননা বহির্দেশের বাজারে চাহিদার দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুকি নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু অন্যদিকে ধনী ব্যবসায়ীদের কাঁচামাল সরবরাহের জন্য তারা প্রস্তুত ছিল এবং সে কারণে উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য মজুরী দিতেও তারা কুণ্ঠিত হত না। রপ্তানীকারকগণ বাণিজ্যের জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করত, অন্যদিকে গরীব

1. An Introduction to Medieval Europe.

ব্যবসায়ীরা সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অপারগ হয়ে শেষে মজুরীভোগী কারিগরে পরিণত হত। ধনিক ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে সংঘগুলিও অসমর্থ হয়ে পড়েছিল।

এই সংঘ ছাড়াও গার্হস্থ্য স্তরের অর্থনীতির (Domestic system) পরিচয় পাওয়া যায়, যা বিকাশ লাভ করে ধনতন্ত্রের ঠিক পূর্বে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত। এই সময় একটি মধ্যবর্তী প্রযোজক শ্রেণী (Middle class)-এর উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়, যারা কুটির শিল্পগুলিকে দ্রব্য উৎপাদনের জন্য নির্দেশ দান করত এবং তাদের জন্য কাঁচামাল ঘরে ঘরে সরবরাহ করত। পরবর্তীকালে তারা যন্ত্রপাতির অধিকারী হয়ে উঠল এবং তারা তা হস্তশিল্পীদের ভাড়া দিত। কারিগরেরা তাদের শ্রমের বিনিময়ে মজুরী পেত। তবে ঐ হস্তশিল্পীগণ উৎপাদনের যন্ত্রগুলি (Means of production) নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হল, ফলে তাদের সৃষ্টির মৌলিকত্বও বিনাশপ্রাপ্ত হল। অধ্যাপক গিসবার্ট তাই মন্তব্য করেন যে, এইভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এবং শিল্পবিপ্লবও ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে তা আত্মপ্রকাশ করে।

৩। শিল্পায়ন (Industrialisation) :

যখন আমরা অর্থনীতিকে সরল এবং জটিল—এই দুইভাগে ভাগ করি তখন অর্থনৈতিক দিক থেকে তার পরিমাণগত দিকটির প্রতিই আমরা ইঙ্গিত করি। কিন্তু সমাজবিদেরা এই পার্থক্যকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে সরল অর্থনীতি বলতে সহজ, সরল এবং অজ্ঞ প্রাক-অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন সমাজের অর্থনীতির কথাই বলা হয়; আর জটিল অর্থনীতি বলতে সেই অর্থনীতি বুঝি যা ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনে সভ্য সমাজের সূচনা করে।

জটিল পরিবর্তনশীল অর্থনীতিকে আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য মূলতঃ দুভাগে বিভক্ত করতে পারি। একটি হল শিল্পায়ণের প্রাথমিক পর্যায় (Early industrialism) এবং অপরটি হল আধুনিক শিল্পায়ণ (Modern industrialism) যার সূচনা হয় প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে।

আধুনিক শিল্পায়ণকে বোঝার জন্য শিল্পায়ণের প্রাথমিক পর্যায় সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তাই শিল্পায়ণের প্রাথমিক পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথমে আলোচনা করা যাক :

(১) এই পর্যায়ে যন্ত্রপাতির (machines) যে ব্যবহার দেখি তা হাতের দ্বারা বা গৃহস্থ পশুর সাহায্যে চালিত হত।

(২) উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু দ্রব্য সঞ্চয় করা হত এই উদ্দেশ্যে যাতে তা পরবর্তী উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে।

(৩) উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমবিভাগের (Division of labour) প্রচলনও দেখা যায়। এ জন্য মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ছুতার, মুচি প্রভৃতি শ্রেণীর আবির্ভাবের ফলে ব্যবসা বাণিজ্যে আরও বিশেষীকরণ (specialisation) দেখা যায়, আদিম সমাজে এর কোন অস্তিত্বই ছিল না বলা চলে।

(৪) এই পর্যায়ে কাঁচামালের গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়। এইসব কিছুর সামগ্রিক ফল হিসেবে ব্যবসা বাণিজ্যও বৃদ্ধি পায়। এই অর্থনীতি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। যে-সব সামাজিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এই অর্থনীতি বিকাশলাভ করে তার মধ্যে সামন্ত প্রথা (Feudal system), সংঘবদ্ধ প্রথা (The Guild system) এবং গার্হস্থ্য প্রথা (Domestic system) উল্লেখযোগ্য।

সামন্তপ্রথা হল ইউরোপের নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই সময়ে কৃষকেরা ভূ-স্বামীর (Lord) জমিতে বেশীর ভাগ সময় কর্মরত থাকত। বিচারের এবং নিরাপত্তার বিনিময়ে উৎপন্ন দ্রব্যের একটি অংশ দান করতে হত ভূস্বামীকে। সামাজিক ক্ষেত্রেও উচ্চশ্রেণীর এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই পদ্ধতি বিলুপ্ত হয়।

সংঘবদ্ধ নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ব্যবস্থা (Guild system) বলতে বোঝায় যখন কোন একটি শিল্পীগোষ্ঠী একত্র হয়ে কোন একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হত। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্নরূপে এই প্রথা স্থায়ী ছিল। সংঘগুলি সাধারণতঃ দুটিরূপে বিদ্যমান —একটি হল বণিক সংঘ (merchant guilds) এবং অপরটি হল হস্তশিল্পী সংঘ (Craft guilds)। বণিকসঙ্ঘগুলি বণিকদের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট থাকত এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও সহায়তা করত। বিভিন্ন বণিকসঙ্ঘগুলি একত্র হয়ে সরকারী ক্ষেত্রে পর্যন্ত প্রভাব বিস্তারে সমর্থ ছিল। হস্তশিল্পীসংঘগুলির বিভিন্ন রূপ ছিল—কোনটি চর্মকার সংঘ, কোনটি কর্মকারদের সঙ্ঘ ইত্যাদি। বংশপরম্পরায় এই

সংঘগুলি পরিচালিত হত, ফলে কারিগরদের দক্ষতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। এই সংঘগুলির যে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ভূমিকাই ছিল তাই নয় রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রেও এদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এই সংঘগুলি, তাদের সদস্যরা যাতে সহজে ধর্মীয় কর্তব্য পালন করতে পারে, সেদিকে নজর রাখত এবং কোন সদস্যের মৃত্যু ঘটলে সংঘ নানাভাবে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করত। মধ্যযুগের বিচারালয়ে এদের উল্লেখযোগ্য প্রভাব-প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়। এই সংঘগুলির মাধ্যমে মধ্যযুগের অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত হত। গিসবার্ট (*Gisbert*) মন্তব্য করেন যে, মধ্যযুগীয় ইউরোপে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং নৈতিক জীবন যেভাবে সুসংঘবদ্ধ হয়েছিল তা ইতিহাসের কোন পর্যায়েই সম্ভব হয়নি।

সংঘগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন ধরনের প্রাক্ ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয় যাকে আমরা গার্হস্থ্য স্তর (domestic system) বলে অভিহিত করতে পারি। সাধারণতঃ ইংলণ্ডে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই সময়ে মধ্যবর্তী প্রয়োজক শ্রেণীর (middle class) উদ্ভব হয়। এই শ্রেণী বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাঁচামাল যোগান দিত এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করত। মাঝে মাঝে এরা বিভিন্ন শিল্পীদের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করত এবং কারিগরেরা তাদের শ্রমের বিনিময়ে মজুরী লাভ করত। কিন্তু এই অবস্থায় কারিগরেরা তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে বেশীদিন সমর্থ হল না, কারণ উৎপাদনের যন্ত্র মধ্যবর্তী প্রয়োজক শ্রেণীদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। ক্রমে ক্রমে এই মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীগণ উৎপাদন কেন্দ্রীভূত করে, কারিগরদের মজুরীর বিনিময়ে সমস্ত উৎপাদনের দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করল এবং স্বভাবতঃই শ্রমবিভাগও বিস্তৃতি লাভ করল। এভাবে যে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বীজ বপন করা হল তা শিল্পবিপ্লব এবং ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করল।

১৭৭০ থেকে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যার যে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হয় ঐতিহাসিক আরণল্ড টয়েনবি (*Arnold Toynbee*) তাকেই শিল্পবিপ্লব নামে অভিহিত করেছেন। বর্তমানে যে শিল্প সভ্যতার যুগে আমরা বসবাস করি তা এই পর্যায়েরই ফলশ্রুতি। শিল্পায়ণের এই পর্যায়কে আমরা পূর্ববর্তী অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে সহজেই পৃথক করতে পারি। এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কারিগরী শক্তির ব্যবহার বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। জলীয়বাষ্প চালিত শক্তি এবং বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহারের প্রচলন এই সময়ই দেখা যায়। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শিল্পের ক্ষেত্রে নানাবিধ আবিষ্কারের প্রয়োগ কৌশলেরও পরিচয় পাওয়া যায়। হস্তশিল্পের পরিবর্তে যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন এ যুগেই হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে অর্থ সংগ্রহও সহজতর হয়। পূর্বে যারা মধ্যবর্তী প্রয়োজক শ্রেণী ছিল তারাই উৎপাদনের যন্ত্রের অধিকারী হত এবং তারা সঞ্চিত অর্থকে বৃহত্তর উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করত।

আধুনিক শিল্পায়ণের ফলেই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে বলা চলে। শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী দিয়ে শিল্প ব্যবস্থাকে প্রভূত লাভজনক ব্যবস্থা হিসেবে পরিচালনা করা শিল্পায়ণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য যাতায়াত ব্যবস্থারও উন্নতি সাধিত হয়। সমুদ্রে এবং ভূঅঞ্চলে উভয়ক্ষেত্রেই নিত্যনতুন যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়।

আধুনিক শিল্পায়ণ প্রধানতঃ মূলধন প্রধান। এর কারণ, প্রথমতঃ, একটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে তাকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। তাছাড়াও শ্রমিকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কাঁচামালের জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য অধিক সময়ের যেমন প্রয়োজন, সেরূপ মূলধনেরও প্রয়োজন রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্নপ্রকার উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির এবং বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। হস্তচালিত শিল্পের তুলনায় যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহারে উৎপাদন অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়, সেজন্যই প্রাথমিক অবস্থায় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য এই মূলধন মজুত রাখতে হয়। আধুনিক শিল্পায়ণের অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বৃহদায়তনের উৎপাদনের জন্য কেবলমাত্র স্থানীয় বাজারের দিকে লক্ষ্য রাখলেই চলে না, আন্তর্জাতিক বাজারের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়।

অধ্যাপক উইলবার্ট ই. মূর (*Wilbert E. Moore*) শিল্পায়ণকে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক মূরের ধারণা অনুযায়ী শিল্পায়ণের আবশ্যকীয় দিকগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমতঃ, তিনি মূল্যবোধের কথা বলেন। মূল্যবোধ বলতে অধ্যাপক মূর যোগ্যতা অনুযায়ী কর্ম বণ্টন বোঝান। আধুনিক শিল্পায়ণে কর্মীর নিয়োগ যোগ্যতার মাপকাঠিতেই বিচার্য হওয়া উচিত। তিনি মনে করেন, আধুনিক

শিল্পায়ণকে যদি সফল করতে হয় তাহলে মূল্যবোধেরও পরিবর্তন দরকার। মানুষ যদি সংস্কারমুক্ত হয় তাহলে সামাজিক পরিবর্তন সহজ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, অধ্যাপক মূর রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার বিষয়টির (political stability) উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন, শিল্পায়ণ প্রসারে জাতীয়তাবাদের (Nationalism) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশে যদি শান্তি, শৃঙ্খলা, সংহতি স্থাপিত না হয় তাহলে তা শিল্পায়ণের পক্ষে পরিপন্থী। দেশের একটি অংশে যদি অশান্তি দেখা দেয় অপর অংশকেও তা বিচলিত করে।

তৃতীয়তঃ, তিনি যুক্তির ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, শিল্পায়ণে যে নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হয় তার সমাধানের জন্য কুসংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী মানসিকতার প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা (empirical) ভিত্তিক জ্ঞান দ্বারা চালিত না হয়ে যদি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান তথাকথিত কুসংস্কারের দ্বারা চালিত হয় তবে তা শিল্পায়ণের পক্ষে ক্ষতিকর।

চতুর্থতঃ, তিনি শিল্পায়ণের সাংগঠনিকতাকে দু দিক থেকে আলোচনা করেছেন। প্রথমতঃ, তিনি মনে করেন সকলের ব্যবহার্য সম্পদ বা মূলধনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন এজন্য দরকার। দ্বিতীয়তঃ, তিনি সংগঠনিক কর্মদক্ষতার উল্লেখ করেছেন। কারণ অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন।

পঞ্চমতঃ, মূর মনে করেন আর্থিক উন্নয়নের জন্য কেবলমাত্র ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা থাকলেই হয় না, মানুষের সৃজনমূলক প্রতিভার বিকাশেরও প্রয়োজন হয়। নতুন কিছু উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা যদি না থাকে তাহলে আর্থিক উন্নয়ন ঠিকমত সম্ভব হয়না।

শেষতঃ, অধ্যাপক মূর শিল্পায়ণের জন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি এ সম্পর্কে সম্পত্তি, শ্রম ও বিনিময় হারের (Property, Labour and Exchange) ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সম্পত্তি বলতে তিনি মনে করেন সেই বস্তু যা চাহিদার তুলনায় সীমিত এবং যা হস্তান্তরযোগ্য। শিল্পায়ণের পক্ষে এসকল দ্রব্য বা সম্পত্তির বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাছাড়া, শ্রমিকের শ্রমের আলোচনায় তিনি একথা বলেন যে, শ্রমিক নিয়োগ শ্রমিকের ব্যক্তিগত দক্ষতার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। বংশ পরিচয়ের মূল্য সেখানে গৌণ। আবার, দ্রব্য বিনিময়ের জন্য মুদ্রার মাধ্যমে একটি বিনিময় হার সুনির্দিষ্ট থাকা উচিত, তা না হলে তা শিল্পায়ণের সহায়ক হয়না।

এ প্রসঙ্গে শিল্পায়ণের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ফলাফলগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন। অধ্যাপক গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন—আধুনিক শিল্পায়ণের ফলে যেরূপ উৎপাদনের হার দ্রুত বৃদ্ধি পায় তা ইতিহাসের কোন অবস্থাতেই সম্ভব হয় নি। সম্পদের অসমবণ্টনই হল শিল্পায়ণের অন্যতম ফল। একটি শ্রেণীর হাতে প্রভূত পরিমাণে অর্থ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে এবং সমাজের বৃহত্তর অংশ উৎপাদন সামগ্রীর মালিকানা থেকে বঞ্চিত হয়। দ্রব্যের উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পায়।

শিল্পায়ণের ফলে দুর্ভিক্ষ আগের তুলনায় অনেক মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং জনস্বাস্থ্যেরও উন্নতি সাধিত হয়েছে। শিল্পায়ণের অন্যান্য ফলাফল হিসেবে গিসবার্ট বলেন, কলা ও বিজ্ঞানের প্রভূত সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে। পূর্বের তুলনায় কাজের সময় (duty hours) হ্রাস পাওয়াতে অবসর সময় উদ্ভাবনী কাজে নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। নানাবিধ ঔষধ পত্র উদ্ভাবন এবং উন্নত খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদনের ফলে জীবনশক্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবনকে উপভোগ করা যত সহজতর হয়েছে পূর্বে তা আদৌ সম্ভব ছিল না।

শিল্পায়ণের ক্ষতিকর দিকটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন—শিল্পায়ণের ফলে অধিক বেকার সৃষ্টি হয়েছে, অসম বাজার দরই এর জন্য মূলতঃ দায়ী। তা ছাড়া তিনি জাতীয় সম্পত্তি নির্দিষ্ট কয়েকজনের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, যা সমগ্র সামাজিক জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর।

৪। প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন (Development of Technology) :

গতানুগতিক এবং আধুনিক সমাজের মধ্যে যে সব কারণে ভেদ রেখা টানা হয় তার মধ্যে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের তারতম্য অন্যতম কারণ (factor)। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমরা যে বস্ত্র পরিধান করি, যে বস্তু ব্যবহার করি, এমন কি, আমাদের আহার্য বস্তু এবং চলাচলের জন্য যানবাহন ব্যবস্থা প্রায় সবই প্রযুক্তিবিদ্যারই অবদান।

প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন আলোচনা প্রসঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে প্রযুক্তি-বিদ্যার অর্থ বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। সাধারণ অর্থে প্রযুক্তিবিদ্যা বলতে যা বোঝায় তা হল বিভিন্ন রকম বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জাম এবং শিল্পের প্রয়োগ

কৌশল। কিন্তু সমাজবিদেরা প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নে সামাজিক এবং মানসিক প্রস্তুতি, উভয় দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সমাজবিদেরা মনে করেন, প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নকল্পে যথাযথ মানসিকতা এবং সামাজিকতার প্রয়োজন রয়েছে। সেজন্য জি. এম. ফস্টার (*G. M. Foster*) মন্তব্য করেন যে—"প্রযুক্তি-বিদ্যার উন্নয়ন একটি জটিল পদ্ধতি। এর দ্বারা কেবলমাত্র পার্থিব (material) এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত উন্নতিই বোঝায় না, এর দ্বারা সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিরও উন্নতি বোঝায়।'

সমাজবিদেরা প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কারণগুলি আলোচনা করেছেন। সমাজবিদ কিংসলে ডেভিস (*Kingsley Devis*) প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নয়নে নিম্নলিখিত সামাজিক কারণগুলিকেই মূখ্য বলে মনে করেন।

প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নে প্রথম কারণ হিসেবে ডেভিস সামাজিক মূল্যমানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানসিকতার এবং মূল্যমানের তারতম্যের জন্য প্রত্যেক সমাজে সামাজিক পরিবর্তন সমানভাবে সম্পন্ন হয় না। রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থা, যা প্রাচীন এবং গতানুগতিক, তার পরিবর্তনে বিশেষ উৎসাহ বোধ করে না। কিন্তু যদি কোন সমাজ পরিবর্তনশীলতাকে খোলা মনে গ্রহণ করতে পারে এবং সব কিছুকেই ব্যবহারিক উপযোগিতার দিক থেকে বিচার করার মত মানসিকতার অধিকারী হতে পারে তাহলে সে-সমাজে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়, বলা চলে। অবশ্য সমাজস্থ ব্যক্তিদের মানসিক প্রগতির যে অভি-ব্যক্তি তা সমাজ ভেদে পরিবর্তিত হয়, কারণ কেবলমাত্র পরিবর্তনের জন্যই পরিবর্তনকে কোন সমাজই সরল মনে গ্রহণ করতে পারে না। পরিবর্তনশীলতা যদি যুক্তির (rationalisation) ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে সেই পরিবর্তনের ফল সুদূরপ্রসারী হয় না এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নও যথাযথভাবে সম্পাদিত হয় না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর এবং লৌকিক (empirical) প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার পিছনে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে। হিন্দুসমাজে পূর্বে যে সামাজিক আচার এবং চিরাচরিত রীতিনীতি প্রচলিত ছিল তা নতুন সামাজিক পরিবর্তনের অন্তরায় স্বরূপ ছিল। যা গতানুগতিক তার সংরক্ষণের ওপরেই তদানীন্তন সমাজ গুরুত্ব আরোপ করত। ফলে আশানুরূপ-ভাবে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন সাধিত হয়নি। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে ধর্মবিপ্লবের আগে রক্ষণশীল মানসিকতা প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নে বাধা স্বরূপ ছিল। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মে নিরাসক্ত অপার্থিব (non-material) জীবনের ওপর যেভাবে গুরুত্ব

আরোপ করা হয়েছে, পার্থিব (material) জীবনের ওপর সেই অনুপাতে হয়নি। ফলে পার্থিব জীবনের পরিবর্তনকে খোলা মনে এই সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ফলে পাশ্চাত্যদেশের মত প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন সমানভাবে সাধিত হয় নি। বর্তমান সমাজকে গতানুগতিক সমাজ থেকে পৃথক করার অন্যতম মূখ্য কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা।

দ্বিতীয় কারণ হিসেবে ডেভিস মন্তব্য করেন যে, সমাজে প্রধান মূল্যগুলির অবস্থিতিই প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নয়নের একমাত্র কারণ নয়। যথাযথ সামাজিক সংগঠন যদি না থাকে তাহলে প্রধান মূল্যগুলি কার্যকরী হতে পারে না। সমাজে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে যার মাধ্যমে মূল্যগুলি বিকশিত হয়। যে পদ্ধতি সমাজে প্রতিযোগিতার এবং সামাজিক সচলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তা প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের সহায়ক বলা চলে। রুদ্ধ সমাজের (closed society) বৈশিষ্ট্যই হল যে, এই সমাজে প্রতিযোগিতা এবং সামাজিক সচলতার যথার্থ অভাব এবং এজন্য রুদ্ধ গ্রাম্য সামাজিক সংগঠন প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নয়নের পক্ষে বাধাস্বরূপ। নতুন কিছু আবিষ্কার করার জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক মর্যাদারও যথাযথ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। একটি জিনিস উদ্ভাবনে নির্ধারিত সময় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের উৎসাহ দানের জন্য আকর্ষনীয় প্ররোচকের (incentive) ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং সামাজিক রীতিনীতিগুলিও সেই মর্মে গঠিত হওয়া উচিত।

তৃতীয় কারণ হিসেবে ডেভিস বিশেষীকরণের (specialisation) উল্লেখ করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, জীবন যেহেতু ক্ষণস্থায়ী এবং মানুষের বুদ্ধিও সীমিত, কাজেই একই ব্যক্তির পক্ষে সমাজের সর্বপ্রকার উন্নয়নে সাহায্য করা অসম্ভব ব্যাপার। সেজন্য তিনি মনে করেন, বিশেষীকরণ ছাড়া দক্ষতা অর্জন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এই বিশেষীকরণ কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিদের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের পার্থক্য নির্দেশ করে তাই নয়, এমনকি একজন বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিবিদ্যাবিশারদের সঙ্গে অন্য একজন বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিবিদ্যাবিশারদের বিশেষীকরণের ব্যাপারে পার্থক্যও বোঝায়।

উপরিউক্ত কারণ ছাড়াও যে সব কারণ প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নয়নে সহায়ক তার মধ্যে মুদ্রণযন্ত্র এবং গ্রন্থাগারের মূল্যও অপরিসীম। মুদ্রণযন্ত্রের মাধ্যমে একশ্রেণীর চিন্তাধারা অন্যশ্রেণীর মধ্যে প্রবিষ্ট করা সহজতর হয় এবং গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের পথ সুগম হয়।

প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নয়নের কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে ডেভিস এমন কতকগুলি সামাজিক কারণের কথা উল্লেখ করেছেন যা প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নে বাধাদান করে। পরিবর্তনশীলতায় অনাস্থা প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের পথে অন্যতম অন্তরায়। যে সমাজ অপার্থিব আধ্যাত্মিক জীবনের ওপর বিশেষ মূল্য আরোপ করে এবং পার্থিব জড় জগতের উন্নতিকে হেয় চক্ষে দেখে এবং যে সমাজ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সেই সমাজ প্রযুক্তিবিদ্যার অন্তরায়স্বরূপ।

তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, সমাজে সামাজিক সচলতার এবং প্রতিযোগিতার পথ উন্মুক্ত করাই যথেষ্ট নয়। প্রত্যেক সমাজই স্থায়িত্বের (stability) ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। সামাজিক সংগঠনের সংহতি শক্তি যদি বিনষ্ট হয় তাহলে প্রতিযোগিতা দ্বন্দ্বে পরিণতি লাভ করে। এই স্থায়িত্ব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি বিচ্ছিন্ন সমাজের (isloated) কথা উল্লেখ করেছেন যা প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নে বাধাস্বরূপ। যদি কোন অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাহলে একদিকে যেমন পারস্পরিক শিক্ষা এবং সংস্কৃতি বিনিময়ের পথ প্রশস্ত হয়না, অপরদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যও উন্নতিলাভ করতে পারে না। এহেন সমাজব্যবস্থা প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের অন্তরায় স্বরূপ।

সমাজের উপর প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাব : প্রথমতঃ, ব্যাপক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তনের ফলেই বর্তমান শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ছাড়া বৃহদায়তন শিল্প সম্ভব ছিল না। শিল্প এবং কৃষিকার্যের উৎপাদন প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ অনেকগুণ বৃদ্ধি করেছে। বিশেষ করে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

দ্বিতীয়তঃ, মুক্ত সমাজের (Open society) উদ্ভবে 'প্রযুক্তিবিদ্যার অবদান অস্বীকার করা যায় না। প্রযুক্তিবিদ্যার ফলে যেমন নানাবিধ বৃত্তির (profession) সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি নানাবিধ মর্যাদা অনুসারী শ্রেণীরও (Status group) উদ্ভব হয়েছে।

তৃতীয়তঃ, প্রযুক্তিবিদ্যার ফলে জীবনযাত্রার মানও (Standard of living) উন্নত হয়েছে। নতুন নতুন জিনিসের উৎপাদন আগের তুলনায় সহজতর হয়েছে, যেমন কৃত্রিম বস্ত্রাদি। অল্প আয়াসে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য সহজলভ্য হয়েছে এবং যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ফলে মানুষের পক্ষে স্বল্প সময়ে অধিক কাজ করা যেমন সম্ভব হয়েছে, তেমনি শ্রমিকের অবসরের সময় বৃদ্ধি পেয়েছে।

সবশেষে উল্লেখ করা যায় যে, প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নয়ন রাষ্ট্রের কার্যাবলীকেও প্রভাবিত করেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃহদায়তন শিল্পের যেমন প্রচলন বেড়েছে, সেরূপ জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের কার্যাবলীও সেই অনুপাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

৩। শিল্পায়নের সমাজতাত্ত্বিক ফলাফল (Sociological effects of industrialisation) :

শিল্পায়ণ এবং মানবসভ্যতা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের জীবন যাপনের পদ্ধতি, চিন্তাধারা এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্পায়নের প্রভাবে প্রভাবিত। এক কথায় শিল্পায়ণের প্রভাব আমাদের সামাজিক জীবনের সর্বত্রই প্রসারিত।

শিল্পায়ণের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক জীবনে নানাবিধ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কৃষিভিত্তিক পরিবারই পূর্বে প্রধানতঃ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান-রূপেই গণ্য হোত। কিন্তু বর্তমানে পরিবারের এই অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিবারের কাছ থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে উৎপাদনের সংস্থা পরিবার নয়, শিল্পসংস্থাগুলি। প্রাক্‌শিল্প যুগে পরিবারগুলি সাধারণতঃ রন্ধনকার্য এবং সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষণ কার্য সম্পাদন করত কিন্তু শিল্পায়ণের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের পক্ষে এই কার্যগুলি সম্পন্ন করা আর সম্ভব হল না।

উৎপাদনের কার্যে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ই সমান তালে অংশগ্রহণ করে। পরিবারের শিক্ষামূলক এবং সামাজিকীকরণের কার্যাবলীও বর্তমানে পরিবার ছাড়াও অন্যান্য সংস্থার উপর অর্পিত হয়েছে। পূর্বের যৌথপরিবারের গঠনও আগের মত রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। শিল্পায়ণের সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনেরও উন্নতি সাধিত হয়েছে, ফলে গ্রাম্য এবং শহর জীবনের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি সাধিত হওয়াতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক পরিমাণে দূরীভূত হয়েছে। শহরাঞ্চলের সামাজিক জীবনের সংস্কৃতি গ্রাম্য জীবনেও আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। কৃষিভিত্তিক গ্রাম্যজীবনে ব্যক্তিদের পক্ষে সামাজিক সচলতার (Social mobility) একরূপ রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু শিল্পায়ণের সঙ্গে সঙ্গে একই ব্যক্তির পক্ষে বৃত্তি পরিবর্তন অনেক পরিমাণে সহজতর হয়েছে এবং বৃত্তি অনুসন্ধানে একই ব্যক্তির পক্ষে দূর দেশে পাড়ি দেওয়াও সহজতর হয়েছে।

শিল্পায়ণের এই প্রভাব পারিবারিক জীবনের অন্যত্রও লক্ষীয়। মর্যাদার ক্ষেত্রেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সাম্য রক্ষা করা সম্ভবপর হয়েছে। প্রাক্‌-শিল্পযুগে

মেয়েদের অর্থ নৈতিক কোন স্বাধীনতা ছিল না বলা চলে। ফলে পরিবারে তার ভূমিকাও ছিল গৌণ। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হয়েছে।

স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে, শিক্ষাক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধার জন্য তাকে আর পরামুখাপেক্ষী (dependence) হয়ে থাকতে হয় না এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা তাদের মনকে আর ভারাক্রান্ত করে তোলে না। প্রাচীন আচার ব্যবহারের (custom) মূল্য অনেক পরিমাণে অন্তর্হিত হয়েছে। এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের (social control) সংস্থা হিসেবে গতানুগতিক প্রাচীন প্রথাগুলির মূল্য অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কলকারখানায় কর্তৃত্বমূলক (Authroritarian) জীবনের প্রভাবও বিশেষ লক্ষ্যণীয়। শিল্পায়ণের প্রভাবে পারিবারিক সম্পর্কও নিয়ম মাফিক হয়ে পড়েছে। শিল্পায়ণের ফলে অর্থ নৈতিক নিরাপত্তা যেমন রক্ষিত হয় তেমনি চাহিদা এবং যোগানের ভারসাম্যের অভাবে অনেক সময় ব্যক্তিগত জীবনে অনিশ্চয়তা এসে পড়ে। বাজার দরের আকস্মিক পরিবর্তন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ, শিল্পভিত্তিক সমাজে সাধারণতঃ অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠার দ্বারাই ব্যক্তির মর্যাদা নির্ধারিত হয়; কিন্তু এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা (social status)-কেও তা আঘাত করে। বাক্ক (*Bakke*) তাই মন্তব্য করেন যে, কোন বিশেষ বৃত্তি শুধুমাত্র ব্যক্তির কেবল জীবিকা অর্জনের সহায়তা করে না, বৃত্তি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সামাজিক মর্যাদা দান করে এবং জীবনকে অর্থবহ করে তোলে।

শিল্পায়ণ নগর জীবনের স্রষ্টা। স্বাভাবিক কারণেই শহরাঞ্চলে শ্রমিকদের বাসস্থানের জন্য নানাবিধ বস্তিরও উদ্ভব হয়। কিন্তু বস্তি অঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ফলে নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এবং এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশই নানাবিধ কিশোর দুষ্ক্রিয়তার (juvenile Delinquency) সৃষ্টি করে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণও সম্ভবপর হয় না।

শিল্পায়ণের ফলে জাতিভেদ প্রথার রক্ষণশীলতা ও মন্দ প্রভাব অনেক পরিমাণে দূরিভূত হয়েছে। জাতিগত বৃত্তি শিল্পভিত্তিক সমাজে এক রকম নেই বললেই চলে। জাতির ভিত্তিতে মর্যাদাও নিরূপিত হয় না। বিভিন্ন জাতিভুক্ত ব্যক্তিরা একত্রে যাতায়াত করে, একত্রে খাওয়া দাওয়া করে এবং একত্রে কাজকর্ম

করে। বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থা, বৃত্তিমূলক এবং রাজনৈতিক সংগঠনগুলি জাতি সম্পর্কে তাদের মানসিকতাকে অনেক পরিমাণে বর্জন করেছে।

জীবনযাপনের মানও (Standard of living) শিল্পায়ণের ফলে উন্নততর হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদনের ফলেই তা অনেক পরিমাণে সম্ভব হয়েছে। প্রযুক্তিবিদ্যা (Technology) দুটি কারণে জীবন যাপনের মানকে উন্নত করেছে।

প্রথমতঃ, প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যক্তির অবসর বিনোদনের পথ সুগম করেছে এবং দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন উন্নত ধরনের ব্যবহার্য সামগ্রীর উৎপাদনের ফলে জীবনযাপনও উন্নততর হয়েছে যা পূর্বে একপ্রকার অকল্পনীয় ছিল।

৬। শ্রমবিভাগ ও বিশেষিকরণ (Division of labour and specialisation) ঃ

শ্রমবিভাগ এবং বিশেষিকরণ আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আদিম সমাজে বর্তমানের মত শ্রমবিভাগ ছিল না বলা চলে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ চেষ্টায় তার প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা করত এবং প্রত্যেককে প্রত্যেক কাজই একই ভাবে সম্পাদন করতে হত। একই ব্যক্তি কখনও শিকার করত, আবার কখনও মাছ ধরার কাজে নিযুক্ত থাকত, আবার কখনও কাঠের কাজও করত। ক্রমে সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাজের ধরনও পরিবর্তিত হয়। একই ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার কাজে নিযুক্ত থাকার পরিবর্তে উৎপাদনের কোন একটি কাজেই নিযুক্তথাকে, যে কাজটির পক্ষে সে বিশেষভাবে উপযুক্ত। এইভাবে নিজ পরিশ্রমে উৎপন্ন দ্রব্যেরে অতিরিক্ত অংশ অপরের কাছে বিক্রি করত। এই ধরনের শ্রমবিভাগকে সহজ (simple) শ্রমবিভাগ বলে। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক শিল্পশ্রেণীর সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমবিভাগও জটিল রূপ (complex) ধারণ করেছে। বর্তমানে কোন একটি দ্রব্যের উৎপাদনের পদ্ধতি এত জটিল যে তা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর পর্যায়ে শ্রেণীবিভক্ত। কোন একজন শ্রমিক কাজটির সেই অংশটিই সম্পাদন করে যেটির জন্য সে বিশেষরূপে দক্ষতা অর্জন করেছে। বর্তমানে শ্রমবিভাগের সঙ্গে কার্যের বিশেষিকরণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান যাকে কোনমতেই উপেক্ষা করা চলে না।

অর্থনীতিবিদ্ এডাম স্মিথ (*Adam Smith*) শ্রমবিভাগ এবং বিশেষিকরণকে অর্থনীতির দিক থেকেই বিচার করেছেন। একটি পিন উৎপাদনের তিনি যে আঠারোটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন, তার থেকে বোঝা যায় উৎপাদন দক্ষতার

দিকটিই বিশেষভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু সমাজবিদেরা শ্রম-বিভাগ এবং বিশেষিকীকরণ নিয়ে যখন আলোচনা শুরু করেন তখন এর সামাজিক প্রতিক্রিয়ার দিকটিই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেন। এ ক্ষেত্রে এমিল ডুর্খাইম (*Emile Durkheim*) এবং কার্ল মার্কসের (***Karl Marx***)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডুর্খাইম প্রাচীন সমাজের তুলনায় আধুনিক সমাজের সামাজিক সংহতি (social solidarity) রক্ষায় শ্রমবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি এই সংহতিকে যান্ত্রিক সংহতি (mechanical solidarity) এবং সাংগঠনিক সংহতি (organic unity)—এই দুইভাবে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। প্রাক-শিল্পযুগে জনগণের আচার-আচরণ এবং চিন্তাধারার ফলে শ্রমবিভাগের দ্বারা সামাজিক সংহতি রক্ষা করা সম্ভব হোত। এই শ্রমবিভাগকে যান্ত্রিক বলার অর্থ হল, এর মধ্যে ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোন স্থান নেই। শিল্প-সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে যখন জনগণের আচার-আচরণ, ব্যবহার, চিন্তাধারা প্রভৃতির ক্ষেত্রে একাত্মতার অভাব দেখা যায় তখনই সেই পরিবর্তিত অবস্থাকে ডুর্খাইম সাংগঠনিক সংহতি আখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য এই শ্রমবিভাগের ফলেই পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তরিকতার অভাব দৃষ্ট হয়, একজন আর একজনের সঙ্গে নিতান্ত স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং পরস্পর পরস্পরের ওপর অতিরিক্ত মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

তবে ডুর্খাইম এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, শ্রমবিভাগ সমাজে সংহতি রক্ষা করে আবার সংহতি বিনষ্টও করে। এই ধরনের সংহতিকে তিনি অস্বাভাবিক (abnormal) শ্রমবিভাগ বলেছেন। এই অস্বাভাবিক শ্রম-বিভাগকে তিনি আবার নিঃসঙ্গতাবর্ধক শ্রমবিভাগ (anomic division of labour) এবং বাধ্যতামূলক শ্রমবিভাগ (forced division of labour) এই দুইভাগে ভাগ করেছেন। নিসঙ্গতাবর্ধক শ্রমবিভাগ বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, শ্রমবিভাগের বিশেষিকীরণের ফলে শ্রমিক সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে এবং শ্রমিকের সঙ্গে মালিকের কোন সম্পর্কই থাকে না বলা চলে। বাধ্যতামূলক শ্রমবিভাগ বলতে তিনি মনে করেন, ব্যক্তি নিজ নিজ বৃত্তি নির্বাচনের কোন সুযোগ পায় না এবং যে কাজটির দায়িত্ব তার ওপর দেওয়া হয় সেই কাজটি তাকে বাধ্যতামূলকভাবে করতেই হয়। ফলে শ্রেণীসংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

এই অস্বাভাবিক শ্রমবিভাগজনিত সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে ডুর্খাইম দুটি পদ্ধতির কথা বলেছেন। একটি হল—নানাবিধ বৃত্তিমূলক সমিতি বা সংঘ (professional association and corporations) প্রতিষ্ঠা করা যাতে শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকে এবং দ্বিতীয়তঃ, মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে আলাপ আলোচনার পথ প্রশস্ত করা যার ফলে এই সমস্যার কিছু পরিমাণে লাঘব হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। ডুর্খাইমের এই প্রস্তাব বিভিন্ন শিল্পতান্ত্রিক সমাজ গ্রহণ করেছে। কার্ল মার্কসের (*Karl Marx*)-এর মতে শ্রমবিভাগই সামাজিক শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে। যারা মানসিক পরিশ্রমের কাজ করে এবং যারা কায়িক পরিশ্রম করে তারা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কৃষিভিত্তিক সমাজের শ্রমিকের সঙ্গে শিল্পভিত্তিক সমাজের শ্রমিকের পার্থক্য এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। এভাবে কর্মের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে শ্রমের বিভাজন যত সূক্ষ্ম হয় শ্রমিকের পক্ষে দক্ষতা অর্জন করা সম্ভবপর হয়ে পড়ে। ক্রমে ক্রমে উৎপাদন যন্ত্রের (instruments of production) সঙ্গে শ্রমিকরা নিবিড়ভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। অবশ্য সামাজিক স্তরবিন্যাসে শ্রমবিভাগের যে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে মার্কস্‌বাদে তা বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়।

শ্রমবিভাগের সামাজিক ফলাফলগুলিও লক্ষণীয়। শ্রমবিভাগ ব্যক্তির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং ফলে সমাজে একদিকে যেমন বিভিন্ন ধরনের বস্তু উৎপাদিত হয়, অপর দিকে ব্যক্তিদের পক্ষে অবসর বিনোদনও সম্ভবপর হয়। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শ্রমবিভাগ থেকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা বোধের (sense of alienation) উদ্ভব হয়। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিক মানবতা বর্জিত (dehumanised) হয়ে পড়ে সাধারণতঃ তিনটি কারণে। প্রথমতঃ, শ্রমিক সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তার কারণ, কেবলমাত্র উৎপাদনের একটি অংশের সঙ্গেই সে যুক্ত থাকে। সে কখনই ভাবতে পারে না যে সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থায় তার কোন বিশেষ অবদান রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, এই নিয়মমাফিক কাজের ফলে ব্যক্তি তার পরিবারবর্গ এবং আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তৃতীয়তঃ, সে নিজের থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে কারণ সে উপলব্ধি করে যে কর্মনির্বাচনে তার নিজ ইচ্ছার কোন মূল্য নেই। যে কাজ সে পছন্দ করে, সে কাজ তার পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে কার্যসম্পাদন থেকে কোন সন্তুষ্টিই তার আসে না এবং তার সৃজনীশক্তির বিকাশ

সাধিত হয় না। সে তার সম্পাদিত কাজটি নিজের বলেও ভাবতে পারে না। ফলে ব্যক্তির মধ্যে এক অপরিতৃপ্তির সৃষ্টি হয়।

শ্রমবিভাগের এবং অতিরিক্ত বিশেষিকরণের ফলে শ্রমিকের চারিত্রিক উন্নতিও ব্যাহত হয়। কাজটি তার কাছে যন্ত্রবৎ হয়ে পড়ে এবং যান্ত্রিকভাবে দীর্ঘকাল ধরে কার্যসম্পাদন হেতু সে ক্রমশঃ একটি যন্ত্রে পরিণত হয়।

৭। শিল্পায়ন এবং সামাজিক পরিবর্তন (Industrialisation and Social change) :

শিল্পায়ণের প্রভাব কেবলমাত্র সমাজের অর্থনৈতিক জীবনকেই প্রভাবিত করে না, বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোর সাধারণ জীবনকেও প্রভাবিত করে। শিল্পায়ণের প্রভাব সামাজিক জীবনে এতই ব্যাপক যে সমাজস্থ ব্যক্তিদের বিভিন্ন আচার-আচরণের এবং ব্যবহারের পরিবর্তনের মধ্যেই তা মূর্ত হয়ে ওঠে। এর প্রধান কারণ মানুষ সামাজিক কাঠামোর দাস।

কার্ল মার্কসের (*Karl Marx*)-এর মতে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন কেবলমাত্র ব্যবহারিক জীবনের (utilatarian) পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই সীমিত নয়, সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে সামাজিক মূল্যবোধ, আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবর্তিত হয়। তাই আমরা প্রাক-শিল্পযুগের ব্যক্তিদের জীবনধারা এবং শিল্পযুগের ব্যক্তিদের জীবনধারার মধ্যে দুস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করি। শিল্পায়ণের ফলে সামাজিক জীবনের এই পরিবর্তনকে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ, শিল্পায়ণের ফলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন এবং বণ্টনের জন্য সমাজস্থ ব্যক্তিরা অধিকতর আরামপ্রদ জীবনযাপনে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে স্বভাবতঃই ব্যক্তিদের পক্ষে সৃজনীমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করা সম্ভবপর হয়েছে। শিল্পায়ণের ফলে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, দর্শন প্রভৃতির বিকাশ লাভ করার পথ সুগম হয়েছে। প্রাক-শিল্পযুগীয় সমাজে মানসিক উৎকর্ষের বিকাশলাভের এ সুযোগ ছিল না বলা চলে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাক-শিল্পযুগীয় সমাজে সাধারণতঃ ব্যক্তিদের পেশা ছিল জাতিভিত্তিক। একই ব্যক্তির পক্ষে অন্যান্য কার্যে জ্ঞান লাভ করার তেমন সুযোগ ছিল না। কিন্তু শিল্পায়ণের ফলে সামাজিক সচলতার পথ সুগম হয়েছে এবং কোন বৃত্তিতে যোগদানের কারণ হিসেবে ব্যক্তির বর্ণগত পরিচয় অপেক্ষা

ব্যক্তিগত গুণাবলীই অগ্রাধিকার পেয়েছে। ফলে নিম্নবংশজাত ব্যক্তির পক্ষেও সামাজিক মর্যাদা লাভ করা অপেক্ষাকৃত সহজতর হয়েছে। আবার উচ্চবংশজাত ব্যক্তির পক্ষেও সামাজিক নিম্নস্তরে অধঃপতিত হবারও সম্ভাবনাও বর্তমান।

তৃতীয়তঃ, শ্রমিকের উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধির ফলে তার জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জীবনযাত্রার মানের আদর্শগত দিকের তুলনায় বস্তুগতদিকের ওপর গুরুত্ব অর্পণে শিল্পায়ণের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

চতুর্থতঃ, প্রাক-শিল্পযুগীয় কৃষি ভিত্তিক সমাজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল পরনির্ভরশীলতা। কিন্তু শিল্পায়ণের ফলে যে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা হল, প্রত্যেকের মধ্যেই আত্মনির্ভরশীলতার মানসিকতার বিকাশ। অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশিলতাই আত্মবিশ্বাসের পথ প্রশস্ত করে এবং এই আত্মবিশ্বাস ব্যক্তির চরিত্র গঠনে সহায়ক হয়। স্ত্রীলোকেদের ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পূর্বে স্ত্রীলোকেরা সমাজে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকত, ফলে দাসত্বমূলক মনোভাববশতঃ তারা সমাজে লাঞ্ছিতা এবং নিপীড়িতা রূপে গমণ্য হত। কিন্তু শিল্পায়ণের ফলে স্ত্রীলোকেদের মধ্যে পুরুষদের সঙ্গে সমান মর্যাদা অর্জনের জন্য তীব্র সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। এই সামাজিক মর্যাদা তাদের জীবনধারা, আদর্শ, শৃঙ্খলাবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করে এবং এই প্রভাব এমনকি পারিবারিক জীবনেও প্রতিফলিত হয়।

পঞ্চমতঃ, শিল্পায়ণের জন্য সামাজিক সংহতি বজায় রাখাও সম্ভব হয়েছে বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। ব্রাউন (*J. A. C. Brown*) বলেন যে, শিল্প সংগঠনগুলির মধ্যে নানাধরণের কর্মরত গোষ্ঠীর (working groups) সাক্ষাৎ মেলে। একই ধরনের কার্যের ভিত্তিতে প্রাথমিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই সমস্ত গোষ্ঠীর সদস্যদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক আন্তরিকতাপূর্ণ এবং সৌহার্দ্রপূর্ণ হয়। শিল্পের কোন একটি সমস্যার ভিত্তিতে নানা ধারনের গোষ্ঠীও গড়ে ওঠে। আন্তরিকতার সম্পর্কে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এই সব গোষ্ঠীগুলির প্রভাব কেবলমাত্র শ্রমিকদের ব্যক্তিগত জীবনকেই যে প্রভাবিত করে তা নয়, বৃহত্তর সামাজিক জীবনের পরিবর্তনেও এই গোষ্ঠীগুলির মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে। যদি এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলির সম্পর্ক মধুর হয় তাহলে সামাজিক জীবনও সুখপ্রদ ও শান্তিদায়ক হয় এবং তা সামাজিক সংহতি বজায় রাখার পক্ষে খুবই অনুকূল হয়।

প্রত্যেকটি সৃষ্টিই তার পিছনে ধ্বংসের বীজ বহন করে আনে। প্রথমতঃ, শিল্পায়ণের ফলে যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে সেগুলির যেমন কতকগুলি ভাল দিক আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, আবার শিল্পায়ণের ফলে এমন কতকগুলি সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সংগঠিত হয় যা সমাজ জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর। শিল্প-সংগঠনগুলি কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তুর সৃষ্টিতেই ব্যস্ত। শিল্পসভ্যতার ক্ষেত্রে যত বেশী বাস্তব জীবনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়, ততই মানবিক মূল্যগুলির অবহেলিত হবার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। এর পরিণতি নিঃসন্দেহে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। দ্বিতীয়তঃ, অনুন্নত দেশে শ্রমিকদের বাসস্থানগুলি ঠিক বসবাসের উপযোগী হয় না, তাদের অতৃপ্তিজনিত জীবনধারণ শিল্পাঞ্চলের পরিবেশকে অস্বাস্থ্যকর এবং নৈরাশ্যজনক করে তোলে। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ যে কেবলমাত্র দৈহিক স্বাস্থ্যের দিক থেকেই ক্ষতিকর তাই নয়, মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশের পক্ষেও ক্ষতিকর। এ সব কিছুর সামগ্রিক ফল বৃহত্তর সামাজিক জীবনকে মন্দভাবে প্রভাবিত করে যার ফলে নৈতিক মূল্যমানের অবনতি ঘটে এবং সমাজে নানাপ্রকার দুষ্ক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। স্ত্রীলোকের চাকরির ফলে পারিবারিক জীবনে নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়। সন্তানের যথাযথ পরিচর্যা হয় না, সময় সময় স্বামী-স্ত্রীর সহজ সম্পর্কে ভাঙন ধরে। কোন কোন সমাজবিদের মতে কর্মরত মহিলার সন্তান যে মাতার সাহচর্য থেকে কর্মরত অবস্থায় বঞ্চিত হয় তাই নয়, যখন মাতা গৃহে ফেরেন তখনও বঞ্চিত হয়। তার কারণ, ক্লান্ত মাতার পক্ষে সন্তানের যথাযথ পরিচর্যা করা সম্ভব হয় না। তা ছাড়া, যে নৈরাশ্যজনক এবং ক্লেদাক্ত পরিবেশে শ্রমিকেরা বসবাস করে, তা তাদের মধ্যে হীনমন্যতার বোধ (inferiority complex) সৃষ্টি করে যা সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। শ্রমিক অসন্তোষ কম-বেশী প্রত্যেক শিল্প সংগঠনের বৈশিষ্ট্য। শ্রমিক অশান্তি যে কেবলমাত্র জাতীয় অর্থনীতিকেই বিঘ্নিত করে তাই নয়, সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলাকেও নষ্ট করে। এই শ্রমিক বিক্ষোভের ফল এত মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে যে, সমাজের সাধারণ জীবনকে অচল করে দিতে পারে। শিল্পায়ণের ফলে শ্রমিকের শক্তির যথাযথ সদ্ব্যবহার হয় না এবং শ্রমিক একটি যন্ত্রে পরিণত হয়। অতিরিক্ত বিশেষীকরণের ফলেও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে এবং বৃহত্তর সমাজে অংশ গ্রহণে অনেক সময় সে অপারগ হয়। এ সব কিছুর সামগ্রিক প্রকাশ সামাজিক জীবনের পরিবর্তনে আত্মপ্রকাশ করে।

৮। উন্নত দেশে কৃষি এবং শিল্প (Agriculture and Industry in developing countries) :

আদিম সমাজ এবং উন্নত সমাজের যে মূলগত পার্থক্য তা হল, আদিম সমাজে কৃষিকার্য এবং শিল্পায়ণের যথাযথ উন্নতিসাধন সম্ভব হয়নি। বর্তমানে যে দেশগুলিকে প্রধানতঃ আমরা 'উন্নত' আখ্যা দিই তার অন্যতম কারণই হল সেই দেশগুলিতে কৃষিকার্য এবং শিল্পের যথাযথ উন্নতি সাধিত হয়েছে। উন্নত দেশে কৃষিকার্য এবং শিল্পায়ণের আলোচনার প্রারম্ভে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভৌগোলিক এবং বাণিজ্যিক দিক থেকে কৃষি এবং শিল্পের আলোচনা সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু নয়। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেই কৃষি ও শিল্পের আলোচনা সমাজবিদ্যার মুখ্য আলোচ্য বিষয়। উন্নতদেশে কৃষি এবং শিল্পের ভূমিকা পৃথকভাবে আলোচনা করা দরকার।

কৃষিকার্যের প্রধান লক্ষ্যই হল জমির উন্নতিসাধন করে লাভজনক শস্য উৎপাদন করা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করে সেচকার্যের ব্যবস্থা করা। কৃষিকার্যে যেহেতু জলবায়ু এবং মৃত্তিকা নিয়ামক হিসেবে কাজ করে, সেজন্য উন্নত দেশগুলিতে মৃত্তিকার উন্নতিসাধন এবং বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন—এই দুটি বিষয়ের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তবে এও লক্ষ্য করা যায় যে, পৃথিবীর অনেক দেশে কৃষিকার্যে এখনও পর্যন্ত উন্নতশীল পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়নি। অনেক দেশে শস্য উৎপাদিত হয় কেবলমাত্র উৎপাদকদের ভোগের জন্য, ব্যবসায়িক দিক থেকে সেই অনুপাতে উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তবে উন্নতশীল দেশগুলিতে সেদিকে যথাযথ নজর রাখা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হয়, যেমন—শস্য উৎপাদনই যথেষ্ট নয়, সেই শস্য বিক্রয়ের জন্য কাছাকাছি বাজার থাকাও প্রয়োজন। সেজন্য উন্নত দেশগুলিতে কৃষিকার্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনের উন্নতিসাধনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় এবং উৎপন্ন পণ্যের বিক্রয়ের সুব্যবস্থাও করা হয়। কাছাকাছি বাজার বলতে কেবলমাত্র কৃষিজমির কাছাকাছি বাজারের অবস্থিতিই বোঝায় না, উৎপন্ন দ্রব্য যাতে যথাযথ মূল্যে বিক্রীত হয় তাই বোঝায়—কারণ কৃষিকার্যের সঙ্গে শ্রমের মূল্যের (cost of labour) প্রশ্নও জড়িত।

উন্নত দেশগুলিতে অন্যান্য দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়—যেমন, শস্য উৎপাদন প্রণালী। জাপান এবং অন্যান্য উন্নত দেশে একই জমিতে বছরে দু-চারবার শস্য উৎপাদনের (double cropping) ব্যবস্থা করা হয়। একই জমিতে বছরে

ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের লাভজনক শস্যও উৎপন্ন করা হয়। কৃষি কার্যের পদ্ধতিতেও বিভিন্নদেশে বিভিন্নপ্রকার উন্নত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ভারতে এবং চীনে সেচকার্যের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উন্নতদেশে কৃষিকার্য কেবলমাত্র প্রকৃতির ওপরই নির্ভরশীল নয়। উন্নতশীল দেশে সেচকার্যের জন্য ক্যানেল এবং কূপ খনন করে কৃষিকার্যের সুব্যবস্থা করা হয়। তা ছাড়া উন্নতশীল দেশ যেমন, আমেরিকায় শুষ্ক চাষের (dry farming) প্রচলনও দেখা হয়। সেখানে এমন অনেক কৃষিজমি রয়েছে যেখানে ঠিকমত সেচ-কার্যের সুব্যবস্থা করা অসম্ভব। আমেরিকায় এমনও কৃষি অঞ্চল রয়েছে যেখানে বৎসরে ২০ ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত হয়, ফলে সেই সকল অঞ্চল এতকাল চাষের পক্ষে অব্যবহার্য ছিল। কিন্তু শুষ্ক চাষের মাধ্যমে সেই অঞ্চলগুলিকেও চাষের উপযোগী করা সম্ভব হয়েছে। গভীর কূপ খননের দ্বারা জলের অভাব মেটান হয় এবং কৃষি জমিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে তাতে বৃষ্টির জল যাতে ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পৌঁছতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়।

ভারতে শিল্পোন্নয়ণ সত্বেও কৃষির গুরুত্ব কিন্তু হ্রাস পায়নি। ভারতের জনসংখ্যার অধিকাংশই কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৬৮-৬৯ সালের জাতীয় আয়ের হিসেবে দেখা যায় যে, জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৪৩·৯ ভাগ কৃষি থেকে উৎপাদিত। ভারতীয় শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হিসেবে কৃষিজাত দ্রব্যের গুরুত্বও দিন দিন বেড়ে চলেছে। চিনি শিল্প, পাটকল শিল্প, বস্ত্রশিল্প ইত্যাদি কৃষিজাতদ্রব্য কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল। সেইজন্য উপরিউক্ত শিল্পগুলির উন্নতিসাধনের জন্য কৃষির গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। ১৯৪৯-৫০ সালের ফিস্‌ক্যাল কমিশন (Fiscal Commission) ভারতের সমাজজীবনে কৃষির গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য নির্দেশ দান করেছেন। ভারতের সমাজ এবং অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে এই কমিশন আলোকপাত করেছেন। বর্তমানে কৃষির আধুনিককরণের এবং এর সঙ্গে জড়িত শিল্পপ্রসারের দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। চাষের জমির তিন-চতুর্থাংশ খাদ্যজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য এবং বাকী অংশ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য কাজে লাগান হয়। কৃষির উন্নতির জন্য যেমন সেচকার্য এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, আবার ভূমি সংস্কারের দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কৃষকরা যদি তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে স্বভাবতঃই উৎপাদনও বিঘ্নিত হবে। সেজন্য কৃষকদের মধ্যে ভূমিদানের ওপরও জোর দেওয়া হচ্ছে। উন্নত চাষের জন্য উন্নত বীজ

সংরক্ষণও করা হয়। দিল্লীর ভারতীয় কৃষিকার্য গবেষণাগার (Indian Research Institute of Delhi) উন্নত ধরনের চাষের জন্য বিভিন্নরকম গবেষণার ওপর জোর দিয়ে কৃষিকার্যের উন্নতিতে সহায়তা করে চলেছে। বিভিন্ন কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়ও চাষের উন্নত প্রণালী সম্পর্কে সমীক্ষা চালাচ্ছে। এই সমস্ত উন্নত ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে দেশে সবুজ বিপ্লব (Green Revolution)-এর আলোড়ন সমগ্র দেশকে আলোড়িত করবে বলে অনেকেই আশা পোষণ করেন। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (Five-year Plans) মাধ্যমে কৃষির ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অনেকেই আশা প্রকাশ করেন যে, ভারত যেহেতু কৃষিভিত্তিক দেশ সেজন্য কৃষির ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হলে শিল্পপ্রসারের ক্ষেত্র দিনে দিনে আরও প্রসারিত হবে এবং অন্যদিকে জনগণের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানও উন্নত হবে।

উন্নত দেশগুলিতে কৃষির ওপর যেমন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, শিল্পোন্নয়ণের প্রতিও সমানভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। অনেক উন্নতশীল দেশে আবার কৃষিকার্য অপেক্ষা শিল্পোন্নয়ণের দিকেই অধিক নজর দেওয়া হয়েছে। ব্রিটেন হল সর্বপ্রথম দেশ যারা বাণিজ্যিক এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে পরিবর্তিত করতে সমর্থ হয়েছে। এছাড়া, বর্তমান পৃথিবীতে শিল্পভিত্তিক দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইডেন, জাপান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উপরিউক্ত দেশগুলি সংস্কৃতি এবং বাহ্যিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির বুনিয়াদ তৈরি করেছে যা পৃথিবীর অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলিকেও উৎসাহিত করছে। যদিও উন্নত দেশগুলির শিল্পোন্নয়ণের এবং অনুন্নত দেশগুলির শিল্পোন্নয়ণের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য বিদ্যমান, তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, উন্নত দেশগুলির শিল্পোন্নয়ণের প্রচেষ্টা পৃথিবীর অনুন্নত দেশের জনগণের দৃষ্টিভঙ্গীর আধুনিককরণে সাহায্য করেছে।

শিল্পায়ণের প্রারম্ভিক অবস্থায় কাঁচামাল ও কয়লার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সেজন্য স্বভাবতঃই যেসব অঞ্চলে কাঁচামাল এবং কয়লা সহজপ্রাপ্য ছিল সেই স্থানগুলিতেই শিল্পগুলির অবস্থান অঞ্চলগত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু বিজ্ঞানের কল্যাণে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি এবং বিদ্যুৎ শক্তির উদ্ভাবনের ফলে শিল্পগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসার লাভ করে। তাই বর্তমান সভ্যতা যেন যান্ত্রিক সভ্যতায় পর্যবসিত হয়েছে। বর্তমানে উন্নতশীল দেশগুলিতে শিল্পোন্নয়ণের পক্ষে উৎপাদনের ব্যয় (cost of production) নির্ধারণে

সরকারী নীতি, অর্থ নৈতিক উন্নতিতে স্থানীয় অঞ্চলের ভারসাম্য, কর্মকর্তাদের যোগ্যতা এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও উন্নত দেশগুলিতে শিল্পোন্নয়ণের পথ সুগম করেছে। যেমন—প্রত্যেক দেশই তৈল উৎপাদন করে না কিন্তু এমন কোন দেশ নেই, যে দেশের শিল্পে তৈল ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু তৈল জাহাজের (tankers) জন্য তৈল প্রাপ্তিও যেমন সহজ সাধ্য হয়েছে আবার খরচও কম পড়ে। বর্তমানে উন্নতশীল দেশগুলিতে শিল্পায়ণের পদ্ধতি যেরূপ জটিলাকার ধারণ করেছে তাতে শিল্পে শ্রমিকের দক্ষতা এবং শ্রমবিভাগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি ছাড়া কোন শিল্প উন্নতি লাভ করতে পারে না। সেইজন্য শিল্পোন্নত দেশগুলিতে প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে ব্যক্তি ক্ষমতার (man-power) যথাযথ সদ্ব্যবহারের. ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অনুন্নত দেশগুলিও দেশের শিল্পায়ণের জন্য উন্নত দেশগুলি থেকে প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিদর্শীদের নিয়ে আসার ওপর জোর দিচ্ছে। উন্নত দেশগুলিতে তাই একদিকে যেমন শিল্পায়ণের চেষ্টা করা হচ্ছে আবার শিল্পায়ণের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির দিকেও লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। একটি অপরটির পরিপূরক হিসেবেই কাজ করে। প্রযুক্তিবিদ্যার মন্থর গতি শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রতিক্রিয়া সূচিত করে।

ভারতে শিল্পোন্নয়ণের প্রকৃতি যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যায় যে—শিল্পোন্নত দেশের শিল্প ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে বিদ্যমান। ব্রিটিশ আমলে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে শিল্পগুলিকে প্রসারিত করা হয় নি। ফলে ভোগ্য বস্তুর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু শিল্পে মূলধন বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তা ছাড়াও শিল্পের আঞ্চলিকতা বা স্থানীয়করণ (localisation) শিল্পের অসামঞ্জস্যতা সূচীত করে। সেজন্য চিনি শিল্প, পাটকল শিল্প, বস্ত্রশিল্প কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তবে স্বাধীনতার পরে শিল্পোন্নয়ের দিকে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে যদিও কৃষির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ পরিকল্পনায়ও এই নীতি আরও ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনাকারীগণ উপলব্ধি করেছেন যে, ভারতের বর্তমান অনুন্নত অবস্থার কারণ হওয়ার মূলে কৃষির ওপর অধিক নির্ভরশীলতা। তাই কৃষির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পোন্নয়ণের দিকেও ক্রমশঃ লক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে।

অনুশীলনী

১। প্রাক্-শিল্পযুগের অর্থনীতির পরিচয় দাও (Give an idea regarding pre-industrical economy)।

২। শিল্পায়ণের অনুকূল কারণগুলি আলোচনা কর (Discuss the factors favourable for industrialisation)।

৩। প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের কারণগুলি আলোচনা কর। কোন্ কোন্ কারণগুলিকে তুমি শিল্পায়ণের বাধাস্বরূপ মনে কর ? (Discuss the causes of the development of technology. What factors do you consider to be the hindrances of technological development ?)

৪। শিল্পায়ণের সামাজিক ফলাফলগুলি আলোচনা কর (Discuss the sociological effects of industrialisation)।

৫। শিল্পভিত্তিক সমাজে শ্রমবিভাগ এবং কর্মের বিশেষীকরণ সম্পর্কে আলোচনা কর (Discuss about the division of labour and specialisation in industrial society)।

৬। সামাজিক পরিবর্তনে শিল্প সংগঠনগুলি কিভাবে সাহায্য করে (How do the industrial organisations help in changing the society ?)।

৭। উন্নতশীল দেশে কৃষি এবং শিল্পের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর (Discuss the role played by agriculture and industry in developing countries)।

চতুর্থ অধ্যায়

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ
(Political Institutions)

১। ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের প্রকৃতি (Nature of power and authority) :

রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মূলতঃ পার্থক্য হল, রাষ্ট্র চরম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আইন প্রণয়নের এবং আইন বলবৎ করার চরম ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে প্রদত্ত। সেজন্য অনেকে রাষ্ট্রকে ক্ষমতার আধার হিসেবে গণ্য করেন। ম্যাকিয়াভেলি (*Machiavelli*) ছিলেন এই মতের সমর্থক। কিন্তু এই মত সকলেই গ্রহণ করেন না। শক্তি (might) রাষ্ট্রের অবশ্যম্ভাবী অংশ তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু শক্তিই যে রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি তা বলা চলে না। শক্তি বা বলপ্রয়োগের দ্বারা যা যথার্থ তা গঠিত হয় না, বরং যা যথার্থ বলে বিবেচ্য হয় তার প্রয়োগের জন্য বলপ্রয়োগের সমর্থন করা হয়। অর্থাৎ বলপ্রয়োগ করার ক্ষমতাকে আমরা উপায় (means) বলতে পারি কিন্তু তা কোন অবস্থাতেই উদ্দেশ্য (end) বলে পরিগণিত হতে পারে না। যখন জনগণের কল্যাণের জন্য কোন শক্তি প্রয়োগ করা হয় তখনই কেবলমাত্র তা সমর্থনযোগ্য। আমরা রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ সমর্থন করি তার কারণ হল—যখন আমরা রাষ্ট্রের নীতি মান্য করি তখন যা আমরা নীতিগতভাবে সমর্থন করি তাকেই আমরা মান্য করি। যাঁরা মনে করেন রাজনীতি হল কেবলমাত্র ক্ষমতার দ্বন্দ্ব (struggle for power) তাঁদের সমালোচনা করে হলওয়েল (*Hallowell*) যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, ক্ষমতার সম্পর্ক কোন একপাক্ষিক ব্যাপার নয়, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কই এর ভিত্তি। পাশবিক শক্তি বা উলঙ্গ ক্ষমতা রাষ্ট্রকে কোন অবস্থাতেই টিকিয়ে রাখতে পারে না। যখন ক্ষমতা কর্তৃত্বে (authority) পরিণত হয় তখনই তা হয় রাষ্ট্রের স্তম্ভস্বরূপ। ক্ষমতা তখনই কর্তৃত্বের রূপ গ্রহণ করে যখন তা সুসংবদ্ধ ও আয়ত্তাধীন হয় এবং তা জনহিতার্থে নিয়োজিত হয়।

ব্যক্তি সাধারণতঃ রাষ্ট্রের আইন অমান্য করে না। যারা আইন লঙ্ঘন করে তাদের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সাধারণতঃ কেন কোন ব্যক্তি

রাষ্ট্রের আইন লঙ্ঘন করে না, তার ব্যাখ্যায় মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, মানুষ সমাজ বা পরিবেশের দাস। কোন একটি ব্যক্তির আচার আচরণের ক্ষেত্রে তার পরিবেশের প্রচণ্ড চাপ তাকে সহ্য করতে হয়। কাজেই রাষ্ট্রের আইন মান্য করার নীতিকে আর পাঁচ জনের মত সেও সমর্থন করে। স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার দেওয়া অপেক্ষা গতানুগতিক স্রোতধারায় গা ভাসিয়ে দেওয়া অধিকতর সহজ। তবে মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের এই মত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন না। ব্যক্তি যদি কোন কর্তৃত্ব মান্য করে, তার কারণ হল, সুসংহত কর্তৃত্ব মান্য করার পিছনে তার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন রয়েছে। যাদের ওপর আইন প্রয়োগ করা হয় তারা যদি তা সহজভাবে গ্রহণ না করে তা হলে তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধের (alienation) সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে কর্তৃত্ব সহজভাবে স্বীকার করার ব্যাপারে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে একাত্মতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই ম্যাক্সহ্বেবার মন্তব্য করেন যে, ক্ষমতা এবং তাতে জনগণের সহজ স্বীকৃতি দুই-ই কর্তৃত্বের সৃষ্টি করে। কর্তৃত্বকে স্বীকার করার পিছনে তিনি তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, গতানুগতিক ধারায় কর্তৃত্ব মান্য করার পক্ষে তিনি যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা হল যে, সাধারণতঃ প্রাক-শিল্পযুগে ব্যক্তিরা নিজ যুক্তি বা বিচারবুদ্ধি দ্বারা চালিত না হয়ে গতানুগতিকতাকেই সমর্থন করত। এই ধরনের কর্তৃত্বকে তিনি গতানুগতিক (traditional) কর্তৃত্ব বলে অভিহিত করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি আইনসম্মত (rational legal) কর্তৃত্ব বলতে যা বুঝিয়েছেন তাই বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি। কর্তৃত্বের পিছনে যুক্তিপ্রবণতা যদি না থাকত বা তা যদি আইনসম্মত না হোত তাহলে জনসাধারণ সহজে তা মান্য করত না। তৃতীয়তঃ, তিনি ঐন্দ্রজালিক (charismatic) কর্তৃত্ব বলতে বুঝিয়েছেন যে, কোন কোন কর্তৃত্বের প্রতি জনগণ স্বাভাবিকভাবেই আস্থা পোষণ করে। ইতিহাসে এমন অনেক নজীর রয়েছে যেখানে কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তির দ্বারা জনগণের আস্থা লাভ করার ব্যাপারে সফল হয়েছেন। হ্বেবার এরূপও মন্তব্য করেন যে, বর্তমানে এই গতিশীল সমাজে কর্তৃত্ব আইনসম্মত (rational legal) হওয়াই শ্রেয়। এছাড়া বাকি দু' প্রকারের কর্তৃত্ব ঠিক বর্তমান সমাজে সমর্থনযোগ্য নয়।

অধ্যাপক লাস্কি (*Laski*) রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের প্রকৃতির আলোচনায় অষ্টিন (*Austin*)-এর মত একাত্মবাদীদের (Monist) তীব্র সমালোচনা করেছেন। অষ্টিনের মতে আইন হল সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশমাত্র। লাস্কি এই মত কোনমতেই গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। তিনি বলেন যে, আইন রচিত হয়

জনগণের জন্য এবং জনগণের সম্মতি যদি আইনের পিছনে না থাকত তাহলে তা কোনোমতেই বলবৎ হত না। রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের কাজ হল—জনগণের সক্রিয় চাহিদা (effective demand) পূরণ করা। আইন জনগণের নানাবিধ চাহিদার পূরণ করে, তাই তারা আইন মান্য করে। বার্কার (*Barker*) অনুরূপভাবেই বলেছেন যে, আদর্শ আইনে বৈধতা (validlity) এবং মূল্য (value) দুইই বর্তমান থাকে।

লাস্কি অবশ্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রকৃতি আলোচনায় মন্তব্য করেছেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষমতার বণ্টন যেভাবে হয়, আইনের প্রকৃতিও সেরূপ পরিবর্তিত হয়। এ ব্যাপারে তিনি মার্কসীয় মতবাদকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক ক্ষমতার বণ্টনে যত বেশী সাম্য (equality) আনা সম্ভব হবে ততই আইনের সার্থকতা বজায় থাকবে।

উপসংহারে বলা যায়—লাস্কি, হেবার প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌রা—রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের প্রকৃতিকে জনগণের স্বার্থরক্ষার মাপকাঠিতেই বিচার করেছেন। জনস্বার্থ রক্ষণ ছাড়া কর্তৃত্বের বা ক্ষমতার অস্তিত্ব কোন গণতান্ত্রিক সমাজে স্বীকৃত নয়।

২। রাষ্ট্র এবং ইহার কার্যাবলী (State and its functions) :

রাষ্ট্র হল সমাজের বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠান। বিভিন্নরকম আইনকানুনের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার সদস্যদের ব্যবহারিক এবং সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে ব্যক্তির প্রয়োজনের কোন শেষ নেই, সেজন্য ব্যক্তিকে তার আধ্যাত্মিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটাবার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করতে হয়। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংঘের মত একটি সংঘ বলাই সমীচীন। তবে রাষ্ট্রের গুরুত্ব এখানেই যে, রাষ্ট্রকে যে বিশেষ ধরনের কার্য সম্পাদন করতে হয় অন্যান্য সংঘের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের হাতে চরম ক্ষমতা প্রয়োগের যে অধিকার রয়েছে অন্যান্য সংঘগুলির সে অধিকার নেই। নিজ আদেশ বলবৎ করার জন্য রাষ্ট্র আইনপ্রণয়ন করতে পারে এবং এখানেই রাষ্ট্রের বিশেষত্ব।

রাষ্ট্রের কার্যাবলী ঠিক কি হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। অনেকে মনে করেন রাষ্ট্র ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনে যত কম হস্তক্ষেপ করবে ততই ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গল, আবার একদল মনে করেন

জনগণের সর্ববিধ মঙ্গলসাধন করার জন্য রাষ্ট্রের কার্যই হল অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করা। প্রথম অভিমতের সমর্থকবৃন্দ হলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং পরবর্তী মতবাদীরা সমাজতন্ত্রবাদী নামে পরিচিত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা জনস্বার্থে সীমিত হওয়া উচিত। তার কারণ তাদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ ভাল-মন্দ সম্পর্কে সচেতন, কাজেই প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধিত হবে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে তাই রাষ্ট্রের কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়। অনেক অর্থনীতিবিদ্‌ও তাই মনে করেন যে, প্রতিযোগিতাই সমাজজীবনে উন্নতির উপায়। কাজেই ব্যক্তির অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্যে কোনরূপ বাধাদান করা রাষ্ট্রের পক্ষে অনুচিত। তবে মানুষ স্বভাবতঃই স্বার্থপর, সেজন্য রাষ্ট্রকে ব্যক্তিগত মঙ্গলের জন্য কিছু কিছু কাজ করতে হয়। তাই রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবনে যত কম হস্তক্ষেপ করে ততই জনগণের পক্ষে মঙ্গল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা যেমত পোষণ করেন, সমাজতন্ত্রবাদীরা তার বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য যা যা করা দরকার রাষ্ট্রই সেগুলি করবে। তাদের বক্তব্য কেবলমাত্র আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করাই রাষ্ট্রের একমাত্র কাজ হতে পারে না। তাঁদের মতে উৎপাদনের যন্ত্রগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হওয়া উচিত, নতুবা অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গরীব এবং ধনী লোকের মধ্যে বিরাট বৈষম্য দেখা দেবে এবং তা হবে সমগ্র সমাজ তথা রাষ্ট্রের মঙ্গলের পরিপন্থী। তা ছাড়াও তাঁরা মনে করেন, রাষ্ট্রে কর্তৃত্ববিহীন অবাধ প্রতিযোগিতা চলা উচিত নয়, তাহলে একটি শ্রেণী বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভে সক্ষম হবে, যা অন্যান্য শ্রেণীর পক্ষে সম্ভবপর হবে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, এ-কথা ঠিক যে, বর্তমানে অনেকেই উপলব্ধি করেছেন যে, রাষ্ট্রের কার্যাবলী সীমিত হওয়া উচিত নয়। তবে রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে মুখ্যতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। এক শ্রেণীর কাজ যা রাষ্ট্রকে নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য করতেই হয়। এই কাজগুলি অপরিহার্য (Indispensable) কাজ বলে পরিচিত, যেমন—বিদেশী রাষ্ট্রের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা। সেজন্য রাষ্ট্রকে নৌ বাহিনী, বিমান বাহিনী প্রভৃতি রাখতে হয়। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষাও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। চুরি ডাকাতির হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রকে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হয়। আইন শৃঙ্খলা না থাকলে রাষ্ট্র হবস্‌ (Hobbes) কল্পিত প্রকৃতির রাজ্যে (State of nature) পরিণত হতে পারে। কিন্তু এমন কতকগুলি

কাজ রয়েছে যেগুলি রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন (Discretionary)। এই কাজগুলি ছাড়াও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় থাকে। তবে জনসাধারণের কল্যাণই যদি রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এই কাজগুলির গুরুত্বও কম নয়। যেমন, স্কুল কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তার করা এবং শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করাও রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন কাজের অন্তর্গত। শ্রমিকের কাজের সময় নির্ধারণ করা এবং বেকার শ্রমিকদের নানাবিধ সাহায্য দান করা রাষ্ট্রের কাজ। তাছাড়াও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা, জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং সেহেতু হাসপাতাল, চিকিৎসালয় স্থাপন করা ইত্যাদি। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি বিধান করাও রাষ্ট্রের প্রধান কাজ।

উইলোবী (*Willoughby*) এবং গেটেল (*Gettell*) রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে একইভাবে অত্যাবশ্যক (essential) এবং ইচ্ছাধীন (optional) এই দুই-ভাগে বিভক্ত করেছেন। ইচ্ছাধীন কাজকে আবার সমাজতান্ত্রিক (socialistic) এবং অসমাজতান্ত্রিক (non-socialistic) এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। অত্যাবশ্যক কার্যকলাপের স্বরূপ আগেই আলোচনা করা হয়েছে, যে কার্যগুলি রাষ্ট্রের অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য। ইচ্ছাধীন অ-সমাজতান্ত্রিক কাজগুলি সম্পন্ন করা হয় জনসাধারণের মঙ্গলসাধনের দিকে লক্ষ্য রেখে কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার পথে যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেই দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়। যেমন—প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্যউন্নয়ন প্রভৃতি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ইচ্ছাধীন সমাজতান্ত্রিক কাজের মধ্যে কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন, ব্যাঙ্কের প্রচলন, টেলিফোন, রেলপথ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমানে ধনতান্ত্রিক জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের (welfare state) জন্য রাষ্ট্রের কার্যাবলীও ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। অগবার্ণ নিমকফ (*Ogburn Nimkoff*) তিন প্রকারের কাজের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমতঃ, সামাজিক সেবামূলক রাষ্ট্র (The social-service state)। এর দ্বারা রাষ্ট্রের সেবামূলক কার্যই বুঝায়, যেমন—ব্যক্তির ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান রক্ষা করা, বৃদ্ধ এবং বেকারদের সাহায্য দান। গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক সংগঠনগুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্যদানে উৎসাহিত করাও এই কাজের অন্তর্ভুক্ত। ভারতে সংবিধানের রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতির (Directive Principles of State Policy) দ্বারা এই ধরণের সেবামূলক কার্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনমূলক রাষ্ট্র (The Production State)। এর দ্বারা উৎপাদনব্যবস্থায়

রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বোঝায়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে উৎপাদন যন্ত্রগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। তৃতীয়তঃ, যুদ্ধাশ্রয়ী রাষ্ট্র (The War State)। অগবার্ণ এবং নিমকফের মতে বর্তমানে যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যই হল সামগ্রিক যুদ্ধ (total war)। কাজেই যুদ্ধ পরিচালনা এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রকে শক্তি এবং সংহতির কেন্দ্রীকরণ করা দরকার। ফলে যুদ্ধ চলাকালীন জরুরী অবস্থায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, আলাপ-আলোচনা, সংঘ প্রভৃতির কার্যাবলী রাষ্ট্রকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

সমাজবিদেরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের সামাজিক কার্যাবলী (Social functions)-এর উল্লেখ করেছেন। বর্তমান সমাজের এমন কতকগুলি কাজ আছে যেগুলির দায়িত্ব রাষ্ট্র ভিন্ন আর কারও পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আবার এমন কতকগুলি কাজ আছে যেগুলির দায়িত্ব কোন রাষ্ট্রই গ্রহণ করতে পারে না। ম্যাকাইভার এবং পেজ (*MacIver and Page*) এসব কার্যাবলীর শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

(১) যে কাজ রাষ্ট্রের পক্ষেই করা সম্ভব (Functions peculiar to the state) : ব্যাপক আইন কানুন একমাত্র রাষ্ট্রই প্রণয়ন করতে পারে এবং সমাজের সকলকে সুখ-সুবিধা ও সমান সুযোগ দেওয়া একমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। প্রত্যেকটি মানুষ যাতে সৃজনীমূলক শক্তিকে প্রকাশ করার জন্য সুস্থ ও উপযুক্ত পরিবেশ খুঁজে পায় তার ব্যবস্থা করা একমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। সকলের পক্ষে বাধ্যতামূলক কতকগুলি কর্তব্য স্থির করাও রাষ্ট্রের কাজ। সুস্থ ও ভদ্র জীবন যাপনের জন্য সর্বনিম্ন মান রাষ্ট্রই নির্ধারণ করতে পারে। রাষ্ট্রের অধীনস্থ অন্যান্য ক্ষমতাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রেরই আছে এবং রাষ্ট্রের মধ্যে যে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন বর্তমান, সেগুলিকে সংযোজিত করার বিরাট দায়িত্ব একমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব। ম্যাকাইভার এবং পেজ (*MacIver and Page*) বলেন, "সংক্ষেপে রাষ্ট্র হল, জনসাধারণের শৃঙ্খলা রক্ষার অছি ও অভিভাবক।" তবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করাই রাষ্ট্রের একমাত্র কাজ নয়। কাউকে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বা সকলকে সমান সুযোগ দান করে বা দুর্বলকে শক্তিশালীর বশীভূত করেও শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায়। কিন্তু ন্যায়ের ভিত্তিতেই সামাজিক রীতিনীতিগুলি নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেওয়াই হল ন্যায় (Justice)। কিন্তু কার কতটুকু প্রাপ্য তা স্থির করাও কঠিন ব্যাপার। কঠিন হলেও এ দায়িত্ব

রাষ্ট্রই পালন করতে পারে, কারণ সমাজের সকল লোকের ওপর একমাত্র রাষ্ট্রেরই সার্বভৌম ক্ষমতা আছে। যারা রাষ্ট্রের আইন অমান্য করে এবং অপরের অধিকারে অযথা হস্তক্ষেপ করে তাদের শাস্তিবিধান করা রাষ্ট্রেরই কর্তব্য।

(২) যে সকল কাজের জন্য রাষ্ট্র উপযুক্ত (Functions for which the State is well adapted): এমন কতকগুলি কাজ আছে যে কাজগুলি সম্পাদন করার পক্ষে অন্যান্য সংগঠনের তুলনায় রাষ্ট্রই বেশী উপযুক্ত। প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে (Natural resources) রক্ষা করা রাষ্ট্রেরই কাজ। অনেকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের অযথা অপচয় করে, সে-সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ একান্তই প্রয়োজন। এই কারণেই রাষ্ট্রকে দেশের সাধারণ সম্পদ ও শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন-কানুন প্রণয়ন করতে হয়।

ব্যক্তির মধ্যে যে ক্ষমতা ও অনন্ত সম্ভাবনা সুপ্ত হয়ে আছে, তাকে আবিষ্কার করার ও পরিপূর্ণ সুযোগ দিয়ে বিকশিত করার যে সুমহান দায়িত্ব, তা অন্য কোন বেসরকারী সংগঠনের ওপর সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, শিক্ষানীতি ও শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের মূল দায়িত্ব থাকবে শিক্ষাবিদ্‌দের হাতে। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "রাষ্ট্রের কাজ হবে অভিনেতাদের অভিনয় করার জন্য উপযুক্ত রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে দেওয়া, অভিনয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা নয়।" তা ছাড়া বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য ব্যবস্থা করা, শিল্পকলাকে উৎসাহ দান করা, রাষ্ট্রের অধিবাসীদের নানারকম সুখ-সুবিধার সুবন্দোবস্ত করা, জনকল্যাণ সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করা, সমাজকে নীতি সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিষয় জানার সুযোগ দান করা প্রভৃতি নানা জনহিতকর কার্যের দ্বারা সমাজকে উন্নত করা রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব।

(৩) যে সকল কাজের পক্ষে রাষ্ট্র অনুপযুক্ত (Functions for which the state is ill-adapted): এমন অনেক ধরনের কাজ আছে যেগুলি করতে রাষ্ট্র অনুপযুক্ত এবং এ ধরনের কাজ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সহজ এবং সুন্দরভাবে করা সম্ভব। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সমগ্র সমাজের ওপর। সমাজের ব্যাপক সমস্যা সম্পর্কে উপায় নির্ধারণ করাই রাষ্ট্রের কাজ। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিগত আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থ, উদ্দেশ্য অনেক সময় এতই সীমিত যে, সেকারণে রাষ্ট্রের পক্ষে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়। বেসরকারী ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিই এসকল প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। এ ছাড়া

আছে বৃহত্তর স্বার্থ যা মানুষকে একত্র করে। ধর্ম সম্পর্কীয় এবং সংস্কৃতি-সম্পর্কীয় স্বার্থও এর অন্তর্ভুক্ত।

(৪) যেসব কাজ রাষ্ট্র সম্পাদন করতে অক্ষম (Functions which the state is incapable of performing) : রাষ্ট্রের পক্ষে জনসাধারণের মতামত প্রকাশ করাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্র হয়ত প্রকাশ্য ভাবে মতামত প্রকাশ করাকে বন্ধ করে দিতে পারে কিন্তু এ হবে বলপ্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ম্যাকাইভার এবং পেজ (*MacIver and Page*) বলেন, "যে কোন মতামত সত্য বলে দাবী করে এবং এ দাবীর পক্ষে বলপ্রয়োগ হল একান্তই অসঙ্গতিপূর্ণ।"

রাষ্ট্রের পক্ষে মানুষের নীতিবোধকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। নীতিবোধ বাইরের জিনিস নয়, অন্তরের জিনিস, তার ওপর রাষ্ট্রের কোন যথার্থ কর্তৃত্ব নেই। রাষ্ট্রের পক্ষে ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব নয়।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, মানুষের আচরণের যেগুলি অন্তরঙ্গ দিক সেগুলি এবং মানুষের সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়।

৩। সমাজের অঙ্গ হিসেবে রাষ্ট্র (State as an organ of society) :

রাষ্ট্র একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কও খুব নিবিড়। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। রাষ্ট্র সামাজিক সংগঠন (Social organisation)-এর একটি রূপ। রাষ্ট্র সমগ্র সমাজের সঙ্গে অভিন্ন নয়। রাষ্ট্র সমাজের একটি অঙ্গ বিশেষ।

ব্যক্তি কোন না কোন রাষ্ট্রের নাগরিক। কিন্তু তা ছাড়াও মানুষ কোন পরিবার, গীর্জা বা কোন সঙ্ঘের সভ্য। নাগরিক হিসেবে ব্যক্তির ভূমিকা যাই হোক না কেন, সামাজিক জীব হিসেবে অন্যান্য ভূমিকার মতনই এটাও একটা ভূমিকা। সামাজিক জীব হিসেবে ব্যক্তি রাষ্ট্রের নাগরিকের থেকেও অধিক কিছু। অন্য ব্যক্তির সঙ্গে যে আমরা সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত হই, অনেক রকম সামাজিক কার্য সম্পাদন করি, সেটা রাষ্ট্রের নাগরিক বা সভ্য হিসেবে নয়, সামাজিক জীব হিসেবেই করে থাকি। কাজেই রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের বা সম্প্রদায়ের গভীর সম্বন্ধ থাকলেও, দুটিকে অভিন্ন করে দেখা যুক্তিসঙ্গত নয়। যে কোন আধুনিক সংবিধান রাষ্ট্রের কার্যাবলীর সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়। যেমন,

কোন রাষ্ট্র ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকদের প্রতি পক্ষপাত আচরণ করতে পারে না। কাজেই রাষ্ট্র একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সমাজ-জীবনের একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ, কিন্তু কোনমতেই সমগ্র সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে অভিন্ন নয়। রাষ্ট্র সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করে, যদিও এই কার্যাবলীর সীমারেখা নির্দিষ্ট আছে। যেমন, পরিবার বা গীর্জার কাজ রাষ্ট্র সম্পাদন করতে পারে না। রাষ্ট্র ব্যক্তির সব প্রত্যাশা পরিতৃপ্ত করতে পারে না, যদিও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতনই রাষ্ট্র একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। যদিও রাষ্ট্র সবরকম সামাজিক কার্য সম্পাদনের উপযোগী প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন নয়, তবু সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রাষ্ট্রের গুরুত্ব কতখানি বোধগম্য হবে, যখন আমরা দেখতে পাই যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করে দেওয়া চলে না। রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদ রাষ্ট্রের বিলুপ্তির কথা বলে। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে রাষ্ট্রহীন সমাজ ব্যবস্থা কল্পনার বিষয়। বাস্তবে এই জাতীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তণ আদৌ সম্ভব কিনা চিন্তার বিষয়। নৈরাজ্যবাদীরাও মনে করেন রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে রহিত করে, সমাজের মধ্যে উদ্ভূত স্বতঃস্ফূর্ত সংগঠনগুলির দ্বারাই সমাজের অত্যাবশ্যক কার্যগুলি সম্পাদন করা সম্ভব। কিন্তু অনেকে মনে করেন এ জাতীয় সমাজ ব্যবস্থা সম্ভব নয়। সামাজিক জীব হিসেবে ব্যক্তি রাষ্ট্র ছাড়া চলতে পারে না। গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, "যদি কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য, যেমন নৈতিক, অর্থ নৈতিক, ধর্মীয়, আমোদ প্রমোদ সংক্রান্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য কিছু জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন সঙ্ঘে সংগঠিত করা সম্ভব হত তাহলে আমরা রাষ্ট্র ছাড়াই একটা সমাজ পেতুম। তাহলে আমরা এমন একটা সমাজ পেতুম যেখানে ব্যক্তি বিচিত্র ধরনের স্বার্থের বা সমগ্রভাবে সব স্বার্থের জন্য সংগঠিত। কিন্তু এ জাতীয় সমাজ বা সংগঠন সম্ভব নয়।" কেননা এই জাতীয় সমাজের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজন এক সর্বোচ্চ সংগঠনের যে সংগঠন সমাজস্থ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তাদের কার্যাবলীর মধ্যে সংহতি সাধন ও সামঞ্জস্য বিধানে সমর্থ হয়, এবং তাদের মধ্যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে সমাজ জীবনের ঐক্য ও শান্তি রক্ষা করে। তাছাড়া এই সংগঠনকে হতে হবে :সর্বোচ্চ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাপারে চূড়ান্ত সংগঠন এবং এই সংগঠন যেন সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলার সংস্থাপনে তার প্রণীত আইনগুলিকে প্রয়োগ করার জন্য উপযুক্ত উপায়ের অধিকারী হয়। কাজেই

1. *P. Gisbert : Fundamentals of Society*. P. 89.

রাষ্ট্রের গুরুত্ব একারণেই, কেননা রাষ্ট্র হল সমাজের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংগঠন (The supreme regulating stucture of the community)।

কতকগুলি কাজের পক্ষে রাষ্ট্র উপযুক্ত, কতকগুলি কাজের পক্ষে রাষ্ট্র অনুপযুক্ত, কতকগুলি কাজ রাষ্ট্র সম্পাদন করতে অক্ষম। কাজেই সামাজিক জীবনের সব আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা রাষ্ট্র পূরণ করতে পারে, একথা বলা চলে না। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, বিশেষ ধরনের কতকগুলি কাজ আছে যা কেবলমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই করা সম্ভব। রাষ্ট্রের পক্ষেই জটিল সমাজ জীবনে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যেহেতু প্রয়োজনানুসারে বলপ্রয়োগ করার অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রেরই আছে। ব্যাপক আইনকানুন রাষ্ট্রই প্রণয়ন করতে পারে এবং সমাজের সকলকে সুখ সুবিধা ও সমান সুযোগ দেওয়া একমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে আত্মোপলব্ধির সুযোগ দেওয়া রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। সমাজস্থ ব্যক্তির অধিকার ও বাধ্যতামূলক কর্তব্য নিরূপণ রাষ্ট্রই করতে পারে। সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সংযোজিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রই গ্রহণ করতে পারে। সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর পরিসর ও ক্ষমতার সীমারেখা নিরূপণ করা রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব।

যে কোন সরল সমাজে সম্প্রদায়ের রীতিনীতিই শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে কার্যকর হতে পারে। কিন্তু যে কোন জটিল সমাজে রাষ্ট্র ভিন্ন অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমাজের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কারণ যে কোন জটিল সমাজে শুধু ব্যক্তি যাতে ব্যক্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে না পারে সেদিকেই লক্ষ্য রাখলে চলে না, গোষ্ঠী যাতে গোষ্ঠীর স্বার্থে হস্তক্ষেপ করতে না পারে তার দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। আর যে-কোন জটিল সমাজে এই সব গোষ্ঠী যে শুধু বিভিন্ন ধরনের, তা নয়, তাদের পরিসর ও ক্ষমতার দিক থেকেও তাদের বৈচিত্র্যের শেষ নেই। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এইসব গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিরোধ অরাজকতার সৃষ্টি করবে। রাষ্ট্রের এই নিয়ন্ত্রণ যদি না থাকে বেপরোয়া অরাজক সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সমাজ জীবনের শৃঙ্খলা ও শান্তি বিপর্যস্ত করে তুলবে। আধুনিক সভ্য রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক স্বাধীনভাবে তার বিচিত্র ধরনের ও বিশেষ ধরনের কার্যাবলী সম্পাদন করতে চায়। এর জন্য প্রয়োজন সমাজজীবনে শৃঙ্খলা, এই শৃঙ্খলা একমাত্র রাষ্ট্রই বজায় রাখতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র তার নাগরিকদের প্রতি পক্ষপাত আচরণের মাধ্যমে এই আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার চেষ্টা করতে পারে কিন্তু তাতে

শেষ পর্যন্ত আইন শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় না, সমাজজীবনে অশান্তি দেখা দেয়। যে কোন রাষ্ট্রকে তার নাগরিকদের যার যতটুকু প্রাপ্য, সেইটুকু দেওয়া দরকার। অর্থাৎ ন্যায়ের ভিত্তিতেই সামাজিক রীতিনীতিগুলি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ কাজ রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে করা সম্ভব নয়। যে-কোন সমাজে সমাজস্থ ব্যক্তিদের সম্পত্তিতে অধিকার থাকে। এই অধিকারের স্বরূপ নির্ধারণ করা ও সম্পত্তিতে অধিকার সংরক্ষিত করা, রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। রাষ্ট্রের আইন অমান্যকারীদের রাষ্ট্রই শাস্তি প্রদান করতে পারে, যে শাস্তি আইন অমান্যকারীরা মেনে নিতে বাধ্য হয়। সমাজের সব সভ্যদের ওপর ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রই এবং সেহেতু সমাজের সভ্যদের সাধারণ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করা রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব।

সুতরাং দেখা যায় যে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানরূপে রাষ্ট্রের গুরুত্ব সমধিক। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র সমাজের অঙ্গস্বরূপ।

৪। দলীয় ব্যবস্থা এবং নির্বাচন (Party System and Election):

(i) **দলীয় ব্যবস্থা (Party System):** প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থার জীবনশক্তিই হল দলীয় ব্যবস্থা। যখন কিছু সংখ্যক রাষ্ট্রের নাগরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে একমত পোষণ করে এবং সেই মত প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধভাবে শাসনতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের পথ অবলম্বন করে তখন সেই গোষ্ঠীকে রাজনৈতিক দল আখ্যা দেওয়া হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে রাজনৈতিক মতামতকে বাস্তবে রূপায়িত করাই হল রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য।

সামাজিক কারণে দল গঠন করা হয়। মানুষে মানুষে মতের বৈষম্য লক্ষণীয়। সমাজে যেহেতু তাদের একত্রে বসবাস করতে হয় কাজেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমমতাবলম্বী ব্যক্তিরা সংগঠিত হয় এবং তাদের মতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়। তাই ম্যাকাইভার (*MacIver*) বলেন যে, রাজনৈতিক দল হল এরকম একটি সংগঠিত গোষ্ঠী যারা একটি মতে বিশ্বাসী এবং সেই মতানুসারে সরকার গঠনে প্রয়াসী হয়। লর্ড ব্রাইস (*Lord Bryce*) একই সুরে বলেন যে, রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশ্য হল যুক্তির দ্বারা নিজদলের অনুকূলে সমর্থন সংগ্রহ করা এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা। দলীয় ব্যবস্থা উদ্ভাবনে বিভিন্ন সময়ে

বিভিন্নরকম কারণ কার্য করে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ধর্মসংক্রান্ত সমস্যাই ইউরোপে রাজনৈতিক দল গঠনের ভিত্তি ছিল। আবার অর্থ নৈতিক বৈষম্যের ভিত্তিতেও রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান ঘটে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সাধারণতঃ অর্থ নৈতিক বৈষম্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থানের পরিচয় মেলে।

রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ব্যাখ্যা করার জন্য মনস্তাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক কারণ দেখানো হয়। মনস্তত্ত্ববিদ ম্যাকডুগ্যাল (*McDougall*) বলেন যে, অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। প্রাচীনযুগে এই প্রবৃত্তি নানাবিধ শারীরিক শক্তির মাধ্যমে অত্মপ্রকাশ করত। কিন্তু সভ্যসমাজে এই প্রবৃত্তি যুক্তিতর্ক, রাজনীতি প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে বৈষম্য তাকে এইসব দল গঠনের কারণ রূপে নির্দেশ করা হয়। সমপরিবেশেই দুইজন ব্যক্তির আচারে-ব্যবহারে, চিন্তাধারা প্রভৃতিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রক্ষণশীল (conservative) মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরও যেমন সাক্ষাৎ পাওয়া যায় আবার প্রগতিশীল (Progressive) ব্যক্তিও দৃষ্টিগোচর হয়। বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিদের এই চিন্তাধারায় প্রকাশ রাজনৈতিক দলে মূর্ত হয়ে ওঠে।

তবে সব রাজনৈতিক গোষ্ঠীকেই রাজনৈতিক দলরূপে আখ্যা দেওয়া যায় না। যখন রাজনৈতিক দলের কয়েকজন ব্যক্তি তাদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ক্ষুদ্র দল সৃষ্টি করে অথবা নিতান্ত ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের দ্বারা চালিত হয় সেই দলকে উপদল (faction) বলে।

রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী (Functions of Political Parties) : রাজনৈতিক দলের সদস্যরা নিজ নিজ দলীয় আদর্শ অনুযায়ী দলের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে দলীয় নীতি ঠিক করে এবং কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য সচেষ্ট হয়। দলীয় নীতি ও কর্মসূচী নির্ধারিত হওয়ার পর সেগুলি সংবাদপত্র, সভাসমিতি, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে তারা প্রচারে ব্রতী হয় এবং জনমত গঠনের জন্য সচেষ্ট হয়। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা রাজনৈতিক দলগুলির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ, কারণ নির্বাচনের জয়পরাজয়ের ওপরেই দলীয় মতকে কার্যকরী করা নির্ভর করে। যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হয় সেই দল তাদের নীতি অনুযায়ী কার্য করতে চেষ্টা করে। কিন্তু যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয় স্বভাবতঃই তারা বিরোধীদল হিসেবে কার্য করে। গণতন্ত্রে বিরোধীদলের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য

এবং এ বিষয়ে ব্রিটেনের রাণীর বিরোধীদল (Her Majesty's opposition) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিরোধীদল না থাকলে ক্ষমতাসীন দলের (Party in Power) স্বৈরাচারী হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। বিরোধীদলের কাজ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ত্রুটিবিচ্যুতি জনসমক্ষে তুলে ধরা এবং জনমতকে প্রভাবিত করা। ব্রিটেনে বিরোধী দলের কাজ কেবলমাত্র ক্ষমতাসীন দলের সমালোচনা করাই নয়, দেশের অচলাবস্থায় সরকারকে নানাভাবে সাহায্য করাও বিরোধীদলের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রথমতঃ, রাজনৈতিক দলগুলি জনসাধারণের সামনে নানাবিধ সমস্যাদি তুলে ধরে জনসাধারণকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং জনমত গঠনের চেষ্টা করে। জনসাধারণকে রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান করাও রাজনৈতিক দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিভিন্ন দলই আদর্শগত বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং তা বাস্তবে প্রয়োগের জন্যও প্রস্তুত থাকে।

দলীয়ব্যবস্থা আইনবিভাগ এবং শাসনবিভাগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের সহায়ক, ফলে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির (Separation of Powers) কঠোরতা অনেক পরিমাণে দুর্বল হয়ে পড়ে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, যেখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, সেখানে দলীয় ব্যবস্থা আইনবিভাগ এবং শাসনবিভাগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে সহায়ক হয়েছে।

(ii) **নির্বাচন** (Election): রাজনৈতিক দলের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমেই নির্বাচনের প্রশ্ন এসে পড়ে। নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। কাজেই নির্বাচন হল গণতন্ত্রসম্মত প্রতিযোগিতা। তবে সর্বদেশে নির্বাচনের পদ্ধতি একরূপ নয়। কোন কোন দেশে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, আবার কোন কোন দেশে পরোক্ষ গণতন্ত্রের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রশ্ন হল, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্বাচনপদ্ধতি বলতে আমরা কি বুঝি? যে নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটদাতাগণ সরাসরিভাবেই ভোট প্রদান করে প্রতিনিধি নির্বাচন করে সেই নির্বাচন পদ্ধতিকে প্রত্যক্ষ (Direct) নির্বাচন আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু যে নির্বাচনে ভোটদাতাগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করে না, কয়েকজন প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং পরে সেই নির্বাচকেরাই যখন প্রতিনিধি নির্বাচন করে তখন সেই নির্বাচনকে পরোক্ষ (Indirect) নির্বাচন বলা হয়। কাজেই পরোক্ষ নির্বাচনে দু'বার

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভারত এবং আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরোক্ষ-ভাবেই হয়। কিন্তু আইনসভার (Legislature) নিম্ন পরিষদের নির্বাচন প্রায় সকল দেশেই প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এই দুই প্রকার নির্বাচনেরই কিছু কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা আছে, যা আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের প্রধান সুবিধা হল যেহেতু জনসাধারণ নির্বাচনে সরাসরি অংশগ্রহণ করে, সেহেতু রাজনৈতিক ব্যাপারে তাদের অনীহা দেখা যায় না। দেশের শাসনক্ষমতা যাদের ওপর অর্পিত তাদের নির্বাচনে অধিকার থাকায় জনসাধারণ এব্যাপারে উৎসাহ বোধ করে। প্রার্থী এবং ভোটারদের মধ্যে আলাপ আলোচনার সুযোগও বর্ধিত হয়। ফলে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা (Political consciousness), রাজনীতিতে আগ্রহ এবং রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে।

তবে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের অসুবিধাও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের গুরুত্ব নির্ভর করে ভোটারদের শিক্ষা বা অশিক্ষার হারের ওপর। যে দেশে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা অধিক সে দেশে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে অযোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে তার প্রত্যুত্তরে রাজনৈতিক চিন্তাবিদরা এই যুক্তি দেখান যে, নিতান্ত স্কুল এবং কলেজী শিক্ষার ওপর রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়া বা কমা নির্ভর করে না। শিক্ষিত লোকেরাই যে যথার্থ প্রার্থী নির্বাচন করতে সমর্থ হবে এমন কোন যুক্তি নেই। রাজনৈতিক সচেতনতা বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার ওপর নির্ভর করে।

পরোক্ষ নির্বাচনের সুবিধা হল যে, এই নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের সুযোগ অনেক বেশী, কারণ কেবলমাত্র জনসাধাণের ওপরই যথার্থ প্রার্থীর নির্বাচন ছেড়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। আইনসভার নির্বাচিত প্রার্থীদের, যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, রাজনৈতিক সচেতনতা সাধারণ ভোটারদের রাজনৈতিক সচেতনতার তুলনায় অনেক বেশী। দ্বিতীয়তঃ বলা যায়, যেহেতু প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে না, কাজেই ভোটারদের মধ্যে উত্তেজনা এবং অশান্তির বা দুর্নীতির সম্ভাবনা কম থাকে। তৃতীয়তঃ অনেকে মনে করেন, পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে অর্থব্যয়ও কম হয়।

পরোক্ষ নির্বাচনের অসুবিধা হল, প্রথমতঃ অনেকে মনে করেন, পরোক্ষ নির্বাচনে যেহেতু নির্বাচকের সংখ্যা কম কাজেই প্রার্থী নির্বাচনে নানাপ্রকার

দুর্নীতি প্রবেশ করে। দ্বিতীয়তঃ, এই নির্বাচনে নির্বাচকেরা দলীয় মনোবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ফলে নিতান্ত দলীয় স্বার্থই অনেক সময় সাধারণ স্বার্থের ওপরে প্রাধান্য লাভ করে। তৃতীয়তঃ, নির্বাচনে জনসাধারণের আগ্রহ বিশেষ থাকে না এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে তাদের উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। চতুর্থতঃ, এই নির্বাচন পদ্ধতিতে ভোটদাতাদের দায়িত্ববোধ ঠিকমত থাকে না, যেহেতু তাদের পদ অস্থায়ী। পঞ্চমতঃ, প্রত্যক্ষ নির্বাচনে জনসাধারণ যদি অযোগ্য বলে বিবেচিত হয় তাহলে খুবই স্বাভাবিক যে তাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যোগ্যতা সম্বন্ধেও প্রশ্ন দেখা দেবে।

নির্বাচনের প্রশ্নে আমাদের আর একটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন তা হল, সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব সমস্যা। আইনসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সমর্থ, সেই দলই আইনসভায় প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম। তবে অনেক রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাবিদ্ মনে করেন যে, আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রাধান্য স্বীকৃত, কিন্তু সংখ্যালঘু দলের আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণের যদি কোন সুযোগ না থাকে তাহলে সেই শাসনব্যবস্থাকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলা চলে না। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের (*John Stuart Mill*) মত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন যে, আইনসভায় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন। কার্যক্ষেত্রেও সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রয়োগপ্রণালী রূপায়িত হয়েছে। এই প্রণালীগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ভোট পদ্ধতি (Limited vote plan), স্তূপীকৃত ভোটদান পদ্ধতি (cumulative method) এবং আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি (Proportional Representation) উল্লেখযোগ্য।

পর্তুগাল ও স্পেনে সীমাবদ্ধ ভোটপদ্ধতি চালু ছিল। এই পদ্ধতির মাধ্যমে যদি কোন নির্বাচনকেন্দ্রে তিনটি আসন নির্দিষ্ট থাকে তাহলে ভোটাররা দুজনের বেশী প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবে না, ফলে সংখ্যালঘুদল একটি আসন লাভ করার সুযোগ পায়।

স্তূপীকৃত ভোটদান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল, একটি নির্বাচন কেন্দ্রে যতগুলি আসন থাকে ভোটদাতাগণেরও ঠিক ততগুলিই ভোট থাকে। ভোটদাতারা ইচ্ছা করলে নিজ ভোটগুলি ভাগ করে দিতে পারে অথবা একজনকেও তার সব ভোটগুলি প্রদান করতে পারে। এর মাধ্যমে সংখলঘুদলের পক্ষেও কিছু আসন দখল করা সম্ভব হয়।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সমগ্র দেশকে কয়েকটি নির্বাচন এলাকায় ভাগ করা হয়। সামান্য সংখ্যা-

গরিষ্ঠতায় কোন প্রার্থী নির্বাচিত হতে পারে। ফলে কোন নির্বাচনকেন্দ্রে যদি তিনজন প্রার্থী থাকে তাহলে মাত্র ৩৪ জনের ভোটেও একজন প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পায়। জন ষ্টুয়ার্ট মিল এই পদ্ধতির সমর্থক ছিলেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, একটি আদর্শ গণতন্ত্রে প্রত্যেকটি গোষ্ঠীরই আনুপাতিকহারে নির্বাচিত হওয়া উচিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধি থাকে, সেইরূপ সংখ্যালঘিষ্ঠ ভোটারদেরও সীমিত প্রতিনিধি থাকা বাঞ্ছনীয়। যদি তা না হয় তা হলে সে-সরকার সমতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হয় না। তার ফলে একটি অংশ অন্য অংশের ওপর শাসনের কর্তৃত্ব আরোপ করে।

৫। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার এবং ভারতে সাম্য (Adult franchise and Equality in India) :

(i) **প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার (Adult franchise) :** প্রতিনিধি-মূলক শাসনব্যবস্থায় (Representative Government) জনসাধারণ প্রত্যক্ষ ভাবে শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের পরিবর্তে ভোটদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ভোটদানের অধিকার সুস্থ নাগরিকের মৌলিক অধিকার। তবে এ সম্বন্ধে অনেকেই ভিন্ন মত পোষণ করেন। যেমন, অনেকের মতে ভোটদানের অধিকার সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত নয়, তা কয়েকটি গুণাবলীর দ্বারা নির্ণিত হওয়াই উচিত। যেমন—ভোটদাতার যোগ্যতা নির্ধারক গুণাবলী হিসেবে অনেকে সম্পত্তির অধিকার, আবার কেউ কেউ শিক্ষাগত যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে গণতন্ত্রসম্মত নীতির সমর্থকদের মতে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের ভোটাধিকার থাকাই উচিত। তাদের মতে ভোটের ক্ষেত্রে ভোটদাতার কেবলমাত্র একটি মাত্রই যোগ্যতা থাকা উচিত, তাহল প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। তবে যারা নানাবিধ সমাজবিরোধী কাজে অভিযুক্ত বা বিকৃত মস্তিষ্ক তাদের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক হলেও ভোটাধিকারের প্রশ্ন ওঠে না।

যে ভোটাধিকারে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ছাড়া অন্য কোন গুণ বা শর্তের প্রয়োজন হয় না, সেই ব্যবস্থাকে প্রাপ্তবয়স্ক অথবা সার্বজনীন (universal) ভোটাধিকার বলে।

যারা সার্বজনীন ভোটাধিকার সমর্থন করেন তাঁরা নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করেন। (১) গণতন্ত্র সম্বন্ধে আব্রাহাম লিংকন (*Abraham Linclon*) যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে গণতন্ত্রকে 'জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের

জন্য সরকার' বলে অভিহিত করেছেন। তাই যদি হয় তাহলে জনগণের শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা উচিত। জনসাধারণই সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন। সুতরাং প্রত্যেক শ্রেণীর ইচ্ছাকে শাসন-ব্যবস্থায় স্থান দিতে হলে প্রত্যেকের ভোটাধিকার মেনে নেওয়া উচিত। (২) রাষ্ট্র যে কার্য করে তা সকলকেই প্রভাবিত করে এবং সকলের স্বার্থে তা করে থাকে। তা যদি হয় তাহলে শাসন ক্ষমতায় অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সকলের সমান অধিকার থাকা উচিত। (৩) যদি কয়েকজনের মাত্র ভোটাধিকার থাকে এবং বৃহৎশ্রেণী যদি তা থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে স্বভাবতঃই সমাজে বৈষম্য দেখা দেয় এবং তা সকল ক্ষেত্রেই আত্মপ্রকাশ করে। সেই মানসিক জটিলতার আঘাত রাষ্ট্রব্যবস্থাকেও দুর্বল করতে বাধ্য। (৪) যদি একটি শ্রেণীর ভোটাধিকার থাকে তাহলে সেই শ্রেণী নিজ স্বার্থেই রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে, ফলে সকলের স্বার্থ রক্ষিত হয় না। (৫) সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত না হলে শাসকশ্রেণীর স্বৈরাচারী হওয়ার পথ সুগম হয়, যা গণতন্ত্রবিরোধী। কিন্তু সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে জনগণের চাপের কাছে শাসকশ্রেণী নতি স্বীকার করতে বাধ্য থাকে। (৬) ভোটাধিকারের মাধ্যমে জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতাও বাড়ে কারণ নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীর সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ হয় এবং নিজ ভোটের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রতিটি ব্যক্তি সচেতন হয়। (৭) সরকার যদি একটি শ্রেণীর ভোটেই নির্বাচিত হয় তাহলে সকল শ্রেণীর কাছ থেকে আনুগত্য দাবি করা সরকারের উচিত নয়। (৮) আইনের মধ্য দিয়েই সকলের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। কিন্তু আইন প্রণয়ন করার পিছনে যদি সকলের সমর্থন না থাকে তাহলে তা কার্যকর করতেও অসুবিধা হয়।

সার্বজনীন ভোটাধিকার যাঁরা সমর্থন করেন না তাঁদের মধ্যে মিল (*Mill*), মেইন (*Maine*), ম্যাকলে (*Macaulay*), স্টিফেন (*Stephen*) প্রমুখ রাজনীতিবিদদের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, ভোটাধিকার নাগরিকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। কাজেই এই অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সার্বজনীনতা থাকা উচিত নয়। প্রত্যেকেরই যদি ভোটদানের অধিকার থাকে তাহলে নির্বাচিত সরকার দুর্বল হয়, কারণ মূর্খ এবং নির্বোধ ব্যক্তিদের দ্বারা কখনও যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত হয় না। তা ছাড়া অশিক্ষিত এবং নির্বোধ ব্যক্তিরা নিজ যুক্তি অপেক্ষা অপরের মতানুযায়ীই বেশী মাত্রায় পরিচালিত হয়। ফলে সামগ্রিক কল্যাণ অপেক্ষা দলগত স্বার্থই চরিতার্থ হয়। তাই

মিল (Mill) বলেন, সার্বজনীন ভোটাধিকারের আগে সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

এই মতকে পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না কারণ, যে দেশের অশিক্ষিত লোকের হার বেশী, সেদেশে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়। কারণ প্রাথমিক শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়া ভোটদান সম্পর্কে সচেতনতা আসে না। তবে এ মতকেও পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় না। কারণ রাজনৈতিক সচেতনতা একমাত্র কলেজী শিক্ষার দ্বারাই গঠিত হয় না। শিক্ষিত লোকেরাও যে স্বার্থপরতার মনোভাব নিয়ে ভোট প্রদান করে না তাও বলা চলে না। রাজনৈতিক দলের সংকটে এবং দলীয় সভা সমিতির মাধ্যমে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হতে পারে। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ সাধারণ জ্ঞান লাভ করে। সম্পত্তির অধিকারের বলে ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়া উচিত—এই যুক্তি যাঁরা দেখান তাঁদের যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ সম্পত্তির অধিকার যদি ভোটাধিকারের রক্ষা কবচ হয় তাহলে এই শ্রেণী এমন কোন প্রার্থীকে নির্বাচন করতে সম্মত হবে না যারা সম্পত্তির অধিকারের বিরোধী। ফলে একটি শ্রেণীর স্বার্থ ই রক্ষিত হবে।

সার্বজনীন ভোটাধিকারের প্রশ্নে স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকারের (Woman Suffrage) প্রশ্নটিও এসে পড়ে। স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার সম্বন্ধে রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে নানাবিধ মতপার্থক্য দেখা যায়। অনেক উন্নতিশীল দেশেও স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার ছিল না। যাঁরা স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকারের বিরোধী তাঁরা নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করেন। (১) অনেকে বলেন, পারিবারিক কাজকর্ম করা এবং শিশুর লালন-পালনই স্ত্রীলোকদের একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত। রাজনীতিতে তাদের সংক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকা উচিত নয়, তাহলে পারিবারিক জীবন বিঘ্নিত হয় এবং নারীসুলভ গুণাবলীও বিকাশ পায় না। (২) স্ত্রী স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ীই সাধারণতঃ পরিচালিত হন। কাজেই ভোটের ক্ষেত্রে যদি নিজ মত অপেক্ষা অপরের মতই প্রাধান্য পায়—তাহলে সে ভোটের কোন মূল্যই থাকে না। (৩) অনেকের মতে স্ত্রীজাতি যেহেতু শারীরিক ক্ষমতায় পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল কাজেই তাদের পুরুষদের ওপর নির্ভর করতে হয়। ফলে তাদের ভোটাধিকার থাকাও যুক্তিসঙ্গত নয়। (৪) অনেকে এই মত প্রদর্শন করেন যে, যুদ্ধে যোগদানের ক্ষমতার ভিত্তিতেই ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়া উচিত। মেয়েদের যেহেতু এ ক্ষমতা নেই কাজেই তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত।

কিন্তু স্ত্রী-ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। শারীরিক ক্ষমতায় মেয়েরা পুরুষদের অপেক্ষা দুর্বল হলেও মানসিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষদের অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। কারণ সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে যে মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় মেয়েরা প্রদান করে তা উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ, দুর্বলতাই যদি স্ত্রী ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে যুক্তি হয় তাহলে একথা বলতে হয় যে, দুর্বলতার জন্যই তাদের নিজ অধিকার সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়া উচিত, নতুবা তারা সমাজের দ্বারা উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হতে পারে।

(ii) ভারতে ভোটাধিকারে সাম্য (Equality in respect of franchise in India) : ভারতীয় সংবিধানে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে সমতা বা সার্বজনীনতা রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তির একুশ বৎসর বয়স তারই লোকসভায় এবং রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে ভোটাধিকার রয়েছে। তবে যাদের বসবাসের জায়গা নেই, যারা বিকৃত মস্তিষ্ক এবং আইনবিরোধী কাজের জন্য অভিযুক্ত তেমন ব্যক্তিদের অবশ্য ভোটদানের অধিকার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সার্বজনীন ভোটাধিকারের এই নীতিকে ভারতীয় গণতন্ত্রের উৎসধারা (Fountainspring of India's democracy) বলা হয়েছে। কারণ, এর মাধ্যমে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক গুণাবলী যেমন—সম্পত্তি, আয়, মর্যাদা, খেতাব এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রশ্ন প্রভৃতি বর্জন করা হয়েছে।

ভারতে সার্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক নীতিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ১৯১৯ সালের ভারতীয় আইনে (Under the Government of India, Act 1919) ভারতীয় জনগণের মাত্র তিন শতাংশের ক্ষেত্রে ভোট দানের অধিকার স্বীকৃত ছিল। ১৯৩৫ সালের আইনে (Under the Act of 1935) অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। শতকরা দশজনের ক্ষেত্রে এই অধিকার স্বীকৃত হয়। কিন্তু বর্তমানে এই অধিকার সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাদেশিকতা (Provincialism) এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের কোন প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। ফলে যে-কোন ব্যক্তি ভারতের নাগরিক হিসেবেই ভোট প্রদান করে—হিন্দু, মুসলমান অথবা খ্রীষ্টান বলে নয়।

তবে সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হলেও সার্বজনীন ভোটাধিকার যে সফল হয়েছে একথা বলা সমীচীন নয়। ভারত অতি দরিদ্র

দেশ এবং এদেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশই অশিক্ষিত। অভাবের জন্য দরিদ্র লোকেদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অর্থনৈতিক প্রলোভনের শিকার হতে হয়। অশিক্ষিত শ্রেণী অনেক সময় ভোটের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন নয় এবং ভোটদানে অনেক ক্ষেত্রে বিরত থাকে। ভোটদানের অধিকার যে মৌলিক অধিকার এবং ভবিষ্যৎ জীবনের নিয়ন্ত্রণকারী তা অনেকেই মনে করে না। তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য এবং সভা সমিতির মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রচারের ফলে অশিক্ষিত জনগণের মধ্যেও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে বলা যায়।

অনুশীলনী

১। ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের প্রকৃতি আলোচনা কর (Discuss the nature of power and authority)।

২। বর্তমান জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রে, রাষ্ট্রের কার্যাবলী আলোচনা কর (Discuss the functions of State in the modern welfare state)।

৩। সামাজিক প্রতিষ্ঠান রূপে রাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনা কর (Discuss the role of the State as a social institution)।

৪। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দলীয় ব্যবস্থা এবং নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা কর (Discuss about the party system and election in the democratic state)।

৫। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সম্পর্কে আলোচনা কর। এ প্রসঙ্গে ভারতে ভোটাধিকারে সাম্য রক্ষিত হয়েছে কিনা আলোচনা কর (Discuss about the adult franchise. Discuss in this context whether equality in India regarding adult franchise has been secured or not)।

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষা

(Education)

১। শিক্ষা কথাটির সাধারণ তাৎপর্য (The General Significance of Education) :

ইংরেজী Educa tion শব্দটি এসেছে ল্যাটিন *Educare* কথাটি থেকে, যার অর্থ হল প্রতিপালন করা (to bring up) এবং *educere*—এই ক্রিয়াপদটির সঙ্গে যুক্ত, যার অর্থ হল উৎপাদন করা (to bring forth)। এই কারণে পাশ্চাত্ত্য দেশে শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হল, কেবলমাত্র ছাত্রকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করা নয়, বরং তার মধ্যে সেই সব অভ্যাস এবং মনোভাবের সৃষ্টি করা যার সহায়তায় সে কৃতিত্বের সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনের সম্মুখীন হতে পারে এবং জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে। প্লেটো (*Plato*)-র মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ছাত্রের সামর্থ্য অনুযায়ী তার দেহ ও মনের সৌন্দর্য ও পূর্ণতাকে বিকশিত করে তোলা ; ভিন্ন ভাষায়, সুস্থ শরীরে একটি সুস্থ মনকে (a sound mind in a sound body) বিকশিত করে তোলা। প্লেটো (*Plato*)-র মতে মনে জ্ঞানের সঞ্চার করাই শিক্ষার কাজ নয়, মনের মধ্যে সুপ্ত যে গুণগুলি আছে তার বিকাশ সাধন করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। অ্যারিস্টটল (*Aristotle*)-এর মতে শিক্ষার অর্থ মানুষের বৃত্তিকে বিশেষ করে তার মনকে বিকশিত করে তোলা যাতে সে সত্য, শিব এবং সুন্দরের ধারণাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং এর মধ্যেই পূর্ণ সুখ নিহিত। হোয়াইটহেড (***Whitehead***) বলেন, "শিক্ষা হল কি ভাবে জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হয় সেই কৌশল অর্জন করা।"

হোয়াইটহেডের মতে শিক্ষা শৈশব থেকেই ছাত্রদের মনে আবিষ্কারের আনন্দের অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে। অপ্রয়োজনীয় এবং নিষ্ক্রিয় ধারণা ছাত্রদের মনে অনুপ্রবিষ্ট করা উচিত নয়, কারণ তাহলে ছাত্রদের মধ্যে বুদ্ধিগত জড়তা এসে যাবে।

জন্ ডিউই (*John Dewey*)-এর মতে শিক্ষা হল একটা সামাজিক প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে সামাজিক করে তোলে। তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য সমাজের স্বীকৃত আদর্শের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে ব্যক্তির কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করা। শিক্ষার

ব্যাপারে পরিবেশের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের মধ্যে যদি কোন অবাঞ্ছিত বিষয়ের উপস্থিতি থাকে তাহলে সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে হবে। শিক্ষাই ব্যক্তিকে সামাজিক দিক থেকে উপযুক্ত করে তোলে। ডিউই (*Dewey*)-র শিক্ষা সম্পর্কীয় ধারণা গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) তাঁর 'Outlines of Social Philosophy' গ্রন্থে শিক্ষার তাৎপর্যকে দুদিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষাকে ব্যাপক অর্থে এবং সংকীর্ণ অর্থে দু'ভাবে নেওয়া যেতে পারে। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল এমন একটা প্রক্রিয়া যা আমাদের সমস্ত জীবন ধরে চলতে থাকে এবং জীবনের সব রকম অভিজ্ঞতাই এই শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করে। তিনি বলেন, "এই অর্থে এটি হল সাধারণ প্রক্রিয়া যার দ্বারা আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় এবং যার দ্বারা মানুষ তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে ও যে বিশ্বে তারা বসবাস করে তার সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে উপলব্ধি করতে পারে। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে আত্মোপলব্ধিকেই বোঝাচ্ছেন। আত্মোপলব্ধির (Self realisation) অর্থ হল মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করা। হোয়াইটহেড (*Whitehead*) বলেন, "শিক্ষার একটিমাত্র বিষয় আছে এবং তাহল সর্বতোভাবে প্রকাশিত জীবন।" যে-কোন মানুষ অনেক সদ্-গুণের অধিকারী হতে পারে, কিন্তু সব গুণগুলিই যে স্বাভাবিকভাবে পরিস্ফুট হয় তা নয়; অনেক গুণ থাকে সুপ্ত হয়ে। উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারাই মানুষের এই সুপ্ত গুণকে বিকশিত করা সম্ভব এবং তারই ফলে মানুষ নিজের অন্তর্নিহিত মহৎ ও বৃহৎ সত্তাকে আবিষ্কার করতে পারে। মানুষের আত্মোপলব্ধি তখনই আসে যখন তার জীবনে জ্ঞান, ইচ্ছা ও অনুভূতির পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটে।

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "সংকীর্ণ অর্থে একে মনে করা যেতে পারে—আমাদের ক্ষমতাকে বিকশিত এবং অনুশীলন করার জন্য সচেতনভাবে পরিচালিত যে কোন প্রচেষ্টা।"

ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*)-র মতে ব্যাপক অর্থে যে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে সে শিক্ষার অধিকাংশই মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে লাভ করে। জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, প্রকৃতির প্রভাব ও প্রেরণা, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, জীবনের সুযোগ ও সাফল্য এবং ব্যর্থতা ও দুর্ভোগ থেকে মানুষ এই শিক্ষা লাভ করে। সংকীর্ণ

অর্থে যে শিক্ষা সে শিক্ষা মানুষ সচেতনভাবেই গ্রহণ করে। একেই বোঝাতে গিয়ে ডিউই (*Dewey*) 'ইচ্ছামূলক শিক্ষা (Intentional Education) কথাটি ব্যবহার করেছেন। সাধারণতঃ সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলতে বোঝায় যখন রাষ্ট্র, পরিবার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কোন একটি সংগঠনের বা ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সাধনের জন্য তরুণদের ক্ষমতাকে বিকশিত করার ব্যবস্থা করে। সমাজবিদ্যায় 'শিক্ষা' কথাটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ না করে সংকীর্ণ অর্থেই ব্যবহার করা হবে। 'শিক্ষা' কথাটিকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করলে এর সামাজিক তাৎপর্যটুকু অতি সহজেই পরিস্ফুট হয়ে 'ওঠে। প্রথমে শিশুর দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে পরিবারের ওপর। তারপর ধীরে ধীরে সে দায়িত্ব এসে পড়ে স্কুল ও কলেজের ওপর।

২। শিক্ষার-মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতিতে অধিষ্ঠিতকরণ (Induction in the learner's culture through Education) :

শিক্ষা শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব সংস্কৃতিতে অধিষ্ঠিত করে। এই বিষয়টির তাৎপর্য যথাযথ উপলব্ধি করতে হলে 'শিক্ষা' ও 'সংস্কৃতির' অর্থ সুস্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া দরকার।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে শিক্ষার একটা ব্যাপক এবং একটা সংকীর্ণ অর্থ আছে। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল একটা সাধারণ প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় এবং যার দ্বারা ব্যক্তি তার পারস্পরিক সম্পর্ককে ও যে বিশ্বে সে বসবাস করে তার সঙ্গে তার সম্পর্ককে উপলব্ধি করতে পারে। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হল ব্যক্তির ক্ষমতাকে বিকশিত এবং অনুশীলন করার জন্য সচেতন-ভাবে পরিচালিত যে-কোন প্রচেষ্টা। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে ব্যক্তির জীবনের অসংখ্য অভিজ্ঞতাকে বোঝায়। ব্যক্তির প্রতিটি অভিজ্ঞতাই ব্যক্তিকে শিক্ষা দান করে এবং তার জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলে। এই সব অভিজ্ঞতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করে এবং তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে বুঝে নিতে সহায়তা করে। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা কোন সচেতনভাবে পরিচালিত প্রচেষ্টা নয়। এই শিক্ষার উপযোগিতা থাকলেও, সচেতনভাবে এই শিক্ষাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ব্যাপারে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হল কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সচেতনভাবে পরিচালিত প্রচেষ্টা বিশেষ, যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে ব্যক্তির অসংখ্য সুপ্ত গুণাবলী বা সম্ভাবনাকে

বাস্তবায়িত করা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য লাভে তাকে সমর্থ করে। বর্তমান আলোচনায় শিক্ষাকে আমরা সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করব।

'সংস্কৃতি' শব্দটিরও ক্ষুদ্রতর এবং ব্যাপকতর দুটি অর্থ আছে। ক্ষুদ্রতর অর্থে সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মার্জিত রুচি বা অভ্যাসজাত উৎকর্ষ। ব্যাপকতর অর্থে জীবনের সব দিকগুলিই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নৈতিকতা, রীতিনীতি, ভাষা, মূল্যবোধ, মানুষের অর্জিত বিভিন্ন অভ্যাস সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান আলোচনায় আমরা সংস্কৃতি শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করব।

শিক্ষা ব্যক্তিকে তার সংস্কৃতিতে অধিষ্ঠিত করে। শিক্ষার একটা লক্ষ্যই হল ব্যক্তিকে তার সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করান যাতে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সার্থক উপযোজন সম্ভব হয়। অনেক শিক্ষাবিদ্ শিক্ষার্থীকে সংস্কৃতিতে অধিষ্ঠিত করাকেই শিক্ষার লক্ষ্য মনে করেন। অবশ্য সংস্কৃতি বলতে তারা বোঝেন শিক্ষার্থীর মানসিক উন্নতি। তাদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তির রুচি এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন করা। কিন্তু এ হল শিক্ষার লক্ষ্যকে খুব সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা।

আসলে সংস্কৃতি শব্দটিকে যে অর্থেই আমরা গ্রহণ করি না কেন, শিক্ষার সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। যদি সংস্কৃতি বলতে আচার ব্যবহার ও রুচির উৎকর্ষ বোঝায়, বুদ্ধি ও চরিত্রের বিকাশ বোঝায়, সাধারণভাবে মনের বিকাশ-সাধন বোঝায় তাহলেও শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সংস্কৃতির এই দিকটির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেয়। শিক্ষা শিক্ষার্থীর মন ও চরিত্রের বিকাশসাধন করে, তাকে সুন্দর আচরণ ও উন্নত রুচি অনুশীলনে সহায়তা করে। নিঃসন্দেহে শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর মধ্যে মার্জিত রুচি, আচরণ ও অভ্যাসের উৎকর্ষ নিয়ে আসা। তবে শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সমাজস্থ মানুষের অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেয়, সমাজের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস, কলা, নিয়ম ও সংস্কারের সঙ্গে পরিচিত করায়। শিক্ষা ব্যক্তির নীতিবোধকে উন্নত করে, মানুষের আচরণের সঠিক মূল্যায়নে তাকে প্রবুদ্ধ করে।

শিক্ষা পার্থিব বস্তুর উৎপাদন সম্পর্কে যেমন শিক্ষার্থীর আগ্রহ বৃদ্ধি করে, তেমনি উৎকর্ষমূলক প্রয়োজন সম্পর্কেও শিক্ষার্থীকে সচেতন করে তোলে। শিক্ষার্থীকে তার চারপাশের রীতি-নীতি, আচার ব্যবহারের বৈচিত্র্য, প্রচলিত প্রথা, অনুষ্ঠান সম্পর্কে কৌতূহলী করে তোলে, তাদের সঠিক স্বরূপ বুঝে নিতে

ও তাদের মূল্যায়ন করতে উদ্বুদ্ধ করে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, কলা, সবকিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষাই শিক্ষার্থীকে এইসব বিষয়গুলির সঙ্গে যথাযথভাবে পরিচিত হবার সুযোগ দেয়। সমাজের সভ্যরা বংশপরম্পরায় যেসব আচার, প্রথা ও অনুষ্ঠান উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে সেগুলির সঙ্গে শিক্ষাই শিক্ষার্থীর পরিচয় করিয়ে দেয়। সংস্কৃতি সম্পর্কে ডিউই (*Dewey*) বলেন, 'এ হল ধারণা ও কলার মূল্যাবধারণ এবং মানবীয় অনুরাগ জাগ্রত করার জন্য অনুশীলন'। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, শিক্ষাই শিক্ষার্থীকে এই মূল্যাবধারণে সমর্থ করে এবং তার মধ্যে মানবীয় অনুরাগ জাগ্রত করে। হোয়াইটহেড (*Whitehead*) বলেন, 'সংস্কৃতি হল চিন্তার ক্রিয়াশীলতা এবং সৌন্দর্য ও মানবীয় অনুভূতিতে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা।' হোয়াইটহেড সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উপরিউক্ত উক্তিতে প্রকাশ হয়ত করতে পারেননি। কিন্তু শিক্ষা যখন শিক্ষার্থীকে তার সংস্কৃতিতে অধিষ্ঠিত করে তখন শিক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে চিন্তার ক্রিয়াশীলতা আনয়ন করে এবং সৌন্দর্য ও মানবীয় অনুভূতিতে যাতে শিক্ষার্থী সাড়া দিতে পারে তার জন্য তাকে প্রস্তুত করে তোলে।

৩। শিক্ষা ও সামাজিকীকরণ (Education and Socialisation):

ইংরেজী Education শব্দ ল্যাটিন educere শব্দ থেকে উদ্ভূত। 'educere' কথার অর্থ হচ্ছে কোন কৌশল আয়ত্ত করা বা তথ্য সংগ্রহ করা। আদিমকালে মানুষ জীবন সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য যে তথ্য আহরণ করত তাকেই বলা হত শিক্ষা। শিক্ষার এই প্রাচীন ব্যাখ্যাকে বর্তমানে সাধারণ অর্থে শিক্ষার যথার্থ স্বরূপ্ বলে গণ্য করা হয়। শিক্ষা বলতে সাধারণ মানুষ বোঝে বিদ্যালয়ে বা অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গ্রন্থলব্ধ জ্ঞান। অর্থাৎ মানুষের যে অভিজ্ঞতা আমরা পুঁথিপত্রের সাহায্যে লাভ করি সে অভিজ্ঞতা বা তথ্যই হচ্ছে শিক্ষা। এ অর্থে শিক্ষার দ্বারা আমরা শিক্ষার্থীকে বিশেষ কোন সামাজিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য প্রস্তুত করে তুলি। বলা বাহুল্য, এ হল শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ। এ শিক্ষা মানুষের জীবনের বিশেষ স্তরে সীমাবদ্ধ। কিন্তু শিক্ষার স্বরূপ এই সংকীর্ণ অর্থের মধ্যে নিহিত নেই। শিক্ষা জীবনের সমপর্যায়ভুক্ত। শিক্ষার পরিধি সমগ্র জীবনব্যাপী, শিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত বা ব্যাপক অর্থ হল জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতা আমাদের আচরণে পরিবর্তন আনে এবং নতুন আচরণের সৃষ্টি করে।

এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ব্যক্তি বিশেষের বা জীবনের বিশেষ স্তরে সীমায়িত নয়। প্রতিটি মানুষের জীবনে চলেছে শিক্ষার অন্তহীন বিরামহীন প্রক্রিয়া। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা মানুষের জীবন বিকাশের সঙ্গে সমার্থক, পৃথিবীতে শিশু ভূমিষ্ট হবার পর থেকেই এই শিক্ষার শুরু, আর শেষ হয় মৃত্যুতে।

যে অভিজ্ঞতা আমাদের আচরণে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয় সে অভিজ্ঞতাই শিক্ষা। কিন্তু সে পরিবর্তন যেন নীতিশাস্ত্র সম্মত হয়, মানুষের জীবনে বাঞ্ছনীয় হয়, সামাজিক আদর্শ লাভের পক্ষে সহায়ক হয়। আসল কথা, ব্যক্তি ও সমাজের অস্তিত্ব সংরক্ষণই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। ব্যক্তির ও সমাজের প্রগতিও শিক্ষার অন্যতম কাজ। ব্যক্তির আচরণকে ব্যক্তি ও সমাজের আদর্শ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করার প্রশ্নও এসে পড়ে। সুতরাং এ দুয়ের অস্তিত্ব এবং অগ্রগতির প্রয়োজনে সমাজ স্বীকৃত আচরণকে গ্রহণ করাই শিক্ষা।

সামাজিকীকরণ বলতে কি বোঝায়? প্রতিটি সমাজেই কতকগুলি আচরণ ধারা আছে যেগুলি সমাজের দ্বারা অনুমোদিত এবং যেগুলি সমাজের দ্বারা অনুমোদিত নয়। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি অপরের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া (interaction)-র মধ্য দিয়ে তার গোষ্ঠীর উপযোগী আচরণ ধারা এবং স্বীকৃত মূল্যগুলি শিক্ষা করে, তাকেই সামাজিকীকরণ বলে। এর প্রধান লক্ষ্য হল ব্যক্তি যাতে তার সমাজের সংস্কৃতিকে তার অঙ্গীভূত করে নিতে পারে তাতে সহায়তা করা। এইভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হলে সামাজিকীকরণ শিশু এবং প্রাপ্ত বয়স্কের সবরকম সামাজিক শিখনের অভিজ্ঞতা, সে অভিজ্ঞতা অ-বিধিবদ্ধ পরিস্থিতি যেমন, গৃহে বা পাড়াতে হোক বা বিধিবদ্ধ পরিস্থিতি যেমন, বিদ্যালয় বা সাম্প্রদায়িক সংগঠনেই হোক। সামাজিকীকরণ বলতে বোঝায় সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিশু তার সমাজের বা গোষ্ঠীর কর্তব্য সম্পাদনকারী এবং সমাজের কার্যে অংশগ্রহণকারী সভ্য হতে শিক্ষা করে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার অর্থ হল শিশুকে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জগতে অনুপ্রবিষ্ট করা। তাকে সমাজের এবং সমাজস্থ নানা ধরনের গোষ্ঠীর কাজকর্মে একজন অংশগ্রহণকারী সভ্যরূপে গড়ে তোলা এবং সমাজের আদর্শ ও মূল্য গ্রহণে তাকে প্রবৃত্ত করা। বোগারডাস (*Bogardus*) সামাজিকীকরণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন', 'এ হল সেই প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তি জনকল্যাণের জন্য একত্রে নির্ভরযোগ্য' আচরণ করতে শেখে এবং তা করতে গিয়ে সামাজিক আত্মনিয়ন্ত্রণ, সামাজিক দায়িত্ব এবং সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞতা লাভ করে।"

ব্যক্তির সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অনেকগুলি প্রক্রিয়া যুগপৎ ক্রিয়া করে। প্রধান প্রধান প্রক্রিয়াগুলি হল বাস্তবতাবোধের বিকাশ, নিজের সম্পর্কে ধারণার বিকাশ, ভাষা আয়ত্তীকরণ, প্রয়োজনীয় কাজকর্ম শিক্ষা করা এবং জীবনের বিভিন্ন ভূমিকার জন্য প্রস্তুতি।

সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ কখনই আশা করতে পারে না যে সমাজের প্রতিটি সভ্যই নিজের থেকেই সমাজের অনুমোদিত আচরণধারা গ্রহণ করবে। সমাজের সভ্যরা যাতে সামাজিক মূল্য, সামাজিক আদর্শ, সামাজিক অভ্যাসগুলি শিক্ষা করতে পারে তার জন্য প্রতিটি সমাজকে তার শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি সভ্যকে তার নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করার জন্য শিক্ষাদান করতে হবে। যদি সমাজে তরুণদের সামাজিকীকরণ তাদের নিজেদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের যথার্থ পরিচয় ঘটে না। সমাজ তার শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদন করে। সমাজে বিধিবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের সভ্যদের সমাজ স্বীকৃত মূল্যগুলি সম্পর্কে সচেতন হবার জন্য বাধ্য করা হয়। অপরিণত বয়স্কদের দুষ্ক্রিয়তার মূলে রয়েছে তাদের সামাজিকীকরণের অভাব। আর শিক্ষার অভাব এই সামাজিকীকরণের অভাবের অন্যতম কারণ। বুদ্ধিগত কারণে যে সব কিশোর কিশোরীরা দুষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে সেগুলি নিবারণ করতে হলে শিশুর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন।

এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পরিবারের মধ্য দিয়ে শিশুর যে সামাজিকীকরণ শুরু হয় বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সেই প্রক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা বজায় থাকে। গোষ্ঠী সংস্কৃতির সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিশুকে শিক্ষা দিয়ে থাকে।

একটা আদর্শ সমাজ তখনই গড়ে উঠতে পারে যখন প্রতিটি ব্যক্তি তার আচরণকে বিচার-বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজ জীবনে প্রতিটি ব্যক্তিরই উচিত অপরের অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া। কিন্তু যে ব্যক্তি বিচার-বুদ্ধির দ্বারা নিজের আবেগ, প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারে তার পক্ষে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা খুবই স্বাভাবিক। ব্যক্তি যদি অধিকার এবং কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন না থাকে তাহলে সমাজ-জীবনের শান্তি ও ঐক্য বিশেষভাবে ব্যাহত হবে। সমাজে প্রতিটি সভ্যের যথাযথ সামাজিকীকরণ হলে

এই সমস্যা দেখা দেয় না। ব্যক্তি নিজ অধিকার এবং অপরের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়। এর জন্য প্রয়োজন সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে শিক্ষিত করে তোলা যাতে সে তার আচরণ বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এবং সমাজ জীবনের শান্তি ও ঐক্য বজায় রাখতে পারে।

ব্যক্তি নিয়েই সমাজ, প্রতিটি ব্যক্তিকে সমাজজীবনে তার অবস্থান অনুযায়ী সমাজের দ্বারা নির্দেশিত কতকগুলি কর্তব্য সম্পন্ন করতে হয়। ব্যক্তির মধ্যে দায়িত্ববোধ ও সামাজিক চেতনা থাকলেই ব্যক্তি এই কর্তব্যগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে। শিক্ষার দ্বারাই ব্যক্তির মনে এই দায়িত্ববোধ ও সামাজিক চেতনা সৃষ্টি করা যেতে পারে। যে সমাজের সভ্যদের সামাজিকীকরণ যথাযথ সাধিত হয় সেই সমাজই যথার্থ প্রগতিশীল, শিক্ষার দ্বারাই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নানাভাবে মানুষকে শিক্ষাদান করে মানুষের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে সার্থক করে তোলে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিশুদের সামাজিক মূল্যগুলি সম্পর্কে সচেতন হতে, সমাজের আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে ক্রিয়া করতে, সামাজিক দক্ষতা অর্জন করতে শিক্ষা দেয়।

সামাজিকীকরণ হল গোষ্ঠীর প্রচলিত সংস্কৃতির সঙ্গে শিশুকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিকে তার সমাজের বা গোষ্ঠীর সংস্কৃতির পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাতে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সার্থক উপযোজন সম্ভব হয়। প্রত্যেক সংস্কৃতিরই রয়েছে তার নিজস্ব মূল্য ও মূল্যের সংহতি (its values and value system)। প্রত্যেক সমাজেই মানুষ বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত, অভিপ্রেত ও অনভিপ্রেত, ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে। শিক্ষার মাধ্যমেই ব্যক্তির দৃষ্টি সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকর্ষণ করা হয়।

অবশ্য সামাজিকীকরণের লক্ষ্য পুরোপুরি লাভ করা সম্ভব নয়। যদি কোন সমাজ তার সভ্যদের সামাজিকীকরণকে সম্পূর্ণ করতে পারে তাহলে সমাজে দুষ্ক্রিয়তা ও অপরাধের অবসান ঘটে, একথা সত্য, কিন্তু যে কারণে সামাজিকী-করণের ক্ষেত্রে শিক্ষার মূল্য হ্রাস পায় না। একথা সত্য যে কোন সমাজেই ব্যক্তির পক্ষে সমাজ স্বীকৃত সব আচরণ শিক্ষা করা ও সব অনুমোদিত মূল্যের সমাদর করা সম্ভব নয়, কিন্তু যতটুকু সম্ভব তা সার্থকভাবে সিদ্ধ হতে পারে শিক্ষার দ্বারাই।

কাজেই শিক্ষা প্রক্রিয়া ও সুপরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থা যে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে সার্থক করে তুলতে পারে তা কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না।

৪। শিক্ষা এবং নৈপুণ্য অর্জন (Education and Learning of skils) :

কর্মনৈপুণ্য বা কর্মদক্ষতা বলতে কি বোঝায়? সাধারণতঃ কোন কার্য সম্পাদনে কুশলতাই হল কর্মনৈপুণ্য বা কর্মদক্ষতা। যে কোন কাজ করতে গিয়ে আমাদের আনুক্রমিকভাবে কতকগুলি আচরণ বা প্রতিক্রিয়া করতে হয়। যখন সুসংবদ্ধ কতকগুলি আনুক্রমিক প্রতিক্রিয়া বিচক্ষণতার সঙ্গে সম্পন্ন করার পারদর্শিতা শিখনের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি তখনই আমাদের কর্মদক্ষতা প্রকাশ পায়। যেমন, নিপুণতার বা দক্ষতার সঙ্গে পিয়ানো বাজান, গাড়ি চালান, উড়োজাহাজ চালান, কবিতা আবৃত্তি করা, ফুটবল খেলা প্রভৃতি। কোন কাজে নিপুণতা বা দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্য হল সেই কাজটি নির্ভুলভাবে ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সম্পাদন করা। মোটর গাড়ি চালনা করতে গিয়ে যদি কোন ব্যক্তির পদে পদে ভুল হয় তাহলে সেই ব্যক্তি গাড়ি চালনায় দক্ষতা অর্জন করেছে একথা আমরা বলি না।

কোন কোন দক্ষতা হল সংবেদন-ক্রিয়াজনিত (sensori motor) প্রক্রিয়া বা প্রত্যক্ষজ-ক্রিয়াজনিত (perceptual motor) প্রক্রিয়া। পড়া, লেখা, গান-বাজনা, ভাষা আয়ত্তীকরণ (বাচনিক), অঙ্কন এবং সাধারণ শিল্পকলা (arts in general) এই ধরণের প্রক্রিয়ার উদাহরণ। কেউ কেউ সংবেদন ক্রিয়াজনিত নৈপুণ্য ও বাচনিক (verbal) নৈপুণ্যের মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করেছেন। কবিতা আবৃত্তি করা তাঁদের মতে বাচনিক নৈপুণ্যের উদাহরণ। কিন্তু এক্ষেত্রেও সংবেদন ক্রিয়াজনিত প্রক্রিয়া বর্তমান। কাজেই সংবেদন ক্রিয়াজনিত নৈপুণ্য ও বাচনিক নৈপুণ্যের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করা খুবই কঠিন।

নৈপুণ্য অর্জনের সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আচরণ বা প্রতিক্রিয়ার আনুক্রমিক সংগঠন (serial organisation)। অর্থাৎ কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হলে আনুক্রমিক শিখন (serial learning) প্রয়োজন। যেক্ষেত্রে আনুক্রমিকভাবে বা ধারাবাহিকভাবে আচরণ বা প্রতিক্রিয়া করা হয় সে ক্ষেত্রেই আনুক্রমিক শিখন নামটি প্রয়োগ করা হয়। এই আনুক্রমিক শিখনের একটা সাধারণ উদাহরণ হল কবিতা আবৃত্তি করা। যেসব ক্ষেত্রে পেশী চালনার দক্ষতা (motor skill) প্রকাশ পায়, সে সব ক্ষেত্রেও আনুক্রমিক শিখনের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। ধারাবাহিকভাবে আচরণ বা প্রতিক্রিয়া করার বিষয়টি শিক্ষার ওপর নির্ভর। একটা উদাহরণের সাহায্যে আলোচ্য বিষয়টা বুঝে নেওয়া যাক : কোন ব্যক্তি

মোটর গাড়ি চালনা শিক্ষা করতে চায়। এক্ষেত্রে নৈপুণ্য অর্জনের জন্য তাকে আনুক্রমিকভাবে প্রতিক্রিয়া করতে হবে। কিন্তু সেটা তখনই সম্ভব হবে যদি গাড়ির প্রতিটি অংশের কার্যের যথাযথ জ্ঞান তার থাকে। শিক্ষার মাধ্যমেই এই জ্ঞান তার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব।

নৈপুণ্য অর্জনের মৌলিক নীতিগুলির সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। নৈপুণ্য অর্জনের একটি মৌলিক নীতি হল নির্ভুলভাবে কর্ম সম্পাদনের ওপর প্রথম থেকেই জোর দেওয়া। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অনুশীলন করা। কিন্তু এই সঠিক পদ্ধতির জ্ঞান শিক্ষই মাধ্যমেই লব্ধ হতে পারে। যেখানে সঠিক পদ্ধতি জানা নেই সেক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন (trial and error) পদ্ধতির মাধ্যমে সঠিক পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে। কিন্তু যেখানে সঠিক পদ্ধতি জানা আছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি মজুত রয়েছে,সেখানে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে শিখে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। শিক্ষার মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগৃহীত হতে পারে। নৈপুণ্য অর্জনের আর একটি নীতি হল শিখনের বিষয়টিকে স্বাভাবিক অংশে ভাগ করে নিয়ে শিখতে হবে, খণ্ড খণ্ড অংশে নয়। এই জ্ঞানও শিক্ষার মাধ্যমে লব্ধ হতে হবে।

নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে জ্ঞানের আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে। একথা ঠিক যে, উপযুক্ত জ্ঞান থাকলেই যে কেউ নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জন করতে পারবে এমন কোন কথা নেই, যদি সে অনুশীলন না করে। কিন্তু উপযুক্ত জ্ঞানের ভিত্তিতেই অনুশীলন সম্ভব হয়। কোন যন্ত্রপাতির প্রয়োগে যে কারিগর দক্ষতা বা নৈপুণ্য অর্জন করতে চায়, সেখানে যন্ত্রপাতির নিখুঁত জ্ঞান তার দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হয়। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমেই এই জ্ঞান সে লাভ করতে পারে। সাধারণতঃ, প্রয়োগমূলক বা ব্যবহারিক বিজ্ঞান (Practical sciences)-গুলির প্রয়োগের যেমন একটি দিক আছে তেমনি তার একটা তত্ত্বগত (theoretical) দিকও আছে। উভয়ের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। যে ব্যক্তি অস্ত্রোপচারে দক্ষতা অর্জন করতে চান তার মানুষের শরীরের গঠন সম্পর্কে নিখুঁত জান থাকা দরকার। শিক্ষার মাধ্যমেই ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ করতে পারে। তাছাড়াও নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে নির্দেশদান (guidance)-এর একটা গূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। নির্দেশক যেমন প্রয়োগ কৌশল শিক্ষা দেবেন তেমনি শিখনের বিষয়টি সম্পর্কেও তাকে সাধারণভাবে শিক্ষা দেবেন, সুতরাং সেদিক থেকেও শিক্ষার সঙ্গে দক্ষতা বা নৈপুণ্যের নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে।

শিক্ষা সাধারণ (general) বা কারিগরী (technical) হতে পারে। প্রত্যেক শিশুরই বিশেষ কোন একটি দিকে প্রবণতা থাকে এবং তার সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে কোন এক বিশেষ ধরনের কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, যার দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবনে সে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হবে। কারিগরী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা হল সেই শিক্ষা যা কোন ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়, যার সহায়তায় সে দক্ষতার সঙ্গে বিশেষ কোন কাজ করতে সমর্থ হবে। যেমন, তাঁত বোনা বা কাঠের কাজ করা। কিন্তু এই দক্ষতা অর্জনের জন্য তার সাধারণ শিক্ষারও প্রয়োজন আছে।

যে কোন সমাজের প্রগতি নির্ভর করে তার সভ্যদের নিজ নিজ কর্মে দক্ষতার ওপর। কিন্তু এই নৈপুণ্য বা দক্ষতা একদিকে যেমন অনুশীলন নির্ভর, অপর দিকে সাধারণ জ্ঞানের ওপর নির্ভর। সে কারণে সভ্য সমাজে কর্মীদের নৈপুণ্য ও দক্ষতা সৃষ্টির জন্য যথাযথ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মীদের উপযুক্ত জ্ঞান দান করে, যে কর্মে তারা নিয়োজিত, সে সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষা দান করে সমাজে দক্ষ বা নিপুণ কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

৫। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা (Role of Educational Institutions) ঃ

শিক্ষার সামাজিক তাৎপর্য নির্ণয় করতে গিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের মধ্যে আমরা পার্থক্য করি। সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে শিক্ষা (Education as social process) এবং সামাজিক সংহতি বা ব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষা (Education as a social system)। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা মানুষের জীবনের বিকাশের সঙ্গে সমার্থক। পৃথিবীতে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পরক্ষণ থেকেই তার শিক্ষা শুরু হয়। কিন্তু এভাবে প্রতিটি ব্যক্তি শিক্ষা লাভ করলেও শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কোন সমাজেই শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষের ওপর ছেড়ে দেওয়া চলে না। তাই প্রতিটি সমাজে একটা সুসংহত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয় যাতে ব্যক্তি সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার (social interaction) মধ্য দিয়ে তার গোষ্ঠীর স্বীকৃত আচরণ ও মূল্যগুলি শিক্ষা করতে পারে। সে কারণে প্রতিটি সভ্য সমাজেই এইশিক্ষা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, উচ্চতর শিক্ষা এবং বিভিন্ন ধরনের কারিগরী

বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করা হয়। কাজেই সমাজে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান।

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন করে যার মাধ্যমে সমাজ তার সভ্যদের সামাজিকীকরণকে সার্থক করে তুলতে পারে। কোন সমাজই সামাজিকীকরণের সুকঠিন দায়িত্ব ব্যক্তি বিশেষের ওপর ছেড়ে দিতে পারে না। সামাজিক প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য প্রতিটি সমাজ সচেতনভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মারফৎ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে।

যে কোন সুসংগঠিত সমাজে শিক্ষা দেওয়ার সুমহান দায়িত্ব কতকগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত করা হয়। প্রশ্ন হল, এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি? এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে মতবিভেদ লক্ষ্য করা যায়। কেউ মনে করেন শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করাই এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। কেউ বা মনে করেন সংস্কৃতি শিক্ষা দেওয়াই তাদের লক্ষ্য। সংস্কৃতি বলতে তারা মনে করেন ব্যক্তিগত মানসিক উন্নতি। কেউ বা মনে করেন, সৎ চরিত্র গঠন শিক্ষা দেওয়া, আবার কেউ বা মনে করেন পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে সব কর্ম করার প্রয়োজন তার জন্য শিক্ষার্থী যাতে নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে পারে, এই সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সেই দায়িত্ব পালন করে। কোন কোন শিক্ষাবিদ্ মনে করেন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ উত্তম নাগরিকতা শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া এবং ব্যক্তির সহজাত সামর্থ্যের আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেওয়া। ডিউই (*John Dewey*)-র মতে সামাজিক কর্মকুশলতা শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

জোয়াড (*Joad*)-এর মতে শিক্ষার একাধিক উদ্দেশ্য আছে—(ক) ছেলে-মেয়েদের জীবিকা অর্জনের জন্য উপযুক্ত করে তোলা। (খ) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যাতে নাগরিক হিসেবে তারা কাজ করতে পারে তার জন্য তাদের উপযুক্ত করে তোলা এবং (গ) তাদের যে সুপ্তশক্তি এবং বৃত্তি আছে তাকে বিকশিত করে সৎ জীবন যাপন করার জন্য তাদের সমর্থ করে তোলা।

বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার লক্ষ্যকে কতখানি সিদ্ধ করতে পারে সে প্রশ্ন না তুলে একথা বলা যেতে পারে যে, মানুষের জীবনের যে বিভিন্ন দিকের বিকাশের কথা ওপরে বলা হয়েছে, শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের মধ্যে এই সবকটিই অন্তর্ভুক্ত হবে। বিশেষ কোন একটি দিক শিক্ষার লক্ষ্য

হতে পারে না। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পূর্ণ মানুষটিকে শিক্ষা দেওয়া, ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিত্বের উন্নতি সাধন করা।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হল—প্রকৃত মানুষ গড়ে তোলা, মানুষের পূর্ণব্যক্তিত্বকে বিকশিত করা। প্রতিটি মানুষকে এমনভাবে শিক্ষাদান করতে হবে যাতে সে তার মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, ইচ্ছামূলক এবং সৌন্দর্য সম্পর্কীয় শক্তিগুলিকে বিকশিত করে নিজের বিশ্ব-মানবত্ব উপলব্ধি করতে পারে।

আধুনিক সভ্য সমাজে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার উপরিউক্ত মহৎ লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিক্ষাদান কার্যে অগ্রসর হয়। শিক্ষাদান হল একটা গতিশীল প্রক্রিয়া। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ছাত্রদের পুঁথিগত বিদ্যা দান করা নয়। যে জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না সেই জ্ঞানের ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কখনই উদ্দেশ্য হবে না যুবকদের মনে কতকগুলি স্বীকৃত সত্য ও মূল্যের ধারণা অনুপ্রবিষ্ট করে দেওয়া। শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, অনুরাগ, প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করাই হবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান কাজ।

আমরা এইবার বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করে সমাজ-জীবনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা কি বুঝে নিতে সচেষ্ট হব।

(ক) **বিদ্যালয়ের কার্য (The functions of the School)**: বিদ্যালয়ের প্রাথমিক কাজ শিশুকে শিক্ষা দান করা, শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে তাকে পড়তে, লিখতে ও অঙ্ক কষতে শেখান এবং মাধ্যমিক স্তরে একটা নির্বাচিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী তাকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু এ ছাড়াও বিদ্যালয়ের আরও গুরুতর দায়িত্ব রয়েছে। বিদ্যালয়কে শিশুর চরিত্রগঠন ও ব্যক্তিত্বের উন্নতি সাধনের দায়িত্ব নিতে হয়। বিদ্যালয় শুধুমাত্র লেখাপড়া শিক্ষা দেবার প্রতিষ্ঠান নয়, সামাজিক শিক্ষাদানেরও একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয়ের কাজ শিশুকে বৃহত্তর সমাজ জীবনের দীক্ষা দেওয়া। বিদ্যালয়ের একটা নিজস্ব পরিবেশ আছে এবং বিদ্যালয়ের কাজ শিশুকে এই পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এই পরিচয়ের মাধ্যমেই বৃহত্তর সমাজ জীবনের সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটে, বিদ্যালয়ের নূতন পরিবেশে শিশুর মধ্যে 'আমরা ভাব' (we feeling) জাগ্রত হয়, শিশু শিক্ষা করে অপরের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করে কিভাবে কাজ করতে হয়। শিশুর শ্রেণীকক্ষ (Class room), খেলার

মাঠ, এবং পাঠ্যসূচী-বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি এই 'আমরা-ভাব' জাগ্রত করার উপযুক্ত মাধ্যম।

ডিউই (*Dewey*) বিদ্যালয়ের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যের উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, সেই পরিবেশের সৃষ্টি করা যার দ্বারা শিশুর মানসিক উন্নতি সাধিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, সেই বিষয়গুলি থেকে পরিবেশকে মুক্ত রাখা যার দ্বারা শিশুর মানসিক উন্নতি ব্যাহত হয় এবং তৃতীয়তঃ, একটি বৃহত্তর ও উচ্চতর পরিবেশের সৃষ্টি করা।

ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*)-এর মতে শিশুর আত্মবিকাশের দায়িত্ব তার ওপর ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। যে জনজীবনের মাঝে সে বেড়ে উঠবে বিদ্যালয়ের কাজ তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া। সে কারণে সমাজে যাদের সঙ্গে সে মিলেমিশে থাকে, তাদের ভাষা তাকে শিখতে হবে এবং এই ভাষার মধ্যেই নিহিত থাকবে সমাজের উদ্দেশ্য ও আদর্শ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা। শিশুকে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে এই শিক্ষা দিতে হবে এবং সহানুভূতির সঙ্গে তার প্রয়োজনগুলিও বিবেচনা করে দেখতে হবে।

বিদ্যালয়ের দায়িত্ব সমাজের ঐতিহ্যের মধ্যে যা কিছু সবচেয়ে শুভ ও শ্রেয় তার সঙ্গে শিশুর পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে সুন্দর ভাবগুলি তাদের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে। যে-সব নিয়ম-কানুন এই সব ঐতিহ্যকে সুনির্দিষ্ট এবং স্থায়ী করে তুলেছে সেই নিয়ম-কানুন সম্বন্ধেও তাদের জ্ঞান দেওয়া বিদ্যালয়ের কাজ।

তারপর শিশুকে পরিচিত করে তুলতে হবে তার চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে। প্রকৃতিকে জানতে শেখানোর মাধ্যমেই তার মনকে বিকশিত করে তুলতে হবে। প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে শিশু চিন্তা করতে শিখবে। তার থেকেই আসবে মানুষের জীবনকে জানার ইচ্ছা, তার থেকেই ইচ্ছে হবে মানুষের ইতিহাসকে জানতে।

কিন্তু শুধুমাত্র জ্ঞান সঞ্চয় করে লাভ নেই, যদি না তাকে কাজে লাগান হয়। সেজন্য জ্ঞানকে যাতে কাজে লাগান হয় সে বিষয়েও শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে। শিশুর কল্পনা শক্তি, সৃজনী শক্তি ও মৌলিক চিন্তাশক্তিকে বিকশিত করে তুলতে হবে। যে-কোন জিনিসের প্রয়োজনের দিক এবং তার সৌন্দর্যের দিক—উভয় দিক সম্পর্কেই যাতে সে সচেতন হয়, সে দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর দৈহিক উন্নতির দিকেও বিদ্যালয়ের লক্ষ্য দিতে হবে।

সে কারণে শিশুকে দিতে হবে খেলাধূলার সুযোগ। শিশু যাতে নির্দোষ আমোদ প্রমোদে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং সৎ অভ্যাস অনুশীলন করতে পারে বিদ্যালয়ের সে দিকেও নজর দিতে হবে; তার ফলেই সে শিখবে কি করে সমবেতভাবে কাজ করতে হয়। তারপর বালক বালিকা যখন সাবালক ও সাবালিকা হয়ে উঠবে তখন স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, পারিবারিক সমস্যা সম্পর্কে তাদের কিছু কিছু সুস্পষ্ট জ্ঞান দেওয়া প্রয়োজন।

বার্টরেণ্ড রাসেল (*Bertrand Rusell*)-এর মতে বিদ্যালয়ের স্তরে শিশুদের সেই বিষয়গুলিই শিক্ষা দেওয়া উচিত যেগুলি সকলের প্রয়োজন। শিক্ষার পরবর্তী স্তরে কোন বিষয় সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদান করা উচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সর্বাধিক স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন; কেননা স্বাধীনতার সংকোচন শিশুদের মৌলিক চিন্তাশক্তির বিকাশ এবং তার বুদ্ধিগত অনুরাগের পথে বাধার সৃষ্টি করে। ছাত্রদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের যদি কোন বিষয় পাঠ করার জন্য বাধ্য করা হয় তাহলে শিক্ষার প্রতিই তাদের বীতরাগ জন্মায়। রাসেল (*Russell*) তাঁর '*Education and Social Order*'[1] গ্রন্থে বলেছেন যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ছাত্রদের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য, সহযোগিতার পরিবেশের মধ্য থেকে যাতে ছাত্ররা কোন বিষয় সম্পর্কে নির্ভুল সিদ্ধান্তে আসতে পারে।

সুতরাং বিদ্যালয়ের দুটি প্রধান কার্য—একটি হল শিশুর জ্ঞান বৃদ্ধি করা, বুদ্ধিকে উন্নত করা, তার দৃষ্টিকে ব্যাপক করা এবং আর একটি হল, তার সামাজিক কর্মকুশলতাকে উন্নত করা, তাকে সুনাগরিক হতে শিক্ষা দেওয়া।

(খ) কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্য (Functions of Technical or Vocational Educational Institutions) : ইতিপূর্বে শিশুর যে শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছি, সে শিক্ষা হল সাধারণ শিক্ষা (**general education**), যার সহায়তায় শিশু নিজেকে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়ে তুলতে পারবে। কিন্তু সাধারণতঃ প্রত্যেক শিশুরই বিশেষ কোন একটি দিকে প্রবণতা থাকে এবং তার সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে কোন বিশেষ এক ধরনের কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, যার দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবনে সে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হবে। কারিগরী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা হল সেই শিক্ষা যা কোন ব্যক্তি বা শিশুকে দেওয়া হয় যার সহায়তায় সে দক্ষতার সঙ্গে বিশেষ

1. *Bertrand Russell*: Education and Social order, Page 32.

কোন কাজ করতে সমর্থ হবে। যেমন, তাঁত বোনা বা কাঠের কাজ করা ইত্যাদি। এই শিক্ষা শিল্প সংক্রান্তও হতে পারে এবং কৃষিসংক্রান্তও হতে পারে। অনেকে মনে করেন যে, কারিগরী শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার বিরোধিতা আছে। হোয়াইটহেড (*Whitehead*) তার বিরোধিতা করে বলেন, "কারিগরী শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষার মধ্যে বিরোধের ধারণা ভ্রান্তজনক। কারিগরী শিক্ষা যথার্থ হতে পারে না যদি তা সাধারণ শিক্ষা না হয়—সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়, যা কৌশল এবং বুদ্ধিসম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গী প্রদান না করে।" প্রাচীন দার্শনিক প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটল বৃত্তিমূলক বা কারিগরী শিক্ষাকে নিকৃষ্ট ধরনের শিক্ষা বলে গণ্য করতেন। তাঁদের মতে এই ধরনের শিক্ষা বুদ্ধি এবং সৌন্দর্য বর্জিত। কিন্তু বর্তমান যুগে এই দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। নানা কারণে বর্তমান যুগে কারিগরী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রথমতঃ, আধুনিক যুগে জীবিকা অর্জনের বিষয়টি খুবই জটিল আকার ধারণ করাতে, এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বর্তমান যুগ বৈশিষ্ট্য অর্জনের যুগ বা বিশেষজ্ঞের যুগ, সে কারণে প্রতিটি বৃত্তির উপযোগী বিশেষ ধরনের শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজন আছে। তৃতীয়তঃ, এই বৈজ্ঞানিক যুগে অনেক বৃত্তিতে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহার করতে হয়, যার জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন। চতুর্থতঃ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যতীত সমাজের সমষ্টিগত উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। পঞ্চমতঃ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা মানুষকে স্বাবলম্বী হয়ে জীবিকা অর্জনে সক্ষম করে।

সাধারণতঃ বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলতে বিশেষ এক ধরনের শিক্ষাকেই বোঝান হয়। ডিউই (*Dewey*)-র মতে বিশেষ কোন একটি বৃত্তির দিকে নজর রেখে ব্যক্তিকে শিক্ষিত করা অসম্ভব। প্রতিটি ব্যক্তি একাধিক বৃত্তির জন্য উপযুক্ত হতে পারে এবং যে-কোন একটি বৃত্তিকে যদি অন্যান্য বৃত্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় তাহলে তা হয়ে পড়ে অর্থহীন। কোন একজন ব্যক্তি কেবল-মাত্রই শিল্পী হতে পারে না; তার পরিবার, তার বন্ধু, তার পরিবেশ এ সবের জন্যও তার অন্যান্য বৃত্তি থাকতে পারে। সুতরাং তার শিক্ষার বৃত্তিমূলক দিকে নজর দেবার সময় তার অন্যান্য বৃত্তিগুলিকে উপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত হবে না। তার বৃত্তি নিয়ে সে এত বেশী মত্ত হতে পারে বা সেই বৃত্তি এত বেশী বিশিষ্টতা অর্জন করতে পারে যে, যার ফলে সে অন্যান্য বিষয়গুলি উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য তা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি ব্যক্তির কোন মানসিক প্রবণতা আছে কিনা তা পূর্ব থেকে নির্ধারণ করেই তবে তাকে এ সুযোগ দিতে হবে। গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, "এ ধরনের তালিমের দুটি প্রয়োজনীয় দিক হল যে, বর্তমান সমাজের পক্ষে এর প্রয়োজন আছে এবং যখন যথার্থভাবে দেওয়া হয় তখন এর একটা শিক্ষাপ্রদ মূল্য আছে।" তবে গিসবার্ট (*Gisbert*)-এর মতে এই তালিম কখনও সাধারণ শিক্ষার স্থান গ্রহণ করতে পারে না।

ডিউই (*Dewey*) তাঁর '*Democracy and Education*' গ্রন্থে শিক্ষার বৃত্তিমূলক দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে কেন্দ্র করে নানারকম ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে। অনেকে মনে করেন এই শিক্ষা হল নিছক ব্যবহারিক এবং হয়ত কেবলমাত্র অর্থকরী। তিনি বলেন, "বৃত্তি আর কিছুই নয় যা ব্যক্তির জীবনের কাজগুলিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যার ফলে কাজগুলি হয় সুসম্পাদিত এবং কাজের ফলাফলগুলি হয় তার স্বজনের পক্ষে হিতকর।" সুতরাং কোন বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বলা যেতে পারে যে, আধুনিক সমাজে সাধারণ শিক্ষা এবং কারিগরী শিক্ষা উভয়েরই প্রয়োজন আছে, এবং সেইদিক থেকে কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা সমাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই এবং ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য উভয়েরই প্রয়োজন।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ (Functions of the University): উচ্চশিক্ষা বলতে সাধারণতঃ আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই বুঝে থাকি। বিশ্ববিদ্যালয়ও সাধারণ শিক্ষা দিয়ে থাকে, তবে স্কুলে বা কলেজে যেমন বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়, বিশ্ববিদ্যালয়েও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এই শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার এক বিশেষ মর্যাদা আছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানকে উন্নত ক'রে ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গীকে ব্যাপক করে, ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং বিভিন্ন ধারণা ও চিন্তার সঙ্গে ব্যক্তির পরিচয় স্থাপন ক'রে তার চেতনাকে তীক্ষ্ণ করতে সহায়তা করে। এ শিক্ষা মানুষের রুচিকে উন্নত ও মনকে সংস্কারমুক্ত করতে সাহায্য করে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। হোয়াইটহেড (*Whitehead*) তাঁর '*Universities and their Education*' প্রবন্ধে এই বিষয়টির ওপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তিনি বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কল্পনা এবং অভিজ্ঞতাকে মিলিত করা।" এই শিক্ষার সাহায্যে মানুষ

নিজের মতামত সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারে এবং প্রয়োজনমত তাকে প্রকাশ করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আত্মবিশ্লেষণ, আত্মসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এনে দেয়।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হুমায়ুন কবির (*H. Kabir*)-এর মতে বিশ্ববিদ্যালয় হল সেই স্থান যেখানে মানুষ মূল্যের সর্বোচ্চ ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং সেগুলিকে তার ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয় উৎপাদনরূপে গ্রহণ করার সুযোগ পায়। বাটলার (*N. B. Butler*)-এর মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও আদর্শ হল 'জ্ঞানের সংরক্ষণ, জ্ঞানের প্রসার এবং জ্ঞানের ব্যখ্যা'। মেকমুরে (*J. Macmaury*)-র মতে বিশ্ববিদ্যালয় হল বিশেষ করে সাংস্কৃতিক জীবন এবং সাংস্কৃতিক প্রগতির কেন্দ্র। লাস্কি (*Laski*)-র মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া কিভাবে তথ্যকে সত্যে রূপান্তরিত করতে হয়।

নিউম্যান (*Newman*) বলেন, "এ তাকে শিক্ষা দেয় কিভাবে বস্তুকে তার যথার্থরূপে দেখতে হয়, ঠিকভাবে আসল বিষয়টিকে ধরতে হয়, চিন্তাকে জটিলতা থেকে মুক্ত করতে হয়, ভ্রান্তিকে নির্ধারণ করতে হয় ও অবান্তরকে বাতিল করতে হয়।" এ শিক্ষা মানুষকে শেখায় কোন্ পরিবেশে কিভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। এ শিক্ষা মানুষের মধ্যে দেবার এবং নেবার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয় যাতে প্রয়োজনমত যেমন সে দিতে পারে, আবার প্রয়োজনমত সে গ্রহণ করতেও পারে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, জগৎ সম্পর্কে এক সংগতিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র চোখের সামনে তুলে ধরাই শিক্ষার, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য। যদি কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান শিক্ষার এই আদর্শ সামনে রেখে নিজ কাজে ব্রতী হয়, তাহলেই সে শিক্ষা ব্যক্তির আত্মবিকাশে সহায়তা করতে পারবে এবং সমাজ-জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে পারবে।

সমাজ-জীবনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সমাজের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ দায়িত্ব আছে। সমাজকে তার অনেক কিছু দিতে হবে; কিন্তু সমাজ-জীবনের প্রকাশ্য প্রয়োজন মেটানই তার একমাত্র কাজ নয়, তার কাজ এর থেকেও বেশী। নাস (*Nash*) বলেন, "সামাজিক সংগঠনের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য আছে বলা মানে এই নয় যে, সমাজ যে-সব দাবি ব্যক্ত করে কেবল সে-সব দাবি সে মেটাবে। সমাজের কি চাওয়া উচিত সে সম্পর্কেও বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সচেতন করে তুলবে এবং যে সমস্ত যথার্থ অভাব সমাজের আছে সেগুলিও পূর্ণ করার চেষ্টা করবে।"

অবশ্য একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাধারণ শিক্ষা সকলের পক্ষে উপযোগী হলেও উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে ব্যক্তির মানসিক প্রবণতা, গ্রহণ ক্ষমতা বা সামর্থ্যের দিকে বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*)-র মতে এর জন্য মানুষের জীবনের সাধারণ সমস্যাগুলিকে সুস্পষ্টভাবে ও পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

মন্তব্য : উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি যে, সমাজ-জীবনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির সামাজিকীকরণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যদিও সামাজিকীকরণের কাজ পরিবারেই শুরু হয়, তবু সেই প্রক্রিয়ার ধারাকে অবিচ্ছিন্ন রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি। তাছাড়াও ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করার সুকঠিন দায়িত্বও এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহণ করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি একদিকে যেমন ব্যক্তিকে কোন জীবিকার জন্য প্রস্তুত করে তোলে, তেমনি অপরদিকে তার মানসিক বিকাশ ও চরিত্র গঠনের দ্বারা তাকে সমাজ-জীবনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।

অনুশীলনী

১। শিক্ষা হল শিক্ষার্থীকে সংস্কৃতিতে অধিষ্ঠিতকরণ—ব্যাখ্যা কর (Education implies induction in learner's culture—Explain.)।

২। শিক্ষার সঙ্গে সামাজিকীকরণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর (Explain the relation between Education and Socialisation.)।

৩। শিক্ষা, দক্ষতা ও শিখন, কিভাবে সম্পর্কযুক্ত (How education is related to Learning and Skills ?)।

৪। শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বর্ণনা কর (Explain the role of educational institutions.)।

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমাজে ধর্মের স্থান
(The place of religion in Society)

১। ধর্মের অর্থ (The meaning of religion) ঃ

মানুষের জীবনে ধর্ম এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধর্ম বলতে কি বোঝায় ? "ধর্ম হল মানুষের পক্ষে কোন উচ্চতর অদৃশ্য শক্তিকে স্বীকার করে নেওয়া, যে শক্তি মানুষের অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং যা মানুষের আনুগত্য, শ্রদ্ধা এবং পূজা পাবার অধিকারী।" ধর্ম হল কোন অতিপ্রাকৃত সত্তায় মানুষের বিশ্বাস, যে বিশ্বাস তার জীবনের সব মূল অনুভূতি ও ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। ধর্ম জটিল বিষয়। তবু তার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে তার স্বরূপকে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ, ধর্মের ক্ষেত্রে কতকগুলি শক্তি প্রেষণারূপে ক্রিয়া করে। যেমন, ব্যক্তির বেঁচে থাকার ইচ্ছা, তার আত্মবিকাশ ও কল্যাণ লাভের আগ্রহ এবং তার আত্মোপলব্ধির বাসনা। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম কোন অতিপ্রাকৃত উচ্চতর সত্তায় বিশ্বাস সূচনা করে যার ওপর ব্যক্তি তার কল্যাণ লাভের জন্য নির্ভর করে। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ব্যক্তির মনে যে ভাব, ধারণা, চিন্তা এবং অনুভূতির আবির্ভাব ঘটে সেগুলি ধর্মের আভ্যন্তরীণ দিক। তৃতীয়তঃ, ধর্মের একটা বাহ্য দিক আছে, সেটি হল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে ঐ অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। চতুর্থতঃ, ধর্মের একটা সামাজিক এবং আনুষ্ঠানিক রূপ আছে।

ওয়েবষ্টারের অভিধান অনুযায়ী ইংরেজী 'religion' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে 'religare' শব্দ থেকে যার অর্থ হল বন্ধন (bond) বা যা দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখে। এর থেকে ধরা যেতে পারে যে, ব্যক্তির জীবনে এবং জাতির জীবনেও বটে, যা যথার্থ সংহতি আনে তাই ধর্ম। 'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে 'মন্' প্রত্যয় যোগ করে সংস্কৃতে ধর্ম শব্দটির উৎপত্তি। যা ধারণ করে তাই ধর্ম ; ধর্ম শব্দটির ধাতুগত অর্থ তাই। অন্তর এবং বাহির মিলে মানুষের জীবনের যে পূর্ণ সামঞ্জস্য তার মধ্যে যা মানুষের জীবনকে ধরে রাখে তাকেই ধর্ম বলা যেতে পারে।

নানাভাবে ধর্মের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ ধর্মের সর্বজন স্বীকৃত সংজ্ঞা নিরূপণ করা খুবই কঠিন। এর কারণ হল ধর্ম অত্যন্ত জটিল বিষয়। ধর্ম মানব

জীবনের প্রতিটি দিককে ছুঁয়ে আছে। আদিম নারীর গুপ্ত ধর্মানুষ্ঠান বা উচ্ছৃঙ্খল হৈ-চৈ পূর্ণ উৎসব থেকে শুরু করে দার্শনিক স্পিনোজার 'ঈশ্বরের প্রতি বৌদ্ধিক অনুরাগ'—এইসব কিছুর মধ্য দিয়েই ধর্মের প্রকাশ ঘটেছে। ধর্ম ব্যক্তিগত এবং সামাজিক। ধর্মের নিম্নতর স্তরে ধর্ম জাদু বা ইন্দ্রজালের সঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু তবু ধর্ম এই উভয়ের কোনটির সঙ্গেই অভিন্ন নয়। বিশ্বাস, আচরণ, বিচার বুদ্ধি এবং আবেগ—এ সবই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। ধর্মমত ও রীতিনীতির মধ্যে ধর্ম নিহিত। তবু এদের ওপরে নির্ভর না করেই মানুষের অন্তরে ধর্ম বিরাজ করে। ধর্ম কি, তার ওপর যতটা নয়, মানুষ কি তার ওপরই ধর্মের অর্থ মানুষের কাছে নির্ভর করে। এই অবস্থায় ধর্মের সর্বজনস্বীকৃত কোন সংজ্ঞা প্রত্যাশা করা আমাদের পক্ষে উচিত হবে না। আবার হতাশ হয়ে ধর্মের সংজ্ঞা দেবার প্রচেষ্টা বর্জন করাও যুক্তিসঙ্গত নয়।

নানাভাবে ধর্মের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা হয়েছে। টাইলার (*Tyler*) ধর্মের খুব ছোট সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে যে, 'ধর্ম হল আত্মিক জীবে বিশ্বাস' (the belief in spiritual beings)। কিন্তু এই সংজ্ঞা সন্তোষজনক নয়। কেননা এই সংজ্ঞায় আত্মিক জীবের স্বরূপ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। ম্যাক্স মূলার(*Max Muller*)-এর সংজ্ঞা, 'ধর্ম হল অসীমের প্রত্যক্ষণ বা উপলব্ধি—এই সংজ্ঞাটিও খুব অস্পষ্ট। ক্রিষ্টোফার ডসন (*Christopher Dawson*)-এর মতে 'যখন এবং যেখানে বাহ্যশক্তির ওপর মানুষের নির্ভরতাবোধ জেগেছে এবং মানুষ সেই শক্তিকে নিজের থেকে বড় ও রহস্যময় বলে মনে করেছে সেইখানেই ধর্মের অস্তিত্ব সূচিত হয়েছে এবং এই শক্তির সামনে উপস্থিত থেকে মানুষের মনে যে ভীতি ও আত্মঅবমাননার ভাব জাগ্রত হয়েছে তা অবশ্যই ধর্মীয় অনুভূতি, যা উপাসনা ও ধর্মীয় প্রার্থনার মূলে বর্তমান। ধর্মের এই বর্ণনাও সন্তোষজনক নয়; কারণ, এই বর্ণনা খুবই ব্যাপক। এই বর্ণনা অনুযায়ী ইন্দ্রজাল ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে এবং সর্বভূতে চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হবে।

ধর্মের অসংখ্য সংজ্ঞার মধ্যে মোটামুটি দুটি সংজ্ঞার উল্লেখ করা যেতে পারে, যে দুটি অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক। ওয়াটারহাউস (*Waterhouse*) ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'ধর্ম হল একটি উচ্চতর সত্তা, যেটি এই জগতে প্রকাশমান এবং যথোপযুক্তভাবে অগ্রসর হলে যার সঙ্গে সহানুভূতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায় বলে ব্যক্তি বিশ্বাস করে। এমন একটি উচ্চতর সত্তার সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজের অনুভূত অসম্পূর্ণতাকে সম্পূরণ করার প্রচেষ্টা হল

ধর্ম।' ফ্লিন্ট (*Flint*) ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "ধর্ম হল এমন এক বা একাধিক সত্তায় মানুষের বিশ্বাস যে তার থেকে অনেক শক্তিশালী ও তার ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য অথচ তার আবেগ ও কাজের প্রতি উদাসীন নয় এবং যে বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে তার অনুভূতি ও কার্য।

আসলে, যে ঈশ্বরের ওপর মানুষের নির্ভরতাবোধ জাগে সেই ঈশ্বরের প্রতি সক্রিয় বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পনই ধর্ম। ধর্মের দুটি দিক আছে। একটি তার অন্তরঙ্গ দিক ও অপরটি তার বহিরঙ্গ দিক। ধর্মের অন্তরঙ্গ দিক হল ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ব্যক্তির মনে যে ভাব, ধারণা, চিন্তা এবং অনুভূতির আবির্ভাব ঘটে সেগুলি এবং এর বহিরঙ্গ দিক হল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, উৎসব যার মাধ্যমে ঐ অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এইসব আচার অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ক্রলে (*Crawlay*)-এর মতে পবিত্র অনুষ্ঠানই হল ধর্মের আসল বৈশিষ্ট্য। এই সংজ্ঞা ধর্ম থেকে ঈশ্বরকে নির্বাসিত করেছে এবং ধর্মের বহিরঙ্গ দিকের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে ঈশ্বরের ধারণা এমনভাবে যুক্ত যে, ঈশ্বরের কল্পনা ছাড়া ধর্মের কোন ধারণা করা যায় না। অবশ্য ঈশ্বর ছাড়াও ধর্মের কথা বলা চলে কিনা এমন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। যেমন, বলা হয় বৌদ্ধধর্মে কোন ঈশ্বরের কথা নেই এবং কোঁতে (*Comte*) মানবত্বকে ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেছেন। তবু একথা বলা যায়, যে ধর্মে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই, সে-ধর্ম হয় ঈশ্বরোপম কাউকে বিশ্বাস করে, নয়ত কতকগুলি মূল্যহীন আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। যে সংজ্ঞাতে ঈশ্বরের কথা থাকবে না তাকে ধর্মের সন্তোষজনক সংজ্ঞা বলা চলে না।

ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে ধর্ম হল মানুষের চিন্তা এবং আচরণের একটা স্বাভাবিক, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং সর্বব্যাপক রূপ। ধর্মের মধ্যে বিশ্বাস এবং ক্রিয়া উভয় উপাদানই বর্তমান।

২। সমাজে ধর্মের স্থান (Place of religion in society) :

ধর্ম যদিও এক হিসেবে ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসের ব্যাপার, তবু সমাজ-জীবনে ধর্মের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। সমাজবিজ্ঞানী ব্লেকমার এবং গিলিন্ (*Blackmar and Gillin*)-এর মতানুসারে ধর্ম যতখানি না ব্যক্তিগত ব্যাপার তার তুলনায় অনেক বেশী সামাজিক। তাঁদের মতানুযায়ী সামাজিক

উপাসনা ছাড়া, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উপাসনার মধ্য দিয়ে ধর্ম বেঁচে থাকতে পারে না। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, যখন কোন গোষ্ঠী সমবেতভাবে উপাসনা করা থেকে বিরত হয়, তখন তাঁদের ধর্মেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

সমাজ-জীবনে ধর্ম নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। বিভিন্ন পারিবারিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ওপর ধর্ম তার প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সামাজিক মেলামেশার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিরা পূজা, উপাসনা প্রভৃতির জন্য এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে সমবেত হয়। এই সামাজিক মেলামেশার ফলে সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও প্রীতির সঞ্চার হয়। কাজেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ধর্মীয় মনোভাব অনেক সময় মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে ও জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পাদন করার জন্য প্রণোদিত করে। বস্তুতঃ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মবোধ জাগ্রত করা ছাড়াও নানা ধরনের কার্য সম্পাদন করে। অনেক ধর্ম-প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয়, হাসপাতাল, অনাথ আশ্রম প্রভৃতির পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

সমাজ-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ধর্মের কার্যকারিতা যে এখনও অক্ষুণ্ণ আছে তা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি যে, সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠান মানুষের কর্মপদ্ধতিকে এখনও প্রভাবিত করে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই সাধারণতঃ ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। আদিম ধর্মীয় অনুষ্ঠান যদিও তার প্রকৃতির বিচারে ছিল কিছুটা স্থূল, তবু আদিম সমাজে ব্যক্তি-জীবনের প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই তার প্রকাশ ঘটেছিল।

আদিম সমাজে সমাজ-জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই যেমন—জন্ম, দীক্ষা, বিবাহ, রোগ, মৃত্যু, কৃষিকার্য প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে নানারকম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রকাশ ঘটত। বর্তমান যুগেও জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু প্রভৃতি নানা সামাজিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনের বিবিধ অনুষ্ঠান যেমন—শস্য বপন, শস্য কর্তন, শিকার, মাছ ধরা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন দেখা যায়। এ ছাড়াও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন গৃহপ্রবেশ, নতুন কর্মভার গ্রহণ, কোন শুভ কার্য শুরু করার সময় প্রায় সব সমাজেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রচলিত। নতুন কর্মভার গ্রহণের সময় শপথ গ্রহণের রীতি বর্তমান সমাজে

দেখা যায়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন থেকে নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির উদ্ভব ঘটে, যার ফলে সমাজ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সহজতর হয়।

আদিম যুগে সামাজিক ঐক্য বজায় রাখার ব্যাপারে ধর্মের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিস্টোফার ডসন (*Christopher Dawson*), টয়েনবি (*Arnold J. Toynbee*) এবং ডেমেণ্ট (*V. A. Dement*) প্রমুখ লেখকবৃন্দ তাঁদের রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন যে, ধর্মই হল সভ্যতার কেন্দ্রস্থিত উপাদান এবং ধর্মের বিপর্যয় ঘটলে সভ্যতারও বিপর্যয় ঘটবে।

ধর্ম মানুষের চরিত্রকে প্রভাবিত করে সামাজিক জীবনকে গঠিত করে। ধর্ম ব্যক্তির মনে সামাজিক মূল্যের বোধ সঞ্চারিত করে, ধর্ম ব্যক্তিকে সামাজিক নিয়ম মেনে চলতে, অপরের চিন্তা ও অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে, সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে এবং চিন্তায় ও কার্যে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন হতে শিক্ষা দেয়। ধর্ম কেবলমাত্র এক ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির প্রতি নয়, সমস্ত বিশ্বের মানুষের প্রতি প্রীতি ও শুভেচ্ছার ভাব জাগরিত করে।

মার্কস (*Marx*) এবং তাঁর সমর্থকবৃন্দ মনে করেন যে, ধর্ম হল জনগণের আফিং এবং তাঁদের মতে ধর্মকে হাতিয়ার করে সমাজের এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীর ওপর শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে যে ধর্মকে হাতিয়ার করে জনসাধারণের ওপর অত্যাচার এবং দমননীতি চালান হয়েছে একথা অস্বীকার করা চলে না। তবে তার থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, ধর্মের সাহায্যে সমাজ-জীবনে কোন উন্নতি সম্ভব হয় নি। অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক উন্নতি, সংস্কার, বিপ্লব ইত্যাদি মানুষের ধর্মবোধের জন্যই সম্ভব হয়েছে। অনেক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক আন্দোলনের মূলে ধর্ম বর্তমান। অনেক সময় অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাছাড়া, ধর্মই বহু মঙ্গলজনক সামাজিক ক্রিয়াকর্মের উদ্দীপক।

যথার্থ ধর্মভাব যদি প্রচার করা যায় তাহলে ধর্মের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজ সহজতর হতে পারে। অনেক মনীষী বিশ্বঐক্য ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যথার্থ ধর্মভাব প্রচারের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। অনেক সময় আমরা ধারণা করি, ধর্ম মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে ভেদাভেদ আনয়ন করে, ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত করে জনকল্যাণের আদর্শ লাভের পথে বাধার সঞ্চার করে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার, যে-ধর্ম সমাজ-জীবনে এই ভূমিকা গ্রহণ করে তা যথার্থ ধর্ম নয়, তা

ধর্মের বিকৃত রূপ। ধর্মান্ধতাই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, সামাজিক ঐক্যের বন্ধনকে শিথিল করে, যথার্থ ধর্মভাব তা করে না। যথার্থ ধর্মভাব মানুষকে সমাজক্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগের জন্য প্রেরণা দেয়। স্বামী বিবেকানন্দের মতে জীব সেবাই ঈশ্বর সেবা। যথার্থ ধর্মভাব মানুষকে সংযত করে, সহনশীল করে, মানুষকে নৈতিক শক্তি যোগায় এবং অপরের সঙ্গে সম্প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সামাজিক ঐক্যের আদর্শ রক্ষায় প্রণোদিত করে।

বস্তুতঃ, যা কিছু শুভ, শ্রেয় ও সুন্দর তার প্রতি অনুরাগ আসলে ধর্মসম্পর্কীয় অনুরাগ। বর্তমানে যেসব সমাজ-কল্যাণমূলক ও জনকল্যাণমূলক কাজ আমরা দেখি, তার মূলেও ধর্মের মনোভাব অনেক সময় বর্তমান থাকে। অনেক সময় শিক্ষা এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় এমন ব্যক্তিদের দ্বারা যাদের লক্ষ্য হল ধর্মমূলক। অনেক সময় কোন প্রতিষ্ঠান হয়ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়, কিন্তু ধর্মীয় মনোভাব এ সব প্রতিষ্ঠানের মূলে কার্যকরী হয়।

প্রয়োজনীয়তা (Its Necessity) ঃ ধর্মের দুটি প্রধান ভূমিকা আছে—একটি হল ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের উন্মেষ যার জন্য ব্যক্তি সসীম হয়েও এক অসীম সত্তার মাঝে নিজের পূর্ণতা ও অমরতাকে খুঁজে পেতে চায় এবং তার সঙ্গে মিলিত হতে চায়। কিন্তু এ ছাড়াও আছে ধর্মের একটা সামাজিক দিক। এই দিকটিই মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে। যে বন্ধন মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে, সেই বন্ধনই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে, মানুষের ঐক্যকে শক্তিশালী করে তোলে। গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, "ঈশ্বরের পিতৃত্বের অধীনে মানুষের ভ্রাতৃত্বের এই হল ভিত্তি।"[1]

ধর্মের প্রধান কাজ সামাজিক ঐক্য বা সংস্কৃতিকে সুদৃঢ় করে তোলা। তাছাড়াও ধর্ম বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের সংযোগসাধন করে তাদের পরস্পরকে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ করে। গীর্জা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি উপাসনা বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য সমবেত হয়। অনেক সময় এ সকল প্রতিষ্ঠান গরীব-দুঃখীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে বা অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কার্য করে থাকে বা শিক্ষা ও আমোদ-প্রমোদের জন্য নানারকম

1. "This is the basis of the brotherhood of man under the fatherhood of God." —*Gisbert*: Fundamentals of Sociology ; Page 215.

অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সকল সময়ই এ সব কাজ যে পুরোপুরি ধর্মসম্পর্কীয় তা নয়। তবে ধর্মের আদর্শই প্রত্যক্ষভাবে সকল কাজের প্রেরণা দান করে।

অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ও উৎসব সামাজিক জীবনের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এসব উৎসব ও অনুষ্ঠান যে সব সময় প্রত্যক্ষভাবে ধর্মমূলক তা নয়, তবে এসব অনুষ্ঠান ও উৎসবের অনেকগুলিরই মূলে ধর্মসম্পর্কীয় মনোভাব বিদ্যমান। ব্যক্তির জীবনে এসব ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে। অনেক ক্ষেত্রে বহু সামাজিক অনুষ্ঠান, যেমন—বীজবপন, শস্য সংগ্রহ, গৃহপ্রবেশ, শপথ গ্রহণ প্রভৃতি ধর্মাচরণরূপে অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং সমাজ-জীবনে সংহতি শক্তিরূপে ধর্ম এখনও পর্যন্ত খুব প্রবল ও সজীব। ধর্মই সমাজের স্থায়িত্বের অন্যতম কারণ। ধর্মীয় গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে গোষ্ঠীচেতনা খুব প্রবলভাবেই আত্মপ্রকাশ করে যার জন্যে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে ভালবাসে না, এমন কি, মৃতের সঙ্গেও সম্পর্ক ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত নয়।

ধর্মীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মধ্যে একই অবস্থায় একই ধরনের অনুভূতি দেখা যায় এবং গোষ্ঠীর নেতাদের নির্দেশ বিনা বিচারে গ্রহণ করার প্রবণতা দৃষ্ট হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের মূলে যূথ-মনোবৃত্তি উল্লেখযোগ্যভাবে ক্রিয়া করে। ম্যাক্‌ডুগ্যালের (*MacDougall*) মতে ধর্মসম্পর্কীয় গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বেশ উল্লেখযোগ্যভাবেই পরিলক্ষিত হয়।[1]

অনেকের ধারণা ধর্ম ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, সমাজ-জীবনকে উপেক্ষা করে ব্যক্তি জীবনের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করে। ব্যক্তিগত উন্নতির ওপর অত্যধিক মনঃসংযোগ করার ফলে সামজিক চেতনা এবং কল্যাণের দিকটিকে অবহেলা করা হয়। তাছাড়া, ব্যক্তির আচার-অনুষ্ঠান পালনের ওপর ধর্ম এতখানি গুরুত্ব আরোপ করে যে, ব্যক্তির আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের দিকটি হয়ে পড়ে গৌণ। ধর্মের মধ্যে সর্বব্যাপক আদর্শের কথা যাই থাক না কেন, প্রতিটি ধর্মেরই একটি স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ রূপ আছে যার জন্য বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগসাধনের পথে অনেক সময় অন্তরায় সৃষ্টি করে। প্রোটেসটেন্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে যে বিরোধের কথা

1. *McDougall*: An Introduction to Social Philosophy; Page 267.

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, তা বিশেষতঃ ধর্মমূলক। ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মীয় যুদ্ধের ভিত্তি হল ধর্ম সম্পর্কীয় বিরোধ। প্রতিটি ধর্মই নিজ নিজ আচার-অনুষ্ঠানের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে।

কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের বাহ্যিক প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যত পার্থক্যই থাক না কেন, ধর্মের মূল তাৎপর্যটুকু উপলব্ধি করলেই বোঝা যাবে যে, সংযোগকারী বা সংহতি শক্তি হিসেবে ধর্ম মোটেই অনুপযোগী নয়। প্রতিটি ধর্মেরই মূল লক্ষ্য এক পরম সত্তার (Supreme Reality) উপলব্ধি। ধর্ম হল সসীম মনের অসীমকে জানার প্রচেষ্টা ও আগ্রহ।

মানুষ যখন উপলব্ধি করে যে, এই পরম সত্তা সত্য, শিব ও সুন্দরের মূর্ত প্রতীক এবং সব মানুষই এক পরম সত্তার প্রকাশ তখনই মানুষের মধ্যে যথার্থ ধর্মবোধ জাগরিত হয়। প্রকৃত ধর্মবোধ জাগরিত হলে মানুষের সমস্ত ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি তিরোহিত হয়, মানুষ অপরকে ভালবাসতে শেখে; প্রেম, মৈত্রী ও ভালবাসার নিগূঢ় বন্ধনে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত হয়। প্রকৃত ধর্ম মানুষকে মানুষের কাছে টেনে নিয়ে আসে, ধর্মান্ধতা বা বিকৃত ধর্মই মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈষম্য সৃষ্টি করে। যথার্থ ধর্মবোধ মানুষকে অপরের ভাব, বিশ্বাস ও ধারণাকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়, মানুষকে ত্যাগী, ক্ষমাশীল, উদারমনা ও সংযমী করে তোলে।

ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষ যে সকল মনগড়া ধারণার সৃষ্টি করেছে, সেগুলিকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়ার কোন সংগত কারণ নেই। রাধাকৃষ্ণণ (*Radhakrishnan*) বলেন, "যখন আমরা সংস্কার বা সংজ্ঞা নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করি তখন আমরা পৃথক হয়ে পড়ি। কিন্তু যখন আমরা ধর্ম-জীবনের প্রার্থনা এবং ধ্যানকে আশ্রয় করি তখনই আমরা একত্র হই।" অর্থাৎ ধর্মের আচারগত দিকটির ওপর গুরুত্ব না দিয়ে ধর্মের মূল ভাবকে উপলব্ধি করতে পারলেই মানুষ বুঝতে পারে যে, সব ধর্মই এক; সব মানুষ এক পরম সত্তার প্রকাশ। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হল আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। সব মানুষই এক বিশ্ব-সত্তার অংশ। একই ঐক্যের সূত্রে সমস্ত মানুষের মধ্যে এক নিগূঢ় বন্ধন বর্তমান। রাধাকৃষ্ণণের মতে এই মূলীভূত ঐক্যের স্বীকৃতিই মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণের ভিত্তিতে কিছু পরিমাণ সহযোগিতাকে সম্ভব করে তুলবে। বস্তুতঃ ধর্মই বিশ্বঐক্য ও বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে তুলতে পারে। সুতরাং সংহতি শক্তিরূপে ধর্মের উপযোগিতা কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়।

৩। আদিম বা অনুন্নত সমাজে জাদু এবং ধর্ম (Magic and Religion in simple societies) :

আদিম বা অনুন্নত সমাজে জাদু এবং ধর্মের সম্পর্ক বিষয়ে কোন আলোচনা করতে গেলেই সর্বপ্রথম 'জাদু' বলতে কি বোঝায় তা বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। আদিম মানুষের কাছে জাদুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কোন এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক শক্তির ধারণা যাকে উপযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রয়োগ করে সে নিজের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করত। এই প্রসঙ্গে রাইট(*Wright*) বলেন, 'আদিম মানুষ 'জাদু' বলতে কি বুঝত সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে জাদুর এমন কোন যুক্তিবিজ্ঞান সম্মত সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব বলেই মনে হয়।' কারণ আদিম মানুষ জাদু প্রয়োগ করলেও যৌক্তিকভাবে সে কখনও জাদুর কথা চিন্তা করেনি।

আমরা '*Frazer*'-এর 'Golden Bough' গ্রন্থটি অনুসরণ করে যাদুর প্রকৃতি বা স্বরূপ এবং তার প্রকারভেদ বুঝে নেবার জন্য সচেষ্ট হব। জাদু হল মানুষের ব্যক্তিগত ক্ষমতার অতীত যে সব কাজ, সেগুলি সম্পাদনের জন্য সবরকম পদ্ধতি বা সূত্র (formulas)। অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে যে, আদিম মানুষের জ্ঞান এবং কলা কৌশলের সংহতিই হল এই জাদু। জাদু সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান এবং পদ্ধতির সবিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, জাদুকর বস্তুগুলিকে এমন নিপুণভাবে পরিচালনা বা ব্যবহার করে স্বীয় উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতেন যে, তিনি প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর স্বাভাবিক প্রত্যাশিত ক্রমকে পরিবর্তিত করতে পারতেন এবং তার দ্বারা তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিতে পারতেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'জাদু' এই প্রত্যয়টি অলৌকিক ক্ষমতা বা অতি-মানবিক ক্ষমতার নির্দেশ করে, যে ক্ষমতার অধিকারী হওয়া প্রতিটি ব্যক্তির একান্ত আকাঙ্ক্ষার বিষয়। কিভাবে সেই শক্তিকে পরিচালিত করতে হবে তার জ্ঞানই হল আসল কথা।

জাদুর সূত্রগুলি যার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তার একটি সাধারণ নিয়ম ফ্রেজার আবিষ্কার করেছিলেন। সেটি হল সহানুভূতির নীতি (Law of sympathy)। এই নীতি দুটি ভ্রান্তধারণার ওপর নির্ভর, সে দুটি হল—(১) সাদৃশ্যের নিয়ম (Law of similarity) এবং (২) অনুষঙ্গের নিয়ম (Law of contagion)। প্রথম নিয়ম অনুসারে যদি দুটি বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকে, তাহলে সে দুটি বিষয় অভিন্ন এবং দ্বিতীয়তঃ, যে দুটি বিষয়ের মধ্যে একবার অনুষঙ্গ লক্ষ্য করা গেছে তারা বরাবরই অনুষঙ্গবদ্ধ হয়ে থাকবে।

অনুকরণমূলক বা সহানুভূতিমূলক জাদু (imitative or sympathetic magic)-র মূলে রয়েছে সাদৃশ্যের নিয়ম। এই নিয়ম যে অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত তা হল এই যে, প্রতীকের (symbol) ক্ষেত্রে যা করা হবে, তা, যার প্রতীক সেই বাস্তব বস্তুর ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন আক্রমণকারী সেনাপতিকে যদি হত্যা করতে হয় তাহলে শস্য বা মোমের দ্বারা তৈরি সেই সেনাপতির একটি মূর্তির বিভিন্ন অঙ্গগুলি পিন বা ছোরার দ্বারা বিদ্ধ করে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে এবং নানাধরনের আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে হবে। যার ফলে সেনাপতির আনুষঙ্গিক অঙ্গগুলি আঘাতপ্রাপ্ত হবে। এটা হল মন্দ জাদুর উদাহরণ, যার সাহায্যে কোন ব্যক্তির অনিষ্ঠ বা ক্ষতি করা যেতে পারে। কিন্তু এ ছাড়াও এক ধরনের সহানুভূতিমূলক জাদু আছে যার দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সম্পাদিত হতে পারে।

উদাহণস্বরূপ, অনাবৃষ্টির সময় মন্ত্র উচ্চারণ এবং আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে জল ছড়ান, এর ফলে বৃষ্টি হবে এরূপ অনুমান করা হয়। হাজার বছর আগে প্রাচীন ভারত, বেবিলন ও মিশরে এবং গ্রীস ও রোমের জাদুকররা এই ধরনের জাদুর আশ্রয় গ্রহণ করত এবং আজকের দিনেও অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও স্কটল্যাণ্ডের ধূর্ত এবং অসভ্য অধিবাসীদের এই ধরনের জাদুর আশ্রয় গ্রহণ করেতে দেখা যায়। মেক্সিকোর কোন কোরা ভারতবাসী (Cora Indian of Mexico) যখন কোন মানুষকে হত্যা করতে চায় তখন কাপড়, পোড়া মাটি বা ঐ ধরনের কিছু দিয়ে তার একটা মূর্তি তৈরি করে, তারপর মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা বা পেটের মধ্যে কাঁটা ঢুকিয়ে দেয় যাতে তার শত্রু ঐ জাতীয় কষ্টভোগ করে। কখনও কখনও কোরা ভারতবাসী এই অনুকরণমূলক যাদুকে মানুষের কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করে। সে যখন তার মেষের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চায়, সে তার একটা মোমের প্রতীক তৈরি করে তাকে একটা পর্বতের গুহায় রেখে দেয়। কারণ এই ভারতবাসীরা বিশ্বাস করে যে, পর্বতই হল ভেড়া, গরু এবং সব ধন ঐশ্বর্যের প্রভু।

সংক্রমণমূলক জাদু হল, যে দুটি বিষয়ের মধ্যে একবার সংযোগ ঘটেছে, তাদের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবার পরও তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, এমন ভাবে যে কোন একটির ওপর কিছু করা হলে অপরটির ওপরও সেই কার্যের প্রভাব পড়বে। এই জাতীয় জাদুর উদাহরণ হল মানুষের শরীরের সঙ্গে তার চুল, নখ বা অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্পর্ক। কাজেই কোন ব্যক্তির চুল যদি যাদুকরের

হস্তগত হয়, তাহলে জাদুকর ঐ চুলের সাহায্যে ঐ ব্যক্তির ওপর তার সঙ্কল্পকে কার্যে পরিণত করতে পারবেন।

ব্রিটেনের গেজেলি পেনিনসুলার আদিম অধিবাসীদের একটা নিয়ম ছিল, কোন জাদু তখনই কার্যকর হবে, যদি যার ওপর জাদু প্রয়োগ করা হবে তার শরীরের কোন অংশ যেমন—মাথার চুল, তার ব্যবহৃত কাপড়, তার মলমূত্র, তার পদচিহ্ন প্রভৃতিকে মন্ত্র উচ্চারণের সময় তার মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা যায়।

সবরকম কাজের ক্ষেত্রেই জাদুর প্রয়োগ চলতে পারে। জাদুর প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উপাদানের অস্তিত্ব উল্লেখযোগ্য—(১) কথা, (২) কার্য বা ক্রিয়া, (৩) বস্তু। সবরকম জাদুর অনুষ্ঠানে এই তিনটি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। কথা হল মন্ত্র যা অনুপম শক্তির অধিকারী। বস্তু হতে পারে কোন দুর্লভ বস্তু যেমন সিংহের নখ, হাঙ্গরের দাঁত ইত্যাদি। মন্ত্র শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে হবে এবং এটা শুধুমাত্র জাদুকরের পক্ষেই জানা সম্ভব। মন্ত্র প্রয়োগের একটা বিশেষ কৌশল আছে, যা শুধুমাত্র জাদুকর জানে। মোট কথা, জাদুকরকে উপরিউক্ত তিনটি উপাদান সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে হয় এবং তাহলেই বাঞ্ছিত ফললাভ ঘটবে। জাদুকে আবার দু-শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—সাধারণ (public) এবং ব্যক্তিগত (private)। ব্যক্তিগত জাদুর প্রয়োগ করা হয় ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য। এ হল খুব বিপজ্জনক। কিন্তু সাধারণ জাদুর প্রয়োগ করা হয় কোন গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কিছু লোকের কল্যাণের জন্য। যেমন—খাদ্য উৎপাদনের বৃদ্ধি জাদুর সাহায্যে ঘটান, জাদুর সাহায্যে বন্যজন্তু হত্যা করা—এইসব ক্ষেত্রে জাদুকরের মর্যাদা গোষ্ঠীর চক্ষে বৃদ্ধি পায়। জাদু অনুষ্ঠান সম্পাদনকারীকে সাধারণতঃ জাদুকর নামে অভিহিত করা হয়।

জাদুর মধ্যে রয়েছে একটি শক্তির ধারণা যা সব কিছুতে অবস্থিত। আদিম মানুষ মনে করত এই অজ্ঞাত শক্তি, যা মানুষের কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধন করতে পারত, সেই শক্তিকে জাদুকর তার স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কাজে লাগাতে পারত। মিলেনিয়ার অধিবাসীরা এইরকম একটা শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করত যার নাম তারা দিয়েছে মানা (Mana)। মানার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মায়েল এডওয়ার্ডস্ বলেন, 'এ হল এক সর্বব্যাপক অতীন্দ্রিয় শক্তি বা প্রভাব যা অপ্রত্যাশিত ভাবে ক্রিয়া করে বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমন্বিত প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।' যদি একটা বিশেষ ধরনের

পাথরের টুকরো কোন আদিম অধিবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করত, সে মনে করত তার মধ্যে 'মানা' আছে। হয়ত সেই পাথরের টুকরোর আকৃতি বিশেষ ধরনের একটি ফলের মতন। সেই ব্যক্তি সেই ধরনের ফলের গাছের তলায় সেটিকে রেখে দিত। যদি সেই বছরে সেই ধরনের ফল প্রচুর ফলত তখন সিদ্ধান্ত করা হত যে ব্যক্তির ধারণা ঠিক, পাথরে মানা আছে।

মানা কোন প্রাকৃতিক গুণ নয়, রহস্যময় মোহিনী গুণ বা শক্তি। মানা সব কিছুতেই পরিব্যাপ্ত।

বিশপ কডরিংটন্ বলেন, এক প্রাকৃতিক শক্তিতে বা প্রভাবেতে বিশ্বাস মিলেনেশিয়ার অধিবাসীর মন সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে আছে, যাকে সর্বত্রই মানা নামে অভিহিত করা হয়। যেসব কিছু সাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাইরে, বা প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বহির্ভূত, সে সবগুলি মানার ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন হয়। সব উল্লেখযোগ্য সাফল্যই প্রমাণ করে যে মানুষের মানা আছে।

জাদু অনেক সময় ধর্মের মতনই চেতন সত্তার কথা বলেছে, কিন্তু জাদু তাদের অচেতন জড় সত্তার মতনই গণ্য করেছে। অর্থাৎ কিনা ধর্মের মতন এই সব চেতন সত্তাকে তুষ্ট করার চেষ্টা না করে তাদের কোন কাজ করতে বাধ্য করেছে বা তাদের ওপরে বলপ্রয়োগ করেছে। কাজেই জাদু অনুমান করে নেয় যে দেবতা বা সাধারণ মানুষ, আসলে সব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সত্তাই শেষ পর্যন্ত সেইসব নৈর্ব্যক্তিক শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন যারা সব কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু যারা জাদুশক্তির অধিকারী তারা আচার-অনুষ্ঠান ও মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা সেই সব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সত্তাকে নিজ উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত করতে পারে। প্রাচীন মিশরে জাদুকরেরা দাবী করত যে তারা ইচ্ছা করলে সবদেশের শক্তিশালী দেবতাদেরও তাদের ইচ্ছামত কাজ করতে বাধ্য করতে পারে এবং তারা অবাধ্য হলে তাদের ধ্বংস করতে পারে। আদিম সমাজে পুরোহিতের কাজ ও জাদুকরের কাজের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য ছিল না। একদিকে যেমন ব্যক্তি প্রার্থনা ও উৎসর্গের মাধ্যমে ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছা যাজ্ঞা করত; অপর দিকে সে এমনসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করত যার দ্বারা সে মনে করত ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া শুধুমাত্র আচার-অনুষ্ঠান বা মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়েই তার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। বস্তুতঃ সে ধর্মীয় ও জাদু অনুষ্ঠান একই সঙ্গে সম্পাদন করত। সে প্রার্থনা এবং জাদুর মন্ত্র এক নিঃশ্বাসেই উচ্চারণ করত। তার আচরণ যে অসঙ্গতিপূর্ণ সে সম্পর্কে সে সচেতন থাকত না।

আদিম সমাজে মানুষ ধর্মকে জাদুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলত। এই বিষয়ই লক্ষ্য করা গেছে আদিম সমাজে মিলেনেশিয়া অধিবাসীদের আচরণে।

জাদুর প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার পর আমরা এবার আদিম সমাজে ধর্মের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হব। আদিম সমাজে ধর্ম বলতে যা বোঝাত তা হল, মানুষের থেকে উচ্চতর যে সব শক্তি, প্রকৃতি এবং মানবজীবনের গতিপথ পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত করে, তাদের তুষ্টতা বা প্রসন্নতা সাধন। কাজেই আদিম সমাজে ধর্মের দুটি দিক রয়েছে—মানুষের থেকে উচ্চতর কোন শক্তিতে বিশ্বাস। দ্বিতীয়তঃ, সেই শক্তিকে তুষ্ট করা। অবশ্য বিশ্বাস অনুমানের পূর্ববর্তী। তবে অনুষ্ঠান ছাড়া শুধুমাত্র বিশ্বাস ধর্ম নয়। আসল কথা যে, মানুষ ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বা ভালবাসাবশতঃ তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে না, সে ধর্মপ্রবণ নয়। আবার ঈশ্বরে বিশ্বাস বর্জিত আচার-অনুষ্ঠানও ধর্ম নয়। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, বাহ্য ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধর্মকে আত্মপ্রকাশ করতেই হবে এমন কোন কথা নেই। কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের কাছে কোন কিছুকে উৎসর্গ না করে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা না করে এবং অন্যান্য বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান পালন না করেও ধর্ম আচরণ করতে পারে। ঈশ্বরকে তুষ্ট করাই যদি কাজ হয় তাহলে মানুষের প্রতি বা ঈশ্বর সৃষ্ট অন্যান্য জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেও তা সম্ভব।

মানুষকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করার জন্য ঈশ্বর প্রয়োজনে প্রাকৃতিক ঘটনার গতিপথ পরিবর্তন করতে পারেন। ধর্মের সঙ্গে যুক্ত এই বিশ্বাস কিন্তু জাদুর নীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধারণা। কারণ জাদুতে বিশ্বাসী যাঁরা তাঁরা মনে করেন প্রকৃতির গতিপথ অপরিবর্তনীয়। ধর্ম মনে করে জগৎ চেতন সত্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যাদের তুষ্ট করে তাদের সঙ্কল্পের পরিবর্তনসাধন করা যায়। কিন্তু জাদু মনে করে যে জগৎ অপরিবর্তনীয় নিয়মের দ্বারা যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত, কোন চেতন সত্তার দ্বারা পরিচালিত নয়।

জাদুতে বিশ্বাসী যারা তারা মনে করে, কোন ব্যক্তির যুদ্ধে সাফল্যের কারণ তার বাহুর শক্তি নয়, তার সম্পদের প্রাচুর্য নয়, সে অবশ্যই কোন আত্মার বা মৃত যোদ্ধার মানার অধিকারী। এই মানাই তাকে ক্ষমতাশালী করেছে এবং সে ক্ষমতা এসেছে তার কাছে কোন কাঁচ বা পাথরের টুকরোর মধ্যে দিয়ে যেটি সে তার গলাতে ঝুলিয়ে দিয়েছে। বিশপ কডরিংটন্ বলেন, মিলেনেশিয়ার অধিবাসীরা কোন পরম সত্তার ধারণার সঙ্গে পরিচিত ছিল না। তারা বিশ্বাস করত মানার অস্তিত্ব। যে

শক্তি জাগতিক শক্তি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মিলেনেশিয়ার অধিবাসীদের ধর্ম হল নিজের জন্য এই মানার অধিকারী হওয়া বা নিজের সুবিধার জন্য একে লাভ করা।

প্রাচীন ভারতেও জাদু ও ধর্মের এই সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ মনে করেন যে প্রাচীন ভারতের সর্বপ্রথম যুগে যে সব যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত, সেগুলির মধ্যে জাদুর উপাদান ছিল। প্রাচীন মিশরেও জাদুকে ধর্মের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছিল। অধ্যাপক মাসপেরো (*Maspero*) বলেন যে, দেবতাদের প্রতি অনুগত ব্যক্তিরা দেবতাদের কাছ থেকে কোন অনুগ্রহ এমনিতে লাভ করতে পারত না। দেবতাকে বন্দী না করে, সেটা করা হত দেবতার দ্বারাই প্রকাশিত আচার-অনুষ্ঠান, উৎসর্গ, প্রার্থনা এবং মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা। আর একজনের অভিজ্ঞতানুসারে মিশরের অধিবাসীরা মনে করত যে এমন কথা ও কার্য আছে যার দ্বারা প্রাণী থেকে দেবতা সকলকেই প্রভাবিত করা সম্ভব। মানুষ যেমন জাদু ছাড়া নিজেদের সাহায্য করতে পারত না, তেমনি দেবতারাও নিজেদের রক্ষা করার জন্য বাহুতে বালা পরিধান করত এবং পরস্পরকে বাধ্য করার জন্য জাদুমন্ত্র উচ্চারণ করত।

ফ্রেজার মনে করেন যে জাদু থেকে ধর্মের উৎপত্তির মূলে রয়েছে এই বিশ্বাস যে, দেবতারাই হল জাদুকর। মিশরের দেবতাদেরও জাদুর সাহায্য নিতে হত মানুষের মতন। তারাও নিজেদের রক্ষা করার জন্য বালা পরিধান করত এবং পরস্পরকে পরাস্ত করার জন্য জাদুর মন্ত্র উচ্চারণ করত। বেবিলোনিয়ার দেবতা ইরা জাদুর আবিষ্কারকর্তা ছিলেন এবং তাঁর পুত্র মারদুক, যিনি বেবিলনের প্রধান দেবতা, পিতার কাছ থেকে জাদুর কৌশল উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। বৈদিক ধর্মে দেবতারা জাদুর দ্বারা তাদের অভীষ্ট লাভ করে। দেবতা বৃহস্পতি জাদুশক্তির অধিকারী ছিলেন। যখন কোন আদিম অধিবাসী জাদুর সাহায্যে তার অভীষ্ট সিদ্ধিতে ব্যর্থ হত, তখন তার ব্যর্থতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য সে ভাবত যে আরও শক্তিশালী কোন জাদুকরের জাদুশক্তিই তার ব্যর্থতার কারণ এবং এই সব অদৃশ্য সত্তার শক্তিশালী জাদুই বৃষ্টি ঘটান, রৌদ্র নিয়ে আসার জন্য দায়ী এবং এই অলৌকিক জাদুকররাই দেবতাতে পরিণত হত, যেমন—ওডিন, আইসিস্ এবং মারদুক। বস্তুতঃ বহু দেবতা প্রথম স্তরে দেবত্বে অধিষ্ঠিত জাদুকর মাত্র ছিল।

ফ্রেজারের মতবাদে সত্যতার উপাদান থাকলেও, যেভাবে ফ্রেজার তাঁর অভিমতটাক উপস্থাপিত করেছেন, ঠিক সেইরূপে অভিমতটিকে গ্রহণ করা

চলে না। এই মতবাদ বড় বেশী বুদ্ধিবাদী বা যুক্তিধর্মী। এই মতবাদে আদিম মানুষের জীবনে চিন্তনের পার্থক্যকে স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু পরিবেশের প্রতি তার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগময় প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। জাদু ও ধর্মের স্বরূপতঃ পাঠকালে স্বীকার করে নেওয়া হলেও আদিম মানুষ জাদু ও ধর্মের পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে সচেতন ছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করলে কালাসঙ্গতি দোষ (anachronism) দেখা দেবে।

অধ্যাপক উইডিম্যান (*Wiedemann*) বলেন, 'নাইল উপত্যকায় জাদুর যে মতবাদ গড়ে উঠেছিল, তা কুসংস্কারের কোন অংশ নয়, ধর্মীয় বিশ্বাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই মতবাদ অনেক পরিমাণে জাদুর ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর ছিল এবং সবসময়ই তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিল।

আধুনিক ইউরোপের অশিক্ষিত শ্রেণীদের মধ্যে নানাভাবে সেই একই ধর্ম ও জাদুর সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। ফরাসীদেশে অধিকাংশ কৃষক এখনও বিশ্বাস করে যে পুরোহিতরা প্রাকৃতিক শক্তির ওপর এক গোপন ও অপ্রতিরোধ্য শক্তির অধিকারী। বাতাস, ঝড়, বজ্র, বৃষ্টি সবই তার আদেশ অনুযায়ী কার্য করে এবং তার বাধ্য।

ফ্রেজার বলেন যে, যদিও আদিম সমাজে ধর্ম ও জাদুর সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, তবু এমন সিদ্ধান্ত করা চলে যে এই দুইয়ের সংমিশ্রণের পূর্ববর্তী একটা সময় ছিল যখন মানুষ তার তাৎকালীন জৈবিক কামনা-বাসনার ঊর্ধে অভাবের পরিপূরণের জন্য শুধুমাত্র জাদুতে বিশ্বাস করত। তাঁর মতে জাদু ধর্মের পূর্ববর্তী। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা জাদুর অনুশীলন করত কিন্তু ধর্ম কি তা তাদের অজানা ছিল। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সবাই ছিল জাদুকর, কিন্তু কেউ ছিল না পুরোহিত। প্রত্যেকেই মনে করত যে প্রকৃতির গতিকে সহানুভূতিমূলক জাদুর সাহায্যে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু কেউ প্রার্থনা বা উৎসর্গের মাধ্যমে দেবতাদের পরিতুষ্ট করতে চাইত না। ফ্রেজার মনে করেন জাদু থেকেই ধর্মের উৎপত্তি, জাদুর ব্যর্থতা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি—প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে ব্যর্থ হয়ে মানুষ চিন্তা করতে লাগল যে প্রকৃতি অলৌকিক সত্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জাদু থেকে ধর্মের রূপান্তর আকস্মিকভাবে ঘটেনি, ধীরে ধীরে ঘটেছে।

আদিম মানুষ ছিল অতিমাত্রায় বিশ্বাসপ্রবণ, কাজেই তার পক্ষে জাদু ও ধর্মের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া কখনই সম্ভব ছিল না। ফ্রেজার জাদু ও

ধর্মের সম্পর্ককে তেল ও জলের সম্পর্ক মনে করলেও আদিম সমাজে শুধু যে এ দুটির একত্র মিশ্রণ লক্ষ্য করা যেত তা নয়, যেন এক অন্তর্নিহিত ঐক্য নিয়ে উভয়ে বিরাজ করত।

ডঃ জেভনস্ (*Dr. Jevons*)-এর মতে ধর্মের আবির্ভাব জাদুর পূর্বে ঘটেছে। কিন্তু ডঃ জেভনস্ এমন কথাও বলেছেন যে, ধর্ম ও জাদুর উৎপত্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঘটেছে এবং স্বরূপতঃ উভয়ই পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র। কাজেই ডঃ জেভনস্-এর বক্তব্যের সমালোচনায় বলা যেতে পারে যে, দুটি বিষয় স্বরূপতঃ পৃথক হলে একটির আর একটি থেকে উদ্ভূত হবার বিষয়টি যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না।

জাদু ও ধর্মের উদ্ভব স্বাধীন ভাবে ঘটেছে, এই অভিমতই যুক্তিসঙ্গত। ধর্ম ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। জাদু উচ্চতর শক্তিকে নিজের কাজে লাগাবার জন্য বাধ্য করতে চায়। ধর্ম চায় তার তুষ্টি বিধান করে অনুগ্রহ লাভ করতে। ধর্ম সামাজিক, জাদু ব্যক্তিনির্ভর। ধর্ম জাদু থেকে নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র। কিন্তু যে আদিম মানুষের মন ছিল অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন তার মনে উভয়ের পার্থক্য সম্পর্কে কোন চেতনা ছিল না এবং এমন কথাও বলা যেতে পারে যে, তার কাছে ধর্ম ও জাদু ছিল অভিন্ন এবং মানসিক দিক থেকে অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। মিলেনেশিয়ার অধিবাসী তার চারপাশে মানার উপস্থিতি লক্ষ্য করে। সে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য এই মানাকে বাধ্যতামূলক শক্তির দ্বারা কাজে লাগাতে পারে বা সে প্রার্থনা ও উৎসর্গের মাধ্যমে সেই ঐশ্বরিক শক্তির কাছে আবেদন জানাতে পারে। যিনি প্রচুর পরিমাণেই ঐ মানার অধিকারী। প্রথমটিতে জাদুর মনোভাব ও শেষেরটিতে ধর্মের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, কাজেই ধর্ম ও জাদু স্বতন্ত্র হলেও আদিম সমাজে এই দুইয়ের একত্র সংমিশ্রণ সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

৪। উন্নত সমাজে ধর্ম (Religion in developed societies) :

ধর্মের কোন রকম অস্তিত্ব ছিল না, এমন কোন সমাজের সন্ধান পাওয়া যায় না। গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, আজকালকার দিনে একথা নিরাপদেই বলা চলে যে কোন প্রাক্-অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট সমাজের সন্ধান পাওয়া যায় নি, যা পুরোপুরি ধর্ম-বর্জিত। কিন্তু যদিও সব সমাজেই ধর্মের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, অনুন্নত বা আদিম সমাজে ধর্মের যে রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, উন্নত সমাজে ধর্মের রূপ তা থেকে ভিন্ন।

উন্নত সমাজে ধর্মের রূপ কি তা জানতে হলে উপজাতীয় ধর্ম (Tribal Religion)-এর সঙ্গে তার পার্থক্যের মাধ্যমেই তাকে ভাল করে বুঝে নেওয়া যাবে। কেননা সামাজিক সংগঠনের সরলতম রূপ হল উপজাতি। উপজাতি হল সামাজিক সংগঠনের প্রাথমিক রূপ, যে সংগঠন আদিম অধিবাসী দ্বারা অধ্যুষিত। এটি একটি অতি ক্ষুদ্র এবং সীমিত সামাজিক গোষ্ঠী, এক হিসেবে এটিকে পরিবারের একটি সংযোজিত অংশ রূপেই গণ্য করা চলে। সমাজের যে স্তরে উপজাতির অস্তিত্ব, সেই স্তরে ব্যক্তির স্বার্থ নিরন্তর বেঁচে থাকার সংগ্রাম, খাদ্যান্বেষণ, প্রাকৃতিক বিপদ এবং শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতির দ্বারা নিরূপিত হত। কাজেই আদিম নরনারীর পক্ষে পার্থিব অভাবের অতি উর্ধে ওঠা সম্ভব ছিল না। কাজেই তার ধর্মও ছিল সেই একই নিম্নস্তরের। ধর্ম সম্পর্কীয় রীতির মূলে যেসব স্বার্থের অস্তিত্ব ছিল সেই স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত ছিল খাদ্য সংগ্রহ, বিবাহ, জন্ম, রোগ, মৃত্যু, যুদ্ধ, বন্যপশু ও আবহাওয়া থেকে আত্মরক্ষা ইত্যাদি।

অন্যান্য মানবীয় স্বার্থের সঙ্গে ধর্মের পার্থক্য ছিল তখনও খুবই অস্পষ্ট। কাজেই দেখা যায়, ধর্মের প্রথম দিকে মানুষের আত্মা প্রকৃতির অধীন এবং দৈহিক প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু এই স্তরেও দেখা যায় জগতের অদৃশ্য শক্তির প্রতি ব্যক্তির গভীর আবেগমূলক প্রতিক্রিয়া বর্তমান এবং যা প্রত্যক্ষগোচর তার মধ্যে নয়, যা অপ্রত্যক্ষগোচর তার মধ্যেই মানুষ জীবনের রহস্য অনুসন্ধান করত। এইসব রহস্যময় শক্তির উপস্থিতি ব্যক্তির মনে যে সশ্রদ্ধ ভয়ের উদ্রেক করে তার থেকেই তার ধর্মের উৎপত্তি। ধর্মের শুরুতে দেখি একাধিক আত্মায় বিশ্বাস, যেগুলি রহস্যজনক শক্তির প্রয়োগ করতে পারে এবং কতকগুলি আনুমানিক ক্রিয়া সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের প্রভাবিত করা যায়। এই ব্যাপারে কিছুটা অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেল যখন মানার অস্পষ্ট ধারণা সজীব আত্মায় রূপান্তরিত হল। ক্রমশঃ প্রাণবাদ আত্মাবাদে রূপান্তরিত হল। এই রূপান্তর ধর্মের অগ্রগতির পথে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ, কারণ এই ধারণাই ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতাবাদের পথ সুগম করেছে যে, ঈশ্বর এক আত্মা। আবার আদিম ধর্মের ক্ষেত্রে অচেতন পদার্থের প্রতি অন্ধ ভক্তিবাদ যাকে 'fetishism' নামে অভিহিত করা হয়, ধর্মের অগ্রগামিতা সূচিত না করে তার পশ্চাদগামিতা নির্দেশ করে। 'fetish' হল কোন অচেতন বস্তু যাকে সাময়িকভাবে কোন আত্মার দ্বারা আশ্রিত মনে করে উক্ত আত্মার সাহায্য লাভের আশায় বা সৌভাগ্য

লাভের জন্য পূজা করা হত। এই জাতীয় ধর্ম বিশ্বাস পশ্চাদাভিমুখী, কলঙ্কজনক, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রামূলক এবং খেয়ালী মনোভাবের পরিচায়ক।

আবার আদিম নরনারীদের মধ্যে বহু আত্মা উপসনাবাদ (Polydaemonism)-ও দেখা যায়। এই আত্মাগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে—যেসব আত্মা প্রাকৃতিক বস্তুর অন্তর্ভুক্ত, মৃত ব্যক্তিদের আত্মা, প্রকৃতির মাঝে বস্তুকে আশ্রয় করে যেসব বস্তু অস্তিত্বশীল—যেমন আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পৃথিবী।

উপজাতির অস্তিত্ব বেশী দিন টিকে থাকে না। কোন শক্তিশালী উপজাতির দ্বারা একাধিক উপজাতিকে পরাজিত করে যুদ্ধে জয়লাভ এবং তার ফলে শক্তিশালী কর্তৃক দুর্বলের ওপর আধিপত্য বা অন্যান্য কারণবশতঃ যখন অনেকগুলি উপজাতির সংমিশ্রণ ঘটে তখন উপজাতি জাতিতে রূপান্তরিত হয়। এবং উপজাতীয় ধর্ম জাতীয় ধর্মে পর্যবসিত হয়। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়—বহু আত্মাপূজাবাদ বহু দেববাদে রূপান্তরিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা উন্নত সমাজের ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি এবার বুঝে নিতে পারি।

প্রথমতঃ, উন্নত সমাজের ধর্মের মধ্যে ভয়ের প্রাধান্য লক্ষিত হয় না, বা ধর্মকে মনে করা হয় না মানুষের থেকে উচ্চতর যে সব শক্তি প্রকৃতি এবং মানব জীবনের গতিপথ পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত করে তাদের তুষ্টতা বা প্রসন্নতা সাধন। উন্নত সমাজে ধর্মের উদ্দেশ্য কোন শক্তিকে তুষ্ট বা প্রসন্ন করা নয়। উন্নত সমাজে ধর্মের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী আদিম সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পৃথক। উন্নত সমাজে ধর্ম মানুষের প্রকৃতির শুধু একটা অংশমাত্র অধিকার করে নেই, ধর্ম এক পরমতত্ত্বের প্রতি ব্যক্তির সমগ্র প্রতিক্রিয়া। ধর্মের মধ্যে রয়েছে একটা মনোগত দিক এবং একটা বস্তুগত দিক এবং এই দুই দিকের সম্বন্ধ। মনের দিক থেকে দেখতে গেলে মানুষের সব মানসিক প্রক্রিয়া চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুর দিক থেকে দেখতে গেলে ধর্ম মানুষের চেতনা-উর্ধ এক ঐশ্বরিক সত্তাকে নির্দেশ করে, যে ঐশ্বরিক সত্তার মধ্যে মানবজীবনের পরম মূল্যগুলি সংরক্ষিত আছে।

দ্বিতীয়তঃ, উন্নত সমাজের ধর্মের পরিধি খুবই ব্যাপক এবং গ্রহণমূলক মনোভাব বিশিষ্ট, কিন্তু আদিম সমাজের ধর্ম অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ পরিধিযুক্ত এবং বর্জনমূলক মনোভাববিশিষ্ট। এই ধর্ম তার দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে উপজাতির

অন্তর্ভুক্ত সভ্য ভিন্ন অন্য কাউকেও অন্তর্ভুক্ত করতে নারাজ। কিন্তু উন্নত সমাজের ধর্ম তার ধর্মের পরিধির মধ্যে সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করতে প্রস্তুত।

তৃতীয়তঃ, উন্নত সমাজে ধর্ম ব্যক্তির নিজস্ব বিষয়, কোন গোষ্ঠীর বিষয় নয়। আদিম সমাজে ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয় নয়, উপজাতীয় বিষয়। উপজাতিরা মনে করত যে তার দেবতা শুধুমাত্র তারই গোষ্ঠীর জন্য, অন্য গোষ্ঠীর জন্য নয়। উন্নত সমাজে ধর্মের ক্ষেত্রে এ জাতীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হয় না।

চতুর্থতঃ, উন্নত সমাজে কোথাও কোথাও বহু দেবতাতে বিশ্বাস এবং উপাসনা লক্ষ্য করা যায়, যেমন কিছু উন্নত হিন্দু সমাজে। উপজাতীয় সমাজে আত্মাদের দেবতা রূপে অভিহিত করা হত। কিন্তু আত্মাগুলি ক্ষমতাসম্পন্ন হলেও বহুদেববাদের উন্নত দেবতাদের প্রকৃতির তুলনায় তারা ছায়াময় এবং স্পষ্ট প্রকৃতিবিহীন।

পঞ্চমতঃ, উন্নত সমাজের ধর্ম সর্বপ্রকারে জড়াত্মক ধারণা বর্জিত। কাজেই, উন্নত সমাজের দেবতারা যথার্থই আধ্যাত্মিক পদবাচ্য। জড়াত্মক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়কে একত্রে মিশিয়ে দেবার যে প্রবণতা আদিম মানুষের মধ্যে ছিল, উপজাতীয় দেবতার ধারণার ক্ষেত্রেও সেই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটে ছিল। কাজেই আমরা ঠিক আধ্যাত্মিক বলতে যা বুঝি উপজাতীয়দের দেবতা সেই অর্থে আধ্যাত্মিক ছিল না। তাদের কম বেশী জড়াত্মক রূপে ধারণা করা হত। উপজাতীয় ধর্ম দেবতাকে কোন প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বস্তুতে অবস্থিত দেখতে চায়। শুদ্ধ অতীন্দ্রিয় আত্মার ধারণা আদিম নরনারীর অজ্ঞাত ছিল। দেবতারা ছিল নামহীন সত্তা।

ষষ্ঠতঃ, উন্নত সমাজে দেবতারা নৈতিক গুণ সম্পন্ন, উপজাতির দেবতারা নৈতিক গুণসম্পন্ন ছিল না। উপজাতির দেবতারা মানুষের থেকে মহৎ বা শ্রেষ্ঠ নয়। তারা মানুষের তুলনায় অধিক ক্ষমতাশালী ও ধূর্ত মাত্র। পবিত্রতা, সাধুতা, ভালবাসা প্রভৃতি নৈতিক সদগুণগুলি আদিম নরনারীরা কখনও এইসব দেবতাদের ক্ষেত্রে আরোপ করেনি। যে একটি মাত্র গুণ এই দেবতাদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হত তা হল ক্ষমতা এবং এই ক্ষমতার প্রয়োগ ছিল খেয়ালখুশীর নামান্তর, দায়িত্ব হীনতার পরিচায়ক এবং বিপদজনক। উন্নত সমাজে দেবতাকে মনে করা হতে লাগল ন্যায়পরায়ণ এবং সাধু, শ্রেষ্ঠ সৎগুণের অধিকারী এবং নৈতিক শৃঙ্খলার সংরক্ষক। এই দেবতারা সাধু ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করেন এবং অসাধু

ব্যক্তিকে শাস্তি দেন। উন্নত সমাজে দেবতারা হয়ে উঠল নৈতিক শক্তি, অনুকরণ-যোগ্য আচরণ পদ্ধতি এবং নৈতিক জগৎ শৃঙ্খলার সংরক্ষক। মানুষ যে পরম মূল্যের সঙ্গে পরিচিত, সেই পরম মূল্যের সংরক্ষক হয়ে উঠল এই সব দেবতারা।

সপ্তমতঃ, উন্নত সমাজে ধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল বহুদেববাদের একেশ্বরবাদের দিকে গতি। বহুদেববাদের একেশ্বরবাদে রূপান্তর নিম্নলিখিত তিনটি রূপের যে-কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। প্রথমতঃ, অন্যান্য দেবতাদের তুলনায় কোন একটি দেবতাকে মহিমান্বিত করা। যেমন, গ্রীক দেবতাদের মধ্যে জিউসকে; রোমানদের মধ্যে জুপিটারকে দেবতাদের নেতারূপে কল্পনা করা হত। দ্বিতীয়তঃ, এক পরম সত্তায় বহু দেবতার মিলন। যদিও বহু দেবতা অস্তিত্বশীল তবু উপাসক দেবতার প্রতি ভক্তি জানাতে গিয়ে কোন একটিমাত্র দেবতার ওপর এত বেশী মনোযোগ নিবদ্ধ করা হত যে সেই দেবতা সাময়িকভাবে একটি বিশ্বশক্তির স্তরে উন্নীত হত। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে ম্যাক্সমূলার (*Maxmuller*) এই মনোভাব আবিষ্কার করেন। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে কখনও বা দেবী অদিতি, কখনও বা বরুণ দেব বা মিত্র শ্রেষ্ঠ দেবতার আসন গ্রহণ করত। তৃতীয়তঃ, সব দেবতাকে এক পরম সত্তার অবভাস (appearance) রূপে গণ্য করা হতে লাগল। একে একেশ্বরবাদ রূপে গণ্য না করে সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism)-রূপে অভিহিত করাই যুক্তিসঙ্গত। প্রাচীন মিশরে সূর্য দেবতাকে সব দেবতার আত্মা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। উপনিষদে ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা, বিশ্বজগৎ অধ্যাস (illusion)। ভারতে এই সর্বেশ্বরবাদ সাধারণের উপাসনার ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য বহু দেববাদকেও স্বীকার করে নিয়েছে।

এখানে একটা প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, আদিম সমাজে কি একেশ্বরবাদে বিশ্বাসের কোন নজির পাওয়া যায় না। কেউ কেউ এমন অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, যেমন এনড্রু লেঙ্গ (*Andrew Lang*) বলেন, কিছু নিম্নতর আদিম নরনারী খৃষ্টানদের মতনই একেশ্বরবাদী, তারা এক পরম সত্তায় বিশ্বাসী। দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার আন্দামান দীপপুঞ্জের ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে এবং মানুষের মধ্যে সবচেয়ে আদিম উপজাতি ফুজিয়ান উপজাতিদের (Fuegian tribes) মধ্যে এক পরমসত্তায় বিশ্বাসের কথা জানা যায়। তবে এই জাতীয় একেশ্বরবাদ যথার্থ একেশ্বরবাদ ছিল না। কেননা আদিম সমাজে কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিশ্বাস

দেখা গেলেও সে বিশ্বাস ছিল সম্প্রদায়ের কিছু লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পল রেডিন (*Paul Redin*) বলেন, 'যথার্থ একেশ্বরবাদী ধারণা আদিম সমাজে খুবই দুর্লভ। বস্তুতঃ যে একেশ্বরবাদী ধারণা প্রচলিত ছিল তা প্রকৃতপক্ষে ছিল বহু ঈশ্বরবাদেরই একটি রূপ। রেডিন আরও বলেন যে, একেশ্বরবাদ তার ধর্মীয় অর্থের দিক থেকে বোঝায় যে একটি সমগ্র সম্প্রদায়ের এক ঈশ্বরে বিশ্বাস। কিন্তু আদিম সমাজে তা কদাচিত দৃষ্ট হত। সেই কারণে অনেকে মনে করেন যে, আদিম সমাজে একেশ্বরবাদী ধারণার অস্তিত্ব যদি কোথাও ছিল, তাহলে সেটা ছিল খুব অস্পষ্ট আকারে। তাদের জীবনে এই ধারণা কার্যকর ছিল না।

অষ্টমতঃ, উন্নত সমাজের ধর্মে ধর্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়া কর্মের, আচার-অনুষ্ঠানের সরলতা লক্ষণীয়। প্রার্থনা একটি বিষদ ধর্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়া। যদিও প্রার্থনা ও জাদুমন্ত্রের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান, বিশেষ করে আদিম নরনারীর ধর্মে উভয়ের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। উন্নত সমাজের ধর্মে প্রার্থনাকে ক্রমশঃ জাদুমন্ত্রের থেকে স্বতন্ত্র করা হয়েছে। প্রার্থনার ক্রমবিকাশের পথে অলৌকিক সত্তাকে জাদুমন্ত্রের দ্বারা কার্য করতে বাধ্য করার বা জাদুসংক্রান্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা এদের কার্যে সহায়তা করার পদ্ধতির অবসান ঘটেছে। উন্নত সমাজে প্রার্থনায় জাদুমন্ত্রের দিক আধ্যাত্মিক মনোভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রার্থনার বিষয়বস্তুর আধ্যাত্মিককরণও উন্নত সমাজের ধর্মের বৈশিষ্ট্য। আদিম যুগের প্রার্থনার লক্ষ্য ছিল জাগতিক সম্পদ লাভের আকুল আবেদন। কিন্তু উন্নত সমাজের ধর্মে দেবতার কাছ থেকে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ লাভের দিকেই মানবমনের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটতে থাকে এবং মানবমন ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভের চেয়েও তাঁর ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে তৃপ্ত হতে চায়। উন্নত সমাজের ধর্মে প্রকৃত প্রার্থনার প্রয়োজনীয় শর্তরূপে অন্তরের শুচিতার ওপর এবং চিন্তন ও উদ্দেশ্যের সততার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

নবমতঃ, উন্নত সমাজের ধর্মে যথার্থ ধর্মবোধের প্রাধান্য, যা উপজাতীয় ধর্মে অনুপস্থিত। উপজাতীয়দের ধর্ম-সম্পর্কীয় চিন্তার পিছনে ছিল তাদের উদ্দেশ্যের স্থূলতা। দেবতাদের কাছে যা তারা চাইত তাদের সেই চাওয়ার ওপর ছিল দৈনন্দিন জীবনের প্রতিফলন। পার্থিব কল্যাণ লাভের কামনার দ্বারা এই ধর্মবোধ বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল। স্বাস্থ্য, খাদ্যের প্রাচুর্য, সন্তানসন্ততি, যুদ্ধে সাফল্য প্রভৃতি জাগতিক কল্যাণের জন্য তারা প্রার্থনা জানাতো, সৎ জীবন-যাপনের জন্য সহায়তা কামনা করা হত না।

দশমতঃ, উন্নত সমাজের ধর্ম রক্ষণশীল মনোভাবমুক্ত। উপজাতীয় ধর্মের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর রক্ষণশীল মনোভাব। অসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে আদিম নরনারী নিজের ধর্মকে আঁকড়ে থাকত। সমাজের অসংখ্য পরিবর্তন সত্বেও পুরাতন বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান এরা বর্জন করত না। উপজাতীয় ধর্ম জাদুতে বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হত। এর ফলে এই ধর্মে কুসংস্কারের প্রাধান্য ছিল এবং পবিত্র ও উন্নত উপাদানের অভাব পরিলক্ষিত হত। উন্নত সমাজের ধর্ম উপজাতীয় ধর্মের মত অতখানি রক্ষণশীল মনোভাবসম্পন্ন নয়। উন্নত সমাজের ধর্ম অনেক পরিমাণে কুসংস্কারমুক্ত এবং জাদুতে বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত নয়।

শেষতঃ, উন্নত সমাজের ধর্মের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ধর্মের সঙ্গে সততার এবং জনকল্যাণের সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতনতা। উন্নত সমাজে মানুষের মধ্যে এই বোধ দেখা যায় যে, যথার্থ ধর্মপ্রবণ ব্যক্তিকে সৎচরিত্রসম্পন্ন হতে হবে এবং সকল প্রকার নীতিবিগর্হিত কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত থাকতে হবে। উন্নত সমাজে ধর্মবোধের অপর এক বৈশিষ্ট্য হল জনসেবাকে ঈশ্বরসেবা বলে মনে করা। 'জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'—ইহা উন্নত সমাজে ধর্মবোধেরই আত্মপ্রকাশ। উন্নত সমাজে যেমন ধর্মের সামাজিক ভূমিকা আছে, আদিম সমাজেও ছিল। আদিম সমাজের সমাজজীবনে যেমন জন্ম, দীক্ষা, বিবাহ, রোগ, মৃত্যু, কৃষিকার্য প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে নানারকম ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রকাশ ঘটত, বর্তমান যুগেও তা লক্ষ্য করা যায়। তবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নত সমাজে যে সব জনকল্যানমূলক কার্য সম্পাদন করে, আদিম সমাজে তা এতখানি দৃষ্ট হত না।

উপসংহারে একথা বলা চলে যে, উন্নত সমাজের কোন কোন ধর্মের মধ্যে বিশ্বজনীন ধর্মের আবেদন রয়েছে। এই প্রসঙ্গে ইসলামধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং খৃষ্টধর্মের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সব ধর্মের মধ্যে রয়েছে সমস্ত মানবজাতির জন্য মূল্য ও আশারবাণী এবং এই ধর্ম দেশ-কাল-জাতি-বর্ণ সব কিছুর সীমারেখাকে অর্থাৎ নিজের স্বাভাবিক সীমারেখাকে অতিক্রম করে যায়।

৫। ভারতের ধর্ম (Religion in India) :

ভারতে কোন বিশেষ একটি ধর্মের কথা বলা চলে না। ভারতে বহু সম্প্রদায়ের বসবাস, যেমন—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, পারসী, শিখ

প্রভৃতি। এইসব সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটিই এক একটি ধর্মে বিশ্বাসী। যেমন, হিন্দুসম্প্রদায় হিন্দুধর্মে, মুসলমান সম্প্রদায় ইসলামধর্মে, বৌদ্ধরা বৌদ্ধধর্মে, শিখ সম্প্রদায় শিখধর্মে বিশ্বাসী। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং এই ধর্মনিরপেক্ষতা নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক। কারণ ভারত সব সম্প্রদায়ের ধর্মের প্রতিই সমানভাবে শ্রদ্ধাশীল। ভারত কোন বিশেষ ধর্মকে মহান, শ্রেষ্ঠ বা প্রগতিশীল বলে নির্দেশ করে না বা অন্য কোন ধর্মকে নিকৃষ্ট, আদিম বা অপ্রগতিপন্থী বলেও ঘোষণা করে না। ভারতে সব ধর্মই সমান মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

প্রতিটি ধর্মের দুটি দিক আছে, একটি তার অন্তরঙ্গ দিক এবং অপরটি তার বহিরঙ্গ দিক। ধর্মের অন্তরঙ্গ দিক হল ঈশ্বররূপ কোন অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ব্যক্তির মনে যে ভাব, ধারণা, চিন্তা এবং অনুভূতির আবির্ভাব ঘটে সেগুলি এবং এর বহিরঙ্গ দিক হল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব যার মাধ্যমে ঐ অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। যে সব ধর্ম কোন ঈশ্বরের কথা বলে না, যেমন জৈনধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম, সেইসব ধর্ম কোন পরম নৈতিক আদর্শে বিশ্বাসের কথা বলে।

ভারতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, তাদের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে যেমন সাদৃশ্য আছে তেমন কতকগুলি বিষয়ে পার্থক্যও আছে।

প্রথমতঃ, ঈশ্বরের প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই ভারতের প্রধান প্রধান ধর্মের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ধর্ম যেমন হিন্দুধর্ম, ঈশ্বরে বিশ্বাসী, আবার জৈনধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। বৌদ্ধগণ বুদ্ধের ধর্মোপদেশ, নীতি ও বাণী যথাযথ অনুসরণ করার পক্ষপাতী। জৈনরাও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। সেকারণে বৌদ্ধ দর্শনের মত জৈন দর্শনও নাস্তিক দর্শন বলেই গণ্য হয়। মুক্ত সিদ্ধ পুরুষরা জৈনদের দৃষ্টিতে ঈশ্বরস্থানীয়। তাছাড়াও কোন কোন ধর্ম একেশ্বরবাদী। আবার কোন কোন ধর্মে বহু ঈশ্বরবাদ থেকে একেশ্বরবাদ সব কিছুরই অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুরা বহু দেবতার পূজা করে। তবু তারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর এক। বেদের যুগ থেকেই হিন্দুরা বহু দেবদেবীর পূজা করে আসছে। ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে একাধিক দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। কিন্তু বৈদিক যুগেও হিন্দুরা উপলব্ধি করেছিল যে বিভিন্ন দেবতা এক পরমসত্তার প্রকাশ। ইসলামধর্ম হিন্দুদের এই বহু দেবতার উপাসনা সমর্থন করে না। ইসলাম ধর্মমতে আল্লা ছাড়া আর কেউ উপাস্য হবার উপযুক্ত

নয়। ইসলাম ধর্ম বহু দেববাদ অস্বীকার করে এবং একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে। এই ধর্মমত অনুসারে দেবতা মিথ্যা, আল্লা সত্য, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। বিশুদ্ধ একত্ববাদই ইসলাম ধর্মের আদর্শ। আল্লা ছাড়া মানুষ আর কারো দাস হবে না, আর কারো দাসত্ব কবুল করবে না। আবার ঈশ্বরে বিশ্বাসী হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মের ঈশ্বরবর্জিত দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণযোগ্য মনে নাও করতে পারে। তাছাড়াও ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্পর্ক বিষয়ে উপরিউক্ত ধর্মগুলির মধ্যেও নানারকম মতপার্থক্য দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়তঃ, ধর্মের সঙ্গে যুক্ত বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের দিক থেকেও উপরিউক্ত ধর্মগুলির মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। হিন্দুধর্ম ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। বৌদ্ধধর্ম বা জৈনধর্ম যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সার্থকতা স্বীকার করে না। ইসলাম ধর্মও যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান সমর্থন করে না।

তৃতীয়তঃ, হিন্দুধর্ম অবতারবাদে বিশ্বাসী, ইসলামধর্ম অবতারবাদে বিশ্বাসী নয়।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও আরও নানান বিষয়ে ভারতের বিভিন্ন ধর্মগুলির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুধর্ম থেকে উদ্ভূত বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্ম কর্মবাদে বিশ্বাসী, কিন্তু অন্যান্য ধর্ম কর্মবাদে বিশ্বাসী নয়। এছাড়া, অমরতা, স্বর্গ ও নরকের ধারণা, দুঃখ থেকে পরিত্রাণ, মোক্ষ প্রভৃতি বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু উপরিউক্ত নানা বিষয়ে ভারতের বিভিন্ন ধর্মগুলির দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা গেলেও, নানা বিষয়ে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমতঃ, বিভিন্ন ধর্মগুলি যে মৌলিক সত্যের প্রচার করেছে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলি ধর্মের সঙ্গে নৈতিক আদর্শের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছে। হিন্দুধর্মে যেসব কর্ম চিত্তশুদ্ধির সহায়ক যেগুলি সম্পাদন করা এবং যেসব কর্ম চিত্তশুদ্ধির পথে বাধাস্বরূপ, সেইসব নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। কর্মের লক্ষ্য যে চিত্তের শুদ্ধিতা, এ বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে হিন্দুধর্মে। বৌদ্ধধর্মেও নির্বাণলাভের জন্য সম্যক্ কর্মান্ত (Right Conduct)-এর ওপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সম্যক্ কর্মান্ত মানে সংযতভাবে আচরণ ও কর্ম করা। বৌদ্ধধর্মে সম্যক্ ব্যায়াম (Right Effort)-এর ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে, যার অর্থ মনকে অসদ্চিন্তা থেকে মুক্ত করে সদ্চিন্তার দ্বারা মনকে

সর্বদা পূর্ণ রাখা উচিত। জৈন দর্শনেও সম্যক্‌চারিত্র (Right Conduct) ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কামনা, বাসনা, ইন্দ্রিয়, বাক্‌, প্রবৃত্তি এবং চিন্তাকে সংযত করাই হল সম্যক্‌চারিত্র। হিতকর আচরণে প্রবৃত্ত হওয়া এবং অহিতকর আচরণ থেকে বিরত হওয়া হল সম্যগ্‌ চারিত্রের লক্ষণ। ইসলাম ধর্মে রমজান মাসে আহার সংযম দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি ও সদাসর্বদা সৎকার্য দ্বারা আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যে রোজার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রোজা আত্মনিয়মানুবর্তিতা ও আত্মসংযম শিক্ষা দেয়। শিখধর্মেও নৈতিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান হবার কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলি মানুষের ভ্রাতৃত্বের (Brother hood of Man) কথা প্রচার করেছে। শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন বাধাতেই বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি জাতিভেদের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং মানুষের ভ্রাতৃত্বের কথা প্রচার করেন। ইসলাম ধর্মে হজ মানুষকে শিক্ষা দেয় যে সব মানুষই সমান, মানুষকে তার পদমর্যাদা, বংশমর্যাদা সবই ভুলে যেতে হবে যখন সে পরিপূর্ণভাবে আল্লার কাছে আত্মসমর্পণ করবে। হিন্দুধর্ম বিশ্বভ্রাতৃত্বের পূর্ণ আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান, এই বোধ থেকেই বিশ্বভ্রাতৃত্বের বোধের উদ্ভব নয়। একই পরম ব্রহ্ম এই বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। জীবাত্মা ও পরমাত্মা মূলতঃ অভিন্ন—এই বোধের উপরই বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত।

তৃতীয়তঃ, ভারতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলি সমাজস্থ মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্যের কথা বিশেষভাবে নির্দেশ করেছে। হিন্দুধর্ম বলে 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'। ইসলাম ধর্মে 'জাকাত' কথাটির অর্থ হল বৎসরের উদ্বৃত্ত ধন-সম্পদের চল্লিশ অংশের এক অংশ বা শতকরা আড়াই টাকা দান করা। জমিতে যে ফসলাদি উৎপন্ন হয় তার অবস্থা ভেদে দশ বা বিশ অংশের এক অংশ দান করাকেও জাকাত বলে। যাদের আছে তারা এবং যাদের নেই তারাও দান করবে।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, ভারতে ধর্ম সমাজের ঐক্যকে সুদৃঢ় করেছে। ধর্মান্ধতার বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় পরস্পরের সম্পর্ককেও কখনও তিক্ত করে তোলেনি। যদিও বা মতপার্থক্য ও ধর্মান্ধতা কখনও কখনও বিপদ বা হানাহানির সৃষ্টি করে থাকে তা নিতান্তই সাময়িক। তা স্থায়ী হয়নি, এবং এক ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের

সম্পর্ককে স্থায়ীভাবে তিক্ত করে তুলতে পারেনি। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গীই ধর্মকে হাতিয়ার করে সমাজের ঐক্যকে বিচার করার পথে প্রধান বাধার সৃষ্টি করেছে।

ভারতে প্রতিটি ধর্মসম্প্রদায় অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের উৎসব, আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি সমানভাবেই শ্রদ্ধাশীল। যে কোন ধর্মসম্পর্কীয় উৎসবের দিনে সকল সম্প্রদায়ের নরনারীকে উৎসবে যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রতিটি ধর্মই যে সকল সম্প্রদায়ের নরনারীর প্রতি মধুর, সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের কথা ব্যক্ত করে—এই মহৎ আদর্শই ভারতের ধর্মকে কোন বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী শক্তিতে রূপান্তরিত হতে দেয়নি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করেছে এবং সমাজের সংহতিকে সুদৃঢ় করেছে।

অনুশীলনী

১। ধর্ম কি? ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সামাজিক ভূমিকা কি? (What is religion? What is the role of religious institution?)

২। সমাজে কি ধর্মের স্থান গুরুত্বপূর্ণ? (Is the place of religion in society very important?)

৩। সরল সমাজে জাদু ও ধর্ম কিভাবে বিরাজ করত, ব্যাখ্যা কর। (Discuss how magic and religion existed in simple societies.)

৪। উন্নত সমাজে ধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ কর। (Indicate the special characteristics of religion in developed societies.)

৫। ভারতে প্রধান ধর্মগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। (Discuss the characteristics of main religions in India.)

———

সপ্তম অধ্যায়
সামাজিক পরিবর্তন
(Social Change)

১। সামাজিক পরিবর্তন বলতে কি বোঝায়? (What is Social Change):

সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ এবং প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে সমাজ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। সমাজ-বিজ্ঞানীরা অনেক সময় সামাজিক পরিবর্তন বলতে স্থায়ী সামাজিক ব্যবস্থার অত্যাবশ্যক অংশের, কখনও বা সামাজিক ব্যবস্থারই (Social System) পরিবর্তন বুঝে থাকেন। আবার কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক ব্যবস্থার আংশিক (Partial) এবং সামগ্রিক (Total) পরিবর্তনের কথা বলেন। যেমন, কোন কোন শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আংশিক পরিবর্তন। আবার শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ যদি প্রবর্তিত হয় তাহলে তা'হবে সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন। কিন্তু অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতে সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টি অলীক। কেননা তাঁরা মনে করেন, কোন সামাজিক ব্যবস্থাই সামগ্রিকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে না। এমন কি বিপ্লবও একটি সামাজিক কাঠামোর সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে না। এঁরা মনে করেন, পরিবর্তন সব সময়ই আংশিক এবং সরল পথে অগ্রসর হয় না।

সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, গৌণ পরিবর্তন এবং মৌলিক পরিবর্তনের মধ্যে প্রভেদ করাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। রস (*Ross*) সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোন মৌলিক পরিবর্তনের বিষয়কে স্বীকার করেন না। তাঁর মতে সামাজিক পরিবর্তন হল শুধু মাত্র সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান (Social institutions)-এর এবং তাদের বিভিন্ন রূপের, অর্থাৎ কিনা সমাজের অংশ এবং উপাদান (Parts and elements)-এর পরিবর্তন।

[1]ম্যাকক্লাঙ্গ লী (*McClung Lee*)-এর অভিমতানুসারে সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নয়। তারা সামাজিক জীবনের

---

1. *McClung Lee :* New Outline of the Principles of Sociology.

মূল ধর্মকে পরিবর্তিত করতে পারে না। তাঁর মতে সামাজিক পরিবর্তন হল সামাজিক ব্যবস্থার বা সংহতির বা সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের বাহ্যরূপ, ক্রিয়া ও কাঠামোর পরিবর্তন। তিনি বলেন সামাজিক পরিবর্তন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় আমরা সামাজিক ব্যবস্থার একটি কাঠামো এবং ক্রিয়ার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন নিরূপণ করতে পারি।

সামাজিক পরিবর্তনের ঐ একই জাতীয় ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অধ্যাপক [1]গিন্‌সবার্গ (*Ginsberg*) বলেন, "সামাজিক পরিবর্তন বলতে আমি বুঝি সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন অর্থাৎ কিনা সমাজের আকারের, এর অংশের গঠনের বা ভারসাম্যের বা এর সংগঠন বা বিন্যাসের পরিবর্তন।" তিনি তাঁর সামাজিক পরিবর্তনের ধারণার ক্ষেত্রে ব্যক্তির মনোভাব (Attitudes) এবং বিশ্বাসের, অবশ্য যতদূর পর্যন্ত তারা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে উর্ধে তুলে ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, পরিবর্তনের কথা বলেন।

কিন্তু অনেকে মনে করেন যে সামাজিক পরিবর্তন শুধু মাত্র পরিমাণগত বা একটি রূপ থেকে আর একটি রূপের পরিবর্তন নয়। তাঁদের মতে সমাজের পরিমাণগত পরিবর্তন গুণগত মৌলিক পরিবর্তনের দিকে চালিত হয়। মার্কসবাদীরা এই অভিমতের সমর্থক। তাঁরা সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিনিরপেক্ষ সামাজিক নিয়মের (Objective social laws) পরিবর্তনে আগ্রহী। অবশ্য অনেকেই সামাজিক পরিবর্তনের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন না।

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলা যেতে পারে যে, সামাজিক পরিবর্তন হল সমাজের সংগঠনের, অর্থাৎ কিনা সমাজের কাঠামোর ও ক্রিয়ার পরিবর্তন। মানব সমাজের সব রকম ঐতিহাসিক পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের, শ্রেণী কাঠামোর, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার, আচার ব্যবহারের, জীবন-ধারার—সংক্ষেপে মানুষের সব রকম মৌলিক সম্পর্কের পরিবর্তনকে বোঝায়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, সামাজিক পরিবর্তন হল মানুষের পরিবর্তন। কিংস্‌লে ডেভিস (*Kingsley Davis*) বলেন, সমাজকে পরিবর্তিত করার অর্থ মানুষকে পরিবর্তিত করা।'

---

1. *Ginsberg :* Concept of Evolution. "Studies in Sociology."

২। সমাজ একটি প্রক্রিয়া—একটি চিরপরিবর্তনশীল বিষয় (Society as a process —an ever-changing phenomena) :

ব্যক্তির জীবনে যেমন আমরা অসংখ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করি, সমাজ-জীবনেও সেরূপ অসংখ্য পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই। সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। বর্তমানে আমরা সমাজের যে রূপ প্রত্যক্ষ করছি একশ বা হাজার বছর আগে সমাজের এ রূপ ছিল না। সমাজের বাইরের আঙ্গিক ও ভেতরের স্বরূপ—উভয়কে কেন্দ্র করে অসংখ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সমাজের গঠন ছাড়াও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন সাধিত হয়। সমাজের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, অর্থাৎ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে বহু পরিবর্তন দেখা দেয়।

সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন উৎস নির্দেশ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক পরিবেশ সামাজিক পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। ধীর এবং আকস্মিক ভৌগোলিক পরিবর্তন, জলবায়ু সংক্রান্ত পরিবর্তন, তাপের পরিবর্তন প্রভৃতি বিশেষভাবে সামাজিক গঠনকে প্রভাবিত করে, সমাজের মধ্যে পরিবর্তন সংঘটিত করে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভয়ংকর ভূমিকম্প, ভয়ংকর বন্যা কোন সমাজের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এমন পরিবর্তন আনতে পারে যে পরিবর্তিত প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য নতুন পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলে সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজস্থ ব্যক্তিদের নতুন জৈবিক অবস্থার (Biological Conition) পরিবর্তন, যেমন—জনসংখ্যার হ্রাস, বংশগত পরিবর্তন প্রভৃতি সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অনেক দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রতিরোধ করার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে সমাজজীবনের অবস্থার মধ্যে নতুন নতুন পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তাছাড়া, মানুষ নিজে জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধির সাহায্যে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করে, সৃষ্টি করে। তার ফলে সমাজের মধ্যে নানারকম পরিবর্তন সাধিত হয়। তৃতীয়তঃ, যন্ত্রশিল্পে অগ্রগতি সামাজিক পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য উৎস। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার মানুষের সামাজিক সম্পর্কে অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে,

বেতার, টেলিফোন, বাষ্পীয় ইঞ্জিন, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কেবলমাত্র যে আমাদের পারিবারিক জীবনের এবং সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছে তা নয়, আমাদের আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস এবং ধারণার মধ্যেও প্রকৃত পরিবর্তন সংঘটন করেছে। উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য মানুষ নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যার ফলে মিল ও কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হস্তচালিত যন্ত্রশিল্পের ক্রমশঃ বিলোপ সাধিত হচ্ছে। মিল এবং কারখানা সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে প্রভূত পরিবর্তন সংঘটিত করেছে। কাজেই বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার নতুন নতুন সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। চতুর্থতঃ, মানুষের জনহিতকর কাজও সামাজিক পরিবর্তনের মূলে বর্তমান। পঞ্চমতঃ, সমাজের ব্যক্তিদের সংস্কৃতির পরিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন সূচনা করে। যে কোন সমাজের দিকে তাকালেই দেখা যাবে সংস্কৃতির বৈচিত্র্য, মানুষের মূল্যবোধের, উদ্দেশ্যর ও আদর্শের বিভিন্ন ধারণা। তারই ফলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি এবং সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে সমাজের মধ্যে নানারকমের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে কোন এক যুগের সাহিত্যও অন্য যুগের ব্যক্তির কাছে সমান আদরণীয় নাও হতে পারে। তাছাড়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলার প্রকাশের ভঙ্গীও নানাভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। সংস্কৃতি সমাজকে প্রভাবিত করে এবং সমাজও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। সংস্কৃতি সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত করে এবং সামাজিক পরিবর্তন নতুন ধরনের সংস্কৃতি সৃষ্টি করে। তাই ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, সমাজ গতিশীল, স্থিরিকৃত ধারণা নয় ; এ হল একটি প্রক্রিয়া, কোন ফলশ্রুতি নয়।[1]

৩। সামাজিক পরিবর্তনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য (A Few Prominent Characteristics of Social Change) :

ইতিপূর্বে আমরা সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন আমরা সামাজিক পরিবর্তনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করব :

দ্রুতগতি, সামাজিক পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ভৌগোলিক পরিবর্তনের তুলনায় সামাজিক পরিবর্তন দ্রুতগতিতে সাধিত হয়। সময় সময়

1. It (society) is becoming, not being ; a process not product—*MacIver and page.*

এই পরিবর্তন এত দ্রুত সাধিত হয় যে, তা অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হয়। যুদ্ধোত্তর কালে, সামাজিক বিপ্লবের পরে, কোন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার পরে এই জাতীয় দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সমাজে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে। রাশিয়ার বিপ্লবের পর রাশিয়ার সমাজ অল্প সময়ের মধ্যে অর্থ নৈতিক ভিত্তিতে নতুনভাবে পুনর্গঠিত হয়েছে। প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান, রীতি-নীতির এমন পরিবর্তন সাধিত হয়, যা কল্পনার অতীত। অবশ্য সময় সময় এই পরিবর্তন খুবই ধীর গতিতে ঘটে থাকে।

সামাজিক পরিবর্তনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে, বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন সত্ত্বেও সমাজের একটা মোটামুটি স্থায়িত্ব আছে, যার জন্য কোন একটি সমাজকে অপর একটি সমাজ থেকে পৃথক করা যেতে পারে।

সামাজিক পরিবর্তনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সামাজিক পরিবর্তন কম বেশী অনিশ্চিত, সে কারণে এই পরিবর্তন সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। যেসব কারণে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে থাকে সেগুলি সংখ্যায় অনেক এবং বিচিত্র ধরনের এবং এই কারণগুলি এতই অস্থায়ী এবং জটিল ধরনের যে এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন হয়ে পড়ে। সমাজ-জীবনের কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র সম্পর্কে, যেমন কোন বিশেষ সময়ে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি, কোন বিশেষ মাসে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে কিন্তু পরবর্তী কুড়ি বছরের মধ্যে কোন বিশেষ সমাজে কি পরিবর্তন ঘটতে চলেছে তা সুনির্দিষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজ নয়।

বৈচিত্র্য সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সামাজিক পরিবর্তন কখনও সামাজিক উন্নতির, কখনও বা সামাজিক অবনতির পরিপোষক, কখনও স্থায়ী, কখনও অস্থায়ী। কোন কোন সামাজিক পরিবর্তন জনকল্যাণের পরিপন্থী, কখনও বা বৃহত্তর সমাজ-জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর।

সময় সময় সামাজিক পরিবর্তন পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে ঘটতে পারে, কখনও বা সমাজস্থ ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে সংঘটিত হতে পারে। যে সাধারণ ধারা বা পদ্ধতি (General Scheme) অনুসারে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে, সামাজিক পরিবর্তনের সেই ধারা বা পদ্ধতিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। তার মধ্যে তিনটি ধারা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। এ তিনটি ধারা হল—একাভিমুখী (Unilinary), পুনরাবির্ভাবশীল (Pendular) এবং বিবর্তনসম্মত (Evolutionary)।

একাভিমুখী সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ হল যে, সমাজ স্থিরভাবে একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে একটি লক্ষ্য অনুযায়ী সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ মতানুসারে প্রকৃতির অন্ধশক্তি, অদৃষ্ট বা ঐশ্বরিক শক্তি এই অগ্রগতির ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করছে এবং সমাজকে কেন্দ্র করে যেসব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় সেগুলি নেহাত আকস্মিক ঘটনা।

দ্বিতীয় মতানুযায়ী সামাজিক পরিবর্তন ঘড়ির দোলকের গতির সঙ্গে তুল্য। সামাজিক পরিবর্তন অবিরত কোন নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী হয় নি, এ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে থেকে থেকে এবং সব সময়ে তা একাভিমুখে হয় নি, মাঝে মাঝে এর পরিবর্তনের গতি রুদ্ধ হয়েছে।

তৃতীয় ধরনের পরিবর্তন হল বিবর্তনসম্মত পরিবর্তন, যে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক বিবর্তন বলতে আমরা এই পরিবর্তনকেই বুঝি।

৪। সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ (Factors of social change) :

উপরিউক্ত আলোচনায় সামাজিক পরিবর্তন বলতে কি বোঝায় তা আমরা জানতে পেরেছি। এখন প্রশ্ন, সামাজিক পরিবর্তন কোন্ কোন্ কারণগুলির দ্বারা বিশেষভাবে সংঘটিত হয়? সামাজিক পরিবর্তন সাধনে পরিবেশগত, জৈবিক, সংস্কৃতিগত, প্রযুক্তিবিদ্যাগত এবং মনস্তত্ত্বমূলক কারণগুলি বিশেষভাবে ক্রিয়া করে। উক্ত কারণগুলি কিভাবে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত করে এবং সমাজের ওপর তাদের প্রত্যেকের প্রভাব কতখানি তার আলোচনা প্রয়োজন :

(১) **পরিবেশগত কারণ** (Environmental factor) : প্রশ্ন করা যেতে পারে, পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলতে কি বুঝব? প্রথমতঃ, আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলতে বুঝতে পারি সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ যার কোলে মানুষের প্রথম জীবন শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ বা প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক—সব মিলিয়ে একটা বৃহত্তর পরিবেশ যাকে মানুষ নিজের প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিত করে নেয়। সমাজবিদ্যার ভৌগোলিক মতবাদীদের মতে ভৌগোলিক পরিবেশ সমাজ গঠনে বিশেষভাবে সাহায্য করে এবং সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত করার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই মতবাদ আমরা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারি না ; তার কারণ, এই মতবাদ ভ্রান্ত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং কিছুটা অবাস্তবতা দোষে দুষ্ট। সামাজিক

পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারে ভৌগোলিক পরিবেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা চলে না, কারণ ব্যক্তির সামগ্রিক পরিবেশের এটি একটি অংশ মাত্র। ভৌগোলিক পরিবেশ যে দ্রুত হ'রে সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন করে তাও বলা চলে না এবং যে কোন ধরনের সামাজিক পরিবর্তনকে কেবলমাত্র ভৌগোলিক কারণের ফলশ্রুতি হিসেবেও ব্যাখ্যা করা চলে না। গত পাঁচ শতাব্দীতে ইউরোপের সামাজিক জীবনে যে পরিবর্তন এসেছে তার পিছনে শিল্পবিপ্লব বহুল পরিমাণে দায়ী; জলবায়ু বা ভৌগোলিক কারণ সেখানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়নি। মানব সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতির মূলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। একই ভৌগোলিক পরিবেশে নানাবিধ সভ্যতার সহাবস্থান সম্ভব এবং বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে একই ধরনের সভ্যতার নজীর পাওয়া যায়। তাই বলে আমরা একথা বলতে পারিনা যে, মানুষের সামাজিক পরিবর্তনে ভৌগোলিক পরিবেশের কোন প্রভাবই নেই। অত্যধিক তাপ বা শৈত্য কোনটিই মানুষের পরিশ্রম করার পক্ষে অনুকূল অবস্থা নয়। যেখানে মাটি অনুর্বর সেখানে ফসল ফলে না, লোকবসতিও গড়ে ওঠে না। আবার যেখানে খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান সে-সব জায়গায় শিল্পের উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনে প্রভূত পরিবর্তন সংঘটিত হয়। অনুকূল পরিবেশ সামাজিক উন্নতি ত্বরান্বিত করে, প্রতিকূল পরিবেশ সামাজিক উন্নতিতে বাধা সঞ্চার করে। ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সমাজজীবনে অকস্মাৎ অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশ সমাজজীবনের ওপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন লোকদের মধ্যে শ্রমশীলতার যে পার্থক্য আমরা দেখি, আবহাওয়া তার অন্যতম কারণ। অবশ্য একথা মনে করলে ভুল হবে যে, প্রাকৃতিক পরিবেশই প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক ব্যবস্থাকে সংগঠিত করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের সামনে নিয়ে আসে নূতন সমস্যা। মানুষ তার বুদ্ধি, জ্ঞান, সংগঠনশক্তি ও পরিশ্রমের সহায়তায় সেই সব সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে এবং তারই ফলে সমাজের বিকাশ সাধিত হয়।

ভৌগোলিক পরিবেশ ছাড়াও সামাজিক পরিবেশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সামাজিক পরিবেশ বলতে বৃহৎ অর্থে কোন একটি দেশের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশই বোঝায়। সামাজিক পরিবেশের সাংস্কৃতিক

দিক সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব এবং সংস্কৃতি কিভাবে সামাজিক পরিবর্তনে সহায়তা করে তা আমরা পরে বিশ্লেষণ করে দেখব। যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক দিকগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা চলে না, কারণ প্রত্যেকটি কারণই প্রত্যেকটির ওপর নির্ভরশীল। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিই আলোচনা অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট হবে এবং আলোচনাও হবে অসম্পূর্ণ।

'সংস্কৃতি' কথাটির অর্থ খুবই ব্যাপক। সেজন্য আমরা পৃথকভাবেই তা আলোচনা করব। এছাড়া পরিবেশ বলতে সেই পরিবেশও বোঝায় যা মানুষ কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করে। যেমন, বিভিন্ন প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবন বা আবিষ্কার নিতান্ত মানুষেরই সৃষ্টি। এ ব্যাপারে নতুনকে জানার আগ্রহে মানুষ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও দক্ষতা নিয়োজিত করে। প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন যে কেবলমাত্র সামাজিক উন্নতিই সাধন করেছে তাই নয়, সামাজিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনও এনেছে।

বর্তমানে শিল্পাশ্রয়ী সভ্যতা এবং মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা এই প্রযুক্তিবিদ্যারই অবদান। প্রযুক্তিবিদ্যা কিভাবে সামাজিক পরিবর্তন সাধন করে তা বিশেষভাবে জানা আবশ্যক। সামাজিক পরিবর্তনে প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকা সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক পরিবেশের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট করার জন্য এই প্রসঙ্গে মার্কসীয় মতবাদ (Marxist theory of social change) সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। সামাজিক পরিবর্তনে মার্কসীয় মতবাদ সাধারণতঃ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অথবা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা (Historical materialism or the materialistic interpretation of history) নামে খ্যাত। এ মতবাদ এই মৌলিক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো (Economic-structure) সামাজিক জীবনের অগ্রগতিতে বিশেষ মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করে। এই কাঠামো উৎপাদনের শক্তি (Forces) এবং সম্পর্ক (relations) দ্বারা গঠিত। অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনে সামাজিক উপরি-কাঠামো (super-stucture) পরিবর্তিত হয়। এই উপরি-কাঠামো বলতে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, আইন-সংক্রান্ত কাঠামোকেই মূলতঃ বোঝায়। উৎপাদনের মূল্যবান জীবনীশক্তি হল উৎপাদক শক্তিগুলি (productive forces) অর্থাৎ ব্যবহার্য যন্ত্রগুলি এবং সেই সব ব্যক্তিরা যারা সেগুলির প্রয়োগ করে। উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে সংগঠিত

হয় এবং সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। ইহাকেই কার্লমার্কস উৎপাদনের সম্পর্ক (relation of production) অথবা অর্থনৈতিক সম্পর্ক (Economic relation) আখ্যা দিয়েছেন। উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উন্নতি, উৎপাদন সম্পর্কীয় পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবীভাবে সংঘটিত করে। সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির (forces of production) দ্বারাই সামাজিক সম্পর্ক (relation of production) নিরূপিত হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, উৎপাদনের যন্ত্র যাদের হাতে অর্থাৎ শাসক বা শোষকশ্রেণী তাদের স্বার্থ হল উৎপাদন সম্পর্ক রক্ষা করা এবং শোষিত শ্রেণীর স্বার্থ হল—এই সম্পর্কে পরিবর্তন আনয়ন করে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করা। ক্রমে এই বিপরীত ধর্মী শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব উৎপাদন সম্পর্কে পরিবর্তন আনে বিপ্লবের মাধ্যমে এবং নূতন সম্পর্ক স্থাপন করে। Communist Manifesto-তে মার্কস এবং অ্যাঙ্গেলস্ (*Marx* and *Engles*) বলেছেন যে, সমাজের ইতিহাসই হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।[1]

পরিবেশগত সামাজিক পরিবর্তনের এই অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাটিকে বিভিন্ন সমাজবিদ্ সমালোচনা করেছেন। কিংসলে ডেভিস এবং ম্যাকাইভার মার্কসীয় ব্যাখাকে ভ্রান্ত এবং অবৈজ্ঞানিক বলে চিহ্নিত করেছেন। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোই শুধুমাত্র সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসে, এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁরা মন্তব্য করেন যে, সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ছাড়া অন্যান্য কারণগুলিও কম দায়ী নয়। তবে ডেভিস এবং ম্যাকাইভারের এই মন্তব্য সমালোচনার উর্ধে এ কথা বলা চলে না। কারণ কার্লমার্কসের বিশেষ বন্ধু অ্যাঙ্গেলস্ (*Engels*) বলেন যে, অর্থনৈতিক অবস্থা হল ভিত্তিস্বরূপ কিন্তু সামাজিক উপরি-কাঠামোর বিভিন্ন দিকগুলি অর্থাৎ আইন, নীতি ইত্যাদিও ঐতিহাসিক সংঘাতের ক্রমোন্নতিতে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং অনেক ক্ষেত্রে ঐ সংঘাতের প্রকৃতি নিরূপণ করে।[2]

কাজেই একথা বলা সমীচীন হবে না যে, মার্কস এবং অ্যাঙ্গেলস্ সামাজিক পরিবর্তনের অন্যান্য দিকগুলি সম্পর্কে একেবারে উদাসীন ছিলেন। তবে মার্কসের উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক ঘটনার মূল সূত্র বার করা এবং তা তিনি সমাজের অর্থ-

1. "The history of all hitherto existing society is the history of class struggle."
—Communist Manifesto.

2. "The economic condition is the basis, but the various elements of the super-structure exert an influence on the development of historical struggle, and in many instances determine their form."—*Engels*.

নৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই খুঁজে পেয়েছেন। ম্যাকাইভার এবং পেজ (*MacIver* and *Page*) মার্কসবাদের সমালোচনা করেছেন এইভাবে যে, এই মতবাদে শ্রেণী সংঘাতের দিকটিকে বড় করে দেখান হয়েছে। অন্যান্য ধরনের সামাজিক দ্বন্দ্বও সমাজে দেখা দিতে পারে, যেমন বর্ণগত, জাতীয় এবং ধর্মীয় দ্বন্দ্ব ইত্যাদি। কিন্তু মার্কসবাদে সামাজিক পরিবর্তনে শ্রেণী সংঘাত ছাড়াও অন্যান্য ধরনের দ্বন্দ্বের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় নি।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশ বিভিন্নভাবে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত করে।

(২) **জৈবিক কারণ** (Biological factor)ঃ যে সমস্ত সামাজিক শক্তিগুলি সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসে তার মধ্যে জৈবিক কারণ অন্যতম। জৈবিক কারণকে আমরা দু দিক থেকে আলোচনা করতে পারি। প্রথমতঃ, লোকসংখ্যার গতির দিক থেকে এবং দ্বিতীয়তঃ বংশগতির দিক থেকে।

সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে জনসংখ্যার গতি নির্ধারণ করা বিশেষ যুক্তিযুক্ত। কারণ জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও হ্রাস যে কেবলমাত্র রাজনীতির বা অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় তাই নয়; সমাজের ওপর জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা হ্রাসের সুদূরপ্রসারী ফল দৃষ্ট হয় যা সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। সামাজিক পরিবর্তন যে-সব কারণগুলির দ্বারা সংঘটিত হয় তাদের মধ্যে জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হেতু সামাজিক পরিবর্তন নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ ইহা সহজে গণনা করা চলে।

কোন একটি দেশের জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে মূলতঃ জন্মের এবং মৃত্যুর হারের দ্বারা। এ ছাড়াও অভিবাসন (immigration) এবং প্রবাসনের (emigration) দিকটিও জনসংখ্যা নির্ণয়ে সাহায্য করে। সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির আলোচনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি যে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দিক থেকেই বিবেচ্য তাই নয়, কারণ জন্ম, মৃত্যু এবং পরিযাণ জৈবিক বিষয়ের ওপরই নির্ভরশীল নয়; সমাজের নানাবিধ মূল্যবোধ এবং আচার আচরণ এই দিকটিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তা ছাড়াও সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলির বিশেষ অবদান রয়েছে।

একটি ভ্রান্ত ধারণা অনেকের মধ্যেই রয়েছে যে, কোন একটি দেশের জন্মহার নিতান্ত জৈবগত কারণ। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক কারণ যে কোন একটি দেশের জন্মহার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে কিনা, সমাজবিদেরা এ প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন এবং তাঁরা সমাজতাত্ত্বিক কারণের উল্লেখ করে এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিবাহ একটি বৈধ সামাজিক অনুষ্ঠান যেটি নরনারীকে তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার ও সন্তান উৎপাদনের সামাজিক অনুমোদন দান করে। বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই একটি নতুন পরিবারের আবির্ভাব ঘটে। সেদিক থেকে বিবাহের সামাজিক গুরুত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। কোন সভ্য সমাজই বিবাহপূর্ব নরনারীর দৈহিক সম্পর্ক সমর্থন করে না। জন্মহার সীমিত রাখার ক্ষেত্রেও এই ধরনের বিধিনিষেধেরও বিশেষ তাৎপর্য আছে। আমাদের হিন্দু সমাজে পারস্পরিক মেলামেশার ক্ষেত্রে সামাজিক বাধানিষেধ মান্য করা হয়। আইন নির্দিষ্ট ন্যূনতম বয়সের উর্ধে বিবাহ আইনতঃ দণ্ডনীয়। আবার অনেক সমাজে আইন নির্দিষ্ট ন্যূনতম বয়সের অনেক উর্ধে নরনারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কারণ অবশ্য এর জন্য দায়ী। জন্মহার সীমিত রাখার পক্ষে কোন কোন দেশের আইনও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা যেন ভুল না করি যে, সামাজিক আচার-আচরণগুলি জন্মহার হ্রাস করার অনুকূল। বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক আচার-আচরণও দৃষ্ট হয় যা জন্মাহারকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। হিন্দু সনাতনধর্মে বংশরক্ষা করা ধর্মীয় নীতি দ্বারা নির্ধারিত। এ ব্যাপারে পাশ্চাত্ত্য দেশের সঙ্গে ভারতের ধর্মজনিত পার্থক্য সুস্পষ্ট। অবশ্য পুত্র ও কন্যার মধ্যে বৈষম্যের জন্য বিভিন্ন সামাজিক কারণ দায়ী। পুত্রমুখ দর্শন এবং বংশরক্ষার জন্য কৌলিন্য প্রথায় অনেকে একাধিকবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন। বর্তমানে আইন দ্বারা অবশ্য এ প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আবার শহর ও গ্রাম অঞ্চলে অন্য রকম চিত্রও আমরা দেখতে পাই। কৃষিভিত্তিক পরিবারে চাষকার্যের সুবিধার্থে অধিক সন্তান অনেকের কাছে বাঞ্ছনীয়। অন্যদিকে শহরাঞ্চলে সম্পত্তি এবং বাসস্থানের অভাব জনসংখ্যা সীমিত করার অন্যতম কারণ।

জন্মহারের হ্রাস-বৃদ্ধি যেমন নানাবিধ কারণ দ্বারা নির্ণীত হয় সেইরূপ মৃত্যুহারের ক্ষেত্রেও নানাবিধ সামাজিক আচার-আচরণ বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। নৃতত্ত্ববিদদের আলোচনা থেকে জানতে পারি যে, আদিম সমাজে মৃত্যুকে প্রতিরোধ করার জন্য নানাবিধ জাদুবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হোত। কিন্তু বর্তমানে

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নে চিকিৎসা জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং মৃত্যুহারও পূর্বের তুলনায় বহু পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। পূর্বে অ-ভেষজ ঔষধ সেবনে নানাবিধ সামাজিক বাধানিষেধ ছিল কিন্তু বর্তমানে শিল্পায়ণ এবং শহরীকরণের ফলে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা ঘটেছে।

জন্ম এবং মৃত্যুহারের মত পরিযাণে (migration)-এর ক্ষেত্রেও নানাবিধ আচার-আচরণ লক্ষণীয়।

পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করলে জানতে পারা যায় যে, নানাবিধ সামাজিক এবং রাজনৈতিক অত্যাচারের ফলে অনেকেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হবার পর বেশীর ভাগ বাঙ্গালী হিন্দু নিজ বাসস্থান ত্যাগ করে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়। অবশ্য বিদেশে নানাবিধ সুযোগসুবিধার এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য, নরনারীর একদেশ থেকে অন্য দেশে গমন করে। উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একথা বলা অসমীচীন হবেনা যে, নানাবিধ সামাজিক কারণ জন্মহার, মৃত্যুহার এবং পরিযাণের কারণকে নির্ধারণ করে এবং এই পরিবর্তনের সমাজতাত্ত্বিক ফল সুদূরপ্রসারী।

জীবনযাত্রার মান এবং জনসংখ্যা ওতঃপ্রোতভাবে সংযুক্ত। এ প্রসঙ্গে ম্যালথাসের (*Malthus*) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ম্যালথাসের মতবাদ অনুসারে জনসংখ্যা গুণোত্তর হারে (Geometrical progression) এবং খাদ্যদ্রব্য সমান্তর হারে (arithmetical progression) বৃদ্ধি পায়। ফলে স্বভাবতই জনসংখ্যার হার খাদ্যসামগ্রীর হারকে অতিক্রম করে। ফলে অভাব, অনটন, দুর্ভিক্ষ, অপুষ্টিজনিত ব্যধি স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়।

ম্যালথাসের মতবাদকে একেবারে উপেক্ষা করা কঠিন। বিভিন্ন অনুন্নত দেশে খাদ্যঘাটতির মোকাবিলায় জন্মসংখ্যা হ্রাসের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ভারতেও জনসংখ্যা সীমিত করণের জন্য জাতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তবে ম্যালথাসের মতবাদ যে সমালোচনার উর্ধে একথা বলতে পারিনা, কেননা বর্তমানে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের দ্বারা মৃত্যুহারও পূর্বের তুলনায় সীমিত হয়েছে এবং নানাবিধ জন্মনিরোধক সামগ্রির (Contraceptives) ব্যবহারের প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত মানসিকতা যদি তৈরি না হয় তাহলে জনসংখ্যার হার হয় উর্ধগতি। জনসংখ্যার অনুপাতে প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural resources) যদি

পর্যাপ্ত না থাকে তাহলে জনগণের মধ্যে অভাব অনটন এবং এজন্য সামাজিক অশান্তি দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক।

জন্মহারের এবং মৃত্যুহারের সঙ্গে আরেকটি বিষয়ও জড়িত, তা হল বয়সভিত্তিক জনসংখ্যার বিভক্তিকরণ (age-group differentiation)। জন্মহার এবং মৃত্যু-হারের ওপরে গড় বয়সের (average-age) হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভরশীল। গড় বয়স যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে যেমন বয়স্ক লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে সেইরূপ গড় বয়স কম হলে অল্পবয়স্ক লোকের সংখ্যার আধিক্য দেখা দিবে। নরনারীর বয়স বৃদ্ধি ও হ্রাসের ওপরও সামাজিক আচার-আচরণের প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অর্জিত গুণাবলীর দিক থেকেও সামাজিক পরিবর্তনে জৈবিক কারণ বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ।[1] সৌজাত্য (Engenies) নামে বিদ্যা বিশেষভাবে বর্তমানে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সৌজাত্য মত অনুসারে পূর্বপুরুষের বিশেষ বিশেষ গুণাবলী সন্তানসন্ততির ওপর বর্তায় এবং কোন ব্যক্তির এই গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য-গুলিকে উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত গুণাবলী বলা হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত গুণাবলীর বিকাশ সাধন ক্ষুদ্র সমাজেই সম্ভব, যখন বিবাহ কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর নর-নারীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকত। কিন্তু যদি বিবাহ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন গোষ্ঠীর নর-নারীর মধ্যে সংঘটিত হয়—যেমন একজন ভারতবাসীর সঙ্গে একজন ইংরেজের বিবাহ হয় তাহলে তাদের সন্তানের গুণাবলী যে পিতা-মাতার কাছ থেকে অর্জিত হবে এ কথা বলা কঠিন। তা ছাড়াও একই গোষ্ঠীভুক্ত পিতা-মাতার বিভিন্ন সন্তানের মধ্যেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের এবং তাদের ব্যক্তিত্বের বিভিন্নতার নানা রকম কারণ দেখান হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পরিবেশগত পার্থক্যও কম দায়ী নয়।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত গুণাবলী সম্পর্কীয় মতবাদটি নানাবিধ সমালোচনার সম্মুখীন, কেননা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের কারণ কোন পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্ণয় করা কঠিন। অনেকে মনে করেন সৌজাত্য বিজ্ঞান পদবাচ্য নয়, কারণ এই বিদ্যার মাধ্যমে একটি পুরুষ বা স্ত্রী কি ধরনের জিন (*genes*) বহন করে তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। আমরা নির্দিষ্ট করে একথা কখনও বলতে পারিনা যে পিতামাতার বিশেষ কোন গুণ তাঁদের সন্তানসন্ততি অর্জনে সক্ষম হবে। বর্তমানে সমাজে ভৌগোলিক সচলতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিবাহ নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ফলে ভিন্ন

1. এ সম্পর্কে ব্যক্তি, সমাজ এবং সংস্কৃতি অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ভাষাভাষী এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাহের প্রচলন দেখা যায়। এর ফলে পরবর্তীকালে বংশধরদের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্যও দেখা যায় এবং সামাজিক পরিবর্তনের পথ সুগম হয়।

(৩) **সংস্কৃতিগত কারণ** (Cultural factor)ঃ মানুষের সঙ্গে অন্যান্য ইতর জীবের পার্থক্যের মূল কারণ সংস্কৃতিগত। অপার্থিব (immaterial) দিক থেকে সংস্কৃতি বলতে বিশ্বাস ও ধর্ম, নীতিবোধ এবং সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা বোঝায়। শুধুমাত্র ইতর জীবের সঙ্গে নয় মানুষের সঙ্গে মানুষেরও যে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় তা এই সংস্কৃতিকেই কেন্দ্র করে। আবার সংস্কৃতি যে স্থিরীকৃত ধারণা তাও ঠিক বলা যায় না। প্রাচীনযুগের বা আদিবাসীদের সংস্কৃতির অনেক কিছুই বর্তমান সভ্য সমাজ পরিত্যাগ করেছে। দু'শো বৎসর আগের সমাজব্যবস্থার এবং বর্তমান সভ্য সমাজের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য তা বিশেষ করে এই সংস্কৃতিকেই কেন্দ্র করে। তবে বস্তুবাদী এবং ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অবশ্য এ ব্যাপারে দুস্তর পার্থক্য রয়েছে। বস্তুবাদীরা সামাজিক পরিবর্তনে এবং উন্নতিসাধনে বস্তুগত দিকটির এবং ভাববাদীরা অবস্তুগত বিষয় অর্থাৎ আদর্শ বা নীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কোন একটি সমাজের সংস্কৃতির গঠনে বিভিন্ন উপাদান ক্রিয়া করে এবং এই সংস্কৃতি সামাজিক পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। বিভিন্ন দেশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিপ্লবই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভারতেও প্রাচীন সমাজে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়নি, তার কারণ তখনকার সমাজ ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। চিন্তাধারার যদি গণতন্ত্রীকরণ সম্ভব না হয় তাহলে সেই সংস্কৃতি সামাজিক পরিবর্তন সংঘটনে বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয় না। নীতিগত, আদর্শগত বা এককথায় সংস্কৃতিগত পার্থক্যের ওপরই সমাজের গতিপ্রবাহ অনেক মাত্রায় নির্ভর করে। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সংস্কৃতি এক একটি দেশের সামাজিক কাঠামোকে কিভাবে পরিবর্তিত করেছে।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই পরিবর্তন আরও ত্বরান্বিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক পরিচয় নিবিড় হয়, ফলে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। তাছাড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যে বিরোধ ও সংঘাত তা দূরীভূত করে এবং সমাজের ঐক্য বা সংহতিকে সুদৃঢ় করে।

সমাজ পরিবর্তনশীল এবং সংস্কৃতি সমাজের মধ্যে নানাধরনের পরিবর্তন সাধন করে সমাজকে গতিশীল রাখে। সমাজের মধ্যে সংস্কৃতির যতই বিকাশ সাধিত হয়, ততই সমাজ থেকে কুসংস্কার, ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রভৃতি বিদূরিত হয়, যা কিছু শুভ বা শ্রেয় তার প্রতিষ্ঠায় মানুষ ব্রতী হয়। মানুষ গতানুগতিকতা বা প্রাচীনত্বের অন্ধ মোহ থেকে মুক্ত হয়ে নতুনকে সাদরে বরণ করতে চায়। এর ফলে সময় সময় সমাজ জীবনে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কিন্তু যা কিছু সুন্দর ও শ্রেয় শেষ পর্যন্ত সমাজ তাকেই গ্রহণ করে। সুতরাং সংস্কৃতি সমাজ-জীবনকে সুন্দর ও আনন্দময় করে তোলে, সামাজিক ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় সহায়তা করে এবং বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ সাধন করে আন্তর্জাতিক সৌহার্দের পথকে প্রশস্ত করে।

সামাজিক পরিবর্তনে সংস্কৃতিগত কারণটিকে আমরা অন্যদিক থেকেও আলোচনা করতে পারি। সমাজের দ্রুত পরিবর্তনে যে বিষয়গুলি বিশেষভাবে জড়িত তা হচ্ছে নিত্য নতুন আবিষ্কার কার্যে এবং উৎপাদনে নতুন পদ্ধতির আরোপ এবং জীবনযাত্রায় মানের (standard of living) উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। পশ্চিমী দেশগুলির শিল্পাশ্রয়ী সভ্যতার বিকাশ সাধনে এবং সামাজিক পরিবর্তনে কর্মের বিশেষীকরণ, কর্ম বিভাজন, শ্রেণীবিন্যাসগত কাঠামো, উন্নততর জীবনযাত্রার চিন্তাধারা এবং শহুরে জীবনযাত্রার প্রভাব বিশেষভাবে দায়ী। প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিগত পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তা নরনারীর দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্বাস, অভ্যাস, মূল্যবোধ প্রভৃতির পরিবর্তনে সহায়তা করে। বর্তমানে সামাজিক মর্যাদা জন্মগত দিক থেকে নির্ধারিত হয় না। অর্থনৈতিক অবস্থা বহুল পরিমাণে তা নিরূপণ করে। ভারতে শিল্পায়ণ এবং নগরীকরণ প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতিরই ফলশ্রুতি যা আমাদের নীতিগত কাঠামোকেও নাড়া দেয়। পূর্বে আমাদের সমাজে স্বেচ্ছামূলক কোন সংগঠন ছিল না। কিন্তু ব্যক্তির প্রত্যেকটি কাজে উদ্যোগী হওয়া, সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে একত্রে চিন্তা করা এবং তদনুযায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি বর্তমানে আমাদের চিন্তার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

তবে উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা যেন ভুল না করি যে, সামাজিক সম্পর্ক এবং মূল্যবোধগুলি প্রযুক্তিবিদ্যারই ফলবিশেষ। প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিবর্তন যেমন একদিকে সংস্কৃতিগত পরিবর্তনে সহায়তা করে সেরূপ সংস্কৃতিগত পরিবর্তন প্রযুক্তিবিদ্যাকে নিজ উদ্দেশ্যসাধনে নির্দেশ দান করে। সামাজিক

মূল্যমানই প্রযুক্তিবিদ্যায় ব্যবহারের পদ্ধতি নির্ধারণ করে। বিভিন্ন দেশ যেমন, গ্রেট ব্রিটেন, সোভিয়েট রাশিয়া এবং ভারত মোটামুটি একই ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যহেতু, তারা তা বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করে।

উদ্ভাবন বা আবিষ্কারের কথা বাদ দিলেও যুক্তিবাদী ব্যক্তির আদর্শ এবং বিশ্বাস সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত করে। মানুষের চিন্তাজগতের সঙ্গে পরিবেশের ক্রমাগত পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে এবং এর ফলেই আদর্শ বা নীতি কর্মে রূপান্তরিত হয়। যে সব ব্যবস্থার দ্বারা মানুষ তার আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করে পরবর্তীকালে তাই সভ্যতায় পরিণত হয়।

(৪) **প্রযুক্তিবিদ্যাগত কারণ (Technological factor)ঃ** গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে অর্থনীতির এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। রুচিরোজগারের জন্যই একজন ব্যক্তির জীবনের বেশীরভাগ সময় অতিবাহিত হয়। ফলে প্রাত্যহিক জীবনধারণের পদ্ধতি প্রযুক্তিবিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়—অর্থাৎ কি ধরনের বস্তু তারা উৎপাদন করবে, কি পদ্ধতিতে তারা তা ব্যবহার করবে এবং উৎপাদনক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করবে এই সব কিছুর দ্বারা সামাজিক জীবন প্রভাবিত হয়। বর্তমান সভ্যজগতে প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে প্রাচীন যুগের সহজ সরল অর্থনীতির কথা ভাবতে গেলে অবাক লাগে। আধুনিক সংস্কৃতির বস্তুগত দিকটি একমাত্র প্রযুক্তিবিদ্যারই অবদান। এখন প্রশ্ন হল, প্রযুক্তিবিদ্যা বলতে কি বুঝি? সাধারণ অর্থে প্রযুক্তিবিদ্যা বলতে যা বোঝায় তা হল বিভিন্ন রকম বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম এবং শিল্পের প্রয়োগ কৌশল। কিন্তু সমাজবিদেরা প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নে সামাজিক এবং মানসিক প্রস্তুতি উভয় দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা মনে করেন প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নয়নকল্পে যথাযথ মানসিকতা এবং সামাজিকতার প্রয়োজন রয়েছে। সেজন্য জি. এম. ফস্টার (*G. M. Foster*) মন্তব্য করেন যে—"প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন একটি জটিল পদ্ধতি। এর দ্বারা কেবলমাত্র পার্থিব এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত উন্নতিই বোঝায় না, এর দ্বারা সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির উন্নতিও বোঝায়।"

প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নে সমাজবিদেরা প্রয়োজনীয় কারণগুলি আলোচনা করেছেন। সমাজবিদ্ কিংসলে ডেভিস (*Kingsley Davis*) প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নে নিম্নোক্ত কারণগুলিকে মূখ্য বলে মনে করেন।

প্রথম কারণ হিসেবে ডেভিস সামাজিক মূল্যমানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানসিকতার এবং মূল্যমানের তারতম্যের জন্য প্রত্যেক সমাজে সামাজিক পরিবর্তন সমানভাবে সম্পন্ন হয় না। সমাজস্থ ব্যক্তিদের মানসিক প্রগতির যে অভিব্যক্তি তা সমাজভেদে পরিবর্তিত হয়, কারণ কেবলমাত্র পরিবর্তনের জন্যই পরিবর্তনকে কোন সমাজই সরল মনে গ্রহণ করতে পারে না। পরিবর্তনশীলতা যদি যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তা হলে সে পরিবর্তনের ফল সুদূরপ্রসারী হয় না।

দ্বিতীয় কারণ হিসেবে ডেভিস মন্তব্য করেন, সমাজে প্রধান মূল্যগুলির অবস্থিতিই প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের একমাত্র কারণ নয়। এজন্য যথাযথ সামাজিক সংগঠন দরকার। যে সমাজ প্রতিযোগিতা এবং সামাজিক সচলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তা প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের সহায়ক বলা চলে। তৃতীয় কারণ হিসেবে ডেভিস বিশেষীকরণের (specialisation) উল্লেখ করেছেন। মানুষের জীবন যেহেতু ক্ষণস্থায়ী সেকারণ একই ব্যক্তির পক্ষে সমাজের সর্বপ্রকার উন্নয়নে সাহায্য করা অসম্ভব ব্যাপার। সেজন্য প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষীকরণ প্রয়োজন।

এখন প্রশ্ন হল প্রযুক্তিবিদ্যার গুরুত্ব আমাদের জীবনে এতবেশী কেন? এই প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হলে সেই সব বাস্তব অবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টিনিক্ষেপ করা উচিত যা প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিবর্তন নিয়ে আসে। প্রযুক্তিবিদ্যাগত যে পরিবর্তন সমাজে দৃষ্ট হয় নতুন কিছু উদ্ভাবন বা আবিষ্কার তারই একটা বিশেষ দিক। কাজেই এ কথা সত্য যে, আবিষ্কার বা উদ্ভাবন যদি না হোত তাহলে প্রযুক্তিবিদ্যাগত সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হোত না। প্রাচীন কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় অনগ্রসরতার মুখ্য কারণ হল, সে-যুগে নতুন কিছু আবিষ্কারের বিশেষ সুযোগ ছিল না। ফলে সমাজ ছিল একরকম নিস্তরঙ্গ। প্রযুক্তিবিদ্যা কিভাবে সমাজে পরিবর্তন সাধন করে এবং সামাজিক পরিবর্তনে প্রযুক্তিবিদ্যার অবদান জানতে হলে আমাদের প্রথমেই জানা দরকার প্রযুক্তিবিদ্যার পিছনে যে উদ্ভাবনীশক্তি কাজ করে তার উৎস কোথায়? আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের পিছনে যে কারণগুলি কার্যকর সেগুলিকে আমরা নিম্নলিখিত দিক থেকে আলোচনা করতে পারি:

(১) নতুনকে জানার জন্য মানুষের ঔৎসুক্যের সীমাপরিসীমা নেই। ফলে এই ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য এবং বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য নানাবিধ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

(২) কেবলমাত্র ঔৎসুক্যই নয়, প্রয়োজনও অনেকসময় মানুষকে নতুন কিছু উদ্ভাবনে প্ররোচিত করে। মানুষের প্রয়োজন যদি সীমিত হোত তাহলে নতুন কিছু আবিষ্কারের পথও কিছু পরিমাণে রুদ্ধ হয়ে পড়ত বলা যায়।

(৩) তবে একথাও সত্য যে, অনেক উদ্ভাবনই পৃথিবীতে সম্ভব হোত না যদি না সাধারণ বিজ্ঞানের কিছু পরিমাণে উন্নতি সাধিত না হোত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রেডিও বা টেলিভিসন আবিষ্কার কি সম্ভব হোত, যদি না বিজ্ঞানের অন্যান্য দিকগুলি সমপরিমাণে উন্নতিলাভ করত?

(৪) কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি বা বিজ্ঞানের উন্নতিই একমাত্র নতুন কিছু আবিষ্কার সূচনা করে না; যদি সম্প্রদায়ের মধ্যে উপযুক্ত মানসিকতা গঠিত না হয়। কাজেই কেবলমাত্র বাহ্যিক অবস্থার দ্বারা তা সম্ভব হোত না। প্রাচীন সমাজে নতুন কিছু উদ্ভাবন যে সম্ভব হয়নি তার মুখ্য কারণ হোল সমাজব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। সামাজিক পরিবর্তনকে সহজমনে গ্রহণ করার মত মানসিকতারও প্রয়োজন আছে।

(৫) প্রাকৃতিক সম্পদের সহজলভ্যতা উদ্ভাবনের অন্যতম কারণ। যদি না কয়লা এবং লোহা সহজলভ্য হোত, অনেক কিছুর আবিষ্কার আজকের দিনে সম্ভব হোত না।

(৬) তা ছাড়া বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রয়োজনও অস্বীকার করা যায় না। যেখানে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রসার যথাযথভাবে হয়নি সেখানে উদ্ভাবনও সেই অনুপাতে সাধিত হয়নি।

এখন প্রশ্ন, প্রযুক্তিবিদ্যা কিভাবে সামাজিক পরিবর্তনে সহায়তা করে।

বস্তুগত সংস্কৃতির পরিবর্তনে সহায়তা করে এমন দুইটি মৌলিক পদ্ধতির কথা অগবার্ণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ তিনি বলেন যে, যান্ত্রিক উদ্ভাবনের গতির সঙ্গে সঙ্গে বস্তুগত সংস্কৃতিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অবশ্য তিনি একথাও স্বীকার করেন যে, সকল বস্তুগত সংস্কৃতিই সমপরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। কোন বস্তুর ব্যবহার যখন হ্রাস পায় সে বস্তু তৈরির প্রচেষ্টাও হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয়তঃ তিনি মনে করেন যে—যান্ত্রিক উদ্ভাবনের সম্প্রসারণ সম্ভব হয় তখনই যখন কোন একটি মৌল উদ্ভাবন বিভিন্নমুখী প্রয়োগনীতিকে স্বীকার করে।

অগবার্ণ তিনটি দিক থেকে সামাজিক পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন যা প্রযুক্তিবিদ্যার দ্বারা সম্ভবপর হয়।

প্রথম প্রণালীটিকে তিনি বিকিরণ (Dispersion) বলে আখ্যাত করেছেন। প্রত্যেকটি যান্ত্রিক উদ্ভাবনেরই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ফল সমাজে দৃষ্ট হয়। অগবার্ণ তাঁর সমীক্ষায় রেডিও উদ্ভাবনের একশত পঞ্চাশটি সামাজিক ফল প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রত্যক্ষ ফল ছাড়াও যান্ত্রিক উৎভাবনের সুদূরপ্রসারী সামাজিক ফলাফলও লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বৈদ্যুতিক শক্তি উদ্ভাবনের ফলে গ্রামে গঞ্জে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগের গুরুত্ব বেড়েছে এবং নানাবিধ ছোট-খাট শিল্পেরও প্রসার সম্ভব হয়েছে। ফলে এই পরিবর্তন সমাজের বিভিন্ন দিককে প্রভাবিত করেছ, যেমন সমাজস্থ ব্যক্তিদের জীবনযাপনের মান উন্নত হয়েছে ; তাদের দৃষ্টিভঙ্গীও প্রসারলাভ করেছে এবং তাদের আদর্শ, বিশ্বাস এবং প্রতিন্যাসের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে।

দ্বিতীয় প্রণালীটিকে তিনি সমকেন্দ্রিকতা (Convergence) নামে অভিহিত করেছেন। একটি যান্ত্রিক উদ্ভাবনের যেমন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ফল সমাজে লক্ষণীয় তেমনি বিভিন্ন যান্ত্রিক আবিষ্কার সমবেতভাবে সামাজিক পরিবর্তনে সহায়তা করে। যেমন যানবাহনের উন্নতি, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং রেডিও বা টেলিভিসনের আবিষ্কারের ফলে শহর ঘেষা ব্যক্তির পক্ষে শহরাঞ্চল থেকে দূরে বসবাস সম্ভব হয়েছে এবং এইভাবেই মফঃস্বল শহরের উৎপত্তি হয়েছে। কাজেই লক্ষণীয় যে, বিভিন্ন যান্ত্রিক আবিষ্কারের সমবেত ফলশ্রুতি সামাজিক পরিবর্তন সূচিত করে।

তৃতীয় প্রণালীটিকে অগবার্ণ বৃত্তাকার (spiral) নামকরণ করেছেন। সুইডেনের সমাজবিদ গুনার মির্ডাল (*Gunnar Myrdal*) এই প্রণালীকে বৃত্তাকার ক্রমপুঞ্জিত দ্রুতগতিপ্রবাহ (circular cumulative accelerating process) বলেছেন। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক : সমাজের অনুন্নত লোকেদের জীবনযাত্রার মান সমাজস্থ অন্যান্য ব্যক্তিদের মত সমপর্যায়ভুক্ত করার জন্য ভারতসরকার অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। ফলে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চাকরির ক্ষেত্রে সুযোগ পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ফলে অর্থোপার্জনের পথও সুগম হয়েছে। অনুন্নত শ্রেণীর সামগ্রিক শিক্ষার এবং জীবনযাত্রার উন্নতির ক্ষেত্রে এই সুদূরপ্রসারী পদ্ধতির সামাজিক মূল্য লক্ষণীয়।

বর্তমান যুগে সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাব লক্ষণীয়। শিল্প বিপ্লবের আগে সমাজব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমান সমাজব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা

করলে তা বোঝা যায়। সামাজিক পরিবর্তনে প্রযুক্তিবিদ্যার বিচিত্রমুখী প্রভাব আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। প্রযুক্তিবিদ্যাগত সামাজিক পরিবর্তনকে আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে পারি।

প্রথমতঃ, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবে সমাজের ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান উন্নততর হয়েছে। নানাবিধ ব্যবহার্য দ্রব্য এবং ভোগদ্রব্যের উৎপাদন সহজতর হয়েছে এবং তা আগের তুলনায় সহজলভ্য। টেরিলিন, টেরিকট এবং শীতাতপযন্ত্রের উদ্ভাবনে জীবনযাত্রার মান উন্নতি হয়েছে। এককথায় বস্তুগত দিক থেকে জীবনকে উপভোগ করার সুযোগ পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, পরিবারের ওপর প্রযুক্তিবিদ্যার ফলাফল লক্ষণীয়।[1] ঘরোয়া উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে শিল্পকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। স্ত্রীলোকদের সমাজে মর্যাদা পূর্বাপেক্ষা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সঙ্গে সমানতালে সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে উদ্যোগী হয়েছে। স্ত্রী-স্বাধীনতা ও বিবাহসম্পর্ক তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এনেছে। স্বামীস্ত্রীর সমমর্যাদা এই প্রযুক্তিবিদ্যারই ফল। প্রাকশিল্পযুগে কৃষিভিত্তিক পরিবারের মেয়েদের ক্ষেত্রে বহির্জগতের দ্বার একপ্রকার রুদ্ধ থাকত। কিন্তু প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে একদিকে যেমন নানাবিধ সমস্যার সমাধান হয়েছে তেমনি আবার অন্যদিকে নানাবিধ সামাজিক সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে। যেমন বিবাহ-বিচ্ছেদ পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তৃতীয়তঃ, প্রযুক্তিবিদ্যার ফলে শ্রেণীকাঠামোও পরিবর্তিত হয়েছে। অনেকেই এই মত পোষণ করেন যে, প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু এ ধারণা খুবই ভ্রান্ত। আধুনিক শিল্পকেন্দ্রিক অর্থনীতি এমনই জটিলাকার ধারণ করেছে যে বিশেষ ধরনের কাজের জন্য দক্ষ শ্রমিকেরও প্রয়োজনীয়তা আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে অনেক শিল্পে নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে প্রশিক্ষণ (traning) ব্যবস্থার চালু হয়েছে। সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণী (Status group) প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রবর্তনেরই ফলশ্রুতি।

চতুর্থতঃ, প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের ধ্যানধারণা, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করেছে। ব্যক্তিরা আগের তুলনায় অনেক বেশী বাস্তবধর্মী হয়ে পড়েছে। ব্যবহারিক উপযোগিতার দিক থেকে সব কিছুকে বিচারের প্রবণতা তার মধ্যে

1. অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বৃদ্ধি পেয়েছে। অতিপ্রাকৃত জগতের এবং ধর্মের প্রতি অনাস্থাই এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফল।

পঞ্চমতঃ, প্রযুক্তিবিদ্যার ফলে রাষ্ট্রের কার্যাবলীও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাকশিল্পযুগে অর্থনীতি মূলতঃ ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হোত। কিন্তু নানাবিধ বৃহদায়তন শিল্পের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী হস্তক্ষেপ অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রাষ্ট্রগুলি জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। জনসাধারণকে নানাবিধ সমস্যা সমাধানে সমর্থ করার জন্য এবং নানা বিপদ থেকে মুক্ত করার জন্য রাষ্ট্রকে নানাবিধ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হচ্ছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সমাজজীবনে প্রযুক্তিবিদ্যার অপরিসীম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

প্রযুক্তিবিদ্যাগত ক্রমোন্নতির সময় সামাজিক পরিবর্তন কি বিশেষ একদিকে চালিত হতে থাকে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, প্রযুক্তিবিদ্যার গতিই হল একটা বিশেষ দিকে। প্রযুক্তিবিদ্যাগত কৌশলগুলি যে সব কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, সেসব কর্ম সম্পাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অধিকতর দক্ষতার প্রকাশ ঘটে। এর ফলে এক একটি কাজের জন্য এক এক ধরনের দক্ষতার বা নৈপুণ্যের সৃষ্টি হয়, ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিশেষজ্ঞের সৃষ্টি হয়। এর ফলে শ্রম বিভাগের প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। অংশের মধ্যে অধিকতর পারস্পরিক নির্ভরতা বর্তমান এমন একটি ব্যাপক সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যাগত ক্রমোন্নতির পরিণাম হিসেবে যে বিষয়গুলি দৃষ্ট হবে তা হল, পেশার ব্যাপারে সভ্যদের অধিকতর সফলতা, ব্যাপকতর আইন প্রণয়ন ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্রীভবন, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের অধিকতর অস্থায়ীত্ব, অধিকতর অবসর এবং অধিক সংখ্যক ব্যক্তির পক্ষে উন্নততর জীবনমান। ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিবিদ্যাগত দক্ষতার সঙ্গে এই অবস্থাগুলি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এদের প্রভাব সুস্পষ্ট। তা ছাড়াও এরা কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, যে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিবর্তনের কোন না কোন ধরনের সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করে। **অবশ্য এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করলে ভুল হবে যে, সব সামাজিক পরিবর্তনই প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিবর্তনের ফলস্বরূপ।** যে কোন সামাজিক পরিবর্তনই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে

প্রযুক্তিবিদ্যার দ্বারাই সংঘটিত হয়, অনেক মতবাদই এরূপ অভিমত ব্যক্ত করে। এসব মতবাদ একদেশদর্শী মতবাদ। সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে সাংস্কৃতিক উপাদান (cultural factors) বর্তমান, এই মতবাদ সেই বিষয়টিকে লঘু করে দেখতে চায়।

প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিবর্তন সর্বদাই সামাজিক পরিবর্তনের আবশ্যকীয় শর্ত। এই সিদ্ধান্ত অংশতঃ সত্য। আমরা স্বীকার করি যে, অন্যান্য উপাদান সামাজিক পরিবর্তন আনার পূর্বে কতকগুলি প্রযুক্তিবিদ্যাগত অবস্থা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু এসব শর্ত সেই সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত নাও করতে পারে। যেমন—ইটালীতে ফ্যাশিষ্ট রাজত্ব বা জার্মানীতে নাজি রাজত্বের আবির্ভাব কোন প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিবর্তনের ফলস্বরূপ নয়, অন্যান্য উপাদানের ফলস্বরূপ। এর অর্থ এই এই নয় যে, গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিবর্তন সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসে—এই সত্যকে অস্বীকার করা হচ্ছে। এর অর্থ হল যে, প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিবর্তনও মানুষের সাংস্কৃতিক ও চিন্তার জগতের পরিবর্তনের ফলস্বরূপ।

(৫) **মনস্তত্ত্বমূলক কারণ (Psychological factor) :** সমাজ হল মনস্তত্ত্বমূলক সংগঠন। মানুষের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া ও সম্পর্ক থেকেই সমাজের উদ্ভব। মানুষের মনই এই পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। মনের সঙ্গে যা কিছুর সম্পর্ক, সমাজ-জীবনের ওপর তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বর্তমান।

সামাজিক পরিবর্তনের মনস্তত্ত্বমূলক কারণ (Psychological Condition)-এর স্বরূপ বুঝে নিতে হলে অ-মনস্তত্ত্বমূলক কারণের সঙ্গে তার তুলনা করলেই তার স্বরূপটি বোঝা যাবে। "ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড়, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রত্যক্ষভাবে সমাজ জীবনের প্রাকৃতিক পরিবেশে যে পরিবর্তন সংঘটিত করে, তাহল সামাজিক পরিবর্তনের অ-মনস্তত্ত্বমূলক কারণ। মানুষের ইচ্ছা, অভিপ্রায়, আগ্রহ, মনোভাব, সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন নিয়ে আসে তা হল সামাজিক পরিবর্তনের মনস্তত্ত্বমূলক কারণ। সমাজস্থ ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে যখন সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে, স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে যখন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সমাজে প্রবর্তিত হয় এবং তার ফলে যে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অবশ্যই মানুষের ইচ্ছা, অভিপ্রায়ের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। অবশ্য অন্যান্য কারণগুলিকেও

উপেক্ষা করা চলবে না। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাকৃতিক পরিবর্তনের প্রতি বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীবশতঃ সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বৈষম্য পরিলক্ষিত হতে পারে।

এখন আলোচনা করা যাক, মনস্তত্ত্বমূলক কারণগুলি কি কি, যেগুলি সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত করে।

প্রথমতঃ, গতানুগতিকতায় অতৃপ্তি সামাজিক পরিবর্তন সূচনা করে। মানুষের মন পরিবর্তনশীল। যা অনড়, অচল, যা স্থির তাতে মানুষের মন তৃপ্ত হয় না। মানুষ পরিবর্তন চায়। যে কারণেও সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ সমাজ জীবনে ফ্যাশন (fashion)-এর প্রতি মানুষের অনুরাগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বেশ কিছু লোক যখন একটা ফ্যাশনের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে, তখন অন্যান্য লোকেরাও নতুন একটা ফ্যাশনের জন্য আকুল হয়ে ওঠে। নতুন ফ্যাশন পুরাতনের স্থান দখল করলে সামাজিক, পারিবারিক এবং অর্থ নৈতিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হয়। বিশেষ এক ধরনের পোষাক পড়ার ফ্যাশন যখন সমাজে প্রচলিত হয়, তখন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য সেই পোষাক দামী জেনেও পিতামাতাকে নিছক পারিবারিক শান্তি বজায় রাখার জন্য সেই পোষাক সংগ্রহ করতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজ প্রচলিত মূল্য (values)-গুলি সম্পর্কে মানুষের ধারণার পরিবর্তন, মানুষের দৃটিভঙ্গীর পরিবর্তনও সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। সতীদাহ প্রথা, গঙ্গায় শিশু সন্তান নিক্ষেপ প্রভৃতি প্রথাগুলি এক সময় সমাজের চোখে নীতি বিগর্হিত কার্য ছিল না। কিন্তু মানুষের নীতিবোধের পরিবর্তন বশতঃ এই জাতীয় প্রথাকে নীতি বিগর্হিত মনে করায় সেগুলি আজ সমাজ জীবন থেকে বিলুপ্ত। এভাবে নীতি বিগর্হিত অচার-অনুষ্ঠান, প্রথা প্রভৃতি বিলুপ্ত হওয়াতে সমাজ-জীবনে বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে।

তৃতীয়তঃ, মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা বোধ, স্বাতন্ত্র্য বোধ, বিচ্ছিন্নতার মনোভাব সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত করে। এই প্রসঙ্গে যৌথ পরিবারে ভাঙন এবং ব্যক্তি কেন্দ্রিক পরিবারের সমধিক প্রচলনের কথা বলা যেতে পারে। অবশ্য অর্থ নৈতিক কারণ যৌথ পরিবারের ভাঙনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কিন্তু একথা অস্বীকার করা চলে না যে, পরিবারের অন্যান্য সভ্যদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বামী-স্ত্রী মিলে ব্যক্তি কেন্দ্রিক পরিবার (Individual family) গঠনের ইচ্ছাই মূলতঃ যৌথ পরিবারে ভাঙন এনেছে।

চতুর্থতঃ, সমাজস্থ মানুষের মার্জিত রুচিবোধ সমাজ জীবনে পরিবর্তন সংঘটিত করে। এই মার্জিত রুচিবোধ অনেক সময় শিক্ষার ফলশ্রুতি। যা কিছু নিন্দনীয়, ক্ষতিকর, গ্লানিজনক মানুষের মার্জিত রুচিবোধ তাকে পরিহার করতে চায়। তার ফলে সমাজ জীবনে ব্যাপকতর পরিবর্তন সাধিত হয়। যেহেতু এই মার্জিত রুচিবোধ সমাজস্থ মানুষের একটি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয় সেহেতু যা কিছু ঘৃণ্য তার থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া সমাজের পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না।

পঞ্চমতঃ, অনুকরণের প্রতি আকর্ষণ সমাজ জীবনে পরিবর্তন সংঘটিত করে, অনেক সময় অন্য সমাজের ভাল-মন্দ মানুষ অনুকরণ করে। এর ফলে সমাজ জীবনে পরিবর্তন সংঘটিত হয়। অনেক সময় অনুকরণ প্রিয়তার জন্যই এক সমাজে প্রচলিত ফ্যাশন, অন্য সমাজে প্রচলনরূপে স্বীকৃতি লাভ করে, যার ফলে সমাজজীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়।

ষষ্ঠতঃ, নূতন আদর্শে বিশ্বাসও সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কারণ। বর্তমান যুগে ব্যক্তিগত কল্যাণের আদর্শে বিশ্বাসী না হয়ে মানুষ সমষ্টিগত কল্যাণ বা জনকল্যাণের আদর্শে বিশ্বাসী। তার ফলে প্রতিটি সভ্য সম্প্রদায় এই আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রেখে সমাজজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধনে তৎপর। জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠন বর্তমান প্রতিটি সভ্য সম্প্রদায়ের লক্ষ্য। সমাজস্থ মানুষ ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই যাতে সমাজ জীবনের সুখসুবিধাগুলি সমানভাবে ভোগ করতে পারে এই ধরণের চিন্তাধারা নূতন আদর্শে বিশ্বাসের ফলশ্রুতি বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

সপ্তমতঃ, সমাজ সংস্কারক ও দেশহিতৈষীদের প্রগতিমূলক, নূতন নূতন চিন্তাধারা সমাজ-জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সূচনা করে। এইসব সমাজসংস্কারক ও দেশহিতৈষী তাঁদের অন্তদৃষ্টির সাহায্যে সমাজের নূতন চলার পথের সন্ধান লাভ করেন এবং সমাজকে সেই পথে চালিত করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হন। তাঁরা তাঁদের উপদেশ, বাণী ইত্যাদির সহায়তায় সমাজস্থ মানুষের চিন্তা ও ভাবধারার মধ্যে পরিবর্তন সংঘটিত করে, তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হন। যা কিছু শুভ ও শ্রেয়, তাকে সমাজ-জীবনে অনুপ্রবিষ্ট করাই তাঁদের ব্রত। এর ফলে সমাজ-জীবনে পরিবর্তন সাধিত হয়।

অষ্টমতঃ, প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব সামাজিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ মনস্তত্ত্বমূলক কারণ।

সমাজ-জীবনকে সুন্দর করে তোলার জন্য অনেক সময় এক সমাজের সঙ্গে অন্য সমাজের প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে যায়। কখনও বা প্রতিদ্বন্দ্বিতাও দেখা যায়। এর ফলে সমাজে নানা ধরনের পরিবর্তন সংঘটিত হয়। উদাহরণস্বরূপ প্রযুক্তি বিদ্যাগত ক্রমোন্নতি, উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের প্রতিযোগিতা উভয় দেশের সমাজ-জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। আবার ব্যাপক সমরাস্ত্র নির্মাণের ব্যাপারে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও সমাজজীবনে পরিবর্তন সূচনা করে।

নবমতঃ, চিন্তামূলক বা ভাবমূলক দ্বন্দ্ব বা সংঘাত (Conflict) সমাজ-জীবনে পরিবর্তন আনার ব্যাপারে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনস্তত্ত্বমূলক কারণ। সমাজ-জীবনে লক্ষ্য করা যায় যে, যখনই কোন একটি বিশেষ চিন্তাধারা নিজেকে আত্মপ্রকাশ করতে চায়, তখন তার বিরোধী চিন্তাধারার আবির্ভাব ঘটে এবং এক তীব্র সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এই সংঘাত সমাজ-জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। চিন্তা বা ভাবের দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত হয় সমাজের নূতন চলার পথ, সমাজ নির্দেশ পায় কিভাবে সে অগ্রসর হবে, অবশ্য এর ফলে অনেক প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, যার প্রভাব সামাজিক জীবনের ওপর সব সময় সুখকর হয় না। সমাজের একাংশ যখন বিধিবাদের পূর্ণবিচারের কথা বলে, তখন অপর একটি অংশ তার বিরোধিতা করে। এই সংঘাত বা বিরোধ সমাজ-জীবনে এনেছে আলোড়ন, পরিবর্তন। অনেকের মতে এই বিরোধ বা সংঘাতই সমাজকে গতিশীল করে, সামাজিক পরিবর্তন সূচিত করে। যারা প্রাচীনপন্থী, যা কিছু পুরাতন তার প্রতি তাদের মোহ, আর যারা নবীনপন্থী তারা নূতনকে স্বাগত জানাতে তৎপর। কাজেই প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থীদের চিন্তাধারা বা ভাবধারার বিরোধ দেখা দেয়। এর ফলে সমাজে পরিবর্তন সাধিত হয়।

দশমতঃ, সমাজস্থ মানুষের প্রতিন্যাস (attitude) বা মনোভঙ্গীও সমাজে পরিবর্তন নিয়ে আসে। সমাজে যারা অস্পৃশ্য, তাদের প্রতি মানুষের মনোভঙ্গীর পরিবর্তন আজ সমাজ-জীবনে এনেছে এক বিরাট পরিবর্তন। কাজেই আজ সমাজ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে তৎপর। যক্ষ্মারোগী, কুষ্ঠরোগী প্রভৃতির প্রতি সমাজস্থ মানুষের পরিবর্তিত মনোভাব আজ সমাজ-জীবনে পরিবর্তন সূচনা করেছে। সমাজ-জীবন আজ তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও সুখী দেখতে চায়। ভারতীয় সমাজের এক বিরাট অংশ মনে করত সন্তান ঈশ্বরের দান, কাজেই জন্ম-নিরোধ

পাপজনক কাজ। কিন্তু বর্তমানে এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে এবং জন্ম-নিরোধের বিরোধিতা থেকে অনেকেই বিরত হয়েছেন এবং সঠিক জন্ম-নিরোধের মাধ্যমে ছোট সংসার গড়ে তুলতে প্রয়াসী। অবশ্য শিক্ষা এই প্রতিন্যাসের পরিবর্তন সাধনে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

শেষতঃ, সমকক্ষ হবার বা ছাড়িয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও সমাজ-জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে। অন্য সমাজের আমরা সমকক্ষ হব, পারলে তাকে ছাড়িয়ে যাব—সমাজস্থ মানুষের মনে এই জাতীয় ধারণা যে সামাজিক পরিবর্তনই শুধু নিয়ে আসে তা নয়, সামাজিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত করে।

পরিশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সামাজিক পরিবর্তন যে সব কারণে ঘটে, মনস্তত্ত্বমূলক শর্ত তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এর কারণ হল, মানুষকে নিয়েই সমাজ, মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের পেছনে রয়েছে মানুষের মন। মানুষের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, অভিপ্রায়, প্রত্যাশা, দৃষ্টিভঙ্গী এবং চিন্তাধারাই সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক, জৈবিক কারণবশতঃ সামাজিক পরিবর্তন ঘটলেও, সেই পরিবর্তনের প্রতি বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নূতন সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করে। বন্যায় মানুষ যখন গৃহহারা হয়, তখন তাদের পুনর্বাসন কিভাবে সংঘটিত হবে মানুষের চিন্তা ভাবনাই তা নিরূপণ করে এবং এর ফলে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়। তাছাড়া, সমাজ-বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করে সামাজিক প্রগতি (Social progress) সাধিত হয় না। সমাজস্থ মানুষ যখন তার আচরণকে বিচার-বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করে, তখনই ঘটে সত্যিকারের সামাজিক প্রগতি। কাজেই মানুষের মনের যথার্থ উৎকর্ষ সাধনেই আসে সামাজিক প্রগতি। সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে এই মনস্তত্ত্বমূলক কারণকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

৫। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক ক্রমোন্নতি, সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতির সম্বন্ধ (Relation of Social change to social Development, Social Evolution and Social Progress) :

সামাজিক পরিবর্তন বলতে কোন বিশেষ সময়ে সামাজিক গোষ্ঠী এবং অনুষ্ঠানের প্রকৃতিগত, বিষয়গত ও গঠনগত পরিবর্তন এবং ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও

অনুষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন বুঝায়। সামাজিক ক্রমোন্নতি, সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতি, এদের প্রত্যেকটিই কোন না কোন এক ধরনের সামাজিক পরিবর্তন। কিন্তু প্রতিটি পদের দ্বারা যে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয় তার মধ্যে প্রকারগত প্রভেদ বর্তমান।

'ক্রমোন্নতি' (Development) পদটি সাধারণতঃ জীবদেহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। জীবদেহের ক্রমোন্নতি সাধিত হলে জীবের আকারগত ও গঠনগত পরিবর্তন সংঘটিত হয়। 'ক্রমোন্নতি' শব্দটি সমাজের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়। সমাজ জীবদেহ নয়, কিন্তু জীবদেহের সঙ্গে তুলনীয়। জীবদেহের মতো সমাজেরও পরিবর্তন ঘটে, সমাজ সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় উপনীত হয়। শক্তি (energy), সংগঠন (organisation) এবং সামঞ্জস্যই (harmony) ক্রমোন্নতির লক্ষণ। জীবদেহের ক্রমোন্নতি সাধিত হয় তখনই, যখন জীবদেহে শক্তি সঞ্চারিত হয়, যখন অধিকতর সংগঠনের জন্য সেই শক্তি কোন নির্দিষ্ট পথে চালিত হয়, এবং যখন জীবদেহের প্রতিটি অংশের ক্রিয়ার মধ্যে এমন সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যাতে সমগ্রের বৃদ্ধি ঘটে, এবং সেই সঙ্গে অংশেরও বৃদ্ধি ঘটে। ক্রমোন্নতির সাধারণ লক্ষণগুলি সামাজিক ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান। সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক ক্রমোন্নতি সংঘটিত করে এবং সামাজিক ক্রমোন্নতির ফলে নানা ধরনের সামাজিক পরিবর্তন হয়।

সামাজিক বিবর্তন (Social Evolution) এক ধরনের সামাজিক পরিবর্তন। কিন্তু যে কোন সামাজিক পরিবর্তনই সামাজিক বিবর্তন সূচনা করে না। সামাজিক বিবর্তন হল সামাজিক আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ক্রমবিকাশের ধারায় উত্তরোত্তর জটিল অবস্থায় উপনীত হওয়া। কানিংহাম (*Cunningham*) সামাজিক বিবর্তনের দুটি দিকের কথা বলছেন। সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন এবং সামাজিক বিশ্বাস ও ধারণার বিবর্তন যা শিল্পগত, ধর্মগত, বিজ্ঞান সম্পর্কীয় ও দার্শনিক ধারণার বিবর্তনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।

সামাজিক অগ্রগতিও (Social Progress) এক ধরনের সামাজিক পরিবর্তন। যখন সমাজ কোন ঈপ্সিত লক্ষ্য বা আদর্শের দিকে অগ্রসর হয়, তখনই সামাজিক অগ্রগতির কথা বলা চলে। 'অগ্রগতি' শব্দটির নৈতিক তাৎপর্য আছে। সামাজিক অগ্রগতি সমাজস্থ ব্যক্তির নৈতিক অগ্রগতি

সূচনা করে। সামাজিক পরিবর্তনের, সঙ্গে সামাজিক অগ্রগতির পার্থক্য আছে। সামাজিক পরিবর্তন একটি মৌলিক প্রক্রিয়া নির্দেশ করে। 'সামাজিক পরিবর্তন' পদটির সঙ্গে কোন মূল্যায়নের ব্যাপার সংযুক্ত নয়। অর্থাৎ কিনা 'সামাজিক পরিবর্তন' ঘটনা হিসেবে 'নৈতিক' বা 'অনৈতিক' কোনটিই নয়। সামাজিক পরিবর্তন শব্দটির কোন নৈতিক তাৎপর্য নেই। সামাজিক অগ্রগতি পদটির সঙ্গে মূল্যায়নের ব্যাপার সংযুক্ত। সামাজিক অগ্রগতি নৈতিক উন্নতি সূচক পদ। সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নিম্নতর স্তর থেকে উন্নততর স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রশ্ন জড়িত আছে।

যে কোন সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক অগ্রগতির সূচনা করেনা। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে বা আদর্শকে লাভ করার জন্য যখন সমাজ একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে উপনীত হয় এবং যখন এই পরিবর্তন সমাজকে পূর্বের তুলনায় লক্ষ্যের অধিকতর সমীপবর্তী করেছে, তখনই সামাজিক অগ্রগতির কথা বলা হয়।

৬। বিবর্তন কাকে বলে? (What is Evolution ?) ঃ

ইংরেজি *Evolution* কথাটি এসেছে Latin শব্দ *evolve* থেকে, যার অর্থ হল বিকশিত হওয়া বা প্রকাশিত হওয়া (To develop or to unfold)। বিবর্তন হল যা অপ্রকাশিত এবং অব্যক্ত ছিল, ধীরে ধীরে তা প্রকাশিত এবং অভিব্যক্ত হওয়া। ধীরে ধীরে একটা ক্রমবিকাশের ধারায় এই অব্যক্ত ও অপ্রকাশিত নিজেকে ব্যক্ত করে। বিবর্তন (Evolution) এবং অগ্রগতি (Progress) এক কথা নয়। অগ্রগতি বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট উচ্চ বা শ্রেয় লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু গিস্বার্ট (*Gisbert*)-এর কথায়, বিবর্তনসম্মত পরিবর্তন হল "একটি ধারার বিভিন্ন শাখায় বিস্তারিত হওয়া, যে শাখাগুলি আবার অনির্দিষ্টভাবে প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে।"[1]

বিবর্তনবাদ অনুযায়ী জগৎ ও জগতের প্রতিটি বস্তুই সরল অবস্থা থেকে ক্রমবিকাশের ফলে জটিল অবস্থায় এবং সমসাত্বিক অবস্থা থেকে বিষমসাত্বিক অবস্থায় (from homogeneous to heterogeneous stage) উপনীত হয়েছে। বিবর্তন বলতে কেবলমাত্র ক্রমবৃদ্ধি বোঝায় না। বিবর্তনের ক্ষেত্রে

---

1. "If we revert to the question of evolutionary change we may describe it as the branching off, of a line in various direction, which again ramify indefinitely."

—*Gisbert : Fundamentals of Sociology* Page 374.

পরিবর্তন কেবলমাত্র আকারে নয়, গঠনেও। যদি কোন বস্তু বা কোন কিছু সম্পূর্ণভাবে বাইরের শক্তির দ্বারা পরিবর্তিত হয় তাহলে তাকে আমরা বিবর্তন বলি না। বস্তুটির গঠনের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি তার দ্বারা পরিবর্তিত হলেই তবে তাকে বিবর্তন বলি। এই মতবাদ অনুযায়ী বর্তমান পৃথিবীতে যে বিভিন্ন শ্রেণীর জীব (species) আমরা লক্ষ্য করি, অতীতের কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর জীব থেকে উদ্ভূত হয়ে ক্রমবিকাশের পথে সেগুলি বর্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে।

সামাজিক বিবর্তন বলতে বোঝায় মানুষের আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সরল অবস্থা থেকে ধীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জটিল অবস্থায় উপনীত হওয়া।

৭। সামাজিক বিবর্তনের স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ (Different Theories on the Nature of Social Evolution) :

প্রশ্ন হল, সমাজের এ ধরনের কোন বিবর্তনের কথা বলা যেতে পারে কিনা ?

ডারউইন (*Darwin*)-এর 'Origin of Species' গ্রন্থ প্রকাশিত হবার বহু পূর্ব থেকেই যদিও বিবর্তনের ধারণাটির সঙ্গে লোকের পরিচয় ছিল, তবু সামাজিক বিবর্তনের ধারণাটি জৈবিক বিবর্তন সম্পর্কীয় মতবাদগুলি থেকেই সরাসরি নেওয়া হয়েছে। জীববিদ্যা সম্পর্কীয় বিজ্ঞানে বিবর্তন হল একটি জীবের ক্রমবিকাশ। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি বস্তু ধারাবাহিকভাবে তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে চলে এবং এই প্রতিযোজনের মাধ্যমে তার নিজ স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করে। ফলতঃ, এই পরিবর্তন বস্তুর সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত। হারবার্ট স্পেন্সার থেকে সামনার (*Sumner*) পর্যন্ত অনেক সমাজ-বিজ্ঞানী সামাজিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নানাভাবে জৈবিক বিবর্তনের ধারণাকে প্রয়োগ করেছেন।

অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, 'বিবর্তন' সমাজের বা সামাজিক বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে না। তাঁদের মতে সামাজিক বিবর্তন বলে কিছু নেই, আছে সামাজিক পরিবর্তন। কিন্তু কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী যেমন ম্যাকাইভার (*MacIver*) সামাজিক বিবর্তনের সত্যতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে তাঁদের মধ্যে সামাজিক বিবর্তনের প্রকৃতি সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়।

হারবার্ট স্পেন্সার (*Herbert Spencer*)-এর মতে সমাজের বিবর্তন বিশ্বের সাধারণ বিবর্তন প্রক্রিয়ারই একটি অংশ বা অঙ্গ। সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, ক্রমবিকাশের ফলে সামাজিক ব্যবস্থা সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায়, সমসাত্বিক অবস্থা থেকে বিষমসাত্বিক অবস্থায় উপনীত হয়েছে। সাবাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে ঐক্যবিধান এবং পৃথকীকরণ পাশাপাশিই চলতে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ব্যবস্থার (Social systems) আবির্ভাব ঘটে। সমাজবিজ্ঞানী স্পেনসার (*Spencer*)-এর মতে বিবর্তন প্রক্রিয়ার তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে। যথা—(১) ঐক্যবিধান (Integration), (২) পৃথকীকরণ (Differentiation) এবং (৩) নিয়মানুগত্য (Determination)। প্রথমতঃ, ঐক্যবিধান প্রক্রিয়া অনুযায়ী বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সংহতির (system) সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ, পৃথকীকরণের ফলে ঐক্যের বা সংহতির মধ্যে আবার বিভেদ দেখা দেয়। তৃতীয়তঃ, এই ঐক্যবিধান ও পৃথকীকরণ একটি নিয়ম মেনে চলে। হারবার্ট স্পেনসার-এর মতে সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রেও এই তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

পরিবার হল সমাজের কেন্দ্রীয় সংগঠন। সমাজের বিবর্তনের প্রথম অবস্থায় বিভিন্ন পরিবার বিভিন্ন সংগঠন হিসেবে বিশৃঙ্খল অবস্থায় পরস্পরের থেকে বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। ঐক্যবিধান প্রক্রিয়ার ফলে এই সব বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত পরিবার সুসংবদ্ধ হয়ে সমাজ গড়ে তুলল। দ্বিতীয়তঃ, পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া অনুসারে শ্রমবিভাগহেতু এই সমাজের মধ্যে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির আবির্ভাব ঘটল। কিন্তু ঐক্যবিধান প্রক্রিয়া অনুসারে এগুলি আবার সুসংবদ্ধ হয়ে নতুন সামাজিক সংগঠনের সৃষ্টি করল। এই ঐক্যবিধান ও পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করে, কাজেই বিবর্তন প্রক্রিয়ার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়মানুগত্যও কার্যকরী হয়। হারবার্ট স্পেনসার-এর মতে সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক অগ্রগতির এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

ম্যাকাইভার ও পেইজ (*Maclver and Page*)-এর মতে সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে নৈতিক অগ্রগতির কোন সম্পর্ক নেই এবং বিবর্তনের মূল প্রথা হল পৃথকীকরণ (defferentiation)। তাঁদের মতে সামাজিক বিবর্তন হল একটা সংহতির (system) মধ্যে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের ফলে একটি সংহতি বা সমগ্রতার মধ্যেই আকারগত ও ক্রিয়াগত বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

ই. সি. হেজ (*E. C. Hayes*)-এর মতে[1] সামাজিক বিবর্তন মানুষকে এক নিম্নতর অবস্থা থেকে উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত করে। সামাজিক বিবর্তনই মানুষকে মর্যাদা দান করে এবং তার মধ্যে নৈতিক চেতনা এনে দেয়। তাঁর মতে সামাজিক বিবর্তনের পথে নতুন ধরনের কলার (Art), সাধারণ ধারণার (Concepts) এবং নৈতিক আদর্শের ও সামাজিক আদর্শের আবির্ভাব ঘটে।

কোন কোন সমাজবিজ্ঞানীর মতে[2] সামাজিক বিবর্তনের একটা নির্দিষ্ট গতিপথ আছে। সামাজিক বিবর্তন হল ধীর ক্রমবিকাশের ধারায় উত্তরোত্তর অবস্থায় উপনীত হওয়া।

সমালোচনা (Criticism) :

সামাজিক বিবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজ দার্শনিকদের অভিমতগুলি এবার বিচার করে দেখা যাক :

বিবর্তনের ধারায় সমাজ সমসাত্ত্বিক থেকে বিষমসাত্ত্বিক অবস্থায় উপনীত হয়েছে—হারবার্ট স্পেনসার-এর এরূপ ধারণাও ভ্রান্ত। তাছাড়া, হারবার্ট স্পেনসার সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতিকেও অনেকটা অভিন্ন বলে ধারণা করেছেন, তাও যথার্থ নয়। কোন এক সময় একটি নতুন সামাজিক ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটেছে বলেই যে সেটি ভাল তা বলা চলে না।

অনেকে মনে করেন যে, সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতি এক ও অভিন্ন, কিন্তু সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতি অভিন্ন নয়, সামাজিক বিবর্তন হল সমাজের ক্রমবিকাশ। সামাজিক অগ্রগতি হল একটি লক্ষ্যের বা আদর্শের অভিমুখে সমাজের অগ্রগমন ও ক্রমোন্নতি। সামাজিক বিবর্তনের গতি যে সকল সময়ই নৈতিক, সৌন্দর্যগত ও বুদ্ধিগত আদর্শের দিকে এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত নয়। সমাজের বিবর্তন অনেক সময় কোন নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কোন লক্ষ্যের অভিমুখে নাও চলতে পারে।

ম্যাকাইভার ও পেজ (*MacIver and Page*)-এর অভিমতও সর্বাংশে সত্য নয়। সমাজের বিবর্তনের মূলে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া বর্তমান থাকলেও কেবলমাত্র ঐক্যবিধান এবং পৃথকীকরণ—এই দুই প্রক্রিয়ার সাহায্যে সামাজিক

---

1. *E. C. Hayes* : Introduction to the Study of Sociology. Page 282.
2. *Bogardus* : Sociology, Page 389.

বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ প্রক্রিয়া ভাষা এবং ধর্মের বিকাশের ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়। বাংলা, গুজরাটি, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃত থেকে আগত হলেও সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য এ ভাষাগুলিতে নেই। কেবলমাত্র পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলেই ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি পরিবার বা রাষ্ট্র থেকে উৎপন্ন হয়নি। এখানে অন্য শক্তিও কাজ করছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পৃথকীকরণ প্রক্রিয়াকে প্রয়োগ করা যায় না। একথাও বলা হয় যে, যেহেতু সমাজ মানসিক ব্যাপার, সেহেতু সমাজের বিবর্তন হল মনের বিবর্তন। কিন্তু মন তো কেবলমাত্র পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা চালিত হয় না, সরলতা এবং সমন্বয় (simplification and synthesis) প্রক্রিয়ার দ্বারাও সমাজের বিবর্তন ঘটে থাকে।

এসব কারণে অনেকে মনে করেন যে, সমাজের পরিবর্তনকে 'সামাজিক বিবর্তন' না বলাই যুক্তিযুক্ত।

সিদ্ধান্ত (Conclusion) :

আবার কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সামাজিক বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। গিন্‌সবার্গ (*Ginsberg*) তাঁর '*The Concept of Evolution*' প্রবন্ধে সামাজিক বিবর্তনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন—"এ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা শেষ পর্যন্ত নতুন কিছু উৎপাদন করে কিন্তু যার পরিবর্তনের মধ্যে একটা সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতা আছে।[1] বিবর্তন মানেই যে সরলতা থেকে জটিলতায় যাওয়া, গিন্‌সবার্গ তা স্বীকার করেননি। তাঁর মতে এ বিশ্বজগৎ যে-কোন পূর্ববর্তী সরল অবস্থা থেকে উদ্ভূত, তা বিশ্বাস করার কোন সংগত কারণ নেই। আদিম যুগের ভাষা যে বর্তমান যুগের ভাষার তুলনায় অনেক সরল ছিল, তা ঠিক নয়।

গিন্‌সবার্গ বিবর্তনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল দুটি : (১) পরিবর্তনের মধ্যে একটা কিছু যা স্থায়ী এবং (২) নতুনত্ব। সমাজের বিবর্তন তার অভ্যন্তরীণ শক্তির দ্বারাই প্রধানতঃ সাধিত হয়, যদিও বাইরের পরিবেশকে উপেক্ষা করা চলে না। এ দিক থেকে দেখতে গেলে সমাজবিবর্তন হচ্ছে সমাজস্থ ব্যক্তিদের বিবর্তন। গিন্‌সবার্গ বলেন, "যে যথার্থ বিকশিত হচ্ছে সে হল সমাজস্থ মানুষ, যারা কথা বলে, চিন্তা করে

1. "It is a process, of change culminating in the production of some thing new but exhibiting an orderly continuity in transition."

—*M. Ginsberg : Studies in Sociology*, Page 78.

এবং ধর্মানুরাগী"।[1] কিন্তু এ মানুষের বিবর্তন হলেও সমাজের সমগ্রতা এবং ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতেই এ বিবর্তনকে বুঝে নিতে হবে। অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তনের যে উপাদান সেগুলি সমাজের অভ্যন্তরে নিহিত থাকে। একথা ঠিক যে, সামাজিক পরিবর্তনের মূলে আছে সমাজস্থ ব্যক্তির মন, বিভিন্ন মনের পারস্পরিক ক্রিয়া এবং তার পরিণতি। কিন্তু যদিও সামাজিক ঘটনা মানুষের জটিল ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার পরিণাম এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই তাদের জানা যায়, তবুও মানুষ যদি একটা সমগ্রতার অঙ্গস্বরূপ হয়ে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা না করে, তবে কোন সামাজিক ঘটনা কখনই সম্ভব হতে পারে না। গিন্‌সবার্গ বলেন, "কিন্তু যদি ব্যক্তিই সমাজ তৈরি করে থাকে, তাহলে, এও সমান সত্য যে, সমাজ ব্যক্তিকে তৈরি করে।"[2] সুতরাং সমাজের বিবর্তন যেমন এক হিসেবে ব্যক্তির বিবর্তন, তেমনি সমাজেরও বিবর্তন।

সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি থেকে বিচার করলে উপরিউক্ত মতকে গ্রহণ করা যায়।

৮। সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতি (Social Evolution and Social Progress) :

সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতি এক ও অভিন্ন নয়। বিবর্তনের (evolution) মধ্যে রয়েছে ঐক্যবিধান এবং পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া, অগ্রগতি (progress) "হল এমন এক দিকে ক্রমোন্নতি বা বিবর্তন যা কোন আদর্শ বা মূল্যের বিচারসিদ্ধ মানকে পূরণ করে।" (a development or evolution in a direction which satisfies rational criteria of value.)

ইংরেজী Progress কথাটি ল্যাটিন শব্দ *Progradi* (*Pro* = সামনে এবং *gradi* = যাওয়া) থেকে উদ্ভূত যার অর্থ হল সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া বা অগ্রগতি। অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটা লক্ষ্য থাকে। যখন কোন পরিবর্তন লক্ষ্যের অভিমুখে বস্তুকে চালিত করে তখন লক্ষ্য থেকে বস্তুটি কতদূরে আছে তার সাহায্যে বস্তুর কতটুকু অগ্রগতি হল তা বোঝা যায়।

---

1. "The real subjects undergoing development are men of societies who speak and think and are religious."

—*M. Ginsberg : Studies in Sociology*, Page 82

2. But if individuals make society, it is equally true that society makes individuals.

—*M. Ginsberg : Studies in Sociology*. Page 87.

সমাজের বিবর্তন হল সমাজের বিকাশ বা ক্রমবৃদ্ধি। সামাজিক অগ্রগতি হল মানুষ যে সামাজিক ও নৈতিক গুণগুলিকে মূল্য দেয়, সমাজস্থ মানুষের জীবনে সেই গুণগুলিকে অধিকতর প্রকাশ, বিকাশ ও স্থায়িভাবে রূপায়িত হওয়া।

সামাজিক বিবর্তনের ফলে সমাজের বাইরের এবং ভেতরের নানারকম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সমাজের অগ্রগতির বিষয়টি অন্য মানদণ্ডের সহায়তায় বিচার্য। অগ্রগতি নির্ধারণ করার জন্য নৈতিক আদর্শের প্রয়োজন। সমাজের অগ্রগতি হল সমাজস্থ ব্যক্তির অগ্রগতি এবং ব্যক্তির নৈতিক উন্নতি তার অগ্রগতির অন্যতম অনিবার্য শর্ত। কিন্তু অনেকে মনে করেন, সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে নৈতিকতার বা নৈতিক মূল্যের কোন সংযোগ নেই। অগ্রগতির সঙ্গে সম্পর্ক আদর্শের, বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্ক বাস্তব ঘটনার। ম্যাকাইভার (*MacIver*) বলেন, 'সংক্ষেপে বিবর্তন হল বৈজ্ঞানিক ধারণা এবং অগ্রগতি হল নৈতিক ধারণা'।[1]

সামাজিক বিবর্তনের ফলে সমাজের বাহ্যিক রূপ ও অভ্যন্তরীণ স্বরূপের কতকগুলি পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু তা বলে এমন কথা বলা যেতে পারে না যে, তাতে সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। হবহাউস (*Hobhouse*) বলেন, "কোন একটি বস্তু বিবর্তিত হয়, এতে প্রমাণ হয় না যে সে-বস্তুটি ভাল। সমাজ বিবর্তিত হয়েছে, এতে প্রমাণ হয় না যে সমাজের অগ্রগতি হয়েছে।[2]

কিন্তু অনেক লেখক উভয়কে অভিন্ন গণ্য করেছেন। কোঁৎ (*Comte*), হারবার্ট স্পেন্সার, লেস্টার ওয়ার্ড (*Lester ward*) প্রমুখ মনে করেন যে, সমাজের বিবর্তন সমাজের অগ্রগতি সূচনা করে। উদাহরণস্বরূপ, সমাজবিজ্ঞানী হারবার্ট স্পেন্সার মনে করেন যে, সমাজ যখন বিবর্তিত হতে থাকে, তখন সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়। তাঁর মতে সামাজিক বিবর্তন মূলতঃ সামাজিক অগ্রগতি। কিন্তু এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। সমাজের বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করলে অনেক সময় দেখা গেছে যে, সমাজের অগ্রগতি সাধিত না হয়ে সমাজ পশ্চাদগামী হয়েছে। হবহাউস (*Hobhouse*) হারবার্ট স্পেন্সারের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি যে, সামাজিক বিবর্তন সামাজিক

1. "......in short......evolution is a scientific concept and progress an ethical concept." *MacIver* : *Society*; Page 525

2. "The fact that a thing is evolving is no proof that is good, the fact that society has evolved is no proof that it has progressed.

—*Hobhouse* : *Social Evolution and Political Theory*

অগ্রগতির সূচক। তাঁর মতে সামাজিক অগ্রগতি সমাজের ব্যক্তিদের নৈতিক উন্নতির ওপর নির্ভর এবং সে কারণে উভয়ের মধ্যে কোন সংযোগ নেই। হবহাউসের মতে সামাজিক অগ্রগতি স্বতস্ফূর্তভাবে ঘটে না, সমাজের ব্যক্তিদের সচেতন প্রচেষ্টায় একে লাভ করা যায়। সমাজস্থ ব্যক্তির যখন নৈতিক মূল্য লাভে যত্নবান হয় তখনই সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়।

কিন্তু হবহাউসের অভিমত সন্তোষজনক নয়। তিনি সামাজিক অগ্রগতিকে নৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করেছেন। সামাজিক অগ্রগতির মধ্যে সমাজের নৈতিক, জাগতিক, বুদ্ধিগত এবং সৌন্দর্য সম্পর্কীয়, সব রকম অগ্রগতিই নিহিত। যখনই আমরা অগ্রগতির কথা চিন্তা করি তখনই আমরা কোন আদর্শের কথা চিন্তা করি এবং সমাজের অগ্রগতির কথা চিন্তা করার সময় আমাদের দেখতে হবে সমাজ সেই আদর্শের দিকে কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে। সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে আদর্শের কোন সম্পর্ক নেই।

সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক অগ্রগতির সম্পর্ক থাকতে পারে, কিন্তু সামাজিক বিবর্তনের আলোচনায় সামাজিক মূল্যের প্রশ্নটিকে অযথা টেনে না নিয়ে আসাই যুক্তিযুক্ত। অবশ্য সমাজে বসবাস করতে হলে সামাজিক মূল্যের (Social Values) দিকটিকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করতে গিয়ে তার মধ্যে নৈতিক মূল্যকে টেনে নিয়ে আসা বাঞ্ছনীয় নয়। যখন শান্ত এবং ধীরভাবে কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে কোন বৈজ্ঞানিক ঘটনা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, তখন অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নৈতিক আদর্শকে টেনে আনা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধী।[1]

সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক অগ্রগতির কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা বিচার করে দেখা যেতে পারে, কিন্তু তা তখনই সম্ভব হবে যখন সামাজিক বিবর্তনকে নৈতিক বিষয় বহির্ভূত ঘটনারূপে প্রথমেই পর্যবেক্ষণ করা হবে।

---

1. অবশ্য নৈতিক মুল্যাবধানের ব্যাপারটিকে এড়িয়ে কাজ করা সকল সময় সম্ভব নয়। তাছাড়া, প্রতিটি সামাজিক ঘটনার দুটি দিক আছে—একটি বাস্তবতার দিক এবং অপরটি মূল্যের দিক। ম্যাকাইভার ও পেইজ (*MacIver and Page*)-এর কথায় "এসব তথ্য, কিন্তু সামাজিক মূল্যাবধারণের থেকে উদ্ভূত বলে সেগুলি মূল্যগত তথ্য। (They are facts but they are also value-facts arising out of social valuations)। সকল সামাজিক পরিবর্তনের এ দুটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান। সে কারণেই একটি থেকে আর একটিকে আলাদা করে দেখা উচিত।

৯। সামাজিক অগ্রগতির স্বরূপ (The Nature of Social Progress) :

সামাজিক অগ্রগতি এবং সামাজিক বিবর্তন এক বিষয় নয়, যদিও উভয়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। গিন্‌সবার্গ (*Ginsberg*) অগ্রগতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "এ হল এমন এক দিকে ক্রমোন্নতি বা বিবর্তন যা কোন আদর্শ বা মূল্যের বিচারসিদ্ধ মানকে পূরণ করা"।[1] অগ্রগতি হল কোন একটি অভীষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া। সুতরাং অগ্রগতির ব্যাপারে দুটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যথা—লক্ষ্যের স্বরূপ কি এবং সেই লক্ষ থেকে বস্তুটি কতদূরে। আমরা সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ঠিক এই জিনিসকেই বুঝে থাকি। যখন আমরা সামাজিক অগ্রগতির কথা বলি তখন আমরা সর্বপ্রথম একটা আদর্শ সমাজের কথা কল্পনা করি, এই আদর্শ সমাজই হল লক্ষ্য যার অভিমুখে সমাজ অগ্রসর হয়। এই আদর্শ সমাজ হল এমন একটা সমাজ যার ভিত্তি হবে সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর উৎস। যে-সমাজে প্রতিটি মানুষ নিজেকে পূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারবে, যে-সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি জনকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করবে, সে-সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ্য হবে সমষ্টিগত কল্যাণ লাভ করা, সেই সমাজে মানুষ কি পার্থিব, কি নৈতিক, কি আধ্যাত্মিক, সকল দিক দিয়েই তার পূর্ণতা লাভ করবে। সমষ্টিগত পার্থিব সুখ ও শান্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উপাদান—নীতিবাদিরা এই মত পোষণ করেন।

সাধারণতঃ, যদি আমরা দেখি কোন সমাজে মানুষ নিজেকে বিকশিত করার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করেছে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের, কলা ও শিল্পের উন্নতি সাধিত হচ্ছে এবং সেখানে নিরাপত্তা, বন্ধুত্ব, সাধুতা, শ্রমশীলতা, আন্তরিকতা, ভালবাসা, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা এসব বর্তমান আছে এবং সে-সমাজে মানুষ নীতিনিষ্ঠ, সামাজিক চেতনাসম্পন্ন, পরার্থপর ও জনকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ, তখন সে-সমাজ যে অন্য সমাজের তুলনায় অধিকতর বাসের যোগ্য তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে কোন একটি সমাজের তুলনায় অন্য সমাজের অগ্রগতি অধিক সাধিত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা খুব সহজ নয়, যেহেতু সেক্ষেত্রে ইতিহাস, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের মনস্তত্ত্বমূলক দিকগুলির সুস্পষ্ট জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মনস্তত্ত্বমূলক দিকটি বিশেষ করে অসুবিধাজনক, কারণ, যাঁরা পুরাতনপন্থী তাঁরা

1. "A dvelopment or evolution in a direction which satisfies rational criteria of value." —*M. Ginsbery : The Idea of Progress ;* Page 42.

মনে করেন অতীত সব সময়ই বর্তমানের তুলনায় ভাল এবং যাঁরা আধুনিক তাঁরা সকল সময় বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রশংসাতেই মত্ত।

কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় নৈতিক মূল্যের কোন স্থান নেই এবং যেহেতু সামাজিক অগ্রগতির ভিত্তি নৈতিক মূল্যের ওপর, সেহেতু সে অগ্রগতির কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। সামাজিক সম্পর্ক (**Social Relation**) এবং সামাজিকতা (**Sociability**)—এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে যখন নৈতিক অনুভূতি অনুপ্রবিষ্ট হয় তখনই সামাজিকতার সৃষ্টি। সামাজিক মূল্যের সঙ্গে নৈতিক মূল্য যুক্ত হলে তবে সমাজ গতিশীল হয়, উন্নত হয়। বস্তুতঃ, নৈতিক মূল্যকে বাদ দিলে যেমন ব্যক্তিগত জীবনের কোন অর্থ থাকে না অর্থাৎ ব্যক্তির উন্নতি বা অগ্রগতির প্রশ্ন আসে না, অনুরূপভাবে নৈতিক মূল্যকে দূরে সরিয়ে দিলে সামাজিক অগ্রগতির প্রশ্ন অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

নৈতিক উন্নতির কথা বাদ দিলে সমাজের অগ্রগতির প্রশ্ন অবাস্তব এবং অর্থহীন। হারবার্ট স্পেন্সার-এর (*Herbert Spencer*) অভিমত যে, সমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলে। সমাজ-দার্শনিক হবহাউস (*Hobhouse*) তা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে মানুষের ইচ্ছার দ্বারাই সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব এবং সামাজিক অগ্রগতি সমাজের মানুষের নৈতিক অগ্রগতি। জন্ ডিউই (*John Dewey*)-ও স্বীকার করেন যে, সামাজিক অগ্রগতি মানুষের ইচ্ছার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষ যখন সামাজিক পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত করে তখনই সামাজিক অগ্রগতি দেখা দেয়।

সমাজ যখন তার লক্ষ্য বা আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে, তখন সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়। কিন্তু সমাজের অগ্রগতির পথে যে কোন প্রতিবন্ধক দেখা দেয় না, তা নয়। সময় সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যা সমাজের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকরূপে দেখা দেয়।

যেহেতু সামাজিক অগ্রগতি জাগতিক ও মানসিক অবস্থার ওপর নির্ভর সেহেতু যে অবস্থাগুলি সমাজের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকরূপে কাজ করে সেগুলি জাগতিক ও মানসিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কুসংস্কার, প্রাচীন রীতি-নীতির প্রতি বিচারবিযুক্ত আনুগত্য, ধর্মান্ধতা, সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের ব্যর্থতা ইত্যাদি সমাজস্থ ব্যক্তিদের মনে গঠনমূলক চিন্তার উন্মেষে বাধা সঞ্চার করে সামাজিক অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে পারে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির

প্রতি যে-সমাজ উদাসীন, যে-সমাজ সামাজিক জীবনের পরিবর্তিত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন সাধন করে না, প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করে না, সে-সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। গোষ্ঠী সংঘাত, সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রীতির সম্পর্কের অভাব, সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক চেতনার অভাব সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণ সাধনে সমাজস্থ ব্যক্তিদের উদাসীনতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেগুলি সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত করে। সর্বোপরি নেতৃত্বের অভাব, কুশাসন, ত্রুটিযুক্ত সামাজিক আদর্শও সমাজের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক।

বিজ্ঞানের উন্নতি জাগতিক উন্নতির পক্ষে, সুতরাং সামাজিক অগ্রগতির পক্ষেও বিশেষভাবে সহায়ক। বিজ্ঞানের সহায়তায় কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করা চলে এবং সমাজস্থ ব্যক্তিদের জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা চলে। যদি সমাজস্থ ব্যক্তিদের জাগতিক প্রয়োজন মেটে, তাহলে সংগঠনমূলক চিন্তার অবকাশ ঘটে এবং জীবনের উচ্চতর প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য ব্যক্তিরা সচেষ্ট হতে পারে। সামাজিক অগ্রগতি জাগতিক উন্নতি ছাড়াও ব্যক্তির মানসিক উন্নতির ওপর নির্ভরশীল। কাজেই সমাজে সমাজস্থ ব্যক্তির শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন। সাধারণ লেখাপড়া ছাড়াও প্রতিটি ব্যক্তি যাতে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাহায্যে কোন বৃত্তির জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে সে-দিকেও সমাজের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শিক্ষা যে কেবল ব্যক্তির বুদ্ধিগত উন্নতি সাধিত করে তা নয়, তাকে সামাজিক দায়িত্ব পালনে সচেতন করে। যদি সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করে, তাহলে সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হতে পারে না। কাজেই উপযুক্ত শিক্ষা সমাজের অগ্রগতির পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক। উপযুক্ত সামাজিক আদর্শও সমাজের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে সহায়তা করে। উপযুক্ত নেতৃত্ব, সুন্দর শাসনব্যবস্থাও সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে সহায়ক। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সমাজের ব্যক্তিদের মধ্যে নৈতিক ও সামাজিক চেতনা জাগ্রত হলে, তারা সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণ সাধনে ব্রতী হয় এবং তখনই সমাজের অগ্রগতির পথে যেসব প্রতিবন্ধক দেখা দেয় সেগুলি দূরীভূত হয়।

অনুশীলনী

১। সামাজিক পরিবর্তন বলতে কি বুঝ? সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলি কি কি?
(What do you mean by social change? What are the factors of social change?)

২। ইহা (সমাজ) চলমান, স্থায়ী নয়—ইহা একটি পদ্ধতি, ফলশ্রুতি নহে—আলোচনা কর।
(It (society) is becoming not being, a process, not product" —Discuss.

৩। প্রযুক্তি বিদ্যা কিভাবে সামাজিক পরিবর্তন ঘটায়?
(How does technology cause social change?)

৪। সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে পরিবেশ এবং সংস্কৃতির ভূমিকা আলোচনা কর।
(Discuss the role of environment and culture as factors of social change.)

৫। সামাজিক পরিবর্তনের দেহগত এবং মনস্তত্ত্বমূলক কারণ ব্যাখ্যা কর।
(Disscuss the biological and psychological reasons for causing social change.)

৬। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক ক্রমোন্নতি, সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক প্রগতির পার্থক্য কি?
(How does Social change differ from Social Development, Social Evolution and Social progress ?)

৭। সামাজিক বিবর্তনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। সামাজিক বিবর্তনের সাথে সামাজিক প্রগতির পার্থক্য নিরূপণ কর।
(Explain the nature of Social Evolution. Distinguish between Social Evolution and Social progress).

৮। সামাজিক বিবর্তনের অর্থ সামাজিক প্রগতি নয়—ব্যাখ্যা কর।
(Social Evolution does not mean social progress—Explain.)

পরিভাষা

A

Attitude—প্রতিন্যাস
Accommodation—উপযোজন
Assimilation—আত্তীকরণ
Associative—সংযোগকারী
Agrarian—কৃষিভিত্তিক
Anomic division of labour—নিঃসঙ্গতাবর্ধক শ্রমবিভাগ
Arithmetical progression—সমান্তর-

C

Community—সম্প্রদায়
Custom—আচার
Casteism—জাত্যাভিমান
Cultural lag—পরিবর্তনজনিত অসঙ্গতি
Clan—গোষ্ঠী
Conjunctive—সংযোগকারী
Craft guild—হস্তশিল্পী সংঘ
Charismatic—ঐন্দ্রজালিক
Cumulative Method—স্তূপীকৃত ভোটদান পদ্ধতি
Convergence—সমকেন্দ্রিকতা

D

Dissociative—বিযুক্তকারী
Disjunctive—বিয়োগকারী
Dialet—প্রতীক
Ductless gland—রসক্ষরাগ্রন্থি
Double-Cropping—দু'চারবার শস্য উৎপাদন
Determination—নিয়মানুগত্য
Dispersion—বিকিরণ

E

Exogamous—বহির্গোষ্ঠী বিবাহকারী
Emigration—প্রবাসণ

F

Face-to-face—মুখোমুখি
Formal group—বিধিবদ্ধ গোষ্ঠী
Folkways—লোকাচার
Feudal system—সামন্তপ্রথা

G

Group mind theory—গোষ্ঠীচেতনাবাদ
Group mind—গোষ্ঠীমন
Group spirit—দলীয় মনোভাব
Group marriage—গোষ্ঠী বিবাহ
Guild system—সংঘবদ্ধ প্রথা
Geometrical progression—গুণোত্তর-হারে

H

Horizontal mobility—অনুভূমিক সচলতা

I

Institution—অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান)
Industrial—শিল্পভিত্তিক
Inter-action—ক্রিয়া-প্রক্রিয়া
Individualisation—ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীকরণ
Impersonal—নৈর্ব্যক্তিক
In-group—অন্তর্গোষ্ঠী
Informal group—অবিধিবদ্ধ গোষ্ঠী
Involuntary group—অনৈচ্ছিক গোষ্ঠী
Industralisation—শিল্পায়ণ
Immigration—অভিবাসণ
Immaterial—অপার্থিব

J

Juvenile Delinquency—কিশোরদের দুর্বিক্রিরিয়তা

L

Law of causation—কার্যকারণ নিয়ম
Limited vote plan—সীমাবদ্ধ ভোটপদ্ধতি

M

Mores—লোকনীতি
Moron—স্বল্পবুদ্ধি
Matrilineal—মাতৃবংশানুক্রমিক
Matrilocal—মাতৃবাসস্থানিক
Matriarchal—মাতৃকর্তৃক
Monogamy—একগামিতা
Maternal—মাতৃতন্ত্রিক
Manorial system—ভূস্বামী প্রথা
Mechanical solidarity—যান্ত্রিক সংহতি
Motor skill—পেশী-চালনার দক্ষতা
Migration—পরিযাণ

N

Normative—আদর্শনিষ্ঠ

O

Objective—ব্যক্তিসাপেক্ষ
Organic theory—জৈবমতবাদ

Out-group—বহির্গোষ্ঠী
Organic Unity—সাংগঠনিক সংহতি

P

Preliteate—অক্ষরপূর্বজ্ঞান সম্পন্ন
Positive—বস্তুনিষ্ঠ
Polyandry—বহুস্বামীক
Polygamy—বহুবিবাহকারী
Promisuity—অনিয়ন্ত্রিত যৌনসম্ভোগ
Patrilineal—পিতৃবংশানুক্রমিক
Patrilocal—পিতৃবাসস্থানিক
Patriarchal—পিতৃকর্তৃক
Polygamy—বহুগামিতা
Polygyny—বহুপত্নীকত্ব
Paternal—পিতৃতান্ত্রিক
Proportional Representation—আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি
Pendular—পুনরাবির্ভাবশীল
Pantheism—সর্বেশ্বরবাদ

S

Sociology—সমাজবিদ্যা
Social science—সামাজিক বিদ্যা ও সামাজিক বিজ্ঞান
Social Control—সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
Social mobility—সামাজিক সচলতা
Socialisation—সামাজিকীকরণ
Social stratification—সামাজিক স্তরবিন্যাস
Social category—সামাজিক বর্গ
Social aggregate—সামাজিক সমষ্টি
Social pathology—সামাজিক ব্যাধিবিজ্ঞান
Symbolic communication—প্রতীক-মূলক যোগাযোগ
Subjective—ব্যক্তিনিরপেক্ষ
Sense of alienation—বিচ্ছিন্নতাবোধ
Superstracture—উপরিকাঠামো
Spiral—বৃত্তাকার
Social equilibrium—সামাজিক ভারসাম্য
Social Evolution—সামাজিক বিবর্তন
Social progress—সামাজিক প্রগতি
Social Development—সামাজিক ক্রমোন্নতি

T

Technology—প্রযুক্তিবিদ্যা

U

Uniformity—একরূপতা
Universal—সার্বিক
Unilateral—একপাক্ষিক
Unilinary—একাভিমুখী

V

Vertical mobility—উল্লম্বী সচলতা
Voluntary group—ঐচ্ছিক গোষ্ঠী

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ ॥ ষ্টুডিও. ডি. ব্যানার্জী ॥ কলিকাতা ১২